রংমশাল

সূচীপত্র — ১৩৫১

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

লেখকের নাম	রচনার নাম	পৃঃ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	বাজার গরম	১৯১
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	মোহনবাগান	১৯৯
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	হিংস্থটে	২০৪
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	ভ্যাবাচাকা	২১১
অজিত দত্ত	একাচোরা	১০৭
অজিত দত্ত	নইলে	২৭৩
অন্নদাশঙ্কর রায়	হনুমানের গান	১৪৫
অন্নদাশঙ্কর রায়	ময়নার মা ময়নামতী	১৬১
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভুতপত্রীর যাত্রা	৭,৫৬,১০৮,১৪৫, ১৬১, ১৯১,২০৪, ২৩৩, ২৪৬, ২৬১
আনন ঘোষাল	টপ্‌কা ঠগী	২২
আনন ঘোষাল	বিড্ গ্যাম্বলিঙ্	৯১, ১২৩
	আফ্রিকার অন্ধকার জঙ্গলে	১১২
	আমাদের লাইব্রেরি	১০৪, ২৮২
ইন্দিরা দেবী	দুই বন্ধু	২৯
ইন্দিরা দেবী	ভাবীগৃহিনীর বৈঠক	৪৭
এডালবার্ট স্টিফ্‌টর	পরের দিন বড়দিন	২০৮, ২৩৬, ২৫৫, ২৬২, ২৭৩
	এ-বছরের ফুটবল লিগ	১৩৪
	এ-বছরের লিগ-চাম্পিয়ন মোহনবাগান	১৭১

লেখকের নাম	রচনার নাম	পৃঃ
	এ-বছরের শিল্ড-হোল্ডার বি-এণ্ড-এ-আর	২০০
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১২৭
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	স্থকুমার রায় ও Monday Club	২২৭
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	হল্‌দি ঝর্ণা	২৪৬
কালিদাস নাগ	স্থকুমার রায়	২২৫
কালিদাস রায়	জাতক কথার পরিচয়	২০
কালিদাস রায়	কর্মীর মুক্তি	৫৫
	কৈফিয়ত	১৪৩
	কোন টিম এ-বছর লিগ পাবে ?	১৫৬
গোষ্ঠ পাল	সেকাল আর একালের ফুটবল	১৫৫
	চলন্তিকা	৪১,৯৩,১৫৭,১৭১,২০১, ২১৫,২৬[illegible]
	চিঠির বাক্স	৪৫,১০৫
দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার	ক্যাঙারু	১
দেবব্রত ঘোষ	মেঘের দেশের পরী	৬১
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	মিস্টার রবট	১৫১
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	ঘড়িও নয় ঘোড়াও নয়	২৫১

লেখকের নাম	রচনার নাম	পৃঃ
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব	১৬৯,১৯৭ ২১১,২৩৫,২৬৬
ধরণী সেন	পিন্টুসেনের পেনসেন	৪৯
	ধাঁধাঁর উত্তর	৫৪,১৫৮,১৭৩,২০২, ২১৬,২৪২,২৫৭,২৭২
নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	আনন্দরঙীন দিনগুলি	১০২
নীলিমা দেবী	কাঠ-ঠোকরার মাথায় কেন ঝুঁটি ?	১৫২
নীলিমা দেবী	সুকুমার রায়ের ছবি	২২২
	নতুন ধাঁধা	৫৪,১০৬, ১৪০, ২৫৮, ১৭৩,২০২,২১৬,২৪২, ২৫৭,২৭২,২৮৩
পরিমল রায়	কয়েকটি কবিতা	২৩৪
পরিমল রায়	কবিতা	২৫১
পরিমল রায়	হালদারের হা-হুতাশ	২৬৭
পরিমল রায়	কণ্টকে কমল	২৭৮
প্রদীপ সেন	মরীচিকার ম্যাজিক	৯৫
প্রভাতকিরণ বসু	অভিশপ্ত বংশ	১৭,৭৭,১১৫
প্রেমেন্দ্র মিত্র	উল্টো-পাল্টা ছড়া	২১৭
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	স্মৃতি তর্পণ	২২০
বুদ্ধদেব বসু	দিগ্বিজয়ীর দিদিমা	১৬৫
বুদ্ধদেব বসু	কবি সুকুমার রায়	২১৯
মহাশ্বেতা দেবী	কেন এদের ভালোবাসে	১৫
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	মশাল	১৪৭,১৬৩,১৯২,২০৬,২৪১ ২৫৩,২৬৪
মাণিক রায়	অষ্টম আশ্চর্য	৪
রঞ্জিতভাই	মহাচীনের ছেলেমেয়ে	৮[illegible]
রঞ্জিত সিংহ	ঘুম পাহাড়	২[illegible]
রামনাথ বিশ্বাস	প্রাগ	[illegible]
	রংমশাল বৈঠক	৯৮,১৩৯,১[illegible] ১৭২,২০০,২১৪,২[illegible]
লীলা মজুমদার	ন'টেমামা	১[illegible]
লীলা মজুমদার	সুকুমার রায়	২[illegible]
লীলা মজুমদার	৺সুবিনয় রায়	২[illegible]
লীলা মজুমদার	পদীপিসির বর্মি বাক্স	১৬৪,১[illegible] ২০৫,২৩৩,২৫০,২৬৪,[illegible]
শিবরাম চক্রবর্তী	কীর্তি যস্য—!	[illegible]
শিবরাম চক্রবর্তী	ভাইফোঁটার উপহার	[illegible]
	শিশু-শিল্প প্রদর্শনী	[illegible]
শৈল চক্রবর্তী	আদি কেষ্টর অ্যাডভেঞ্চার	
শ্রীশামুক	ফিঙেবাবুর অসুখ	[illegible]
শ্রীশামুক	চায়ের পেয়ালায় তুফান	[illegible]
সত্যব্রত ঘোষ	উঁচু নজর	[illegible]
	সম্পাদকের দপ্তর	১৫৮,১৭৩,[illegible] ২১৬,২৩১,২৪২,২৪৫,[illegible]
	সম্পাদকের লিখন	[illegible]
সুকুমার দে সরকার	কারিগর	[illegible]
সুকুমার রায়	কবিতা (হাতের লেখার প্রতিলিপি)	[illegible]
সুকুমার রায়	নিরুপায়	[illegible]
সুকুমার রায়	আড়ি	[illegible]
সুকুমার রায়	তেজিয়ান	২২২
সুকুমার রায়	আশ্চর্য	২৩১
	সুকুমার রায়ের আঁকা ছবি	২১৯,২২৪
সুনির্মল বসু	পাহাড়ী স্মৃতি	২৮
হরপ্রসাদ মিত্র	স্বর্গীয়	১৬৬
হেমেন্দ্রকুমার রায়	জয়ন্তের পুনরাগমন	১১, ৭১, ১৬৭,১৯৫
হৈমন্তী চক্রবর্তী	দাসীর মেয়ে আর রাজার মেয়ে	১৯৮

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ।

ডিরেক্টার-বর্গ।

মিঃ জে. সি. মুখার্জ্জি — বার-অ্যাট্-ল—ভূতপূর্ব্ব প্রধান একজিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন। ডিরেক্টার—আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট কোং। ইত্যাদি

খান বাহাদুর এম. এ. মোমিন সি. আই. ই. — ডিরেক্টার—নিউ এসিয়াটিক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ, আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ। ইত্যাদি

মিঃ জি. ভি. সোয়াইকা — প্রোঃ—সোয়াইকা অয়েল মিলস্, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—সোয়াইকা কেমিক্যাল এণ্ড মিনারেল কোং লিঃ। সোয়াইকা ফার্টিলাইসর লিঃ, সোয়াইকা ষ্টাণ্ড অয়েল এণ্ড বার্ণিশিং কোং। ইত্যাদি

মিঃ এন্. সি. চন্দ্র — ডিরেক্টার—ন্যাশনাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ, বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ, মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ। ইত্যাদি

মিঃ বি. সি ঘোষ — কণ্ট্রোলার—হিন্দুস্থান কোঃ অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ।

মিঃ এস. দত্ত—(ম্যানেজিং ডাইরেক্টর) — ডিরেক্টার—এইচ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ, রামচন্দ্র ভপুর টি কোং লিঃ, ইণ্ডিয়া কলেক্টীভ ফার্ম। ইত্যাদি

আদায়ী মূলধন	৯,২৫,০০০ টাকার উর্দ্ধে
গচ্ছিত আমানত	১,১০,০০০ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন	১,৫০,০০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে

জেনারেল ম্যানেজার—**জে. এন্. সেন,** বি. এ., এফ. আর. এস. (লণ্ডন)

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.
Founded by Prof. K. N. Sen.

রংমশাল

নবম বর্ষ (১) — বৈশাখ ১৩৫১

ক্যাঙ্গারু

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

এক

ক্যাঙ্গারুকে নিশ্চয় চেন তোমরা ?

—অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারু ?

—তা নয়।

—চিড়িয়াখানার ? খুব চিনি।

—মোটেই নয়। বোস পাড়ার কালীবাবুর ছেলে।

ওর আসল নাম হচ্ছে করালীকিঙ্কর। ও রকম দাঁতভাঙা নাম আমি উচ্চারণ কখনো করতে পারি নে।

আসল করালীকিঙ্করেরা অর্থাৎ ভূত দানা প্রেতেরা যে দেখতে কেমন, তাই বা কে বলবে ? ওর চেহারা যেমন, তা দেখে ওর নতুন বন্ধুরা যদি ওকে রামকিঙ্কর বলে বসত সেলাম দিয়ে তাহলে মানাত কিনা, শুধু বলতে পারেন যাঁরা ছবি আঁকেন।

ওর, মামাই নাশ করলেন। ওর ছেলেবেলার লাফিয়ে চলার ভঙ্গী দেখে তিনিই প্রথম ওকে ক্যাঙ্গারু বলে ডাকতে সুরু করলেন।

তবু এ রকম দেশছাড়া নাম অবশ্য কারুই প্রথমে পছন্দ হয় নি।

শেষে পাড়ার লোকেরা তো বটেই, ওর মা বাবাও কবে থেকে ওকে ওই নাম ধরেই ডাকতে লাগলেন।

নামে বিখ্যাত এই ছেলেটি আসলে বাঁপায়ে ছিল একটু খাটো। সেটুকু সামলাতে এক এক সময় ও এমন ঝাঁকি দিয়ে চলত যে আপ্‌না থেকেই পৃথিবীর অভিধানে ওর জন্যে ওই নামটাই এসে পড়ত। এই জন্যেই ওর মামার দোষ কেউ আর দিতে পারে নি।

কিন্তু ভাগ্নেকে ওই রকম নাম দিয়ে ওর মামার বোধ হয় মনের কোণে কোথায় একটুকু উসখুস করত। ঠিক সময়ে তাই তিনি এগিয়ে এলেন। কালীবাবু পেন্সান নিয়েছিলেন ক'বছর থেকেই। অল্পই পেন্সান। ছোট ভাইয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও তাঁকেই হয় দেখতে। যে সম্পত্তিটুকু আছে তারও আদায় নেই। দুর্দ্দিনে বেশ একটু মুস্কিলেই পড়েছেন বৈ কি? ওই একটি মাত্র ছেলে, খেলার মাঠের ধার দিয়ে যারা যায়, এমন হাজার লোকের চোকে পড়ে সে ছেলেটি—জানা নেই বটে, মনে মনেই তাদের এসে যায় ওর নামটি। শুধু ইস্কুলটারই ছিলনা কপালে যে বিখ্যাত হয় ওর নামে। আসল নামটিও কাটিয়ে ও একেবারে সব রকম ধরা ছোঁয়াকে টপকে' এসেছে।

মামা দেখলেন এতটা ডিঙনো ওর ঠিক হয় নি। পড়া আর শুনো ও দুটোকে যা-ই করুক, বয়সটা বেড়ে চলেছে, দু'পয়সা ঘরে আনাটাকেও যদি ডিঙিয়ে যায়, সে কথাটা ভাল হবে না। কাজেই তাঁর ক্যাঙ্গারুকে তিনি খেলার মাঠে যতই ছেড়ে দিন না কেন, কাজের ঘরে এনে বললেন, এবারে ব'স্‌।

বসতে বলে পড়ে গেলেন মামাই মুস্কিলে। পা দু'টিতে ওর বিদ্যে যতই থাক্‌, বসবার মত বিদ্যে ওর পেটে পিঠে খুঁজে বা'র করা বেশ শক্ত। অনেক তিনি ঘুরলেন। কিন্তু ওকে বসাবার মত ঠিক জায়গা হয় তো ভয়েই আর উকি দিলে না।

মামা দেখলেন, বসাটা বিধাতা লেখেন নি ওর জন্যে একেবারে। কাজেই তখন তেমন কাজের জন্য তিনি গেলেন তাঁর বন্ধু অতুল রায় মহাশয়ের কাছে, তিনি হয় তো এ. আর. পির আফিসে ওকে ওয়ার্ডেন করে নিতে পারেন। তা হলে মাইনের দিকটাতেও

সেখানে, আর ভাল ছেলেদের সঙ্গ, দু' দিকেই ও কিছু একটা পাবে। বিশেষ করে ওর দাঁড়ান বেড়ানটা ঠিক রয়েই গেল।

অতুলবাবু ওকে দেখে এবং ওর পরিচয় পেয়ে ভারি খুসী হয়ে গেলেন। মামাকে থ্যাঙ্কস্‌ দিয়ে বললেন—"বাঃ! তোমার ভাগ্নে? দিব্বি লম্বা চেহারা ত! নামটাও, করালীকিঙ্কর, পুরুষ মানুষের খাঁটি নাম। তা, এতদিন নিয়ে আসনি কেন?"

—"অন্য জায়গাতেও একটু আধটু চেষ্টা হচ্ছিল।" বলে' মামা ইসারা করলেন ডান পায়ে চেপে দাঁড়াতে ক্যাঙ্গারুকে। — —ওয়ার্ডেন হতে এসেছে, বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়লে চলবে না।

নিজের সত্যি নামটা ক্যাঙ্গারু প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ প্রশংসা শুনে ডান পা-টাতে চেপে ও বেশ্‌ উঁচু হয়ে দাঁড়াল। দেখতে প্রায় যেন শিখ ছেলের মত। অতুলবাবু দেখে বললেন, "না, না, বেশ্‌ করেছ এনে, এছেলে এখেনেই Shine করবে।"

ক্যাঙ্গারু পা চেপে আর দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে থেকে ভর্ত্তি হয়ে গেল।

বাইরে এসে আদরে মামা বললেন, "খুব রক্ষে করলি! যা হোক, এবারে মিলিটারী হচ্ছিস্‌, তোর আসল নামটার মান রাখিস বাপু।"

দুই

কিন্তু যেটা সত্যি সত্যি ওর নাম হয়ে গেছে, সেটাকে চাপতে গিয়েই মহা গোল বাঁধল। —

—মাঠে লাইন করে ড্রিলের বেলা, পোযাক টুপি এঁটে ও যখন দাঁড়াল, ওর খাঁটি পুরুষালী নামটার সঙ্গে ওকে মানাল, চমৎকার। মামা ওকে বসতে দিতে পারেন নি, কিন্তু দাঁড়িয়েই ওর শোভা হল খুব। সৌরীন্‌ ছিল দলের মধ্যে সব চেয়ে লম্বা, তার হিংসে হতে লাগল। মনীশ ছিল সব চেয়ে খাটো, সে ভয় খেয়ে গেল, মার্চ্চ করবার বেলায় তার পা দুটোতে কুলোবে কি না। মাঝারি রমেন ভাবলে এতদিন তবু মাঝারি বলে খাতির ছিল, এবারে তাও গেল। পা আর দাঁত চেপে মিলিটারী ক্যাঙ্গারু এমন ভাবে দাঁড়াল নাক আর বুক সমান এগিয়ে, যে, দেখে লাইনের ওয়ার্ডেনেরা ভাবলে, ড্রিল এবারে সাবধানে করতে হবে। ও জিনিষটে মোটেই ছেলেখেলা নয়।

"এটেন্‌সান !"

সমস্ত লাইন জমাট হয়ে রইল।

ষ্টাফ্ অফিসার বেশ করে দেখে গেলেন। তা'পর হাঁকলেন—"রাইট, টার্ণ !"

লাইনটে একেবারে ডাইনে ঘুরে গেল। —ক্যাঙ্গারু ঘুরল একেবারে বাঁয়ে।

- -সে ডান পা চেপেই দাঁড়ায়, সে···পা-টাকে ঘুরোতে গিয়ে, পৃথিবীতেই উল্টোলো আগে।

সেটাকে সামলাতে গিয়ে ক্যাঙ্গারু যখন আবার ঘুরলে, তখন ওর মামার দেওয়া নামটা এক মিনিটে সারা ওয়ার্ডেনের লাইনে ছড়িয়ে গেল।

এরপর লেফ্‌ট টার্ণের বেলায় যা হল, তাতে লাইনটেকে, আর, নিজেকে সামলিয়ে রাখাই ষ্টাফ-অফিসারেরও হল বিষম দায়।

অবশেষে সেদিনের ড্রিল চুকে গেল। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই মুস্কিল হল এই যে, রাইট আর লেফ্‌টের বেলায় সব ক'জন ওয়ার্ডেনেরি হঠাৎ ধাঁধাঁ লেগে যায় যে—কোন্ দিকে ঘুরবে—কি, ঘুরবে কি ঘুরবে না।

এরপর অবশ্য পড়ে যায় রৈ রৈ।

সত্যি করে বলতে গেলে, এ ওয়ার্ডের ওয়ার্ডেনের দলটা অনেকটা ক্যাঙ্গারুর দল হয়েই দাঁড়াল।

অবিরাম হাওয়া লেগে গিয়ে ক্যাঙ্গারুর।

তিন

এরি মধ্যে দেখা গেল, সারা কলকাতাও প্রায় ক্যাঙ্গারুর দল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় তার চাইতেও বেশি। বোমা না আসতেই বাসে ট্রামে ঝুলছে লোক। ষ্টেসনগুলোতে, পথেঘাটে, কারু পা আর মাটিতে নেই। ক্যাঙ্গারুর মতই, প্রিয় জিনিষগুলোকে থলের ভিতর পুরে, লোক নিরুদ্দেশ হতে চাইছে।

এই সময়ে কিন্তু আমাদের ক্যাঙ্গারুর দল, কাজের বেলা, সত্যিকার ক্যাঙ্গারু লাফের চাইতেও হয়ে উঠল বিশেষ সুপটু। ওদের উদ্যোগের হাসির বর্ষায় আর আকাশ ভরা জ্যোৎস্নায়

সহরটা ভাসছে। এর ভিতরে পূব দিক থেকে বোমারু আসছে এই একটা খবর এসে গেল। ওয়ার্ডেনদের তখনি একটা পাকা রেজিমেণ্ট গড়ে উঠল। যোগ্য লোকদের উপর পড়ল এক একটা কাজের ভার। সৌরীন্ সেন সাইরেন watch করবে বলে, তার নামটাই বদলে' হল—সাইরেন সেন। বলাই বোস তার বেল্ট কসে এঁটে দাঁড়াল বম্বার বোস হয়ে। ফটিক চাটুয্যে সামনে এসে জায়গা নিলে ফাইটার (Fighter) চাটুয্যে টাইটেলে। S. P. Tarruffder সাহেবী ধরণে নাম লেখে, সে হল Spit-Fire. ভূষো কালির রং কালিদাস—এক ডাকে হল Black-Out ভট্টচায্। কিন্তু ক্যাঙ্গারুর নাম নিয়েই হল সমস্যা। ওর এবারের নাম কি হবে? একজনে বললে ও হোক 'ক্রীম ক্রেকার'। তার কারণ হচ্ছে, ও ছোট একটা ছেলের কান্না শুনে ছুটেছিল সাইরেন শুনেছে মনে করে।

এ নিয়ে হয় তো তুমুল কিছু হত, কিন্তু অখিল—মানে All Clear দত্ত তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দিলে যে, ও হোক 'কাঁদুনে গ্যাস্'।

কথার মাঝখানে······হঠাৎ হুইস্‌ল্ বেজে উঠল—ওয়ার্ডে।— —জোর সাইরেনের আওয়াজের ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে। তারপরেই আকাশের জ্যোৎস্না তোলপাড় করে প্লেনের শব্দ, বাড়ীতে বাড়ীতে জানালা কবাট বন্ধের শব্দ, "আলো নিভাও!" 'আলো নিভাও!' হাঁক। তিনটে বোমারু আর ফাইটার প্লেন এদিক ওদিক দিয়ে চলে গেল। পিছনেই উঁচুতে এক বিশাল বোমারু গুম্ গুম্ শব্দ করে মেঘ-লোক কাঁপিয়ে গেল। আধ মিনিটের ভিতরে এ্যাণ্টি ক্রাফ্‌টের গর্জ্জন আর মানুষের চীৎকার।

ওয়ার্ডেনরা এসে দাঁড়াল কয়েকটা বাড়ী ঘিরে—একটা ভীষণ বোমা পড়েছে, কিন্তু ফাটে নি। কোন্ মুহূর্ত্তে ফাটে—ঠিক নেই। এ পাড়া হয়তো একেবারে উড়ে যাবে।

ওয়ার্ডেন পোষ্ট থেকে ফোনের উপর ফোন চলল, এ. আর. পির কণ্ট্রোলারও এসে পড়লেন। নানা দল থেকেই ওয়ার্ডেনরা তাদের সাজ সরঞ্জাম নিয়ে এসে ভিড় করে ফেললে। হুলস্থুল একটা ব্যাপার—কি করে এ পাড়া বাঁচান যায়?

সবাই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাবছে বোমাটাকে নিয়ে কি করা যায়! বালির বস্তা চাপা দেওয়া হবে, না, মাঠে নিয়ে ফেলা হবে। এই নিয়ে খুব জটলা চলল। ওর চার ধারে পাহারার গণ্ডী দিয়ে রাখা হয়েছে। পাড়াটা শ্বাস বন্ধ করে যেন স্তব্ধ হয়ে আছে।

ওয়ার্ডেনদের কারো কারো যে মাথার চুল লোহার টুপিগুলির ভিতরে ক্রিকেট পোষ্ট হয়ে দাঁড়ায় নি তাই বা কে বলবে? কিন্তু কি করে বালির বস্তা চাপা দেওয়া যায়? কে

এগুবে ? কে দেখে আসবে ঠিক কোন্ জায়গায় বোমাটা রয়েছে ? বের করা সেটা যাবে কিনা ? সাইরেন সেন কোথায়—ফাইটার, বম্বার বোস কোথায় Spit-Fire ! শিখের মত লম্বা আর গুর্খার মত বেঁটে কারো এগোবার সাহস নেই ।—বোধ হয় বোমাটা এবার ফাটছে !

একটি লাফ ! এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে, বোমাটাকে দেখতে পেয়েই ছুহাতে তাকে জড়িয়ে তুলে ছুটে চলে গেল মাঠের দিকে—ক্যাঙ্গারু, আমাদের কাঁছনে গ্যাস,—চোকের নিমিষে পূবে গর্ত্তের মধ্যে সেটাকে ফেলে দিয়ে—ছুটে দাঁড়াল এসে ভাঙা পাচিলটার দক্ষিণ ধারে।

সব দিকে হৈ হৈ শব্দ।

চারদিকের অবাক লোক প্রথমে কেউ কেউ হয়তো জোরে চোখ বুজে ছিল। তার পরেই কোলাহল। কতক লোক ছুটে চলল তার দিকে, ভেঙে চলল গণ্ডীর লাইন।

— —একটা জোর হুইস্‌ল !

হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে এ. আর. পির কন্ট্রোলার বললেন মোটা গলায়—"চুপ করুন ! চুপ করুন !—এই আমাদের সত্য ওয়ার্ডেন ! ও বোমাটা একটা মিথ্যে বোমা, আমরা ফেলিয়েছি ইচ্ছে করে,—ওয়ার্ডেনরা কি রকম কাজ করতে পারে—ঠিক সময়ে, তা জানবার জন্যে। আমাদের ছেলেদের মধ্যে সত্য বীর আছে, তা জেনে আমরা যথার্থ গর্ব্ব বোধ করছি।" চোকের নিমিষে তিনি এগিয়ে গিয়ে, করালীর হাত ধরে তাকে কাছে টেনে বললেন, "এইবার বোমাটা খুলে দেখ, ওতে রয়েছে ছুহাজার টাকার নোট—বীরের যোগ্য পুরস্কারের জন্য।"

অতুল রায় ছিলেন সামনের দিকে। চশমাটা খুলে তিনি আনন্দে চোকের জল মুছছিলেন।

ওয়ার্ডেনরা এসে ঘিরে দাঁড়াল ক্যাঙ্গারুকে।

লাফ—ক্যাঙ্গারু দিলে না বটে একটুও, কিন্তু এ. আর. পিতে এসেছিল-যে ও চাকরীই করতে সে কথা গেল ভুলে, মনে মনে ভাবলে, এক লাফে মামাকে গিয়ে বলি—আমারি ভাইবোনদের ভেবে—দেশের পায়ে নীরবে শুধু একটা প্রণাম করতে এলেম, তাতে কেনই টাকার কথা ? ও সব, মামা, তুমি পারো গিয়ে—ভাবো।

৮, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩

ভুতপত্রীর যাত্রা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ভুতপত্রী যাত্রার প্রস্তাবনা ॥

। আসর জমাটি সাট ।

প্রবেশ ঃ—বাঁধনদার, বাজনদার গাজনদার··· ।

গীত ॥

অ আ রাত কয়টা ?
একটাই রাত্—মনে হয় হতেই চায় না প্রভাত !
বোধ হচ্ছে রোঁদ্-ঘড়িটা বলছে, বেজে গেছে সব কয়টা !
আসরটা বেঁধেছে ঘেসে-জমিনে,
পেতেছে তত্বপরে ভিজা তক্তা,
গাড়তে ভুলেছে পিরেক্ কয়টা ॥

গাজন্—গান গাইতে আসা ভাইরে বাদশা বাবুর বাড়ী
গান নাই তামুক নাই নিশা হৈল ভারি—
বাঁধন—অ আ ভায়া রাত কয়টা ?
বাজন—পান দিল, গুয়া দিল, দিল নাই চুণ
কীবা বলবাম্ বাবু মশার গুণ ?
বাঁধন—অ আঃ মশাঃ
গাজন—দেখি, যাণ সৌকৎ লোক লৌকৎ দৌলৎ মন্দ্ ভারি
বাজন—পান তামাক্ দেবার বেলায় হাত টান্ সবারি
বাঁধন—অঃআ যাত্রা আর গায় না
সকলে—হাই হাই বাদশা বাবুর যাই বলিহারি ॥

গীত ॥

ভোলা মন আছে ঝাড় লণ্ঠন, তেল বাতির নাই জপম্
ত্যাল্ ও নাই পুরাতন হ্যারিকন্ লণ্ঠনটায়
বৈঠকখানায় ফরাশ বিছায়, আসরে ফরাশের নাই দর্শন,
দর্পণ আঁটা দেয়ালে, দেয়াল-গিরিতে লাগলো গ্রহণ ॥

। ম্যানেজারের প্রবেশ ।

গীত ॥

দাদা ঢাকে ঢোলে দেওনা চাঁটি
না হলে যে আসর মাটি।

গাজন—বাতি নইলে আসর জমাটি হয় কখনো কর্ত্তা ?

ম্যানেজার—দাদা বাতি জ্বলবে এলেই দেশলাই, বলছি বাতি জ্বলবে যখনকার তখন,
ভাবনা কি বাতি আসবে কাঁচি আসবে সব আসবে, আমি ম্যানেজার
ক্ষিতিশ চন্দর আছি যখন—জম জমাটি করবোই আসরটা !

বাঁধন—বেঁচে থাকো ম্যানেজার ভাই, তুমিই এখানে হর্ত্তা কর্ত্তা !
আমাদের আর কেউ নাই
দেখো যেন তামুকটা আসটা পাই।

(ম্যানেজারের গীত)

ম্যানেজ্‌মেন্ট চাই !
এক আমি আছি ওল্ড্ সারভেন্ট
নিউ-ইণ্ডেন্ট্‌স আর সবকটা চাকর বাকররাই
কলুতে কি হলুদের খবর নিতে পারে ভাই ?
আমি এক আছি বলে চারিদিক সামলাই-সুমলাই।
ঢাকের সময় ঢোল, ঢোলের সময় খোল,
খোলের সময়—গোলে হরিবোল।
এ সকোল হিছাব কেবা বোঝে ? কারে বা বোঝাই ?
ও ভুতো মাষ্টার
বেক্‌গ্রৌণ্ড্ সামলে বাজিও কনসার্
—সুর সার বেঁধে ফেল ভাই
পুরোপুরি পার্চমেন্টাল্ বাস্থি চাই
আমি আর কিছু চাইনা—আসরে প্রপর ম্যানেজমেন্ট চাই ॥

(বুড়ো জমাদারের প্রবেশ)

জমাদার—আরে বাবু হিঁয়া বক্ বক্ কর্‌তা, যাও পিশিমা মাসিমা বুলাতা—

ম্যানেজার—এই যে যাই, ম্যানেজমেন্টো চাই, বুঝেছো তো গোঁসাই !

বাজন্দার গাজন্দারের

॥ বাদ্য গীত ॥

ধিরকুট্ ধিরকুট্ তানা নানা, ভুতপাত্র পালা গানা
ইহাগচ্ছ উহাগচ্ছ, গয়ং গচ্ছ কেন কচ্ছ তানা নানা।
পরে আসছে তিল্‌কুট্ বিস্কুট ভাজা চানা
গীদ্ ধর শুনতে পাচ্ছ ভুতনাথ মামা ॥

॥ ইতি আসর জমাটি সাঙ্গ ॥

"অথ ভুতপত্রীর যাত্রারম্ভ"

॥ ভুতনাথের নান্দি ॥

ভুত চৌদশীর বারবেলাতে ভুতপত্রীর যাত্রা জমাতে
মন কর তন্নাম স্মরণ
যন্নাম ভুতভয় প্রভৃত উৎপাত বারণ অঘটন ঘটন নিবারণ !

। মাসি পিসি বন্দনা ।

॥ গাজন্দার বাজন্দার বাঁধন্দার ॥

। বালক সঙ্গীত ।

মাসি পিসি বনগাঁ বাসি বনের ধারে ঘর
কখন মাসি বল্লে না যে খৈ মোপটা ধর
পিসি রাঁধেন দিশি রান্না
কাঁকড়া দিয়ে কুমড়োর ডালনা
চাখতে কেউ পান্ না।
কত কান্না কাটি ঝগড়া ঝাঁটি তাই নিয়ে
হাঁটা হাঁটি বরাবর
কাশীপুর কলকাতা বরানগর
বাগেরহাট যশর !
খোঁজাখুঁজি দেশ দেশান্তর,
আরে ভাই ঘুমের মাসী ঘুমের পিসি

ঘুম দেন তাই ভালোবাসি
ও সে ঘুমপাড়ানি মাসি পিসির ঘুমের বাড়ী ঘর
বাটা ভরে পান খান পিচ্ ফেলান ভাবর ভাবর
খিড়কি ছুয়োর খোলে যদি
ফুরুৎ করে সেঁধাই ঘর
সুরুৎ করে বেরোই পরে সরু সুতার কাপড় ॥

(বাঁধন্দার, জুড়ি দোহার, গাজন্দার বাজন্দার)

আরে ওই দেখা যায় মাসির বাড়ী—
চারিদিকে মালঞ্চ ঘেরা
গাড়ী-বারাণ্ডা বারো দোয়ারী ;
ফাটকে হুঙ্কার সিংগী শার্দ্দুল সিংগী
দিন্ কি রাত কি দেয় পাহারা
কাছে নাই গলি কুচা
গড়বন্দি পাঁচিল উচা
পাথুরে চুণকাম করা
তথৈবচ শুনা যায় পিসির বাড়ী,
বাড়ীর মত বাড়ী চমৎকার—
যান্ বন্দর প্রস্তর গড়া !
ছুয়ের মাঝে অলজ্ঘাচর, পশুপক্ষির নাই চলাচল
মরুথল রোদ জল ঝড় বাতাসে ঘেরা ॥
বাঁধনদার—হাঁহে, প্রসঙ্গত শুনিয়া মাসি পিসির সমাচার
অবু বাবুর মন হৈল ছুই স্থান দেখিবার
লোক লস্কর সঙ্গে পাল্কি চড়ি রঙ্গে
প্রথমে মাসির বাড়ী হল আগুসার ।
তৎপরে পিসির বাড়ী তাড়াতাড়ি
কি ভাবে গমন হল তাঁহার,
ভুতপাত্র পালা গানে ধরা গেল এখানে
তারি সমাচার ॥
ইতি যাত্রার সুচনা

জয়ন্তের পুনরাগমন

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম

পাঁচলক্ষ টাকা

তাদের সাধ ছিল, গোটা পৃথিবীটার বুকের উপর দিয়ে দৌড়োদৌড়ি ক'রে আসে।

আমরা জয়ন্ত আর মাণিকের কথা বলছি। তারা পৃথিবী-ভ্রমণে বেরিয়েছিল। সুমাত্রা, জাভা ও বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপ বেড়িয়ে, গিয়েছিল তারা রহস্য-ভীষণ আফ্রিকায়। সেখানে বৎসর-খানেক কাটিয়ে তারা দক্ষিণ য়ুরোপের কয়েকটি দেশ দেখে ইংলণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

চমৎকার লাগছিল। নানা দেশ, নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা আচার-ব্যবহার! কখনো অকূল নীলসাগরের তরঙ্গ-দোলায়, কখনো বিজন গহন বনের ভিতরে চির-সন্ধ্যা-অন্ধকারে, কখনো রৌদ্রতপ্ত, রুদ্র মরু-জগতের নির্জ্জল ও নিস্তব্ধ হাহাকারের মধ্যে, কখনো তুষার-ঝটিকায় বিচিত্র, বরফে-মোড়া তুঙ্গ গিরি-শিখরে মেঘরাজ্যের কাছে! কখনো জাভার বড়-বুদ্ধের মন্দির-চাতালে, কখনো মিশরের পিরামিডের চূড়ায়, কখনো গ্রীসের পার্থেননের প্রাচীন মর্ম্মর-স্বপ্নের সামনে এবং কখনো বা চিরন্তন নগর রোমের অতীত কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের ভিতরে!

কতবার নাগরিক সভ্যতার সদর-মহল ছেড়ে তারা প্রবেশ করেছে অজ্ঞাত অসভ্যতার অন্তঃপুরে! যেখানে বোর্ণিয়ো-সুমাত্রার স্তব্ধ অরণ্যের প্রভুর মত বৃক্ষ-রাজ্যে বাস করে ওরাং-উটানরা; যেখানে আফ্রিকার বন-প্রান্তরে জেব্রা ও জিরাফের পিছনে পিছনে মৃত্যু-বিদ্যুতের মতন ছুটে যায় লাঙ্গুল ছুলিয়ে কেশর ফুলিয়ে সিংহের দল; যেখানে জলে ভাসে কুমীর ও হিপো এবং স্থলে বেবুন ও উটপাখীদের রঙ্গভূমির চারিপাশে ভূমিকম্প জাগে হাতী ও গণ্ডারদের পায়ের তালে; যেখানে গাছের ডালে ঝোলে অজগর এবং পাহাড়ের নীচে-উপরে শোনা যায় গরিলার গর্জ্জন!

ছবির পর ছবি বদ্‌লে যায়—দৃশ্যের পর দৃশ্য—ধ্বনির পর ধ্বনি! এ-সবের কাছে কোথায় লাগে সিনেমার সবাক চিত্র! জয়ন্ত ও মাণিকের বার বার মনে হয়েছে, এতদিন পরে ধন্য তাদের জীবন, সার্থক তাদের জন্ম, সফল তাদের বাসনা!

কিন্তু এ-যাত্রায় তাদের পৃথিবী-ভ্রমণ সম্পূর্ণ হ'ল না। ইংলণ্ডে পা দিয়েই তারা শুনলে, য়ুরোপের দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের প্রচণ্ড যুদ্ধ-দামামার ধ্বনি! এবং তারপর কিছুদিন যেতে-না-যেতেই বিলাতের সারা আকাশ ছেয়ে দেখা দিলে পঙ্গপালের মত জার্ম্মানির উড়োজাহাজরা। জল-স্থল-শূন্য—সর্ব্বত্রই মৃত্যুর হুঙ্কার ও মানুষের আর্ত্তনাদ!

জয়ন্ত ও মাণিক বুদ্ধিমান। সব পথ বন্ধ হবার আগেই তারা ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এল আবার স্বদেশে।

... ...

ছুই বৎসর পর দেশে এসে তারা ছুই দিন বিশ্রাম করলে। তৃতীয় দিনে ছুই বন্ধু বেড়াতে বেরুলো।

জয়ন্ত বললে, "মাণিক, ছু-বছর পরে এখানে এসে মনে হচ্ছে, যেন আমাদের কলকাতার উপরেও আছে খানিকটা নূতনত্বের পালিস!"

মাণিক বললে, "হ্যাঁ। কিন্তু এ পালিসের চক্‌চকানি দীর্ঘস্থায়ী নয়।"

জয়ন্ত বললে, "কোন নূতনত্বই দীর্ঘস্থায়ী নয়। আর তা নয় ব'লেই তো নতুনের এত আদর।"

মাণিক বললে, "পুরাতনেরও আদর কি কম? মানুষ তো একটানা নূতনত্বের স্রোতে ভেসে যেতে ভালোবাসে না! তারই ভিতরে থেকে থেকে সে ফিরে চায় আবার অতি-পরিচিত বন্ধুর মত পুরাতনকে!"

—"ঠিক বলেছ। পুরাতনের পর নূতন, আবার নূতনের পর পুরাতন। মানুষ এ-ছুটির কোনটিকেই ত্যাগ করতে পারে না। তাই তো হঠাৎ সুন্দরবাবুর পুরাতন মুখ দেখে আমার মনে জাগছে খুসির ইঙ্গিত!"

—"সুন্দরবাবু? কোথায়?"

—"ঐ যে!"

মাণিক ফিরে দেখলে, ওধারের ফুটপাথের উপর দিয়ে জন-পাঁচেক পুলিসের লোকের সঙ্গে হন্‌-হন্‌ ক'রে এগিয়ে চলেছে সুন্দরবাবুর বৃহৎ বপু।

এইবারে সুন্দরবাবুও তাদের দেখতে পেয়ে চম্‌কে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ দিয়ে সবিস্ময়ে বেরিয়ে পড়ল সেই বিখ্যাত শব্দটি—"হুম্‌!"

সুন্দরবাবুকে যারা চেনে তারা জানে যে, অতিরিক্ত ক্রোধে বা বিস্ময়ে বা ছুঃখে বা আনন্দে তিনি এক-একরকম সুরে "হুম্‌" শব্দটি উচ্চারণ ক'রে ভাবাভিব্যক্তির চূড়ান্ত পরিচয় দেন। তাঁকে যারা চেনে না তারা জানতেই পারবে না যে, একটিমাত্র "হুম্‌" শব্দ কত-রকম ভাব প্রকাশ করতে পারে!

সুন্দরবাবু ও-ফুটপাথ্‌ থেকে ছুটে আসবার উপক্রম করছেন দেখে, জয়ন্ত ও মাণিক তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এগিয়ে গেল।

—"আরে জয়ন্ত, আরে মাণিক,—হুম্‌! সাত সাগর লঙ্ঘন ক'রে কবে আবার তোমরা কলকাতায় এসেছ হে?"

—"পশু।"

—"তোমরা তো ব'লে গিয়েছিলে পাঁচ-ছয় বছরের আগে কলকাতায় ফিরবে না!"

—"তাই তো ভেবেছিলুম। কিন্তু হিট্‌লার যে আমাদের তাড়িয়ে দিলে! নিজের দেশের জন্যে যুদ্ধে মরতে রাজি আছি, কিন্তু বিদেশ-বিভূঁয়ে জার্ম্মান বোমা খেয়ে হাত-পা খোঁড়া ক'রে বেঁচে মরে থাকতে চায় কে?"

হ্যাঁচ্চো শব্দে হেঁচে ফেলে সুন্দরবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ ভাই! এই ছাখো হাঁচি পড়ল!........তারপর? কোন্‌ কোন্‌ দেশ বেড়িয়ে এলে?"

জয়ন্ত হেসে বললে, "এক নিঃশ্বাসে কি সাতকাণ্ড রামায়ণের কথা বলা যায়? বরং সন্ধ্যের মুখে আমার বাড়ীতে যাবেন। নিমন্ত্রণ রইল।"

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "আ আমার পোড়াকপাল, আমার আবার নিমন্ত্রণ! আমি যে ঢেঁকি, ধান ভান্‌তেই জন্মেছি, স্বর্গে গেলেও ধান ভান্‌তে হবে!"

—"ব্যাপার কি, নতুন কোন শক্ত 'কেস' হাতে পেয়েছেন নাকি?"

—"কেস্‌টা খুব শক্ত ব'লে বোধ হচ্ছে না, তবে আগেকার চেয়ে একটু ঘোরালো হয়ে উঠেছে বটে! শুনবে? আচ্ছা, চলতে চলতে বলি শোনো।"

সুন্দরবাবুর সঙ্গে অগ্রসর হ'তে হ'তে জয়ন্ত এই কথাগুলি শ্রবণ করলে:

—"রামচন্দ্র বসুর বাড়ী হচ্ছে দশ নম্বর ধরণী সেন ষ্ট্রীটে। তিনতালা বাড়ী—রামবাবুর নিজের বাড়ী। তিনি অবিবাহিত, বয়স পঞ্চাশের ওপারে। ধনী। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আছে এক ভাইপো, সে দেশে থেকে জমিজমার তদ্বির করে।

"রামবাবু বাড়ীর তেতালায় একলা থাকতেন। বাড়ীর দোতালার ঘরগুলো ভাড়া নিয়েছে ভৈরবচন্দ্র বিশ্বাস নামে একটি লোক। সেও একলা, মাস-তিনেক হ'ল কলকাতায় নতুন এসেচে।

"একতালায় ছুটি গরীব কাঙালী পরিবার বাস করে। তারা পুরাণো ভাড়াটে।

"আজ ছুদিন আগে রামবাবুর শয়নগৃহে রামবাবুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। লাস দেখলেই বোঝা যায়, বিষপানের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। স্থির করলুম আত্মহত্যা।

"কিন্তু তদন্তের ফলে আত্মহত্যার কোনই কারণ পাওয়া গেল না। রামবাবুর অর্থের অভাব বা অন্য কোনরকম ছুঃখ-ছুর্ভাবনাও ছিল না। মৃত্যুর দিন তিনি থিয়েটার দেখে রাত সাড়ে বারোটার সময়ে বাড়ীতে ফিরে আসেন।

"কেউ যে তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরেছে, এমন প্রমাণও পেলুম না। প্রথমত, সকলেরই মুখে শুনলুম, তিনি অজাতশত্রু—সবাই তাঁকে ভালোবাসে। দ্বিতীয়ত, তাঁর ঘর থেকে কিছুই চুরি যায় নি। লোহার সিন্ধুকের চাবি তাঁর পকেটেই ছিল। সিন্ধুকের ভিতরে পাওয়া গিয়েছে ছয় শত টাকার নোট আর কিছু সোনার গহনা। চুরি করবে ব'লে নিশ্চয়ই কেউ তাঁকে বিষ খাওয়ায় নি। চোর কখনো এতগুলো টাকা আর গহনা ফেলে যেত না।

"লাস শব-ব্যবচ্ছেদাগারে পাঠিয়েছিলুম। ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ, রামবাবুর মৃত্যু হয়েছে গোখ্‌রো সাপের বিষে। অথচ তাঁর গায়ের কোথাও সর্পদংশনের দাগ নেই! তাঁর ডান পায়ে তিনটে ছোট ছোট টাট্‌কা ক্ষতচিহ্ন আছে বটে, কিন্তু ডাক্তারের মতে সেগুলো হচ্ছে বিড়ালের মতন কোন ছোট জানোয়ারের নখ দিয়ে আঁচড়ানোর দাগ!

"দেখ তো ভাই জয়ন্ত, এ আবার কি ফ্যাসাদ! সর্পদংশনের দাগ নেই, অথচ রামবাবুর মৃত্যু হয়েছে গোখ্‌রো সাপের কামড়ে! আর কলকাতা সহরে পাকা বাড়ীর তেতালায় গোখ্‌রো সাপ! অপরংবা কিং ভবিষ্যতি! তাই চলেছি আবার তদন্তে।

"হুম্! এই যে আমরা ঘটনাস্থলে এসে পড়েছি! এইখানা রামবাবুর বাড়ী। জয়ন্ত, মাণিক, তোমাদেরও তো চড়ুকে পিঠ, যদি আগ্রহ থাকে আমার সঙ্গে আসতে পারো।"

দেশে ফিরেই আবার এ-রকম অপ্রীতিকর মামলা নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্যে জয়ন্ত ও মাণিকের কোনই আগ্রহ হ'ল না। তারা সুন্দরবাবুর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে যাচ্ছে, এমন সময়ে রামবাবুর বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি যুবক। তার মাথার চুল এলোমেলো, দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, দুই গালে অশ্রুর চিহ্ন—সারা মুখখানি যেন বিষাদে আচ্ছন্ন।

সুন্দরবাবু সুধোলেন, "তুমি আবার কে বাপু?"

—"আমি রামবাবুর ভাইপো।"

—"নাম কি?"

—"অজিতকুমার বসু।" তারপর একটু থেমেই সে বললে, "শুনছি, কাকাবাবুর লোহার সিন্ধুকে নাকি মোটে ছ'শো টাকা পাওয়া গিয়েছে?"

—"হ্যাঁ।"

অজিত পকেট থেকে একখানা পত্র বার ক'রে বললে, "কাকাবাবু যে রাত্রে মারা যান সেইদিনই এই চিঠিখানা আমাকে লিখেছিলেন। আর এই চিঠি পেয়েই তাড়াতাড়ি আমি কলকাতায় এসেছি।"

চিঠিখানা পড়তে পড়তে সুন্দরবাবু বার বার "হুম্" শব্দ উচ্চারণ করছেন শুনে জয়ন্তও কৌতূহলী হয়ে তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে।

চিঠিখানা এই:

"স্নেহের অজিত,

যুদ্ধ বেধেছে ব'লে অনেকেই ভয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে। বন্ধুদের পরামর্শে আমাকেও তাই করতে হ'ল। আমার সমস্ত টাকা—অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ—আমি আজ ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছি। পঞ্চাশখানি দশ হাজার টাকার নোট আমার ঘরের লোহার সিন্ধুকে বেশী দিন রাখা নিরাপদ হবে না। এ-সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই—কারণ তুমিই আমার উত্তরাধিকারী। অতএব পত্র পেয়েই কলকাতায় চ'লে এস। ইতি, তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরামচন্দ্র ব.."

চিঠি-পড়া শেষ ক'রে সুন্দরবাবু আবার বললেন, "হুম্!"

জয়ন্ত বললে, "অজিতবাবু, আপনার বিশ্বাস ঐ লোহার সিন্ধুকেই রামবাবু পঞ্চাশখানি দশ হাজার টাকার নোট রেখেছিলেন?"

—"কাকাবাবুর একটিমাত্র লোহার সিন্ধুকই আছে।"

—"সুন্দরবাবু, আপনি কি বলেন?"

—"এ আবার কি হ'ল ভাই জয়ন্ত! ভেবেছিলুম মামলাটা খুব হাল্‌কা, কিনারা করতে দেরি লাগবে না! কিন্তু কেঁচো খুঁজতে খুঁজতে ক্রমেই যে সাপের পর সাপ বেরুচ্ছে!"

মাণিক বললে, "যে সে সাপ নয় সুন্দরবাবু, একেবারে জাত-গোখ্‌রো!"

—"হুম্, বিষম রহস্য! সাপে কামড়ায় নি, অথচ সাপের বিষে মৃত্যু! লোহার সিন্ধুক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা অদৃশ্য! তার মানে, এ মামলাটা হচ্ছে খুনের মামলা।"

জয়ন্ত যেন আপন মনেই বললে, "লাসের পায়ে বিড়ালের মতন ছোট জানোয়ার নখ দিয়ে আঁচড়েছে! এরই বা মানে কি?" [ক্রমশঃ

কেন এদের মানুষ ভালবাসে কাহিনী

(প্রাচীন সুইস থেকে)

শ্রীমহাশ্বেতা দেবী

দিগন্ত প্রসারী পাহাড় আল্পস্। তার চূড়ায় চূড়ায় রাজত্ব তুষার রাণীর। মঁব্লাঁর চূড়ায় তাঁর সিংহাসন। হাজার হাজার তাঁর চাকর ছিল। যেসব পথিক আর চড়াইয়ের মানুষরা পাহাড়ে ঝড়ে প্রাণ হারাত, তাদের আত্মা তিনি কিনে নিতেন। তাদের দিয়ে তুষার ঝরান হোত,

বরফের ধারে কেটে শ্যাময়দের যাবার পথ তৈরী হোত। ঝড় তোলা, পথিকদের পথ ভুলান—এসব ছিল তাদের কাজ। যেদিন তুষাররাণীর রাগ হোত, তারা ভয়ে ত্রস্ত থাকত। সন্ধ্যায় উপত্যকায় ভেড়ার পাল নিয়ে ফিরতে ব্যস্ত পাহাড়ী ছেলেরা, বরফ ধ্বসার বিপুল আর্ত্তনাদ শুনত। সভয়ে কপালে ও বুকে হাত ঠেকাত তারা, তুষার রাণীর রাগ শান্ত হোক।

সেই সব হাজার হাজার অশান্ত আত্মার মধ্যে ছিল সোণেলি। সুইস্ শিশুদের বন্ধু ছিল সে। বরফ নিয়ে খেলা করতে এসে, তুষার রাণীর কোপে তারা যে প্রাণ হারাত না, সে শুধু সোণেলির্ জন্যই। চড়াই ভাঙা পাহাড়ীদের, আর এইসব ছোট্ট বন্ধুদের সে রক্ষা করত। এ কথা তার প্রভু জানলে, তাকে ছাগলের কাঁচা চামড়ায় জড়িয়ে, মাটির নীচের নরকে বন্দী করে রাখবেন, তা সে জানত। কিন্তু ভয় সে পেত না। সকালের সোণালী আলোয় মনের আনন্দে গান করত। আত্মার আনন্দময় গান। শ্যাময়ের দল দাঁড়িয়ে যেত, তাদের চড়াইয়ের পথে। রাখালদের পাশে ভেড়া-শিশুরা উৎকর্ণ হয়ে শুনত।

একরাত্রে ঝড় সুরু হয়েছে। ধ্বসের পর ধ্বস্ নাম্‌ছে—বরফের ঘর্ষণে ভীষণ শব্দ, উত্তরে হাওয়ায় পূর্ণ জোয়ার। সেই সময়, পাহাড়ের পথে যখন একটিও মানুষ নেই, তখন সোণেলীর কানে অতি পরিচিত লাঠির শব্দ এল। সেই শব্দ ধরে একটি ছোট ছেলে উঠে এল, হাতে তার পাহাড়ভাঙা লাঠি, লণ্ঠন ঝোলান কাঁধে। এই দুর্য্যোগে সে তার বাবাকে খুঁজতে এসেছে। সামনে তার কঠিন বরফ, তাতে লাঠি বসে না—তার পা পিছলে গেল—আর লণ্ঠন গেল নিভে। সোণেলী তার দেহ অতি যত্নে তুলে ধরল—সামনের মঠে তাকে পৌঁছে দেবে। কিন্তু তার সভয় দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠল তুষার রাণীর ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি। ক্রোধে তাঁর শুভ্র মূর্ত্তি কাঁপ্‌ছিল। "ওকে আমার ভৃত্য করব, তাতে তুমি বাধা দিয়েছ কেন?—ওরে হতভাগা এখনি তুই কুকুর হয়ে যা এ অন্যায় আমি সহ্য করব না"—কথা শেষ হবার আগেই সোণেলী একটি সুন্দর কুকুর হয়ে গেল। তুষার রাণী দ্বিতীয় অভিশাপ উচ্চারণ করার আগেই সে ছেলেটিকে কামড়ে তুলে নিয়ে তাঁর বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে অন্ধকারে মিশে গেল।

আজ পর্য্যন্ত তার বংশধরেরা তুষারময় গিরিসঙ্কটে বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করে আসছে। শীতের রাত্রে পথিক পথ হারায়, আর সেণ্ট্ বার্ণাডরা দুধ আর কম্বল বয়ে তাদের প্রাণ বাঁচায়। আর এই সুইস্ হাইল্যাণ্ডাররা এই উপকারী বন্ধুদের মূর্ত্তি খোদাই করে রেখেছে তাদের লকেটে। সব ভ্রমণকারীদেরই তারা এই গল্প বলে, আর শ্রদ্ধার সাথে কাহিনী তাদের হৃদয়ে গাঁথা আছে। স্মরণ করে সেই উপকারী তুষার শিশুর আত্মাকে।

উপন্যাসের পূর্ব্বাংশ

[বিশ্বেশ্বর মল্লিক ছিলেন এক বিখ্যাত ডাকাতে দলের নেতা। বহু পাপকাজ করার পর অসৎ উপায়ে তিনি এক জমিদারী হস্তগত করলেন। শেষে তাঁর পুরণো সঙ্গীদের ধরিয়ে দিয়ে তিনি নিজে সাধু সেজে গেলেন সরে। তাঁর কয়েকজন সঙ্গী অনবরত তাঁর ওপর প্রতিশোধ খুঁজে ফিরতে লাগল। বিশ্বেশ্বর ইতিমধ্যে সংসারী হয়ে বসলেন। তাঁর সাত ছেলে চার মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে ও বড় ছেলের বিয়ে হয়েছিল। ইতিমধ্যে ভগবানের বিচার সুরু হয়ে গেল। ছোট ছেলে মরল জলে ডুবে, বড় জামাই মরল হার্টফেল করে, সেজ ছেলে মরল গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। বড় ছেলের হল কুষ্ঠ, মেজ ছেলে হল পাগল, বড় মেয়ে আত্মহত্যা করল। অন্যগুলি জ্বরে পড়ে আর বাঁচলো না। বিশ্বেশ্বর নিজে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হলেন।

বংশনাশ এড়াবার জন্য বিশ্বেশ্বর নিজের একমাত্র পৌত্র প্রদীপকে সাবধানে আগলাতে লাগলেন। এই সময়ে প্রদীপের একটি বন্ধু ও সমব্যথী ছিল বাবী নামে একটি মেয়ে। প্রণববাবু ছিলেন প্রদীপের মাষ্টার-মশাই ও পরামর্শ দাতা। প্রণববাবু প্রদীপকে খুব স্নেহ করতেন ও প্রদীপও তার মাষ্টারমশাইকে শ্রদ্ধা করত। শত্রুদের উৎপাতে বিশ্বেশ্বর ও প্রদীপের মাষ্টার প্রণববাবু গ্রাম ছেড়ে প্রদীপকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। সেখানে শত্রুদের উৎপাতে অস্থির হয়ে তাঁরা পথে অনেক বিপদ আপদ এড়িয়ে চলে এলেন দার্জ্জিলিঙে। দার্জ্জিলিঙে কিছুদিন থাকার পর প্রদীপের মাষ্টারমশাই প্রণববাবু প্রদীপকে বিশ্বেশ্বরের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে তাকে সঙ্গে করে সুদূর বিন্ধ্যাচলে এলেন। বিন্ধ্যাচলে প্রদীপের এক নতুন জীবন আরম্ভ হল। সেখানে ওস্তাদের কাছে শরীর চর্চ্চা করে প্রদীপের শরীর হয়ে উঠল পাথরের মত শক্ত, আর তার মনে এল প্রমত্ত সাহস।

এদিকে প্রদীপের দাদু অনেকদিন প্রদীপকে না দেখে আর থাকতে না পেরে মির্জ্জাপুরে চলে এলেন। কিন্তু প্রদীপের দাদুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপদের বিপদ আবার ঘনিয়ে এল। একদিন প্রদীপরা সকলে বেড়াতে বেরিয়েছে এমন সময় হঠাৎ একদল লোক লাঠি হাতে তাদের আক্রমণ করল। দুপক্ষেই ভীষণ লড়াই ও রক্তারক্তি হ'ল কিন্তু দল ভারী থাকায় শেষ পর্য্যন্ত ওরা প্রদীপকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে উধাও হ'ল।]

দূরে দেখা গেল, একটা গ্রামের ধারে মোটরটা দাঁড়িয়েছিল, তখনি ধূলোর ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন ক'রে মিলিয়ে গেল।

কাছাকাছি এসে প্রণব দেখ্‌লে ওস্তাদ্‌জীর লোকেরা তৈরী ছিল, পথের ওপর গাছের গুঁড়ি ফেলে দিয়ে মোটর আট্‌কেছিল, কিন্তু এরা মাত্র দুজন, তাদের কাছে পারলোনা। গ্রামের লোক ডাক্‌তে ডাক্‌তে পালালো।

৩

ওস্তাদ্‌জীও মির্জ্জাপুরের পথে দাঁড়িয়েছিলেন, 'খুব দুঃখ করলেন, আফ্‌শোষ করলেন কেন দল ভারী ক'রে লোক পাঠায়নি। এত সাহস হবে তাদের, তিনি ধারণাই করতে পারেননি। তাঁর এলাকা থেকে তাঁর সাক্‌রেদকে নিয়ে যাবে! যাইহোক্, তিনি ব্যবস্থা করছেন। দিকে দিকে চর পাঠাচ্ছেন। কিন্তু টাকার দরকার।

বিশ্বেশ্বরবাবু বল্‌লেন, টাকার জন্যে ভাববেন না।

কিন্তু টাকার জন্যে ভাব্‌তে হ'ল।

পরদিন একখানা খাম এলো ডাকে—এলাহাবাদ ফোর্টের মধ্যে যেখানে অক্ষয়বট আছে সেখানে কোনো লোককে আশি হাজার টাকা নগদ দিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তিনদিন ভাব্‌বার সময় দেওয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরবাবু বল্‌লেন, আশি হাজার টাকা বড় বেশী হ'য়ে গেল না? এখন কোথায় বা পাই অত টাকা এখানে?

প্রণব বল্‌লে, তার চেয়ে বলুন কেনই বা দিতে যাব ওদের? কিছু করতে হবে না। আমি একলাই গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করব শুধু হাতে।

শুধু হাতে? পুনশ্চ ব'লে তলায় কি লিখেছে দেখোনি? 'টাকা না আনিলে কিম্বা পুলিশে খবর দিলে প্রদীপেরই বিপদ জানিবেন।'

ওতে ভয় খাবার কিছু নেই। আমি আজই এলাহাবাদ চল্‌লুম।

প্রয়াগ ঘাট। যমুনার কূল থেকে পরে পরে নৌকো ছাড়ছে যাত্রী নিয়ে। প্রণবও উঠে বস্‌লো, দু' পয়সা দিতে হবে সঙ্গম পর্য্যন্ত যাওয়া আসার দরুণ। গঙ্গার সাদা জল যেখানে যমুনার কালো জলের সঙ্গে মিশেও মিশ্‌তে পারছেনা, সেইখানে নৌকো থেকে নেমে জলে দাঁড়িয়ে স্নান করতে প্রথমটা প্রণবের একটু ভয় হ'ল, ডুব জল নয়ত? না, দেখে একটি ছোট ছেলে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

স্নান ক'রে এক ঘটি জল নিয়ে সে লাল কেল্লার দরজায় এসে দাঁড়ালো।

অক্ষয়বট দেখ্‌তে দলে দলে লোক চলেছে।

অন্ধকার ছোট ঘরের মধ্যে রূপো বাঁধানো গুঁড়ি ছোট্ট একটি বটের চারা ওপরে রৌদ্রের দিকে শাখা বিস্তার করতে চাইছে। সেখানে ভিড় কম ছিলনা। প্রণাম ক'রে প্রণব অপেক্ষা করতে লাগ্‌লো।

নেহাৎ ক্ষীণকায় একটি লোক কাছে এসে জিগ্যেস করলে—প্রণববাবু, টাকা এনেছেন?

অত টাকা একসঙ্গে আনা যায়? অর্দ্ধেক এনেছি। বাইরে পুঁটলীগুলো রেখে আসতে হল, গোরা সিপাহীর হাতে দিয়ে এসেছি।

কি, আমাকে বন্দী করতে চান নাকি? মনে রাখ্‌বেন, যে মুহূর্ত্তে আমায় ধরিয়ে দেবেন, সেই মুহূর্ত্তেই প্রদীপের বিপদ।

কোথায় আছে, তোমাকে যন্ত্রণা দিয়ে সে খবরটা আদায় করতে পারব ত?

খবর আদায় ক'রে কোনো লাভ হবে না। গিয়ে দেখ্‌বেন হয়ত তাকে হত্যা করা হয়েছে। বুঝ্‌তেই পারছেন, যারা নিয়ে গেছে, তারা শুধু টাকাই চায়, দয়ামায়া ব'লে তাদের মনে কিছু নেই!

চলো ফোর্ট থেকে বেরোনো যাক্।

গেট্ থেকে একটা পুঁটলী হাতে নিয়ে বেরোবার সময় প্রণব বল্‌লে যে টাকা আছে এতে, এখানে নেবে?

এখানে কি নেওয়া যায়? চারদিকে সেপাইশান্ত্রী? চলুন্ ঐ নদীর দিকে নির্জ্জন জায়গায়। অর্দ্ধেক টাকা কিন্তু চল্‌বে না। আমি নিতে পারব না।

বালির চরে তারা গিয়ে দাঁড়ালো, ধারে কাছে কোথাও লোক নেই, দূরে দূরে দু'একজন যাচ্ছে।

প্রণব দেখ্‌লে লোকটার মুখ রুক্ষ কঠিন, নিষ্ঠুর তার দৃষ্টি। তবু বল্‌লে, ছেলেটাকে বাঁচানোর সম্বন্ধে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো না?

না, তাহ'লে আমার বিপদ্ বাড়ে। আর বিশ্বাস, কাকে করবেন আপনি! জানেন, ওস্তাদজী পর্য্যন্ত টাকা খেয়ে আপনাদের বিপক্ষে গেছে?

তা কি সম্ভব?

টাকায় সব সম্ভব। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি টাকাই আনেননি। ভালো করলেন না। আর দুদিন দেখে ওরা চ'লে যাবে অনেক দূরে, আবু পাহাড়, কিম্বা আসাম। তখন কোনো সন্ধানই পাবেন না। এই ব'লে গেলাম।

দ্রুতপদে সে চ'লে গেল।

পৃথিবীতে কত আশ্চর্য্য জিনিস ঘটে, তার মধ্যে একটি প্রদীপ আজ প্রত্যক্ষ করলো।

যে বাড়ীতে ওকে তিন তলায় মুখ বেঁধে বন্দী ক'রে রেখেছিল, তার জান্‌লা থেকে দেখ্‌লে সাম্‌নের বাড়ীতে বাবী—তার ছেলেবেলার বন্ধু বাবী, সিঁথেয় সিঁদুর, দিব্যি বৌটি!

চেঁচিয়ে একবার বাবীকে ডাক্‌তে পারলে হয়, কিন্তু মুখ বাঁধা, আর বাবীও সিঁড়ির রেলিং ধ'রে নেমে যাচ্ছে।

[ক্রমশঃ

জাতক কথার পরিচয়

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

বুদ্ধদেবের কথা তোমরা সবাই শুনেছ। আড়াই হাজার বছর আগে তিনি জন্মেছিলেন। তিনি এদেশে নূতন ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন। নূতন ধর্ম্ম প্রচার করতে হলেই নূতন নূতন তত্ত্বকথা বলতে হয়। তিনি যে সব তত্ত্বকথা বলেছিলেন তা সাধারণ লোকে বুঝতে পারে নি। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যাদের শ্রমণ ও ভিক্ষু বলা হতো তাঁরা গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সে তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা ক'রে আস্তেন। কিন্তু তাতেই ত যথেষ্ট হলো না। সব দেশ, সব কাল ও সব শ্রেণীর লোককে ত বুঝানো চাই। বুদ্ধের ভক্তেরা সেইসব তত্ত্বকথা সহজ ভাষায় লিখতে আরম্ভ করলেন।

বেদ বেদান্তের কথা উপনিষদের কথাও দেশের সাধারণ লোক বুঝত না। হিন্দু ঋষিরা সাধারণ লোককে বুঝাবার জন্য গল্পের সৃষ্টি করেছিলেন—সেই গল্পগুলোই পুরাণ নামে চলছে। কোন কঠিন জিনিষ সাধারণ লোককে বুঝাতে হলেই গল্পচ্ছলে বলতে হয়। বুদ্ধের ভক্তরাও বুদ্ধের সার কথাগুলো সাধারণ লোককে বুঝাবার জন্য গল্পের সৃষ্টি করলেন। এই গল্পগুলোর নামই জাতকের গল্প। জাতকের গল্পগুলোই বৌদ্ধ পুরাণ।

এই গল্পগুলো একই সময়ে একই লোকে রচনা করেন নি। বহু বৎসর ধ'রে এই গল্পগুলো রচিত হয়েছে। এই গল্পগুলো পালি ভাষাতে রচিত। পল্লীর লোকে সে ভাষা বুঝত তাই পল্লীভাষা—পল্লী ভাষাই পালি ভাষা। তখনকার দিনে এ ভাষা সবাই বুঝত। সে ভাষার রূপ বদলে এখন বাংলা, হিন্দী, আসামী ইত্যাদি ভাষা হয়েছে। এখনকার লোকে পালি ভাষা বোঝেনা। সেজন্য জাতকের গল্পগুলোর পরিচয় এ দেশের লোক অনেক দিন পর্য্যন্ত পায় নি। জাতকের গল্পগুলোর ইংরাজিতে তর্জ্জমা হয়েছিল তা থেকে এখন বাংলায় তর্জ্জমা হচ্ছে। এখন তোমরা এ গল্পগুলোর কতক কতক জানতে পেরেছ।

অনেকে বলেন, এ দেশের লোক গল্প লিখতে পারে,—কিন্তু গল্পের বিষয়বস্তু অর্থাৎ কাঠামো আবিষ্কার করতে পারে না। আমাদের পুরানো বাংলা সাহিত্য পড়লে তা মনে হয় বটে। সাতশ বছর ধরে বাঙ্গালী কবিরা একই শ্রীমন্ত সদাগর, চাঁদ সদাগর ও বিদ্যাসুন্দরের গল্পকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখেছে। কিন্তু জাতক কথা পড়লে মনে হয়—একদিন এদেশের লোক যেমন অজস্র গল্প লিখতে পারত—তেমনি অজস্র গল্পের প্লট আবিষ্কার করতে পারত। জাতকের সব গল্পগুলোর প্লট তারা আবিষ্কার করেনি। রামায়ণ মহাভারত ও দেশবিদেশে চল্‌তি অনেক গল্পও তারা নিয়েছিল কিন্তু আবিষ্কারই করেছিল বেশির ভাগ। রামায়ণ মহাভারতের গল্প ও চল্‌তি গল্পগুলোকেও তারা ভেঙেচুরে নূতন ছাঁচে ঢেলে নিয়েছিল। হিন্দু আদর্শের কথাগুলোকে

বৌদ্ধ আদর্শে পরিবর্ত্তন করেও নিয়েছিল। তাদের এই অজস্র গল্প আবিষ্কারের শক্তি দেখলে অবাক হ'তে হয়। জাতক কথা গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার—জানি না কতগুলো লুপ্ত হয়ে গেছে—যা পাওয়া গিয়েছে তার সংখ্যাও অনেক বেশি।

আমাদের দেশের রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের পরই গল্প হিসাবে এই জাতক কথার ঠাঁই।

জাতক কথাগুলো বুদ্ধদেবের মুখের কথা নয়—বুদ্ধদেবের মুখে কথাগুলোকে বসানো হয়েছে। নয়ত বুদ্ধদেবের সঙ্গে এগুলোর সম্বন্ধ আছে এইভাবে লেখা হয়েছে। তার কারণ এই, এগুলো বুদ্ধদেবেরই জীবনের সঙ্গে যোগ আছে। একথা না বল্‌লে লোকের শ্রদ্ধা হবে কেন—গল্পের ভিতরকার সারকথা লোকে বা'র করেই বা নেবে কেন—গল্পগুলোর মহিমা বা মর্য্যাদা স্বীকার করবে কেন? সাদরে রক্ষা ও প্রচার করবে কেন? কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়। কারণ, গল্পের ভিতরকার উপদেশ বুদ্ধদেবেরই বটে।

প্রত্যেক গল্পের গোড়ায় আছে—ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর রাজা তখন বুদ্ধদেব অমুক হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এক ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বুদ্ধদেব বহুবার জন্মাতে পারেন না। ওটা গল্পের ধর্‌তা মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কথা এই—মানুষ বহুবার ইতর প্রাণী হয়ে জন্মায়, তারপর ক্রমে মানুষ হয়ে জন্মায়—তারপর সৎকর্ম্ম করলে ক্রমে সে ভালো লোকের ঘরে জন্মায় এমনি ক'রে জন্মে জন্মে তার উন্নতি হয়। শেষে অনেক জন্মের সৎকর্ম্মের ফলে এবং কামনা জয়ের ফলে সে মহাপুরুষ হ'য়ে জন্মায়। মহাপুরুষ হয়ে সে সারাজীবন সৎকর্ম্ম করে—সাধনা করে—জীবের কল্যাণ করে—তপস্যা ক'রে একেবারে নিষ্কাম হয়ে যায়, তখন সে হয় বোধিসত্ত্ব।

বুদ্ধদেব বলেছেন—আমিও একজন্মে বোধিসত্ত্ব হইনি,—ইতর প্রাণী হ'তে আরম্ভ করে বহু জন্ম পার হয়ে এসে বহু সৎকর্ম্ম ক'রে তবে এজন্মে বোধিসত্ত্ব হয়েছি। জাতকের গল্পগুলো বোধিসত্ত্বের এই জন্মগুলির কাল্পনিক উপাখ্যান—এক এক জন্মে তিনি এক একটি সৎকর্ম্ম করছেন। তাঁর ঐ সৎকর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে এক একটা গল্প রচিত হয়েছে। তিনি যে সকল সৎকর্ম্ম করবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন—সেই সকল সৎকর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝাবার জন্য ঘটনাগুলোর কল্পনা করা হয়েছে।

জন্মে জন্মে সৎকর্ম্ম ক'রে কেমন করে মুক্তির পথে আগাতে হয়, বুদ্ধদেবের দোহাই দিয়ে সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য গল্পগুলো রচিত হয়েছে। যে জন্মায়—সেই জাতক। বুদ্ধদেবকে বলা হয় মহাজাতক। মহাজাতকের জীবন কাহিনী বলে এগুলোর নাম জাতক।

মূল উদ্দেশ্য বুদ্ধদেবের উপদেশের সারকথা প্রচার হ'লেও এগুলো গল্পাংশে নিকৃষ্ট নয়। বেশির ভাগ গল্পে গল্পটাই প্রধান হয়েছে—উপদেশটা হারিয়ে গিয়েছে। অনেক গল্পে আবার কোন উপদেশ নেই কেবল বুদ্ধদেবের জন্মের সঙ্গে যোগ মাত্র আছে। যারা খাঁটী কথাশিল্পী তারা গল্পের কৌশলের উপরই জোর দিয়েছেন—কেবল বোধিসত্ত্বের নামমাত্র যোগ দিয়েছেন।

আনন ঘোষালকে চেনো ?

সত্যিকারের ছদ্মবেশী ডিটেক্‌টিভ, যাঁর সতর্ক দৃষ্টি পাহারা দেয় কলকাতা সহরে ও সহরতলীতে, বাংলার গ্রামে গ্রামে, তাঁরই নিজের অভিজ্ঞতার কয়েকটি বিচিত্র কাহিনী রংমশালে নিয়মিত প্রকাশিত হবে। এইটি তার প্রথম কাহিনী।

টপ্‌কা ঠগী

আনন ঘোষাল

গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন।

রোদের তাপে কোলকাতার ফুটপাথ পর্য্যন্ত তেতে উঠেছে। হ্যারিসন রোডের মত বড় রাস্তায়ও পথিকের সংখ্যা তত বেশী নয়। বিশেষ কাজ না পড়লে লোকে পথে বেরয় না। ছোট বোনটার অসুখ না হলে অমলও পথে বেরত না। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে সে বাড়ী ফিরছিল। হটাৎ তার লক্ষ্য পড়ল, একটা হাবলা গোছের লোকের দিকে। লোকটি এগিয়ে এসে অমলকে জিজ্ঞেস করল—বলতে পারেন মশায়, সোনাপটী কোন দিকে ?

লোকটাকে কোলকাতায় নবাগত বলেই মনে হয়। সহানুভূতির সঙ্গে অমল তাকে জানাল—সেত বড়বাজারে। কোলকাতায় নূতন বুঝি ? যান না, সোজা চলে যান, এই রাস্তাতেই পড়বে। ঠিক সেই সময়, একদল লোক পাশের গলিটা থেকে ফুটে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। পরনে তাদের লাল গেঞ্জি ও লুঙ্গি। কানে তাদের গোঁজা একটা করে বিড়ি, তাদের কথাবার্ত্তা থেকে বোঝা যায়, তারা চলেছে সিনেমার ছবি দেখতে। আর এও বোঝা যায়, ছবিখানার নাম কাল্লু ভকত্।

ভদ্রলোকটী ধন্যবাদ জানিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে চললেন। ভদ্রলোকটী ভিড়ের ভিতর অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঠং করে একটা আওয়াজ হল। আওয়াজটা অমলের কানে গিয়েছিল। আওয়াজ লক্ষ্য করে চোখ নামাতেই অমল দেখতে পেল ফুটের উপর পড়ে রয়েছে একটা লাল কাগজে মোড়া কি একটা ভারি জিনিস। বোঝা গেল জিনিসটা সোনাপট্টিগামী গেঁইয়া ভদ্রলোকের পকেট থেকেই পড়েছে।

ভীড়ের ভিতর থেকে একজন এগিয়ে এসে জিনিসটা তুলে নিল। মোড়কটা খুলে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ল একটা চকচকে সোনার গোলা। লোকটা দাঁত বার করে বলে উঠল—মাইরি মাইরি। এতো সো-সোনা।

অমল প্রতিবাদ করে সোনাটা কেড়ে নেবে কিনা ভাবছিল। এমন সময় তারই মত একজন পথিক এগিয়ে এসে বলল—এই খবরদার। ওই ভদ্রলোকের পকেট থেকে সোনাটা পড়েছে। আমি নিজে দেখেছি। লোকটাকে ডেকে আন। নয়ত থানায় ওটা জমা দে।

ভিড়ের লোকগুলো ঘাবড়ে গিয়ে সেই গেঁইয়া ভদ্রলোকটীকে খোঁজাখুঁজি করল কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মিলল না। এর পর সকলেই প্রস্তাব করল সোনাটা থানায় জমা দেবার জন্যে, কিন্তু যে লোকটা সোনাটা পেয়েছিল সে কিছুতেই সেই প্রস্তাবে রাজি হল না। বরং সে একটা উল্টো প্রস্তাব আনল। সে মাথা নেড়ে উত্তর দিল—রেখে দেন মশয়, পড়ে পাওয়া চৌদ্দ

আনা। পুলিশের পেটে না দিয়ে আসেন নিজেরাই ভাগ করে নিই। ৫০টা টাকা দিয়ে একজন নিয়ে নেন। টাকাটা ভাগ করে নিয়ে মোরা সে মোটরে করে মেট্রোয় চলি। কি মশয়, রাজী আছেন নাকি ? দুশো টাকার জিনিস পঞ্চাশ টাকায় খরিদ করতে কার না ইচ্ছে সকলে ঝুঁকে পড়ে সোনাটা পরীক্ষা করতে শুরু করল। একজন বলে উঠল—দেন মশায় দেন, হয়। আমাকেই দেন। আমার কাছে কিন্তু আছে ২০টা টাকা।

ঠিক এই সময় অপর আর একটি ছেলে ভিড়ের পাশে এসে ব্যাপারটা পরিলক্ষ্য করছিল। ছেলেটী আর লোভ সামলাতে না পেরে পকেট থেকে ৫০ টাকা বার করে এগিয়ে এল। টাকা কটা মনি অর্ডার করবার জন্যে সে পোষ্ট অফিস যাচ্ছিল। মনে মনে সে ঠিক করেছিল, সোনাটা সেই দিনই সোনাপট্টিতে ২০০ টাকায় বিক্রি করে, ঠাকুমাকে তাক্ লাগিয়ে দেবে।

অমল কোলকাতাতেই মানুষ হয়েছে। সে সহজেই গুণ্ডাদের চালাকীটা ধরে ফেলল। সে ছোকরাটীকে নিরস্ত করে বলল—কি করছ হে খোকা, ওটা কক্ষনো সোনা নয়। এরা সব ঠগীর দল। ওটা শুধু একটা চকচকে পেতল। চালাকি পেয়েছ না, ওর মত আমি ছেলেমানুষ নই।

ছোকরাটী ভড়কে গিয়ে টাকা কয়টা পকেটে পুরে সরে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময় অপর একজন লোক এগিয়ে এসে সোনাটা ৬০ টাকায় কিনে নিয়ে বলল—না, এ সোনাই, আমাদের দোকান ছিল যে।

একে একে ঠগীর দল বেমালুম সরে পড়ল, সোনা বলে পেতলটা ভদ্রলোকটীকে গছিয়ে দিয়ে। ঠগীর দল চলে যাবার পর ভদ্রলোকটী সানের উপর গোলাটা একটু ঘসে নিল। বেশ বোঝা গেল, গোলাটা সোনা নয়, পেতল। অস্থির হয়ে ভদ্রলোকটী কেঁদে ফেলে অমলকে বলল—কি হবে মশাই, আপনার কথা কেন শুনলাম না। আমাকে বাঁচান আপনি। আসুন আমার সঙ্গে, ওদের খুঁজে বার করি।

অমলের মন ছিল স্বভাবতঃই দয়ালু। দুর্বৃত্তদের খোঁজে ভদ্রলোকটী অমলকে নিয়ে এল কলাবাগান বস্তির একটা পাতলা নির্জ্জন গলির ভিতর। এই গলিটায় এসে ভদ্রলোকটীর চেহারাটা হঠাৎ গেল বদলে। হঠাৎ সে পকেট থেকে একটা ছোরা বার করে অমলের মাথার উপর তুলে ধরে বলল—আরে শালা জান বাঁচাও। আমাদের শীকার ভাগাও ?

দেখতে দেখতে টপ্‌কা ঠগীর পুরো দলটাই সেখানে হাজির হল। কারুর হাতে তাদের ছিল ছুরী, কারুর হাতে লোহার ডাণ্ডা। কাঁপতে কাঁপতে অমল একে একে তার হাতের আংটী, মনি ব্যাগ, সোনার ঘড়ি, ফাউন্টেন্ পেন, এমন কি পেনসিলটা পর্য্যন্ত তাদের হাতে তুলে দিয়ে বড় রাস্তায় ফিরে এল। মনে মনে তার একটা দম্ভ ছিল সে বড় সাবধানী বড় চালাক, তার সে দম্ভ টপ্‌কা ঠগীরা ভেঙ্গে দিয়েছে। অবসাদ ক্লান্ত মনে সে থানার দিকে এগিয়ে চলল।

কীর্ত্তি যস্য—!

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

স জীবতি। কিন্তু আমাদের প্রাণকেষ্টর বেলা তার অন্যথা দেখা যাচ্ছে। কীর্ত্তি করে' সে মারা যাবার দাখিল; ফাঁসি ঠিক না হলেও, নিজেকে ফাঁসিয়েছে তাতে ভুল নেই। যে পথ দিয়ে লোকে ফাঁসি যায়—এবং তার চেয়ে কাছাকাছি আর যে সব তীর্থক্ষেত্র—জেল হাজত ইত্যাদি বাস করে—সেই পথে—সেই আদালতেই তাকে হাজির হতে হয়েছে।

কেন যে তার ধৈর্য্যচ্যুতি হোলো বলা যায় না, বাসে যেতে যেতে, মোটা সোটা এক মেমকে হঠাৎ সে এক চড় মেরে বসেচে। এবং তার ফলে,—আহত ব্যক্তিটি স্থুল বলে' নয়, মেম্ বলেই, বেজায় হুলুস্থূল পড়ে গেছে।

সবাই এসে বল্চে, "প্রাণকেষ্ট, এমন কাজ তুমি কেন করলে? এ কাজ তোমার উপযুক্ত হয়নি।" প্রাণকেষ্টর কোনো জবাব নেই।

"তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছল না কি? নইলে হঠাৎ অমন ক্ষেপে ওঠবার কারণ?" জিজ্ঞেস করে একজন।

প্রাণকেষ্ট চুপ করে' থাকে।

"না কি—মেম্ তোমাকে মারতে এসেছিল বুঝি? তাই বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার খাতিরেই বোধ করি—?" আরেকজন সংশয় প্রকাশ করে: "কিন্তু মেমরা তো সচরাচর বড় কিছু বলে না?"

প্রাণকেষ্ট রা কাড়ে না কোনো।

"মাতৃবৎ পরদারেষু এ কথা কি তোমার জানা নেই প্রাণকেষ্ট? তবে? তবে হ্যাঁ, মেমকে তুমি মাতৃতুল্য মনে না করতে পারো বটে। আমাদের কার বাবা আর কটা মেম্ বিয়ে করতে গেছে! কিন্তু—কিন্তু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ, এটা তো মানো? মেম্ কিছু তোমার নিজের দ্রব্য নয়—? নিজস্ব জিনিস না?" পণ্ডিতম্মন্য এক ব্যক্তি শাস্ত্রের দ্বারা প্রাণকেষ্টকে আঘাত করেন। চাণক্যশ্লোক মেরে ওকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেন তিনি। "পরের মেমের গায়ে হাত তোলা কি তোমার উচিৎ হয়েছে? তুমিই বলো?"

প্রাণকেষ্ট কিছুই বলে না—কেবল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। এবং ওই ঘোঁৎকারের বেশি আর কিছুই তার কাছে আদায় করা যায় না।

কেউ দুঃখ করে, কেউ বা সহানুভূতি জানায়, কারো কারো চেষ্টা হয় প্রাণকেষ্টকে অভিনন্দন দান করার। সম্বর্দ্ধনা দাতাদের প্রত্যাশা, প্রানকেষ্টর এই তো সবে হাতে খড়ি, মেম্ থেকে আস্তে আস্তে ও সাহেবের দিকে এগুবে—এবং ক্রমশঃ ওর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে' হাজার হাজার প্রাণকেষ্ট দেখা দিলে দেশোদ্ধারের আর দেরি কি?

বেশীর ভাগ লোকই অবশ্যি ছি ছি করে। কিন্তু প্রাণকেষ্টর কোনো হুঁ হাঁ নেই।

খবরের কাগজ থেকে ফোটো নিতে এসেছিল, একটি সদ্যোজাত সাপ্তাহিকের সম্পাদক বাণী চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, পাড়ার হাতে-লেখা ত্রৈমাসিকের নাছোড়বান্দা ছেলেরা জীবনী ছাপতে রাজি হয়েছিল—তাদের একমাত্র মুখপত্রে যার মুদ্রণ সংখ্যা মাত্র ১—কিন্তু প্রাণকেষ্ট তাদের সবাইকে ভাগিয়ে দিয়েছে। এমন কি, প্রাণকেষ্টর ছোট ছেলেটাও বড় গলা করে' এসে বলেছিল, "বাবা, তুমি একটা বিবৃতি দাও।" প্রাণকেষ্ট তাতেও কোনো উচ্চবাচ্য করেনি।

সেই ঘটনার পর থেকে প্রাণকেষ্ট কেমন যেন মনমরা হয়ে গেছে।

অবশেষে প্রাণকেষ্টর বিচারের দিন এল। আদালড় ভীড়ে ভীড়াক্কার! কাঠগড়ায় দাঁড়ালো প্রাণকেষ্ট। মুখে তার সকাতর হাসি। এক বাক্যে বীর ও কাপুরুষ আখ্যা লাভ করলে যেমনতর মানুষের দেখা যায়।

প্রাণকেষ্ট এইবার মুখ খুলবে আশা করে সবাই।

কিন্তু প্রাণকেষ্ট মুখ খোলে না।

প্রাণকেষ্ট উকীল দেয় নি, নিজেও জেরা করছে না—সাক্ষীরা একে একে সাক্ষ্য দিয়ে যায়—আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত—সমস্তই প্রায় ঠিক ঠিক বলে' যায়—প্রাণকেষ্ট কান পেতে শোনে। অধোবদন প্রাণকেষ্ট

অবশেষে হাকিম নিজে প্রাণকেষ্টর জবানবন্দী চান্। কেন সে এমন হঠকারিতা করে' বস্‌ল—তার কৈফিয়ৎ তলব করেন।

প্রাণকেষ্ট মুখ খুল্‌ল। অবশেষে মুখ খুলতে হোলো ওকে:

"শুনুন্ ধর্ম্মাবতার, বলি তাহলে—"ম্লান হাসি হেসে হেসে সুরু করল প্রাণকেষ্ট। "কেন যে এমনটা ঘটে গেল তাহলে বলি। শ্বেতাঙ্গী মহিলাটি বাসে উঠ্‌লেন, উঠে বসলেন। তারপর উনি তাঁর হাতব্যাগ্ খুল্‌লেন, খুলে মণিব্যাগ্ বার করলেন, তারপর হাতব্যাগ বন্ধ করলেন, মণিব্যাগ্ খুল্‌লেন, খুলে একটা আনি বার করলেন। আনিটি বার করে' মণিব্যাগ্ বন্ধ করলেন, হাতব্যাগ্ খুললেন,—খুলে মণিব্যাগ্ রাখলেন, রেখে হাতব্যাগ্ বন্ধ করলেন—তারপর উনি তাকিয়ে দেখলেন যে কণ্ডাক্টার বাসের দোতলায় উঠ্‌চে। অতএব আবার তিনি তাঁর হাতব্যাগ্ খুললেন, খুলে মণিব্যাগ্ বার করলেন, করে' হাতব্যাগ্ বন্ধ করলেন, মণিব্যাগ

খুললেন, খুলে আনিটি তার ভেতর রাখলেন। রেখে মণিব্যাগ্ বন্ধ করলেন, করে' হাতব্যাগ্ খুল্‌লেন, খুলে মণিব্যাগ্ রাখলেন, রেখে হাতব্যাগ্ বন্ধ করলেন—"

"মণিব্যাগ্ বন্ধ করলেন, তাই বলো।" হাকিম ঠিক অনুধাবন করতে পারে না। কেমন যেন গোলমাল ঠ্যাকে তাঁর।

"মণিব্যাগ্ বন্ধ করলেন? না, হুজুর! মণিব্যাগ্ খুলে তার মধ্যে হাতব্যাগ্ রাখ্‌লেন? না, হাতব্যাগ্ খুলে মণিব্যাগ্ রাখ্‌লেন? না—কি—মণিব্যাগ্ খুলে হাতব্যাগ্ বার করে' তার ভেতর আনিটা রেখে, তারপর হাতব্যাগ্ বন্ধ করে'—নাঃ, তাও তো নয়। তাই বা হয় কি করে'? মণিব্যাগের ভেতর কি হাতব্যাগ্ রাখা যায় কখনো? আপনি সমস্ত গোলমাল করে' দিলেন হুজুর। আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে কেমন। দাঁড়ান্ হুজুর, আবার তাহলে গোড়া থেকে খেই ধরি।"

প্রাণকেষ্ট আবার আনুপূর্ব্বিক আরম্ভ করে। যেখানে এসে আট্‌কেছিল প্রায় সেখান অবধি গড়গড় করে গড়িয়ে আসে এক খেয়ায়।

"—তখন উনি দেখলেন যে কণ্ডাক্‌টার বাসের দোতলায় যাচ্ছে। দেখে্ ফের তিনি তাঁর হাতব্যাগ্ খুললেন, খুলে মনিব্যাগ্ বার করলেন, বার করে' হাতব্যাগ্ বন্ধ করলেন, বন্ধ করে' মনিব্যাগ্ খুল্‌লেন—"

"বন্ধ করে' মনিব্যাগ্ খুললেন?" হাকিমের খট্‌কা লাগে: "সে আবার কেমন হোলো?" পুনরায় তিনি বাধা ছ্যান্: "বন্ধ করচেন, আবার খুল্‌চেন—হু রকমের দুটো কাজ একসঙ্গে হয় কি করে'?"

"কি করে' হয় বল্‌তে পারব না হুজুর, তবে হয়েছিল এইটুকুই শুধু বলতে পারি। একটা খুল্‌চেন আরেকটা বন্ধ করচেন—একটার পর একটা ঘটে যাচ্ছে।" প্রাণকেষ্ট প্রাঞ্জল করার জন্য প্রাণপণ করে।

"ওঃ, বুঝেচি—" হাকিম মাথা নেড়ে বলেন: "আচ্ছে বলে' যাও।"

প্রাণকেষ্টর করুণ সুরে সুরু হয় পুনরায়:

"—তখন উনি দেখলেন যে কণ্ডাক্‌টার বাসের দোতলার দিকে হেলতে দুলতে রওনা হচ্ছে। অতএব, আবার উনি ওঁর হাতব্যাগ্ খুললেন, খুলে মনিব্যাগ্ বার করলেন, মনিব্যাগ্ বার করে' হাতব্যাগ্ বন্ধ করলেন—কোন্‌টার ভাগ্যে কি ঘট্‌চে ভালো করে' লক্ষ্য করুন হুজুর! তারপর হাতব্যাগ্ বন্ধ করে' মনিব্যাগ্ খুললেন, মনিব্যাগ্ খুলে তাঁর আনিটি যথাস্থানে রাখলেন। রেখে মনিব্যাগ্ বন্ধ করলেন, তারপর তাঁর হাতব্যাগ্ খুললেন, খুলে মনিব্যাগ্‌টি রাখলেন ভেতরে—রেখে হাতব্যাগ্ বন্ধ করলেন! ...তারপর তিনি কণ্ডাক্‌টারকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখ্‌লেন—দেখে ফের তাঁর হাতব্যাগ খুল্‌লেন খুলে মনিব্যাগ বার করলেন, বার করে' হাতব্যাগ্

বন্ধ করলেন, তারপরে মনিব্যাগ্ খুল্‌লেন, খুলে একটা আনি বার করলেন এবং মনিব্যাগ্ বন্ধ করলেন—"

হাকিম আর সহ্য করতে পারেন না: "থামো—থামো!" বিশ্রী রকম চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি: "তুমি আমায় পাগল করে' দেবে দেখ্‌চি।"

"আজ্ঞে, আমারও ঠিক তাই হয়েছিল বোধ হয়।" ম্লান হাসির সঙ্গে করুণ স্বরের মিক্‌চার করে' বল্ল প্রাণকেষ্ট: "কিন্তু হুজুর বলেছেন সব কথা খুলে বল্‌তে, কিছু না গোপন করে'—আমারো না বলে' উপায় নেই। যেমন যেমনটি আমি দেখেছি তেমন তেমনটি হুজুরকেও আমি দেখাতে চাই। তারপর তিনি করলেন কি, মনিব্যাগ্ বন্ধ করে' তাঁর হাতব্যাগ্‌টা খুল্‌লেন, খুলে—"

"বটে? দেখাতে চাও? এখানে দাঁড়িয়ে আমাকেই দেখাতে চাও? য়্যাদ্দূর আস্পর্দ্ধা!" হাকিমের চোখমুখ যেন কিরকম হয়ে ওঠে—তাঁর হুকুম্ কি হুম্‌কি, ঠিক বলা যায় না, আদালতের কড়ি বরগা পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে তোলে।

"তবে এই ছ্যাখো।" এই বলে' হাকিম আসন ছেড়ে উঠে, কাঠগড়ার কাছে গিয়ে, প্রাণকেষ্টর গালে দারুণ এক চপেটাঘাত বসিয়ে ছ্যান্। এই ছ্যাখো তবে। হয়েছে এবার?"

"হুজুর, আমিও এর বেশি কিছু করিনি।" প্রাণকেষ্ট সকাতরে জানায়। এখন দেখলেন তো হুজুর।"

বিদেশের খাঁটি কথা যদি ঘরে বসে জানতে চাও তবে ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাসের এই বইগুলি পড়ো।—

ভয়ঙ্কর আঁফ্রিকা—	২॥০
আজকের আমেরিকা—	২॥০
কোরিয়া ভ্রমণ—	১।০
আফগানিস্থান ভ্রমণ—	২৲
মরণ বিজয়ী চীন—	৩॥০
ভবঘুরের গল্পের ঝুলি—	৸০
লাল চীন—	১॥০

বড় বড় বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

এর আগে কখনও হয় নি
ছোটদের দিয়ে ছোটদের জন্যে
অভিনয়, নাচ, গান, বিচিত্রা,
শ্রীইন্দিরা দেবীর প্রযোজনায়
আগামী ১৯ বৈশাখ (২ মে) সন্ধ্যায়
শ্রীরঙ্গমে
রংমশাল অফিসে টিকিট পাওয়া যাবে

পাহাড়ী-স্মৃতি

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

উষর মাঠের শেষে ধূসর পাহাড়,
আজো জাগে মনে মোর রূপটি তাহার।
রূপসা নদীর ধারে সাঁওতালী গ্রাম,—
তোমরা জানোনা কেউ, শোন নাই নাম।
ছোট ছোট ঘরগুলি গাছের ছায়ায়,
আমারে ভুলিয়েছিল কি যেন মায়ায়।
পাহাড়ের গায়ে ঘন পলাশের বন,
ফাল্গুনে জাগে তাতে রঙের প্লাবন ;
তারি মাঝে ছায়া-ঘেরা বুনোদের ঘর,
ঠিক যেন একখানি ছবি মনোহর।
কালো কালো সাঁওতাল শিশুদের দল,
অঙ্গন ঘিরে ঘিরে করে কোলাহল।
তাহাদের হাসি আর উল্লাস গান,
আজো মোর মনে পড়ে' মাতায় পরাণ।
ছোট ছোট মেয়েগুলি কোঁকড়ান কেশ,
হলুদে ছোপানো সাড়ী মানায় যে বেশ।
চরণে তাদের বাজে ঝুম্ ঝুম্ মল,
মনটি সরস অতি প্রাণটি সরল।
মহুয়ার বনে গিয়ে মহুয়া কুড়ায়,
জংলা সুরেতে তারা কত গান গায়।
মনে পড়ে জ্যোৎস্নায় জাগে উৎসব,—
ধূমধামে মেতে ওঠে সাঁওতাল সব।
বাঁশীর পাহাড়ী সুর মাদলের তাল,
কাণে মোর বেজে ঠিক রবে চিরকাল।
কত দিন কেটে গেছে, ভুলি না যে আর,
রঙের মশাল জ্বালে স্মৃতিটি তাহার।

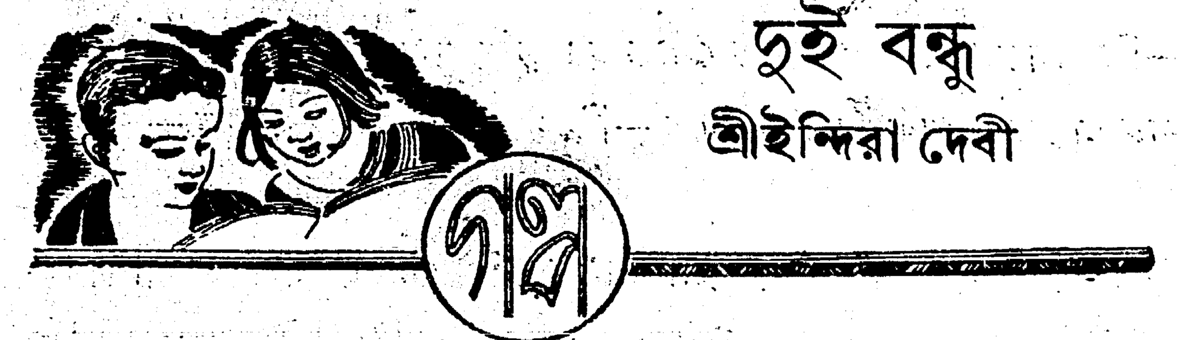

দুই বন্ধু

শ্রীইন্দিরা দেবী

গ্রামের পূব দিকটায় পাখীদের কলোনী। সব রকম পাখীদের বাস সেখানে। লাল, নীল, হলদে, ধূসর রং থেকে আরম্ভ করে শালিক, ময়না, টিয়া, চন্দনা, বৌ-কথা-ক', মাছরাঙা, কাঠঠোকরা থেকে চড়াই, মনিয়া কেউ-ই বাদ নেই।

কিন্তু হলে কি হয়, খাবার নিতে সকলেই গ্রাম ছাড়িয়ে আসতে হয়। সারাদিন সব খেয়ে দেয়ে, বাচ্ছাকাচ্ছাদের জন্য নিয়ে থুয়ে বাড়ী ফেরার পালা সেই সন্ধ্যার শাঁখ বাজার একটু আগেই।

পাখীদের কলোনী থেকে কিছু দূরে একটা মাঝারি গোছের পুকুর আছে, রাজহাঁস আর তার গিন্নি এইখানে বেশীর ভাগ সময়ই গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকে আর কর্ত্রীত্ব করে পাখী রাজ্যে মাঝে মাঝে ঘুরে এসে খবরাখবর করে। সকলেই এদের কর্ত্তা গিন্নিকে খুব খাতির করে। কথায় বলে রাজহাঁস—রাজচক্রবর্ত্তীর মত—খাতির করবে না? তোমরা কি বল?

এই পাখীমহলে কিন্তু দু'টো বিদেশী পাখী এসে বাস করতো, তারা হ'ল—টম্ টিট্স্। এদের দুজনের ভাব আর ভালবাসা যদি দেখো অবাক হয়ে যাবে। ভারী সুন্দর চেহারা এদের, সর্ব্বদাই দু'জনে একসঙ্গে আছে, কথা বলছে, গান গাইছে। তাদের দু'জনকে পেয়ে আমাদের দেশী পাখীরা খুব আনন্দে ছিল। ওদের মধ্যে যে পুরুষ সে হচ্ছে 'গ্রাবি' আর যে মেয়ে সে হচ্ছে 'ফ্লাপি'।

নাম দু'টো বিদেশী? ওমা! ওরাও যে বিবেশী! ফ্লাপির পাখাগুলো এত সুন্দর দেখলে তোমার লোভ হবে, মনে হবে একটি একটি করে সব খুলে নিই।

একদিন দু'জনে যখন খাবারের জন্য শহরের দিকে এসেছে হঠাৎ গ্রাবির মনে হলো কোথা থেকে চমৎকার খাবারের গন্ধ আসছে, গন্ধ পেতেই গ্রাবির জিভে জল এলো। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে সে দেখলো রাস্তার একপাশে জঞ্জালের টবের উপর পচা আলু আর পিঁয়াজের খোসা, তারই সুগন্ধে চারিদিকের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

—ওঃ কি চমৎকার! ফ্লাপি! এসো এসো আমরা দু'জনে ভাগ করে খাই। আজ এত সুন্দর খাবার আমাদের বরাতে ছিল? ভগবানকে ধন্যবাদ।

কিন্তু ফ্লাপি তেমন মেয়েই নয়—সে যেমন দেখতে সুন্দর মনও তেমনি, সে যাবে ডাষ্টপিনে পচা আলু আর পেঁয়াজের খোসা খেতে? রামোচন্দ্র।

—কি বিশ্রী সখ তোমার, ঐখান থেকে তুমি খাবার খাবে? কখনও না।

—তাতে কি হয়েছে? এমন সুন্দর খাবার আবার ছেড়ে দেয় নাকি? এসো এসো, সময় নষ্ট করো না।

—কিছুতেই না, ফ্লাপি গর্জ্জে উঠলো।

—কি পাগলামী হচ্ছে? এমন সুন্দর খাবার ছেড়ে দিতে আছে নাকি? তুমি কি পাগল হলে?

এবার ফ্লাপির রাস্তা সীমা ছাড়িয়েছে—কি বলছো, তোমার অত লোভ হয় তুমি খাও, আমি খাবো না।

গ্রাবি ফ্লাপিকে সত্যি খুব ভালবাসে তাই এতক্ষণ ধৈর্য্য ধরে সেধেছে—কিন্তু আর নয়, থাকুক—ও না খায় নাই খেলো—আমি খাবো।

গ্রাবি সেই রাশীকৃত জঞ্জালের উপর গিয়ে বসে খেতে আরম্ভ করলো আর ফ্লাপি রাগে, ঘেন্নায় সামনের দোতলা বাড়ীর সীলিং-এ বসে দুঃখ আর রাগে কেঁদে ফেল্লো। আরও কিছুক্ষণ বাদে একাই উড়ে চলে গেল তাদের কলোনীর দিকে। মনে মনে ঠিক করেছে আজ গিয়েই সে বাসা ভেঙ্গে ফেলবে এবং অন্য কোনও গাছে গিয়ে একা বাসা বেঁধে বাস করবে।

কলোনীতে যাবার মুখটাতে রাজহাস আর তার গিন্নি বুক ফুলিয়ে সাঁতরাচ্ছে। ফ্লাপিকে অসময়ে উড়ে আসতে দেখেই প্যাঁক প্যাঁক করে হাসগিন্নি বল্লে উঠলো: কি গো বাছা, একা এমন অসময়ে যে? আর কি? ফ্লাপি ঝরঝর করে কেঁদে ফেল্লো।

—বলনা গা, কি ব্যাপার, কাঁদছো কেন? দু'জনে ঝগড়া হয়েছে বুঝি? ফ্লাপি তখনও ফোঁপাচ্ছে, অভিমানে তার গলা বন্ধ হয়ে আসছে। অনেক সাধ্যি সাধনার পর হাসগিন্নির কাছে ফ্লাপি সব বলে ফেল্লে।

হাসগিন্নি উপদেশের সুরে বল্লে: বেশ করেছ বাছা, ওখানে যত নোংরা জিনিস থাকে অমন জায়গায় নেমে খেতে যাওনি খুব ভাল হয়েছে, ওরা পুরুষ মানুষ ওদের সব সাজে, আমরা হলাম মেয়ে, অত লোভ কি ভালো? যাও, যাও বাসায় গিয়ে বোস গে, ফিরে আসবে একটু পরে।

—না, আমি ও বাসায় যাবো না আর কথাও কইবো না ওর সঙ্গে, ধরা-গলায় ফ্লাপি বল্লে।

—ওমা সে কি? যাও বাছা যাও বাসায় যাও, অত রাগ করতে আছে কি? প্যাঁক প্যাঁক করে হাঁসগিন্নি বলে ওঠে।

হাঁসগিন্নি বুঝিয়ে সুজিয়ে ফ্লাপিকে পাঠালো। ফ্লাপি তখন ঠিক করলে আজ গ্রাবি ফিরলে একটা হেস্ত নেস্ত করবে, কিছুতেই ও আর একসঙ্গে থাকছে না।

যত দিন-গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে ফ্লাপি ততই ঠিক করে নিচ্ছে প্রথম সম্ভাষণ সে কেমন করে গ্রাবিকে করবে। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা এলো—ক্রমশঃ গাঢ় অন্ধকারে পৃথিবী ঢেকে গেল। পাখী কলোনীর সমস্ত বাসায় কিচির মিচির করে হল্লা সুরু হয়েছে, যে যার ঘরে ফিরেছে, ছেলে বৌ নিয়ে সব গল্প করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে। দূরের ঐ ঘন গাছটায় শালিক বৌএর নতুন বাচ্ছাটা চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচাচ্ছে, শালিক বৌ কর্ত্তার সঙ্গে কথা বলছে আর বাচ্ছাকে ধমকাচ্ছে।

আশায় আশায় বসে শেষে ভাবনায় পড়লো ফ্লাপি। কি করবে বুঝতে পারছে না সে—হাঁসগিন্নির কাছে যাবে? তারা তো এখন আর পুকুরের ধারে নেই, ঘরে চলে গেছে—যাবেই বা কেমন করে? বাসার দরজার কাছে মুখ রেখে ফ্লাপি বসে রইল। সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা করে উৎকণ্ঠা আর ভাবনায় ফ্লাপি সমস্ত রাত কাটালো! পরের দিন সকালে হাঁসগিন্নি চান করতে আমার আগেই ফ্লাপি গিয়ে বসে রইল। হাঁসগিন্নির বয়স হয়েছে, স্নান পুজো না করে তো কারুর সঙ্গে কথা কইতে পারে না কাজেই ফ্লাপি অপেক্ষা করে রইল। সব কাজ শেষ হলে নজর পড়লো হাঁসগিন্নির—শুকনো মুখে পুকুরের ওপরের গাছটাতে ফ্লাপি বসে আছে।

—কি গো বাছা, তোমাদের ঝগড়া আজও মেটেনি নাকি?

—আর ঝগড়া কাল তো বাড়ীই আসেনি—বলতে বলতে ফ্লাপির চোখ দু'টো ছলছল করে উঠলো।

—ওমা তাই বুঝি শুকনো মুখ, তা অত ভাবছো কেন? আসবে নিশ্চয়, রাগ টাগ করেছিল তারপর বোধহয় বেশী অন্ধকার হয়ে পড়েছে তাই আসতে পারেনি, তুমিও তো যাবে ওদিকে, যাও দেখা হয়ে যাবে, ভাবনার কিছু নেই, যাও যাও মুখ শুকিয়ে বসে থেকোনা।

ফ্লাপি শহরের দিকে এলো বটে কিন্তু কোথায় গ্রাবি? সারাদিন খুঁজে খুঁজে হয়রান—গ্রাবিকে কোথাও পাওয়া গেল না। ফ্লাপি কি আর করবে—কাঁদতে কাঁদতে সন্ধ্যার সময় বাসায় এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইল।

একদিন দু'দিন করে অনেকদিন কেটে গেল কিন্তু গ্রাবি ফিরে এলোনা। দুঃশ্চিন্তা নিয়ে ফ্লাপি অপেক্ষা করে কিন্তু সান্ত্বনা পাবার জন্য হাঁসগিন্নির কাছে যায় না—ওরকম কথা তার ভাল লাগে না, কারুর করুণা তার অসহ্য।

এদিকে হয়েছে কি গ্রাবি মনের মত খাবার পেয়ে খুসী মনে খাচ্ছে, কোনদিকে দৃষ্টি নেই—এমনকি ফ্লাপির রাগের কথাও ভুলে গেছে। একমনে সে যখন খেয়ে চলেছে তখন দূর থেকে এক ঝাড়ুদারের ছেলে তাকে দেখে পিছন থেকে চুপি চুপি এসে টপ করে ধরে ফেল্লে। থতমত খেয়ে গ্রাবি যখন দেখলে—তখন সে সেই ঝাড়ুদারের ছেলের হাতে বন্দী হয়েছে।

হায়! হায়! কেন সে লোভ সামলায়নি—কেন সে খেতে গিয়েছিল পচা আলু আর পিঁয়াজের খোসা, ফ্লাপির অত বারণ না শুনে। কিন্তু তখন আর কোনও উপায় নেই—একেই বলে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

ঝাড়ুদারের ছেলে কানাই তাকে খুব যত্ন করে নিয়ে একটা কাঠের খাঁচার ভিতর রেখে, তাদের কুঁড়ে ঘরের সামনে ঝুলিয়ে রেখে দিলে।

গ্রাবি রোজ ভাবে কি করে সে মুক্তি পাবে, ফ্লাপিই বা কি মনে করছে, রোজ সে কাঠের দরজা ঠোকরাতে থাকে। কিন্তু আর যাই হোক ঝাড়ুদারের ছেলে তাকে খুব ভালবাসে।

ফ্লাপি সারাদিন ধরে গ্রাবিকে খুঁজে খুঁজে বেড়ায় কোথাও তাকে পায় না, তার একটুও ভাল লাগে না, পাখী-মহলে জানাজানি হয়ে গেছে, কাজেই তাদের কাছে যেতে লজ্জা করে, একা, একা ঘুরে বেড়ানই ভালো।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন সে কানাইদের পাড়ায় হাজির হলো। ঝাড়ুদারদের বস্তি, মাটীর ঘর, খোলা আর খড়ের ছাদ, মাটি দিয়ে লেপা আঙ্গিনাগুলো ঝক্‌ঝক্ করছে—আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছে।

এ ছাদ ও ছাদ করে উড়ে বসতে বসতে ফ্লাপি কানাইদের চালে গিয়ে বসলো আর অমনি নজর পড়লো কাঠের খাঁচাটার দিকে—নিশ্চয়ই ওদের কোনো জাত ভাই আছে মনে ভেবে এগিয়ে যেতেই ফ্লাপি অবাক!

যাঁ্যা—একি? ফ্লাপি যা দেখছে সত্যি তো? গ্রাবি? এত রোগা হয়ে গেছে গ্রাবি? ফ্লাপি আর দেরী করতে পারে না, খাঁচার পাশে এসে বসে। কতদিন পরে দু'জনে দেখা, কান্নাকাটি, রাগ অভিমানের পর তখন দু'জনে কত কথা।

কিন্তু—এখন গ্রাবিকে নিয়ে যাওয়ার কি হয়?

অবশেষে ঠিক হলো যতদিন না গ্রাবি মুক্ত হয় ততদিন ফ্লাপি রোজ আসবে।

ফ্লাপি রোজই আসে আর দু'জনে মিলে কাঠের দরজা ঠোকরাতে থাকে। ঠোকরাতে ঠোকরাতে তারা দেখলে যে দরজা একবারে নড়নড় করছে আর দু'একদিনের মধ্যে ভেঙ্গে যাবে তখন গ্রাবিকে অনায়াসে মুক্ত করা যাবে।

কিন্তু যা ভাবা যায় তা যদি সব সময় হতো তাহলে আর দুঃখ কি? একদিন ফ্লাপি এসে দেখলে খাঁচার দরজা খোলা, গ্রাবি নেই। এইবার সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো আর ছুটলো হাঁসগিন্নির কাছে।

হাঁসগিন্নি বলে: ভাবছো কেন অত? ছাড়া যখন পেয়েছে তখন নিশ্চয় ফিরে আসবে, অধৈর্য্য হয়ো না।

কিন্তু ফ্লাপি বোঝে না অথচ দিন গেল রাত গেল গ্রাবির দেখা নেই।

এইরকম করে দিন কাটে! ফ্লাপি আর খুঁজতে যায় না, বারেবারেই সে এই করবে নাকি?

কানাই সেদিন আধ-ভাঙ্গা দরজা দেখে তার ভাই বোনদের জিজ্ঞাসা করলো কে ভেঙ্গেছে? সবাই অস্বীকার করে, কানাইএর এমন পয়সা ছিল না যে আবার একটা খাঁচা কিনে আনবে। হঠাৎ তার মনে হলো বাবুদের বাড়ী রুগ্ন ছেলে বাবলুর কথা। বাবার সঙ্গে ঝাড়ু দিতে গিয়ে বাবুদের বাড়ীর ছেলেটীর সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল, ছেলেটী অসুস্থ, বেচারীর রোগ আর সারছে না, সারাদিন চুপ চাপ শুয়ে থাকে, বড়লোকের ছেলে যথেষ্ট খেলনা, ছবির বই, নানা দেশের নানা জিনিস তার বাবা মা তাকে দিয়েছে, সেদিন তার খেলনা থেকে একটা এরোপ্লেন বাবলু তাকে দিয়েছিল, দম দিলে সেটা কেমন মাটী ছাড়িয়ে ওঠে।

কানাইকে বাবুল খুব ভালবাসে, গেলে ছাড়তে চায় না—সে খাটের উপর শুয়ে থাকে আর মাটীতে রাজ্যের খেলনা নিয়ে বসে থাকে কানাই।

কানাইও মাঝে মাঝে বুনো ফুল তোড়া বেঁধে নিয়ে যায় বাবলুর জন্য। খাঁচাটা ভাঙ্গা দেখে কানাই এর মনে হলো এমন সুন্দর পাখীটা তার বাবলু বন্ধুকে দিলে কেমন হয়—সে কত ভালবাসবে।

যেই ভাবা অমনি কাজ!

ঐ রকম একটা চমৎকার পাখী দেখে বাবলুর রুগ্ন মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

তখনি একটা চকচকে পিতলের খাঁচায় গ্রাবি স্থান পায় এবং বাবলুর ঘরের সামনে বারান্দার নীচে তাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। সকালে বাবলুকে যখন ইজিচেয়ারে বারান্দায় শুইয়ে দেয় চাকার চাকরে তখন বাবলু গ্রাবিকে পাশে এনে কত কথা বলতো, নিজে যা ফলটল খেতো তা থেকে সে গ্রাবিকে দিতো। বাবলু কত কথা বলতো গ্রাবি সে সব না বুঝলেও তার ভালবাসা সে বুঝেছিল।

বাবলুর মা'ও তাকে মাঝে মাঝে বলতেন: কথা বলতে শেখনারে, বল রাধাকৃষ্ণ।

অমন ধারা কথা গ্রাবি তাদের দেশে শোনেনি—পাখী মহলেও না। বাবলুর মার চেহারাটা বেশ, কেমন লাল পাড় শাড়ী, কপালে আর মাথায় লাল মত কি, ছেলের জন্য কত ব্যস্ত, বাবলুকে কত ভালবাসেন। বাবলুরও বন্ধু দু'টি তার মা আর কানাই।

বেশ সুখেই কাটছিল, কিন্তু ফ্লাপির জন্যই যা কষ্ট—কে জানে বেচারী কি ভাবছে, একা একা কিই বা করছে, হাঁসগিন্নি আছে সেই যা ভরসা।

হঠাৎ দু'দিন থেকে বাবলুর অসুখ খুব বেড়ে গেল, সে আর বাইরেও আসতে পারে না, কথাও কয় না। বাবলুর মা আর হাসে না দিনরাত বাবলুর কাছে বসে থাকে। গ্রাবির দিকে আর কেউ নজর দেয় না। দু'দিন থেকে গ্রাবি খায়নি তার খাঁচা পরিষ্কার হয়নি। বাবলুকে ঐ রকম দেখে গ্রাবির খাবার কথাও মনে থাকে না। মাঝে মাঝে ঘাড় কাৎ করে বারান্দা থেকে ঘরের ভিতরটার দেখবার চেষ্টা করে গ্রাবি—কিন্তু ঢাকা দেওয়া বাবলুর পা দুটো ছাড়া কিছুই সে দেখতে পায় না।

আরো ক'দিন পরে সেদিন সকালে গ্রাবি দেখলে ঝি চাকর সবাই চোখ মুচছে আর বাবলুর মা মাটিতে

পড়ে উপুড় হয়ে কাঁদছে, বাবলুর খাট খালি। কি যে হলো গ্রাবি বুঝতে পারে না, সে যদি ওদের ভাষা জানতো, নিশ্চয় বাবলুর কথা জিজ্ঞাসা করতো, বাবলুকে যে ও সত্যি ভালবাসে।

কত লোক আসছে বাবলুর বাবা শুকনো মুখে তাদের বিদায় দিচ্ছেন। কেউ কেউ মায়ের কাছে যাচ্ছে, মা মুখের ঢাকাও খুলছে না, কথাও কইছে না।

দুদিন পরে একদিন চাকর তাকে খাবার দিতে এসে ভুলে দরজাটা খুলে রেখে চলে গেলো।

গ্রাবি এখন ইচ্ছা করলেই উড়ে যেতে পারে!

তবু গ্রাবি ভাবে বাবলুর কথা, যেতে তার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু বাবলুকে তো সে দেখতে পায় না, সারাদিন খোলা দরজাটার সামনে বসে থেকে সন্ধ্যাবেলা যখন সূর্য্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছেন, আকাশটা লাল, সব পাখীরা বাসায় ফিরছে তখন গ্রাবি কি মনে করে বেরিয়ে এসে বাবলুর ঘরে জানলায় বসলো। ঘর খালি, বাবলুর খাটে কেউ নেই, ঘরের ভিতর একটা পিদীম জ্বলছে আর বাবলুর মা এককোণে একই অবস্থায় শুয়ে আছে। এমন দৃশ্য গ্রাবি কখনও দেখেনি। মনটা তার ভারী হয়ে এলো, চোখ দু'টোয় জল এলো, সমস্ত ঘরটায় উড়ে উড়ে বেরিয়ে দু'চার বার ডাকলো—বাবলু! বাবলু! কিন্তু কেউ উত্তর দিলো না। ধীরে ধীরে সে বাইরে এসে অনন্ত আকাশের তলে আশ্রয় নিলো।

গ্রাবি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত॥

রংমশালের আগামী আকর্ষণ—

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা—ভ্রমণ কাহিনী

সুকুমার দে সরকারের—ছোট গল্প

অমরেশ রায়ের—বৈজ্ঞানিক ফ্যানট্যাসি

আনন ঘোষালের আর একটি য়্যাড্‌ভেঞ্চার কাহিনী

আর, বছরের মাঝামাঝি এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের আর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হইবে। ভাদ্রের রংমশালে **গ্রাহকগ্রাহিকা সংখ্যা** শুধু গ্রাহকগ্রাহিকাদের লেখা লইয়া প্রকাশিত হইবে। এ ছাড়া, কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। এই বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য গ্রাহকগ্রাহিকাদের মূল্য বেশী দিতে হইবে না।

আদি কেষ্টর অ্যাড্‌ভেঞ্চার

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

আদি কেষ্টর নাম শুনেছো
যদি শোন ভুল বুঝেছো
গল্পটা তার লোকের মুখে চলে।
গল্পটা তার খানিক রচা
খানিক কাঁচা খানিক পচা
ইতিহাসে এই কথাটাই বলে।

কেউ বলে সে পুঁটকে ছেলে
কেউ বলে সে শুট্‌কে কেলে
কেউ বা তারে 'কেষ্ট' বলেই ভজে
কেউ বলে সে গুণ্ডা গোচের
যণ্ডা কিম্বা গোঁয়ার ধাঁচের
কেউ বা তারে বলে নেহাৎ বাজে।

এখন বলো কোনটা বলি
নানান মতের কোনটা ফেলি
বলবো নাকো সবার যেটা জানা।
আদি কেষ্টর ছবিখানি
এই সঙ্গে দিলাম আনি
বাংলা ঢুঁড়ে কষ্টে অতি আনা।
কষ্ট করেই নাম সে পায়
দুঃখ সয়েই দুঃখ যায়
এই কথাটা সবাই নাকি মানে
একদিন সে পয়সা নিয়ে
উধাও হয় কি কিনতে গিয়ে
তারপর সে করলো কি কে জানে ?

ডায়েরীতে তার কিছু আছে
কিছু মেলে লোকের কাছে
সারাদিন তার যায়নি টিকি দেখা,
ন্যাপ্‌লা বলে অতি ভোরে
দেখেছে সে হাঁটতে জোরে
বাসের গাড়ী থামতে যেথায় লেখা।

ভেব্‌লু বলে দেখেছে সে
কিউয়ের মাঝে থাকতে বসে
ঠেলাঠেলি করছিল না সে ত !
বেঁচে গেছে বললে ট্যাঁপা
লরীর তলায় পড়তো চাপা
একটু হ'লে গুঁড়িয়ে শুধু যেত।

আরও বল্লে চুপি সাড়ে
এক বুড়ো তার পয়সা কাড়ে
আদি কেষ্টর সাহস বটে বেড়ে !
যুদ্ধ ক'রে করলো আদায়
বেটক্করে পড়লো কাদায়
নেড়ী কুকুর খেঁকিয়ে গেল তেড়ে।
সামলে নিয়ে টাল খেয়েছে
এমনি সময় নজর গেছে
লাল পাগড়ির টনক নড়ে ওঠে
ইধার ডাকু ভাগ্‌তা হ্যায়।
এই না বলে পিছন ন্যায়
নাগরা ঠুকে পাহারওলা ছোটে।

ছুটছে আদি ছুটছে চোবে
ছুটছে লাটু ছুটছে দোবে
গলির মোড়ে পড়লো চানাওলা।
ছড়িয়ে পড়ে চানার ঝুড়ি
মশল্লা আর গরম মুড়ি
চিনে বাদাম মোটর ভাজা ছোলা !

দাপাদাপি হট্টগোলে
আইসক্রীমের বাক্স খোলে
ছেলেরা সব ছড়িয়ে দিলে ফেলে।
ধাক্কা লেগে ফলের ঝুড়ির
বেতো কোমর খ্যান্ত খুড়ির
'যাই মা' রবে জবর আছাড় খেলে।
ভিখিরীরা টপ্‌কে গলে
এগিয়ে পড়ে 'অকু' স্থলে
মুড়ি চানা বরফ দেদার খেলো।
সবাই বলে দিনটা ভালো
দাতার দানে জগৎ আলো
'রিলিফ' বটে, দুঃখ মোদের গেলো !

হুড়ো হুড়ির অট্ট রবে
বন্ধ করে দোকান সবে
খবর গেল লালবাজারের ফোনে।

রায়ট কিম্বা লুটতরাজ
বিদ্রোহ কি গুণ্ডা বাজ
এমনি ধারা করলো সবাই মনে।

তিরিশখানা জঙ্গী লরী
হাজির হলো গুর্খা ভরি
আরো ফৌজ আনতে হুকুম হ'ল।

পল্টনেরা দিল হানা
বাধালো যা কাণ্ডখানা
কতক অ্যারেষ্ট কতক শুধু ম'ল।

ইতিমধ্যে আদি কেষ্ট
গোবেচারা শান্ত শিষ্ট
মায়ের কাছে হাজির ঠোঙা হাতে,

কিরে আদু কোথায় ছিলি
শুনিসনি কি চলছে গুলী
লুঠ দাঙ্গা চলছে এ পাড়াতে ?

কাদা মাখা গায়ে পায়ে
ভাবটা তাহার জানায় মায়ে
রত্ন কি আনলে সে যে কিনি,

বোনটি শীলা ঠোঙাটারে
খুলেই ফেল্লে একেবারে,
মা দেখ্‌লেন একটি সের চিনি ॥

যারা বাৎসরিক চাঁদা ৩।০ পরিবর্ত্তে ৩৲ টাকা পাঠিয়েছ অথবা ষাণ্মাসিক চাঁদা ১৶০ পরিবর্ত্তে ১।।০ বা ১।।৵০ পাঠিয়েছ তারা ঐ হিসাবে তাদের বাকিটুকু এক পয়সার ডাকটিকিট দিয়ে পুরো করে রংমশাল অফিসে অবিলম্বে পাঠিয়ে দিয়ো।

প্রাগ

ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

প্রাগের অপর নাম প্রাহা। চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী। আমরা প্রাহায় পৌঁছে একটা রেল স্টেশনের কাছে গেলাম এবং আমি লরী থেকে নামলাম। আমার সাইকেল এবং পিঠ ঝোলাটা হংগেরীর লোকটি নামিয়ে দিল এবং সেও নামল। সেই লোকটি পায়ে হেঁটে চল্‌ল আর আমি তার পেছনে সাইকেল চালিয়ে চল্‌লাম। ঘণ্টা খানেকের মাঝেই আমরা একটি মজুর ঘরের সামনে আসলাম। মজুর ঘরটা পূর্বে সেলভেসন আর্মির বাড়ি ছিল। বর্তমানে তা মজুর ঘরে পরিণত হয়েছে। হংগেরীয়ান লোকটি আমাকে বাইরে রেখে ঘরে চলে গেল। আমিও চিন্তা না করে তার পেছন নিলাম। ঘরের ধূম্রপাকের মধ্যে অনেক লোক বসেছিলেন। চিৎকার করে বল্‌লাম, 'এখানে কেউ ইংলিশ বলতে পারেন?' একজন লোক এগিয়ে এসে বল্‌ল,—'আমি অতি অল্প ইংলিশ জানি। আপনার কি চাই বলুন ত?' আমি বল্‌লাম—'একটা ঘর চাই, তারপর খাব এবং বেড়াব, অন্যান্য কাজও আছে।' লোকটি বিনাবাক্য ব্যয়ে আমাকে ম্যানেজারের কাছে নিয়ে গেল এবং একটা ঘরের বন্দোবস্ত করে দিল। ঘরটি বড়ই সুন্দর।

দোতলার উপরে আমাকে ঘর দেওয়া হয়েছিল এবং সেই ঘরে ছিল নরম বিছানা (soft bed), সেজন্য আমাকে দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হত। সাইকেলখানা ভাল করে রাখবার জন্য বাইরে এসে দেখি, আকাশটা একদম অন্ধকার হয়ে গেছে এবং ছিটা ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে আরম্ভ হয়েছে। চেক্ ম্যানেজারটি বড়ই উগ্রপ্রকৃতির। তিনি আমার সংগে অতি কম কথাই বল্‌লেন, কিন্তু আর একটি ছোকরা যার বয়স বেশি হয়ত ষোলই হবে, সে এসে আমাকে আর একখানা ঘর দেখিয়ে দিল। আমি সাইকেলখানা ঘরের মাঝে ঢুকিয়ে স্মোকিং রুমে চলে আসলাম। বাড়িটা ছিল অন্য ধরণের তৈরী। বোধহয় পূর্বে কোন ধনী লোকেরই ছিল, তাই এখানে টাকার অনুপাতে ভাল এবং মন্দ নানারূপ ঘর পাওয়া যায়। একখানা ভাল ঘর হতে একজন ভদ্রলোক (মানে যার পোশাকটা বেশ জম্‌কালো) এসে আমার কাছে বসলেন। আমি তখন খাবার কেনায় ব্যস্ত ছিলাম। তোমরা রেস্টোরেণ্টে অথবা ভাতের দোকানে গিয়ে বল, "এই খাবার নিয়ে আয় ত, অথবা বল চা দিয়ে আয় ত?" এখানে সেরূপ কিছু নাই। এখানে একজন মাত্র লোক সবাইকে খাবার দিচ্ছে। স্মোকিং রুমের এক পাশে কতকগুলি প্লেট আর বড় বড় কাপ পড়েছিল। আমি একটা প্লেট আর দুটা কাপ উঠিয়ে যে লোকটি খাবার দিচ্ছিল তার কাছে গিয়ে বললাম—ভেজিটেরিয়ানইস্কি—অর্থাৎ আমাকে নিরামিশ খেতে দাও। ডিম নিরামিশের মাঝেই গণ্য হয়। সেদিন ডিম ছিল না। ছিল কতকগুলি বীনের বিচি সিদ্ধ, আলু, মাখম আর রুটি। সকলের কিন্তু মাখন কেনার ক্ষমতা ছিল না। যারা মাখন কিনতে পারত না, তারা 'ড্রিপিং' কিন্‌ত। গরু এবং শূকরের কাঁচা মাংস থেকে যে চর্ব্বি বের করা হয় তাকে বলা হয় ড্রিপিং। ড্রিপিং জিনিসটা খেতে মন্দ নয়, তবে আমার তা খেতে সংস্কারে বাঁধত, এমন কি অনেকদিন তা খেয়ে বমিও করেছি, তাই আমি মাখনই খেতাম। কপি এবং প্রচুর পরিমাণে চিনি দুধও নিলাম। তা দেখে অনেকের তাক লেগে গেল। খেতে বসে এসে মনে হল কাঁটা

আর চামচের কথা। কাঁটা চামচ যখন চাইলাম তখন একজন বল্‌ল পাঁচ করুন (Korun) জমা রাখো নতুবা এসব পাবে না। বুঝলাম এখানে যত লোক থাকে তারা এতই দরিদ্র যে কাঁটা আর চামচ পেলে ওরা বিক্রি করে দেয়। আমি বিনা আপত্তিতে পাঁচ করুন জমা রেখে কাঁচা চামচ নিয়ে খেলাম। তোমরা হয়ত বলবে রাতারাতি ইউরোপীয়ান হলে কি করে? তার উত্তরে বলব, সারাদিন পথে ছিলাম, হাতে কত কি লেগেছে তার হিসাব ত নাই, তারপর ঠাণ্ডা জল দিয়ে যদি হাত দুখানা ধুতাম তবে হাতে চেতনা ফিরে আসতে অনেক সময় লাগত, তাই কাঁটা চামচের সমূহ দরকার। ভেবনা মানুষ এত সহজে বদ্‌লায়। অনেক ধাক্কা খেয়েও মানুষ বদলাতে চায় না। এখন আমি হাতেই খাই, কাঁটা চামচ ব্যবহার করি না। তবে আমার মনে হয় কাঁটা চামচ ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

একটি ভদ্রলোকের কথা বলেছিলাম, সে ভদ্রলোকটি আমাকে বার বার জার্মান ভাষায় বলেছিলেন, খবরদার এখানে অনেক চোর আছে। ভদ্রলোককে বলেছিলাম, "ভয় করবেন না; আমি পর্যটক মাত্র আমার কাছে টাকা নাই, আমি ডিপ্লমেটিক লোও নই, খাঁটি পর্যটক মাত্র। আমি যে খাঁটি পর্যটক তার প্রমাণ স্বরূপ আমার অটোগ্রাফ বইখানা তাঁর হাতে দিলাম। তিনি তা দেখে বুঝলেন আমি সত্যই পর্যটক, কোন প্যলিটিকেল দলের লোক নই। আমি কিন্তু ভদ্রলোকের পরিচয় পাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম। কয়েকদিন পর তিনি আমায় বলেছিলেন তিনি একজন 'এ্যান্‌টি ফাসিস্ট'। 'এ্যান্‌টি ফাসিস্ট' শব্দটা আমাদের দেশে একটা বাজে কথায় পরিণত হয়েছে। কারণ এর অর্থ কেউ বুঝে না। কিন্তু সকল কথা সকল সময় লম্বা করে বলাও চলে না। 'এ্যান্‌টি ফাসিস্ট' কথাটার ব্যাপক অর্থ আছে। কলকাতায় আসার পর একজন সংবাদ পত্রের কর্তাগোছের লোক বলেছিলেন, বিষয়টা একটু ব্যাপক করে লেখেন। একটু ব্যাপক মানে কি মশাই, একদম কমিয়ে দেব, তাই লেখাই বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তোমার আদেশে লিখব তা ভেবনা এই ছিল আমার মনের ভাব। তা বলে তোমরা আমার মত হয়ো না। যখন আমি বলেছি 'এ্যান্‌টি ফাসিস্ট' কথাটার মস্ত বড় একটা ব্যাখ্যা রয়েছে তখন তোমরা রাগ করে বল না, যাকগে আমরা এসবের কথা ভাববই না। তোমাদের ত ফাসিস্ট ছাড়বে না অতএব এই কথাটাও তোমাদের বুঝতেই হবে। আমি কিন্তু এসবে যাব না, তোমাদের বড় বড় বন্ধুদের জিজ্ঞাসা কর তবে বুঝবে 'এ্যান্‌টি ফাসিস্ট' কাকে বলে।

সেই ভদ্রলোকই একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, "ফরাসী ফাসিস্টরা জুবিতির রেল লাইন ফাসিষ্ট ইতালীকে ছেড়ে দিয়েছে। এখন বুঝলে ত সাম্রাজ্যবাদী ফরাসীও ফাসিস্ট রূপেই গণ্য হয়।

আমার খাওয়া হয়ে গেলে আর বাইরে যেতে ইচ্ছা হল না। বেকার মজুররা কি কথা বলে সময় কাটায় তাই শুনতে ইচ্ছে হয়েছিল, তাই চুপ করে বসে তাদের কথা শুনতে লাগলাম। আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত লোক যখন একত্রিত হন, তখন তারা ইংলিশে কথা বলেন। ইউরোপে যখন বিভিন্ন দেশের লোক একত্রিত হয়ে কথা বলে তখন তারা ফরাসী ভাষা ব্যবহার করে! মজুর ঘরটাতে নানা দেশের লোকই ছিল তাই ফরাসী ভাষায় কথা হচ্ছিল। দুঃখের বিষয় কয়েক মিনিট বসে থাকার পরই একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আমাকে সকলের কাছে পরিচয় করে দিলেন এবং তিনিই অপরের কাছ থেকে নানারূপ প্রশ্ন সংগ্রহ করে আমাকে সেই প্রশ্নগুলির জবাব দিতে বল্‌লেন। আমার মজুতদের কথা শোনা আর হল না, মজুরদেরই আমার কথা শুন্‌তে হয়েছিল। একটি বৃদ্ধ লোক জিজ্ঞাসা করেছিল, "ভারতের মাঝে এমন লোক এখনও আছে শুনেছি যারা মানুষ খায়, তা সত্যি কি?" তোমরা তার কি উত্তর দিতে জানি না কারণ তোমাদের মাঝে এখনও অনেকের ধারণা রয়েছে আফ্রিকার

জংলী লোকও মানুষ খায়। আমি যা জবাব দিয়েছিলাম তা শুনে বৃদ্ধের জ্ঞানচক্ষু খুলেছিল এবং যতদিন আমি
প্রাগে ছিলাম প্রত্যেক দিনই বৃদ্ধ এসে আমাকে নমস্কার দিত।

পরের দিন সকাল বেলাটা বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল, কিন্তু পিঠে ব্যথা হওয়ায় বিছানা থেকে উঠবার ক্ষমতা
ছিল না। ঘুম থেকে উঠতে দেরী হল দেখে একটি লোক আমার সংবাদ নিতে এসেছিল। তাকে ইংগিতে
জানালাম আমার পিঠে ভয়ানক ব্যথা করছে তখন সে নীচে গিয়ে আর একজন লোককে ডেকে আনল। লোকটি
চেক। সে এসেই একটা মলম আমার পিঠে ঘসে দিল এবং তাতে আমি বেশ আরামও পেয়েছিলাম। বিকালে
ঘর হতে বের হয়ে একটি ছোট্ট ক্লাবে যাই। সেই ক্লাবে অনেকগুলি যুবক বসেছিল। তার মাঝে ছোট ছোট ছেলে
মেয়েও ছিল। এদের ক্লাবে বসে থাকতে দেখে মনে হল, এ আবার কি? পরে জেনেছিলাম এসব ছেলেমেয়ের
কারো বাবা নাই আর কারো মা নাই। তাই তারা তাদের বড় ভাইদের সংগেই থাকে। বড় ভাই যেখানে যায়
তারাও সংগে যায়। কারো বাড়িঘর নাই ত, তাই আজ ক্লাবে, কাল হোটেলে এরূপ করে দিন কাটায়। আমাদের
দেশের অনেক লোক না খেয়ে মরতে দেখেছ, ইউরোপে তা হয় না। তারা খাবার এবং থাকবার স্থান যোগাড়
করেই। যখনই খাবার এবং থাকবার যোগাড় হয় না তখনই তারা চলে যায় পুলিশ স্টেশনে এবং গিয়ে বলে, "হয়
খাবার দাও নয় কাজ দাও।" পুলিশ যাদের পারে তাদের কাজে পাঠায় আর যাদের কাজ দিতে পারে না তাদের
খাবার দেয়। উপবাস করে মরাটা যেমন অন্যায় কাজ তেমনি উপবাস করে মরতে দেওয়া আরও অন্যায় তাই
ইউরোপের লোক শুধু যুদ্ধের সময় ছাড়া উপবাস করে কেউ বড় একটা মরে না।

চারটা দিন আকাশ পরিস্কার ছিল না, তাই আমিও কোথাও দূরে যাইনি। পঞ্চম দিন বাইরে
যাব, এমন সময় শরীর ভয়ানক চুলকাতে লাগল। তাড়াতাড়ি করে ঘরে গিয়ে সার্টটা খুলে ফেললাম।
সার্টটা পরীক্ষা করে দেখলাম তা সাদা উকুনে ভর্তি হয়েছে। তৎক্ষণাৎ বয়কে ডেকে সার্টটা দেখালাম এবং
বললাম, এখন বিছানার চাদরগুলি বদলাও, তারপর আমার কাপড়গুলি হয় নিজে ধুয়ে দেও, নয়ত ধোবাকে
দিয়ে ধুইয়ে নিয়ে এস। বয় অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে আমার কথায় রাজি হল। ইউরোপ
ভ্রমণের সময় আমি দুই প্রস্থ পোষাক রাখতে বাধ্য হতাম। প্রকৃত পক্ষে সেদিনটাতেও আমার বাইরে
যাওয়া হয়নি। পরের দিন থেকে আকাশ একেবারে পরিস্কার। ইউরোপের পরিস্কার আকাশ বড়ই আনন্দ
দায়ক। পরিস্কার আকাশের সুন্দর সূর্য্যালোক আমার মনকে দ্বিগুণ উৎসাহিত করেছিল।

ঐ যে গরীব এবং বেকার মজুরদের মাঝে আমি থাকতাম সেই ঘরটাতে নানা রকমের লোক বাস
করত। অনেক জার্মান পর্যটকের সংগেও আমার দেখা হয়, আবার যে সকল ইহুদীকে জার্মানী হতে তাড়িয়ে
দেওয়া হয়েছে তারাও ঐ ঘরটাতে থাকত। জার্মান পর্যটকরা মনের দুঃখে গড়গড় করত, আর নির্বাসিত
জার্মান ইহুদীরা দেশ ত্যাগের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলত। এতে তোমাদের মত ছেলেমেয়েও ছিল। তাদের
কেন দুর্দ্দশা হল, সকলেই সেই দুর্দ্দশার কারণ জানতে চাইত। কেউ কিন্তু তাদের এই দুর্দ্দশার কারণ অজানিত
কোন শক্তির উপর ছেড়ে দিত না। ইহুদীরা বলত, তাদের দুর্দ্দশার কারণ হিটলার, আর জার্মান পর্যটকরা
বলত, তাদের দুর্দ্দশার কারণ বৈদেশীক সাম্রাজ্যবাদ।

প্রাগে ছিলাম প্রায় চৌদ্দ দিন। এই কটা দিন বেশ করে পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি। প্রাগ বড়
নগর নয়। ড্রেসডেনের সমান হবে বলে মনে হয় না। তাই পায়ে হেঁটে চলতে কোন কষ্ট হ'ত না।
নগরখানা বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। লোকজনও বেশ দয়ালু। আমার সংগে যিনি চলতেন তিনি একটা

ইংলিশ কথাও বলতে পারতেন না। ইচ্ছা করেই তাঁকে গাইড করেছিলাম, কারণ তখনকার দিনে প্রাগ ছিল রাষ্ট্রনীতি চিন্তা করার একটা বিশেষ আড্ডার স্থান। জার্মানী ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। হিটলারের কথা সকলেই বলত। হিটলার ভবিষ্যতে মধ্য-ইউরোপের ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে কিরূপে রাখবেন তার কথা যেমন লোকে চিন্তা করত, তেমনি চিন্তা করত ষ্টালিনের কথা। চিন্তা করা আর সংগে সংগে সেই চিন্তা অনুযায়ী কাজ করা হল ইউরোপীয়দের জন্মগত অভ্যাস। কাজ করাটা কিন্তু বড়ই শক্ত। আমাদের দেশে যেমন লোক 'অমুকের জয়' চীৎকার করেই কাজ শেষ করল, ইউরোপের লোক সেরূপ নয়, তারা চিৎকার করেনা, তারা করে কাজ। তারপর ইউরোপীয় লোকের মনের ভাব সহজে বদলায় না। যদি কারো মনে কোন একটা পরিবর্তনের চিন্তাধারা এসে যায় তবে যে পর্যন্ত সেই চিন্তাধারা কাজে পরিণত না করতে পারে সেই পর্যন্ত সে কাজই করে যায়। এরূপ অনেক লোকের সংগে এই গরিব লোকদের বাসস্থানে দেখা হয়েছিল।

কতকগুলি গরীব লোক একদিন আমাকে নিয়ে একটি ধনী চেকের বাড়ীতে গিয়ে বলেছিল, আমি অনেকগুলি শীতবস্ত্র চাই। যখন এরা কথা বলছিল তখন আমি অন্যমনস্ক ছিলাম। আমি দেখছিলাম ধনী লোকটির বাড়ির সাজসজ্জা। এমন সময় ধনী লোকটি আমাকে তাঁর একটি পোষাক এনে তাই পরতে বলেন। আমি ধনী লোকটির আচরণে দুঃখিত হয়েছিলাম এবং ইংলিশ, ফ্রেন্চ এবং জার্মান ভাষায় মিলিয়ে ধনী লোকটিকে বলেছিলাম, "অপরের দ্বারা ব্যবহৃত পোষাক আমি ব্যবহার করিনা, তা ছাড়া আমার পোষাকের কোন দরকার নাই।" ধনী লোকটি আমার কথা ভাল করে বুঝতে না পেরে তার একজন ইংলিশ ভাষা জানা কেরাণীকে ডাকেন। কেরাণীকে যখন বললাম যে আমি কিছু চাইতে এখানে আসিনি, আমি এসেছি শুধু একজন ধনী লোকের বাড়ী দেখতে, তখন ধনী লোকটি চেক গরীবদের উপর বড়ই রাগ করলেন এবং বেশ বকতে আরম্ভ করলেন। তাঁর রক্ত চক্ষু দেখেই কতকগুলি লোক ভীত হয়েছিল এবং তিনি যখন রাগ করে কথা বলতে আরম্ভ করলেন তখন সকলেই মাথা নত করে রইল। ধনী লোকটি আমাকে প্রশংসা করে বলেছিলেন, "কোন ভদ্রলোকের ছেলে সেকেণ্ড-হাণ্ড পোষাক ব্যবহার করে না। ভারতের লোক সবাই ভদ্রলোক অর্থাৎ ধনী তাই তারা এরূপ ছোট লোভে কখনও পা বাড়ায় না।" ভদ্রলোকের প্রশংসা বেশিক্ষণ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না, তাই তাকে দুভাষীর মারফতে বলেছিলাম—"দয়া করে আগে আপনার দেশ হতে দারিদ্র দূর করুন, দেখবেন এরূপ মিথ্যা কথা বলে অর্থাৎ আমার নাম করে আপনার কাছ থেকে পোষাক চাইতে আর কেউ আসবে না।" আমার কথা শুনে ধনী ভদ্রলোক একটু দমে গেলেন। আমি তথায় আর বেশিক্ষণ না বসে একটা বড় রেস্তোরাঁয় গিয়ে চেক ভাষায় লেখা ভিক্ষাপত্র বিলি করতে লাগলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম চেকদের ভিক্ষা দেবার ক্ষমতা অতি অল্প। যারা দিচ্ছে তারা সবাই জার্মান, হংগেরিয়ান এবং সারবিয়ান। অনেকে চেকদের বেশ প্রশংসা করেন, আমি কিন্তু শুধু গরীব চেকদেরই প্রশংসা করব, ধনীদের কথা মুখেই আনবনা কারণ এঁরাই হলেন কুলীংশ্রেণীর লোক এবং একদম হৃদয়হীন।

প্রাগে বেশিদিন না থেকে স্থইডেনটেন্ এলাকার দিকে রওয়ানা হলাম। এদিকে ক্রমেই আমাকে চড়াই ঠেলে উঠতে হয়েছিল বলে প্রত্যেক দিন ২৫ মাইলের বেশি পথ অগ্রসর হতে পারিনি।

সম্পাদকের লিখন

বন্ধুগণ,

এই সেদিন কলকাতার বাইরে গিয়েছিলুম। ফিরে আসবার সময়ে ট্রেণের কামরায় ছিলুম একলা আমি।

একাকীত্ব পছন্দ করি। মনে হচ্ছিল যেন নিজের ঘরে ব'সে আছি। বড় ভালো লাগছিল। খোলা জান্‌লা দিয়ে আঁখি-পাখীকে উড়িয়ে দিলুম মাঠে বনে আকাশে বাতাসে। মনের পট হয়ে উঠল ছবির পট।

বড় ভালো লাগছিল লাঙলের নক্সা-কাটা শস্য ক্ষেত, আঁকা-বাঁকা নদীর তীররেখা, দিগন্তে হারিয়ে-যাওয়া ঘাসের শ্যাম-শয্যা, তরুকুঞ্জের ছায়ায় ঘুমন্ত ছোট ছোট গ্রাম।

দেখি, অধিকাংশ যাত্রীই রেলগাড়ীতে চ'ড়ে এ-সব দৃশ্যের দিকে চোক ফেরায় না। কামরায় উঠে তারা গল্প করে বা ঝগড়া করে বা ঘুমিয়ে পড়ে। কোন কোন ভয়াবহ যাত্রী আবার বিকট স্বরে সঙ্গীতকে ধমক দিয়ে আমাদের শ্রবণ-যন্ত্রকে বিকল করবার চেষ্টা করে। আমি ও-দলের মানুষ নই। রেলগাড়ীর টিকিট কেনবার সময়ে আমি মনে করি, ছবিঘরের টিকিট কিনছি।

ঐ যে একটি শুভ্র পথের রেখা গ্রামের প্রান্ত থেকে বেরিয়ে, কখনো তরু-বীথিকার ভিতর দিয়ে, কখনো নিবিড় জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে আবার আত্মপ্রকাশ ক'রে ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে, ঐ পথের শেষে কি আছে? কোন বিদেশী রাজার বাড়ী? কোন তপস্বীর তপোবন? কোন রক্ষোপুরের পাথরের দেওয়াল—যার ওপাশ থেকে শোনা যায় বন্দিনী রাজকন্যার করুণ কান্না?

মধ্য-দিন—ওড়ে তপ্ত ধূলি! দূর গ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছে কোমরে আঁচল বেঁধে একটি তরুণী—মাথায় তার কিসের পসরা। রবীন্দ্রনাথ ওকে দেখেই কি তাঁর "পসারিণী" কবিতাটি রচনা করেছিলেন?

যেখানে তাল-নারিকেলের দল চারিদিকে দাঁড়িয়ে একটি টল্‌মলে পুকুরের জলে নিজেদের ছায়া দেখবার চেষ্টা করছে, সেইখানে ঘাটের পইঠায় ঘট রেখে একটি মেয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছে মূর্ত্তির মত। ও মেয়েটি কি ভাবছে? ওর কি নূতন বিয়ে হয়েছে? এসেছে এই প্রথম শ্বশুরবাড়ীতে? ওর কি মন কেমন করছে বাপের-বাড়ীর কথা ভেবে?

দুপুর গেল। বৈকালও যায় যায়। চৈত্র-শেষের সূর্য্যের তাপ হয়ে আসছে মৃদু। মাঠে মাঠে বনের ছায়া দীর্ঘতর। আচম্বিতে আকাশেও কিসের কালিমা? কাল বৈশাখীর নবকৃষ্ণ মেঘ?

দেখতে দেখতে ঘনসন্নিবিষ্ট ব্যূহবদ্ধ শিক্ষিত সৈন্যশ্রেণীর মত সেই কাজলকালো বিপুল মেঘের দলবল হু-হু ক'রে আকাশ-প্রান্তরের মাঝখানে এসে পড়ল—চতুর্দ্দিকে বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ নিবিড় অন্ধকার ছড়িয়ে। সূর্য্য পলাতক। বজ্রের হুহুঙ্কার। উন্মত্ত ঝড়ের প্রচণ্ড অট্টহাস্য। দিকে দিকে আর্ত্ত অরণ্যের হাহাকার। মানুষের চক্ষু অন্ধ।

তারপর দেখি পশ্চিম আকাশে আবার বসেছে সূর্য্যালোকের সমুজ্জ্বল আসর এবং কালবৈশাখীর কালো ফৌয যুদ্ধযাত্রা করেছে পূর্ব্ব-গগনের দিকে। এ যেন পাশাপাশি কান্না আর হাসি, সুখ আর দুঃখ, সংগ্রাম আর শান্তি।

এমনি ছবির পর ছবি। কখনো কোমল, কখনো ভীষণ, কখনো করুণ, কখনো শান্ত। অবাক হই, রূপে মন ভ'রে যায়, বড় ভালো লাগে।

বন্ধুগণ, আমার মন আমার চোখ তোমরা নাও। বিচিত্রের শোভাযাত্রা দেখতে শেখো। সিনেমার টিকিটের চেয়ে রেলগাড়ীর টিকিট হচ্ছে বেশী মূল্যবান, বেশী লোভনীয়। মনে রেখো আমার এই নববর্ষের বাণী। ইতি—তোমাদের, শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

চলন্তিকা

চলন্তিকার হালখাতার মহরতে নববর্ষের প্রথম নূতন দিনে নবমবর্ষের রংমশাল তার অসংখ্য গ্রাহকগ্রাহিকা পাঠকপাঠিকাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভ কামনা জানাচ্ছে। রংমশাল এমনি করে বছরে বছরে চিরনূতন হয়ে যেন তোমাদের মনে আলো আনন্দ ও আশা জাগিয়ে তোলে। আমরা বর্ষের এই প্রথম মধুমাসে এক মহাপুরুষকে স্মরণ করছি, যিনি ২৫শে বৈশাখ বাংলা মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই অমর কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা নমস্কার করি।

আজ এই দুর্মূল্যের বাজারে নানা বিপদ বাধা সত্ত্বেও রংমশাল তার আদর্শ অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে এ কথা জেনে ও জানিয়ে আমরা আনন্দিত হচ্ছি। গ্রাহকগ্রাহিকা পাঠকপাঠিকা ও সাহিত্যরসিকদের প্রশংসাবাণী রংমশালের চলার পথে প্রেরণা দিয়েছে। তাই আজ আমরা

শিশু-কিশোর তরুণদের এই সবচেয়ে বড় পত্রিকাখানি তাদের মনের মত রচনাসম্ভারে সাজিয়ে
প্রকাশ করতে পারছি। এই বছরের রংমশাল আরো অনেক নতুন জিনিষ নিয়ে তার গৌরব বৃদ্ধি
করবে। হেমেন্দ্রকুমার রায় যে উপন্যাসটি লিখছেন সেটি হবে তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।
অবনীন্দ্রনাথের অপরূপ রচনা ভুতপত্রীর যাত্রা রংমশালের একটি বিশেষ সম্পদ। দক্ষিণারঞ্জন
মিত্র মজুমদার যাঁর কাছে রংমশাল সমস্ত পত্রিকার চেয়ে প্রিয় পত্রিকা তিনি তাঁর নানা সুমধুর
রচনায় রংমশালকে ঐশ্বর্য্যশালী করবেন। শীঘ্রই আমরা আরও একটি নূতন উপন্যাস সুরু
করবো। তাছাড়া—প্রেমেন্দ্র মিত্র, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সতীকান্ত গুহ, সুকুমার দে সরকার,
আনন ঘোষাল, ইন্দিরা দেবী, সুনির্ম্মল বসু, জসিম উদ্দীন, শামুক, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, প্রভাতকিরণ
বসু, কবিশেখর কালিদাস রায় এবং আরো অনেকের রচনাবলী রংমশালে প্রকাশিত হবে।

মাংসের যোগান দিতে ভারতবর্ষের গৃহপালিত পশু প্রায়-নির্ম্মূল হতে বসেছিল। পশু
সম্পদে ভারতবর্ষ পৃথিবীর সুবিখ্যাত। দেশের এই সম্পদ রক্ষা করবার জন্য বহুদিন থেকে
আন্দোলন চলছিল। সম্প্রতি বাঙ্গলার গভর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহারে নির্দ্দেশ করেছেন যে সপ্তাহে
ছুদিন—সোম ও বৃহস্পতিবার কেউ মাংস খেতে পাবে না বা মাংস বিক্রী হবে না। এই নির্দ্দেশে
বাঙ্গালীদের কোন ক্ষতি নেই, বাঙ্গালীরা এমনিতেই রোজ মাংস খায় না। তাছাড়া বাংলার
জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থান এরূপ যে অত্যাধিক মাংস খাওয়া সাধারণের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।
যাই হোক এতে করে বাংলার পশু রক্ষার একটি উপায় হল।

ভারতবর্ষের ক্রিকেট খেলার মরসুম শেষ হল। এবারে রণজী ক্রিকেটের সেমি-
ফাইনালে বাঙলা দল বিজয়ী হয়েও শেষ পর্য্যন্ত ফাইনালে পশ্চিম ভারতীয় রাজ্য দলের কাছে
শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ২৩ রাণে পরাজিত হল। পশ্চিম ভারতীয় রাজ্যদলের কয়েকজন
খেলোয়াড়ের বিশেষ করে শান্তিলাল গান্ধী, কিষেণচাঁদ ও সৈয়দ আমেদের খেলা সত্যিই
প্রশংসাযোগ্য। এই খেলায় বাংলা দল কোন কৌতুহল বা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারেনি।
প্রথম ইনিংসে বাংলা দলের মোট দৌড় হয়েছিল ২৩৪ আর পশ্চিম ভারতীয় রাজ্য দলের হয়েছিল
৪৩৩। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৭৬ দৌড়ে বাংলার পতন হ'ল। এক ইনিংস ও ২৩ রাণে বাংলা
পরাজিত হল। আশা করি বাংলা দল এই পরাজয়ে যে শিক্ষা লাভ করল ভবিষ্যতে ক্রিকেট
প্রতিযোগিতায় তা অনেক কাজে আসবে।

সম্প্রতি কানাডা রাজ্যের মন্ট্রিল সহরে এক রহস্যময় ব্যাপার ঘটেছে। ঐ সহরে
একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মান্দ্রাজী ডাক্তারের একমাত্র মেয়ে কুমারী ভালসা মাথাইয়ের কোন সন্ধান
পাওয়া যাচ্ছে না। এই নিয়ে সহরে খুব হৈ চৈ এর সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ মরীয়া হয়ে কোমর
বেঁধে সন্ধানে লেগেছে এবং সম্ভব অসম্ভব সব রকম জায়গায় খানাতল্লাসী করেছে। এমন কি

তারা চৌবাচ্চা, বরফ কল, চুল্লী প্রভৃতিও খুঁজে দেখেছে। একটি বিরাট ছতলা বাড়ি একেবারে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হচ্ছে। যেখান থেকে মেয়েটি হারিয়েছে, তার আশেপাশের সব বাড়ি রোজ খানাতল্লাস করা হচ্ছে। কিন্তু কিছুই ফল হয় নি। আমেরিকার একজন বিশিষ্ট ভারতীয় নেতা সর্দ্দার জে, জে, সিং মনে করেন যে মেয়েটি যখন বরফ পড়া দেখবার জন্যে বেড়াতে বেরিয়েছিল, তখন হয়তো অসাবধানে মোটরের ধাক্কা লেগে তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তাহলেও তার মৃতদেহটাও অন্ততঃ ত পাওয়া যেতো। কুমারী ভালসার একটি বন্ধু বলেছে যে ভালসা যেমন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছে তেমনি হঠাৎ সে ফিরে আসবে। মন্ট্রিলএ খুব হুলস্থুল চলছে।

গত ২২শে মার্চ্চের একটা সংবাদে প্রকাশ যে, জাপানীরা তিন জায়গায় ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করেছে এবং সোমরা পার্ব্বত্য অঞ্চলে সঙ্ঘর্ষ চলছে। ইতিপূর্ব্বেই ব্রিটিশ বাহিনী উত্তর ব্রহ্মের প্রধান প্রধান ঘাঁটি থেকে জাপানীদের বিতাড়িত করছিল। সেই সময় হঠাৎ জাপানীদের ভারতবর্ষে প্রবেশ খুব আকস্মিক ব্যাপার। জাপানীরা প্রথমে ইম্ফলের (মণিপুরের রাজধানী) দিকে অভিযান চালিয়ে ঐ সহরের ৮ মাইল দূরে এসে পৌঁছেছিল। তারপর হঠাৎ তারা গতি পরিবর্ত্তন করে উত্তর দিকে গিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি কোহিমা নাকি আক্রমণ করেছে। ইম্ফলকে তারা চারধার থেকে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। তাদের প্রধান লক্ষ্য বোধ হয় রেলপথগুলি বিচ্ছিন্ন করা। যাই হোক, যুদ্ধ এতদিন পরে সত্যিই ভারত সীমান্তে এসে পড়ল।

রংমশালের এক বিজ্ঞাপনে দেখতে পাবে তোমাদের সুপরিচিতা শ্রীইন্দিরা দেবীর প্রয়োজনায় ছোটদের দ্বারা ছোটদের বড় অভিনয় হচ্ছে শ্রীরঙ্গম নাট্যমঞ্চে আগামী ১৯শে বৈশাখ। শুধু অভিনয় নয়, বুঝতে পারছ আরো অনেক নাচ গান হল্লাহাটের কাণ্ড আছে। শুনে খুসী হচ্ছি যে এ রকম ব্যাপার বঙ্গদেশে এই নাকি প্রথম।

জানেন তো—

অল্পবয়সে বীমা করিলে চাঁদা কম লাগে—নিয়মিত সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং পরিণত বয়সে এককালীন নগদ টাকা হাতে আসে। নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানেই জীবন বীমার ব্যবস্থা করা উচিত কেননা সেখানে বীমাকারীদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। বীমা করিবার পূর্ব্বে বাংলার সর্ব্বপুরাতন বীমা প্রতিষ্ঠান **হিন্দু মিউচুয়াল** লাইফ এসিয়োরেন্সএর কথা সর্ব্বাগ্রে মনে আসে, কেন না এই প্রতিষ্ঠান অর্দ্ধশতাব্দীর উপর বাংলার ঘরে ঘরে বাঙালীর গৃহে ও প্রবাসে অগণিত দাবীর মুদ্রা প্রদান করিয়াছে।

* **হিন্দু মিউচুয়াল হাউস** *

১৪, ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা।

অষ্টম আশ্চর্য

শ্রীমানিক রায়

দেখেচ কি উড়ুক্কু মাছ ?
জল ফেলে উড়ে উড়ে চলে
আকাশেতে পাখ্‌নার বলে ?
দেখে থাকো যদি কভু ডুবন্ত চিল,
শূন্য-বিহার ছেড়ে ভাসে এসে জলে
তবে তার পাবে কিছু আঁচ ঃ
কেমন ছিল যে সেই উড়ুক্কু মাছ।

কাঠবেড়ালি তো তুমি দেখেচ নিশ্চয়
গাছে গাছে রয়।
কাঠ বলে' প্রায় হয় ভ্রম ;'
কাঠ্‌ঠোক্‌রার তারা আত্মীয় নয় ;
কাঠ হাসির মত অতি মনোরম।

সোনার পাথর বাটি দেখা যায় নাকি,
নয় একদম্ ফাঁকি।
দেখেছে তাহারা,
হাতীর ঘোড়দৌড় দেখেছিল যারা।

জলহস্তীর কথা বোলো নাকো আর।
আমার বিশ্বাস,
জলহস্তীরা আছে।

আজো আছে তেম্‌নি আকার—
কিছুমাত্র হয়নিকো ক্ষীণ।
তবে তারা জলে আর করেনাক বাস
হয়েছে প্রবীণ।
চালাক্‌ও হয়েছে কিছু আমার ধারণা।
জলহস্তীর কথা নয় কানে শোনা,
স্বচক্ষে দেখেছি আমি—

দেখেছি যেদিন—
স্থলকচ্ছপ এক আমার সকাশ।

পরীরা নিশ্চয় আছে, আছে মহাশয়,
পররা যত খারাপ, পরী তত নয়—
পরীরা বরং আপনার।
অনেকের তপস্যার ফল।
পরীরা এখনো আছে আমার প্রত্যয়।
সোনার পাথরবাটি
যেমন, তেম্‌নি তারা দামী।
তেম্‌নি তারা খাঁটি।

বল্‌ব কেমন সেই পরী ?
কিছুটা উড়ুক্কু তার মাছের মতন,
কিছুটা ঘুরুক্কু তার গাছের মতন,
কিম্বা কাঠবেড়ালির মত।
অনেকটা জলে জলে ঘুরন্ত চিল—
তুরন্ত কতো
সেইরূপ, জানো, এই পরী ?
জলহস্তীর সাথে নেই তার মিল
তবু এক তিল।
বরঞ্চ জলকন্যার
কিছু মেলে—ছাড়তে পারলে চৌব্বাচ্চায় ;
তবে কিনা, ছাড়া ভারী দায়,
ডুবে যায় আবার ?

বিশ্বাস না হয় যদি কারো—
মনে করো বক্‌চি বেভুল ?
তাহলে এখানে এসে দেখে যেতে পারো
এই পরী—মোদের পুতুল ॥

"নববর্ষ তুমি দাও শান্তি
দাও মধুরতা সৌম্য ম্লান কান্তি
জীবনের দুঃখ দৈন্য অতৃপ্তির পর
করুণ কোমল আভা গভীর সুন্দর।"

বন্ধুরা !

বৎসর প্রারম্ভে নতুন দিনের প্রভাতে তোমাদের সমস্ত ভাই বোনেদের আমার আন্তরিক আশীষ ও প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই। দুঃস্বপ্নে দুগ্রহে দুঃখ বেদনা অভিশাপে জড়ানো ছিল বাংলার বিগত বছরের দীর্ঘ দিনগুলোয়। আমরা হেরেছি অনেক, হারিয়েছি অনেক, ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করেছি নানাভাবে। বিগত বছরের দুঃখ ভরা দিনগুলোর জের টানবো না বর্ত্তমান বছরের দিনগুলোতে। যা গেছে যাক, যা হারিয়েছি হারাক, যে ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে হোক—বিগত বছরের কোন চিহ্ন আনবো না আমাদের নতুন বছরের জীবনে।

এ বছরে আমরা প্রস্তুত হবো, তৈরী থাকবো। বিগত দুঃখের দিনগুলো যেন গুণ টেনে ফিরে না আসে। নতুন বছরের নতুন দিনে, ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে নতুন আশা নিয়ে, নতুন ভাষা নিয়ে রংমশাল তার যাত্রা সুরু করুক। তার আলো তোমাদের সকলের অন্তরকে রাঙিয়ে তুলুক আজকের দিনে এই প্রার্থনা রেখে গেলাম চিঠির বাক্সে।

শ্যামগোবিন্দ মজুমদার (কলিকাতা) ৫৭৭, হাতে অনেক সময় ? কি করবে ? বাইরের বই পড়ো। সব চেয়ে ভালো হয় যদি তোমার অবসর সময়টা বেড়িয়ে কাটাতে পারো। যেখানেই যাও সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে মিশো, সেখানকার অবস্থা ও আবহাওয়া জানবার চেষ্টা করো। যদি পারো ছোট ছেলেদের সঙ্গে মিশে তাদের লাইব্রেরী ও ক্লাব গঠনের দিকে উৎসাহ বাড়িয়ে দাও। যেখানেই যাও, কাজ করো, সংগঠন শক্তি বাড়াও, আত্মবিশ্বাস আনো, কেমন ? তোমার দিদির কথা জেনে খুব ভালো লাগলো। **জঃ না. দা.** (পাটনা) ২০৪৪, সব সময় চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় নানাকারণে, স্থানাভাবও বটে—সেজন্য কি তোমরা রাগ করো ? লেখা বিচারকের কাছে গেছে। **সমরেন্দ্র, উমা, নীলিমা চক্রবর্ত্তী** ও **বাণী** (আজমীর) ১৫১৫, তোমাদের সকলের চিঠি একত্রে পেলুম। উমা, ভূত কি রকম দেখতে ? বল্লুম তো আমার মত। বাংলা দেশে অনেক ভূত আছে এলে দেখাবো—কেমন ? নীলিমা, অন্য কি নাম ভাই বলতে চাও ? এখানে এই একটাই নাম আছে। বাণী, ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে, তোমার গোটা গোটা লেখা ভারী আনন্দ দিয়েছে। অনেক লিখলেই লেখা ভালো হবে। সমরেন্দ্র, ডাক টিকিট পাঠালেই বন্ধু যাবে। **গীতা দে** (কটক) ১৫৯৪, তোমার দাদার মৃত্যু সংবাদ শুনে ব্যথিত হলাম। আমাদের দেশে অকাল মৃত্যুই সব চেয়ে বড় অভিশাপ এবং

দেশের দিক থেকে যে কত বড় ক্ষয় ক্ষতি তা বলবার নয়। তোমার দুঃখ বেদনার সঙ্গে আমার আন্তরিক যোগ আছে জেনো। তোমার দাদার প্রিয় কাজগুলি তুমি নিজে করো—সেই কাজ ও ভালবাসার মধ্যে তাঁকে নিজের কাছে ধরে রেখো। তাঁর কথা স্মরণ করে নিজেকে সব দিক দিয়ে সুন্দর করে তোলবার চেষ্টা করো তাহলে আমিও কম খুশী হবো না। আর যাঁর কথা লিখেছ, সমর বিভাগের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে জানালে খবর পাওয়া যায়, আশা রাখতে হয় ভাই। **অমিয়া চট্টোপাধ্যায়** (পুরুলিয়া) ১২৯১, অগ্রহায়ণ মাসের রংমশাল পাবে অল্প কিছু বেশী দাম পড়বে। ইন্দিরাদি তোমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে ভালোবাসেন তাই মাঝে মাঝে দেখা দেন, তাঁকে বলবো তোমাকে সেলাই শেখাতে। **বেলারাণী গাঙ্গুলী** (হবিগঞ্জ) ১৫০৬, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে জেনে খুশী হলাম। চিঠি ও লেখা যথাস্থানে পৌছবে। **প্রতিভারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পারুল দেবী** (বৈঁচি) ১৯৩৮, চিঠিখানা পেয়ে ভালো লাগলো। তোমরা যে ভাবতে শিখেছ এ কথা জানতে পেয়ে আশ্বস্ত হলাম। ভাল মন্দ নিজেরা যত চিনবে শিখবে তত তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। লেখাটা তো ভালই লেগেছে তবু যথাস্থানে পাঠিয়েছি বিচারের জন্য। **সত্যব্রত ও দেবব্রত ঘোষ** (কুমিরা) ২০৪৯, সবগুলো চিঠি পেয়েছি। অবনীন্দ্রনাথের বইগুলোর নাম পাঠাচ্ছি যত শীঘ্র সম্ভব। যাঁদের ঠিকানা চেয়েছ সম্ভবতঃ তাঁদের সবগুলো আমি জানি না। লেখা পাঠিয়েছি। **নির্ম্মলকুমার রায়** (কলিকাতা) ১৮৭০, কবিতায় লেখা চিঠি পেলাম, গল্পও। পাঠিয়ে দিয়াছি বিচারকে কাছে। **ধীরেশচন্দ্র চৌধুরী** ১৯৫৮, পুরো নাম ঠিকানা নেই কেন? তোমাকের নাটক চাই এ কথা পরিচালক মশাইকে জানিয়ে দিচ্ছি। ছদ্মনাম ব্যবহারে কি লাভ? সালেমা খাতুনের জন্য তোমার আন্তরিক দুঃখ অনুভব আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করেছে। **সত্যেন্দ্রনাথ বসাক** (কলিকাতা) ১৮১২, তোমার নির্ভীক সমালোচনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পরিচালক মশাইকে তোমার চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমাদের ভালো মন্দ লাগার দিকে আমাদের দৃষ্টি আছে জেনো। **সুশীলকুমার সিদ্ধান্ত** (রাইগঞ্জ) ১৯৯৫, যে সম্পর্কে আমায় লিখতে বলেছ চেষ্টা করবো সে সম্পর্কে তোমাদের সহজ ভাষায় কিছু লিখে দেবার জন্যে—তবে আমি নই, এ বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ তাঁকে দিয়েই লেখাবো। রঙীন ছবি দেওয়া এ সময়ে সম্ভবপর নয়। সময় একটু ভালো হলে রংমশালকে আরো সুন্দর করে সাজানো হবে। ওটা যথাসময়ে জানতে পারবে। **সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়** (জামসেদপুর) ১৩৫৯, যাঁকে চিঠি দিতে চেয়েছ আমার ঠিকানায় দিলে তিনি পাবেন না। তিনি এখানে নেই, ভারতের কোন স্থানে সমর চিকিৎসক হিসাবে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। **সুজিত রায়** (নৈহাটী) ১৩০৪, তোমার চিঠি আন্তরিকতায় ভরা। তোমার মত দেশের কথা সবাই যদি ভাবতো তাহলে এ দেশের দুঃখ কষ্ট অনেক কমে যেতো। **আশীষনাথ রায়** (পাটনা) ৫১০, বাংলার দুঃসময়ে তোমরা ছোট হলেও দূরে থাকনি এ কথা জেনে আশ্বস্ত হলাম। তোমার অল্প অভিযোগ পরিচালক মশাইকে জানিয়েছি। **প্রফুল্লবালা সাধুখাঁ** (উত্তরপাড়া) ১৯৪২, তোমার প্রার্থনার সঙ্গে আমাদের সকলের অন্তরের যোগ আছে। **বিভুতিভুষণ চক্রবর্ত্তী** (কলিকাতা) ২০৩৭, অফিস থেকে তোমায় চিঠি দেওয়া হয়েছে। লেখা সব সম্পাদকের কাছে। খুব রাগ হয়েছে আমায় উপর? **সাধনা ও রেণু বিশ্বাস** (চট্টগ্রাম) ১৬৬২, জানার বাইরে অনেক জিনিস আছে জানার মত। ও বিষয়ে আমার কোন প্রত্যক্ষ ধারণা নেই কিন্তু এ সম্বন্ধে যাঁদের কাছে শুনেছি তাঁদের অবিশ্বাস করতে পারি না। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞকে দিয়ে কিছু লেখাবার ইচ্ছা আছে। **অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়** (ভবানীপুর) ৭৩৪, তোমার দীর্ঘ চিঠি মন দিয়ে পড়লুম। তোমার নির্ভীক মতামত ও

সমালোচনা আপাতদৃষ্টিতে কটু হলেও রংমশালের প্রতি আন্তরিকতার পরিচায়ক। এই দুঃসময়ে রংমশালকে সুন্দর এবং তোমাদের কাগজ করে তোলার আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা আমাদের আছে, নিঃসন্দেহে এটুকু বিশ্বাস করো। এবং সেইমত ব্যবস্থা হচ্ছে জেনো। চিঠির বাক্স ছাড়া অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কে তুমি তো কোনও মতামত বা সমালোচনা করনি। ছোটদের আরো পাঁচটা পত্রিকার সঙ্গে রংমশালের তুলনা করে দেখো, তাহলে তফাতটা বুঝতে পারবে। চিঠির বাক্সে 'ধ্বনি প্রতিধ্বনি' তোমায় আনন্দ দিতে পারেনি। তোমাদের ভাই বোনদের মনের কথা ব্যক্ত করার মধ্যে তুমি খুঁজে পেয়েছ অযথা নাম কেনার বাসনা। এতে কিন্তু আমি খুশী হইনি, এটায় আমি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির আভাস পাই। ছোটদের জন্য আজকাল নানা পত্রিকায় যে ছোটদের আসর করা হয়েছে, পত্রিকা বিশেষে সে সব আসর ছোটদের জন্য হলেও ছোটদের পক্ষে আশঙ্কাজনক। এজন্য ছোটদের অবহিত হওয়া দরকার। তাছাড়া ছোটরা ছোট তারা কিছু জানে না বোঝে না—এমন একটা আবহাওয়ার চলন আমাদের সংসারে থাকায়, ছোটরা বড়দের সব কাজে কর্ম্মে অপাংক্তেয় ভার স্বরূপ হয়ে আছে। এই মনোভাব ছোটদের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করি, সেইজন্যই ছোটদের মনোভাব প্রকাশের সমর্থক আমি এবং ছোটদের মনের কথা আগেই জানতে চাই। ছোটদের মত ও মনকে আমি শ্রদ্ধা করি। সেই কারণেই চিঠির বাক্সে 'ধ্বনি প্রতিধ্বনি' 'আশা ও ভাষা'র স্থান হয় মাঝে মাঝে।

ছোটদের মনোভাব প্রকাশের বিরোধী নই বলেই তোমার চিঠিকে 'ছেলেমানুষী' বলে উড়িয়ে দিইনি।

মণিমালা (৫৭৭), রংমশালকে যে তোমরা অন্তর দিয়ে ভালবাস তার পরিচয় পাই তোমাদের চিঠিতে। তোমাদের সকলকে নববর্ষের প্রীতি জানাচ্ছি। শুভার্থিনী—

দিদিভাই

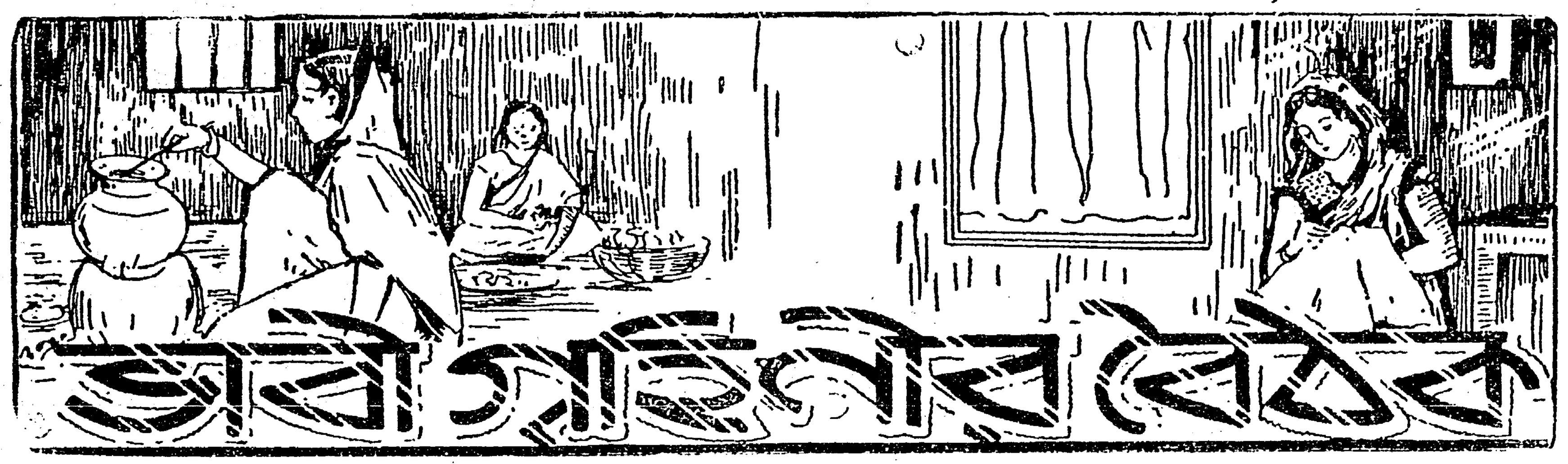

শ্রীইন্দিরা দেবী

ছোট্ট-বোনেরা!

নতুন বছরের অভিবাদন নাও। নববর্ষ তোমাদের কাছে সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠুক। দিদিভাই মারফৎ তাগাদা পেলাম এবং জায়গাও পেলাম একটু তাইতে এলাম তোমাদের কাছে। ইতিমধ্যে তোমরা যারা চিঠি দিয়েছ সেগুলিও আমার হাতে এসে পৌঁছেচে। নতুন বছরে তোমরা শিখতে চেয়েছ নতুন কিছু।

আজকে নববর্ষে তোমাদের বিমুখ করবো না বরং তোমাদের কথামতই একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিই। বাড়ীতে অতিথি এলে কি করে অল্প ব্যয়ে তাঁদের জলযোগ করান যেতে পারে? অনেক সময় দেখবে এই নিয়ে

মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে, এমন কি শেষে দুর্য্যোগের আশঙ্কাও হয় মনের মত কিছু না দিতে পারলে। যাই হোক—অল্প ব্যয়ে ভাল জল খাবারের মধ্যে একটি হচ্ছে স্যানডুইচ।

স্যানডুইচ বলতে আমরা বুঝি ২ স্লাইস রুটীর মাঝখানে কিছু পুর দিয়ে যে খাবার অতি সহজে এবং অল্প কষ্টে তৈরী করা যায়। তাছাড়া এই খাবারটী চায়ের টেবিলে, স্কুল কলেজ ও অফিসের টিফিন হিসাবেও বেশ ভাল। স্যানডুইচ কিন্তু অনেক রকম করা যায়। ভারী স্যানডুইচ ২।১ খানা খেলেই বেশ তৃপ্তির সঙ্গে পেট ভরে। গরম স্যানডুইচ তৈরী হয় টোষ্ট রুটী এবং কিছু রান্না জিনিস, ডিম, মাছ, মাংস কিম্বা সবজীর সাহায্যে। হাল্কা স্যানডুইচ তৈরী হয়—পাতলা পাতলা কাটা রুটীর টুকরো ও সবজী বা মাছ মাংসের পুর দিয়ে।

ফ্যান্সি স্যানডুইচ পাতলা করে কাটা-রুটী ও মুখরোচক পুর দিয়ে তৈরী হয়। এগুলিও অনেকটা হাল্কা স্যানডুইচের মত। প্রভেদ এই যে এগুলি মাপে হয় ওর চেয়ে ছোট অর্থাৎ দু'স্লাইস রুটীর থেকে ৪টি ফ্যান্সি স্যানডুইচ হতে পারে। প্রথমে লম্বা ভাবে মাঝামাঝি রুটী কেটে এবং পরে আবার আড়াআড়ি ভাবে কাটলেই ৪টি পাওয়া যায়, এগুলো পরিবেশন করা যায় সরবৎ ইত্যাদির সঙ্গে। পেট ভর্ত্তির চেয়ে এগুলি মুখের স্বাদ ফেরাতেই ওস্তাদ।

মিষ্টি স্যানডুইচ তৈরী হতে পারে নানারকম শুকনো ও তাজা ফল, বাদাম, ক্ষীর, গুড়, মধু, জ্যাম, জেলী ইত্যাদির সাহায্যে। এই পুরগুলি রুটি বা মিষ্টি বিস্কুটের মধ্যে দিয়েও মিষ্টি স্যানডুইচ তৈরী করা যেতে পারে। এই ৪।৫ রকমের মধ্যে 'ভারী' ও 'গরম' স্যানডুইচের কথা। প্রথমে শোনো 'Double Decker Sandwich' বা দোতলা স্যানডুইচ। তিন স্লাইস মাঝারি রকম কাটা রুটীতে মাখন মাখিয়ে রেখে টমেটোকে পাতলা চাকা কাটো, তারপর অল্প একটু 'রাই' সহযোগে সাজানো একখানি মাখন মাখানো রুটীর উপর চাপা দেবে আর একটি রুটী। এবার দ্বিতীয় রুটির উপর পুরু করে বিছিয়ে দেবে ছোট্ট ছোট্ট করে কাটা লেটুস পাতা এবং উপরে একটু রাই, এবার এর উপর চাপা দাও আর একটি রুটী অর্থাৎ তৃতীয় রুটীব স্লাইসটি—তাহলেই তিন স্লাইস রুটীর সাহায্যে প্রস্তুত হলো দোতলা স্যানডুইচ—এর একতলায় টমেটো আর দোতলায় লেটুস পাতার পুর।

ঠিক এইভাবে মাছ বা মাংসের স্যানডুইচ করলে খেতে খুব ভালো হয়। এর প্রথম থাকে দিতে হয় মাছ বা মাংসের পুর, দ্বিতীয়তে শশা বা টমেটো, লেটুস বা সিদ্ধ আলুর পুর। খেতে কিন্তু খুব চমৎকার। শুধু সিদ্ধ আলুর বা সিদ্ধ আলু কড়াইসুটীর স্যানডুইচও খেতে সুস্বাদু। মাছকে কেবল রান্না বা ভাজা করে না খেয়ে স্যানডুইচের পুর করে ব্যবহার করতে পারা যায়।

এখন শোনো গরম স্যানডুইচ প্রস্তুত করবার প্রণালী। দু'টী ডিমকে শক্ত করে সিদ্ধ করে নেবে এবং কিছু কাঁচা খাবার মত টাটকা সবজী নেবে যেমন শশা, লেটুস টমেটো ইত্যাদি। ধুয়ে নিয়ে পাতলা করে কেটে নেবে, যদি তাতে না হয় তাহলে অল্প একটু নুন দিয়ে সামান্য সিদ্ধ করে কেটে নেবে। তারপর সিদ্ধ করা ডিমকে পাতলা চাকা করে কেটে, ৪ স্লাইস রুটি নিয়ে টোষ্ট করবে, গরমে থাকতে থাকতেই তাতে ভালো করে মাখন মাখিয়ে নেবে তারপর এক থাক রুটির উপর সবজী এবং এক থাকের উপর ডিমের চাকা দিয়ে তারপর গোলমরিচের গুড়ো ও নুন ছড়িয়ে দিয়ে আর একটা রুটি চাপা দিয়ে দেবে, এইভাবে দ্বিতীয় খানাও করে নিয়ে প্লেটে রেখে তার চারদিকে সাজিয়ে দাও বাকী সবজীগুলো এবং রুটির উপর দাও অল্প কিছু লেটুস পাতার কুচি। দেখবে খাদ্য তার স্বাদের মতই দেখতে সুন্দর হয়েছে।

পিনু সেনের পেন্‌সেন্

শ্রীধরণী সেন

পিনু সেন পেন্‌সেন্ নিয়েছেন, শুনেছেন কি?

শোনেন নি? তবে কি ছাই শুনলেন? এত বড় কাণ্ডটা—

আরে ঐ যে নীল দীঘির ধারে লাল অফিসের বড়বাবু রায়বাহাদুর পিনু সেন, কোটে ডগ্‌মগে ঘড়ির চেন্—চেনেন না? হাঁ, ঐ উনিই। হাঃ হাঃ—হাসির কথা নয়, আরে আগে শুনুন গল্পটা বলি—

পিনু সেনের ওরফে শ্রীযুক্ত পিনাকীমোহন সেনের বয়স তখন বাহান্নও হয়নি। নীল দিঘীর ঐ লাল দপ্তরে চাকরী করছেন প্রায় পঁচিশ বছর। বড় সাহেব, ছোট সাহেব, একরাশ সাহেবসুবো একেবারে তাঁর হাতের তেলোয়। পূজো-পার্ব্বণে সাহেববাড়ী বড় বড় ভেট যায়, তালঠুকে তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন, বকুনি খেলে মিঠে হাসেন। অফিসে ভীষণ ডিসিপ্লিন্ রাখেন। শীঘ্রই বড়বাবু পিনু সেন রায়বাহাদুর হলেন। গ্র্যাণ্ড হোটেলে তিনি ঘন ঘন নিমন্ত্রণ খেতে লাগলেন।

আর তার পরপর তিন বছরের মধ্যে তাঁর বড় ছেলে, তাঁর ভাগ্নে জামাই, তাঁর বিধবা সেজ বোনের মেজ দেয়র, তাঁর খুড়তত ভাইর পিসতত শালা আর তাঁর এক বন্ধুর এক পুষ্যি পুত্তুর—এই পাঁচটি অকালকুষ্মাণ্ড বেকার যুবক একে একে তাঁর দৌত্যে তাঁরই অফিসে আশ্রয় লাভ করল।

পিনু সেন তাঁর রায়বাহাদুর খেতাব প্রাপ্তির পঞ্চবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাড়ীতে আত্মীয়স্বজনদের ডেকে বিরাট এক পোলাও ভোজ দিলেন। বিশাল বপু রায়বাহাদুর গিন্নী কোমরে কাণে গলায় হাতে পায়ে তেইশ সের সোনা ঝম্‌ঝম্ করে হাসিমুখে বাড়ীর চারিদিক ঝলমল করতে লাগলেন। বলতে নেই, বাড়ীতে লক্ষ্মীর এক কুড়ি কাচ্চাবাচ্চা, এক কুড়ি দাসদাসী।

বেশ কাটছিল; মাসে মোটা মাহিনা, মস্ত হাল ফ্যাসানের বাড়ী, খানতিনচার গাড়ী, লোকলস্কর এলাহি ব্যাপার, এমন রাম রাজত্ব আর কোথাও নেই।

এমন সময় দেশে এলো বন্যা; জলের নয়, রায়বাহাদুরের মতে বদমাইসীর বন্যা। ধরপাকড় শুরু হ'ল। শুরু হ'ল হরতাল আর আন্দোলন; আইন আরো লম্বমান হ'ল বুঝি অমান্য করার জন্য। জেলে আর জায়গা হয় না, মাঠে ঘাটে তাঁবু পড়ল।

বড়বাবুর পাঁচটি অকালকুষ্মাণ্ড যারা এতদিন তাঁর তেলনুন খেয়ে পুরুষ্ঠু হয়েছে, সেই হতভাগারা নিমকহারামি করল। একজোটে তারা ষ্ট্রাইক্ করল, অফিস গমন বন্ধ করল, নেকটাই ছেড়ে খদ্দর পরল।

পিনু সেন তেলে বেগুনে প্রজ্জ্বলিত হলেন। দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা? নিজের বড় ছেলেটা পর্য্যন্ত!

সাহেব মহলে তাঁর ডাক পড়ল। ভোজপুরী হলুদ সিং এসে বলল—বড়া সাব্ সেলাম দিয়া। রায়বাহাদুর বড়বাবু পিনু সেন সেলাম দিতে দৌড়লেন।

বড় সাহেবের খাস্ কামরায় ঢুকে দেখেন, গোটা ইংরেজ রাজত্বটাই সেখানে টিট্ বসে আছে। বড় সাহেব, মেজ সাহেব, ছোট সাহেব সবাই, তাদের ছাপোসা ছোক্‌রা সাহেবরা পর্য্যন্ত।

ইংরাজ রাজত্ব প্রশ্ন করল—এসব কি শুনছি রায়বাহাদুর ?

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রায়বাহাদুর আম্‌তা আম্‌তা করে কোন রকমে জবাব দিলেন—হুজুর, এ দীন অধীন কিছু জানে না, আমাকে সব লুকিয়ে করেছে হতভাগা পাজীরা—

আবার প্রশ্ন হ'ল—তোমার বড় ছেলেও এর মধ্যে আছে না ?

ভাঙ্গা গলায় রায়বাহাদুর বললেন—আজ্ঞে হাঁ, না—সে আমার ছেলে নয়— সে—সে—

বিদ্রূপের স্বরে এবার বজ্র প্রশ্ন হ'ল—যখন তাকে এই অফিসে ঢুকিয়েছিলে, তখন তোমার বড় ছেলে বলেই তার পরিচয় দিয়েছিলে না ?

নিখাদ কোমলে জবাব এলো—সাহেব, দু'দিন সময় দাও আমাকে, আমি সব ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি—বলতে বলতে স্বর সপ্তমে উঠল, রায়বাহাদুর ডাঃ জেকিল্‌এর প্রেতমূর্তি মিঃ হাইডের মত সাড়ে সাত ইঞ্চি বেড়ে উঠলেন, বুকের ছাতিটাও ইঞ্চি পাঁচেক ফেঁপে উঠল।

ইংরাজ-রাজত্ব হেসে উঠল।—তথাস্তু, দু'দিন সময় দেওয়া গেল। তারপর যেন দেখি সব ঠাণ্ডা, যে যার কাজ করছে। মাইনে বাড়িয়ে দেবো, এ কথাও বলতে পারো। আচ্ছা এখন তুমি যেতে পারো রায়বাহাদুর—ও ইয়েস্, তোমার টিফিন খাওয়া হয়েছে ?—ইয়েস্ স্যার, নো স্যার, বলে রায়বাহাদুর তখনকার মত ইংরাজ-রাজত্ব পরিত্যাগ করলেন।

বেরিয়ে দেখেন তাঁর গাড়ীর সোফার রামদীন্ দাঁড়িয়ে। অন্য দিন হ'লে তাকে বলতেন,—বাবা রামদীন, গাড়ীখানা বার কর বাবা, এবার বাড়ী যাব আর পারি না। কিন্তু আজ—এই শূয়ার কাঁহাকা গাড়ী নিকালো জল্‌দী, হিঁয়া দাঁড়িয়ে কেয়া করতা হাম্ ঘর জায়গা।—রামদীন্ অবাক, বাবু তাঁর সঙ্গে বাংলায় ছাড়া কথা বলেন না—আর আজ শূয়ার নিকালো! না, রামদীন বাবুকে বাড়ী পৌঁছে ছুটি নেবে, আর শূয়োরের কাজ করবে না।

দোতলার ঝিল্‌মিলি-জানালার পাখি খুলে নিদ্রালুশ চোখে সেন গিন্নী দেখেন রায়বাহাদুরের বুইক্ গাড়ীখানা ফটকে ঢুকছে।—এই ঠিক্ দুপুরে বাড়ী ফিরছেন, শরীর খারাপ হ'ল নাকি ? হবে না, বয়েস বাহান্ন হতে চল্ল, এত খাটুনী ওঁর নরম শরীরে কি সয়—

ঝম্‌ঝম্ করতে করতে হাতের বালা কাঁকন বাজিয়ে সিঁড়িকম্প করে সেন গিন্নী মহা ভাবনায় নীচে নেমে এলেন।—হ্যাঁ গা কি হয়েছে ? য়্যাঁ—অমন চেহারা করেছ কেন ? য়্যাঁ কি হয়েছে— ?

বাঙ্গালীর নিজের রাজত্বে ও ইংরাজ রাজত্বে হালচালের তফাৎ আছে। রায়বাহাদুর একেবারে স্বরাজ্যমূর্ত্তি ধারণ করলেন।

—তুম্‌রা মাথা হুয়া। ইয়ে, তোমার মাথা হয়েছে আর কি হয়েছে! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

—য়্যাঁ বাঘের ঘরে কিগো—হ্যাগা এসব কি প্রলাপ বকৃছ। এসো এই শোফাটায় একটু শোও দিকিন স্থির হয়ে, কপালে একটু জলপটি দিয়ে দি—

—জলপটি না চুলোপটি। বিছুটি—দিতে হবে ঐ বাছাধনদের সব—

—ওমা! একি আজ হ'ল গো তোমার—গিন্নীর কাজল চোখে জরীর আঁচল পড়ল, এবার ডুকরেই তিনি কেঁদে উঠলেন।

—আঃ তুমি আবার ছোট খুকীর মত কাঁদতে বসলে কেন ? তোমার আবার আজ হল কি ?

বড় মেয়ে ময়না ছুটে এলো।—কি হয়েছে মা ? বলেই থমকে দাঁড়াল—এ যে বাবা! এই দুপুরে, ওই চেহারা ?—কি হয়েছে বাবা ?

—আর বাবা হয়েছে। আমি তোদের বাবা নই, আমি বড়বাবু নই, আমি রায়বাহাদুর নই—

—কি হয়েছে কি ?

—আমার চাকরীর মাথা হয়েছে! ঐ পাঁচটা কেউটে সাপ ষ্ট্রাইক্ করেছে—বাবুরা আজ অফিস যান নি। দেশ উদ্ধার হচ্ছে! ওদের আমি দেখে নিচ্ছি—বদমায়েস কাঁহাকা। সাহেবকে তো বলে বসেছি—কুছ্ চিন্তা নেই, সব ঠাণ্ডা হো যায়গা, এখন সামলাও—

গিন্নী চোখ মুছে বলে উঠলেন—ওমা কি হবে, তবে যে ওরা পাঁচজন আমাকে প্রণাম করে আজ সকালে বলে গেল, তাদের মাইনে বেড়েছে। সে কথা শুনে আমি বললাম—তা হ'লে আজ বিকেলে একটা টি-পার্টি দেবো—

—য়্যাঁ মাইনে বেড়েছে ? টি-পার্টি ? রায়বাহাদুরের মূর্চ্ছার উপক্রম হ'ল।

—হ্যাঁ গো। আজ বিকেল পাঁচটায়। আর সময় নেই, সব তৈরী হয়ে গিয়েছে। রায়বাহাদুর এবার সত্যিই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

অনেকক্ষণ পরে তাঁর হুঁস হ'ল। গিন্নীর হাত থেকে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে বললেন—

—হতভাগারা চা খেতে এসেছে ?

—চা খাওয়া এই ওদের হ'ল। বিনয়কে ডাকবো ?

— কোথায় আছে আপদগুলো ?

—সব এক জায়গাতেই আছে, নীচে ঐ বৈঠকখানায়। হাসিমুখ করে বসে। আমাকে ওরা সব বলেছে।

—বলেছে ? ব্যস্ তবে আর চুপ করে আছ কেন ? বলে যাও। কি বলেছে ?

—ঠিকই বলেছে। ভারী সুন্দর বলেছে।

রায়বাহাদুরের আবার মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম। ভাগ্যিস্ ময়না তখনই চা ও নিম্‌কি আনল, তাই রক্ষে!

—তাহ'লে তুমিও দলে ছিলে ?

—ছিলাম না, হলাম। কাল গঙ্গাস্নান করে সব গয়না খুলে ফেলব। আর নিজের জমা টাকাগুলো সিন্দুক খালি করে দরিদ্রনারায়ণকে দান করে দেবো। বুড়ী হয়েছি আর ওসব ছেলেমানুষী ভাল লাগে না।

—এতদিন তো বেশ ভাল লেগেছিল। কেনবার আগে দয়া করে আমাকে বললেই ন্যাটা চুকে যেতো। অতগুলো টাকা! যত সব—তা যাক্, একটা কাজের কথা শোনো: যাও দিকিন, দিন কতক কাঞ্চনপুরে তোমার বাপের বাড়ী, অনেক দিন তো যাওনি।

—হ্যাঁ, তাই যাবো, তবে আজ নয়। আর তোমার কথায় নয়।

—এ বাড়ীতে কর্ত্তা কে ?—সে কথা জেনে রেখো।

—আর এ বাড়ীর গিন্নী কে ?—সে কথাও মনে রেখো।—

—আচ্ছা, আগে ঐ বেহায়াগুলোর আড্ডা আক্রমণ করি : বলে রায়বাহাদুর দুপায়ে যেন দুদমা বাজিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

ছেলের দল বৈঠকখানায় বৈঠক বসিয়েছিল। একটু কেশে ওয়ার্নিং বেল্ দিয়ে রায়বাহাদুর ঘরে ঢুকলেন। ছেলেদের কলতানও হঠাৎ থেমে গেল।

তারপর প্রায় একঘণ্টাব্যাপী এক বৃহৎ একাঙ্ক এক-দৃশ্য এক-চরিত্রের নাটক শুরু হ'ল সেই ঘরে। কখনও হুঙ্কার কখনও ধিক্কার, কখনও অহঙ্কার কখনও অনুনয়, কখনও তিরস্কার কখনও নমস্কার, কখনও অভিশাপ কখনও আশীর্ব্বাদ, শেষে ধম্‌কে থম্‌কে, চোখ রাঙিয়ে, হাত পা ছুড়ে, হেসে কেঁদে নাকের জলে চোখের জলে একশা হয়ে রায়বাহাদুর লাল রাজত্বের অপরিসীম মহিমা ও কালো রাজত্বের অপরিসীম ঘৃণা প্রকাশ করলেন।

রায়বাহাদুরের এতো চমৎকার বর্ত্তৃতা আগে কেউ কোন দিন কোথাও শোনেনি। শ্রোতারা চমৎকৃত হ'ল। পুরস্কার বিতরণী সভায়, বারোয়ারী পূজা পার্ব্বণে তিনি সদা সর্ব্বদা আম্‌তা আম্‌তা করতেন বা অর্দ্ধেক বলে ধপাস্ করে বসে পড়ে ঘন ঘন কপালের ঘাম মুছতেন। লোকেরা মুচ্‌কি হাসতো। কিন্তু ইংরেজ ব্যাপারীর নিজ কারখানায় গড়া ধাতুটি আজ ছেলে ছোকরার ধৃষ্টতায় যেন স্ফুলিঙ্গ কাটতে লাগল। বড়বাবু অকাল কুষ্মাণ্ডগুলোর চোখ ভাল করেই খুলে দিলেন। তারা জানতো না, এই বড়বাবু রায়বাহাদুরের রাজ অন্তঃপুরে এতখানি মিষ্টি সন্দেশ আত্মগোপন করেছিল।

স্থূল এঞ্জিন থেমে পড়ে যখন হাঁপাচ্ছিল, সেই অবসরে তরুণ যাত্রীরা নিজেদের জায়গা সঠিক গুছিয়ে নিলে। তারপর তারা রায়বাহাদুরের বড় ছেলে বিনয়কে বলতে বলল।

এপক্ষেও প্রায় এক ঘণ্টা। অপর পক্ষে তেজ্যপুত্র করার হুম্‌কি ও হুঙ্কার, আবার অনুনয় বিনয়। আবার জবাব। বিতর্ক-সভা তীব্র হতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে কি যে হয়, রায়বাহাদুরের মুখে আর কথা নেই; তাঁর কান জোড়ার ভেতর দিয়ে যেন এক মহামন্ত্র ক্রমশঃ তাঁকে নিস্তেজ করতে লাগল। তিনি যেন তাঁর চেতনা হারাতে লাগলেন। ছেলেরা এবার সবাই কিছু কিছু বলে চলেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস একটুখানি নয়। আরো কিছুক্ষণ; তারপর পিনু সেনের চোখে মুখে এক আশ্চর্য্য অনুভূতি ফুটে উঠতে লাগল। অপর পক্ষে ততই উৎসাহ বেড়ে চলল। শেষে তাঁর বাঘের মত বিরাট মুখমণ্ডলে ত্যাগ ও প্রতিজ্ঞা রূপ নিতে লাগল।

সভা যখন ভাঙ্গল তখন রাত ৯টা। ছেলেরা যেন স্বরাজ পেয়েছে এমনি হৈ হৈ করতে করতে বেরিয়ে গেল। খাওয়া দাওয়া শেষে শয়ন কক্ষে গিন্নীর ডাক পড়ল। গিন্নীও যুদ্ধের জন্য তৈরী ছিলেন, কিন্তু এ ডাক তো বাঘের নয়। এতো ভাল মানুষেরই ডাক। তাঁর নিজের রূপও বদলে গিয়েছে; শরীরে আর গয়নাগাঁঠির আড়ম্বর নেই, পরণে ধব্‌ধবে সাদা খদ্দরের একখানা প্লেন সাড়ী ও হাতে-কাজ-করা জাফ্‌রানী খদ্দরের ব্লাউস। গিন্নী ঘরে আসতেই মুগ্ধ হয়ে হাসিখুসী চোখে রায়বাহাদুর চেয়ে রইলেন। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমনি স্মিতহাস্যে বললেন—বাঃ তোমাকে আজ সুন্দর দেখাচ্ছে তো?

—আঃ কি যে বল—ওরা শুনতে পাবে যে।

—জানো কাল কাজে ইস্তফা দিচ্ছি।

—ইস্তফা তুমি? যাও আর বাজে বোকো না।

—না বাজে আর বকবো না। আমার চাকরীর আর এক বছর মেয়াদ ছিল, বলে কয়ে বড় জোর আর দু'এক বছর হ'ত। কিন্তু না, আর নয়, আমি কালই একেবারে ছুটি নিয়ে পেনসেন নেবো। ওটা আমার পাওনা,

না নিলে উপর ওয়ালাদেরই ষোল-আনা লাভ। তা ছাড়া, তোমাদের মুখ চেয়ে, এই কাচ্চাবাচ্চার সংসারের দিকে চেয়ে, পেনসেনটা আর পরিত্যাগ করতে পারব না, মাপ কোরো।

—মাপ করলাম; কিন্তু ছেলেরা?

—বুঝবে; তাদের বুঝিয়েছি। বলেছি চাকরী ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু এই বুড়োটাকে আর কিছু ছাড়তে বোলো না। শুনে রাখো, পেনসেনের প্রাপ্যটা তোমাদের দেশই পাবে। আমার ছেলেমেয়েরা আমার দেশ।

বড় মেয়ে ময়না ঘরে এলো। তারও আজ নতুন সাজ। বাবাকে প্রণাম করে হাসিমুখে বললে—বাবা আমিও একটা জিনিষ চাই। আমি দেশের কাজ করবো, গরীব ছেলেমেয়েদের পড়াব, স্কুল করবো আর পাড়ায় পাড়ায় টো টো করে ঘুরবো। তুমি বকবে, না আশীর্ব্বাদ করবে—যা করবে আজই করে ফেলো। আর সময় নেই।

রায়বাহাদুর হেসে বললেন—সত্যি মা আর একটুও দেরী করিসনে, আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করছি। এতদিন তোদের বাইরে বেরুতে দিই নি, কেবল তোদের বকেছি। আজ আশীর্ব্বাদ করতে মন খুসী হয়ে উঠছে। পৃথিবীটা কি জল্‌দি বদলাচ্ছে, না রে ময়না? আমার মতো একটা এত বড় স্থবির জড় পদার্থও আজ অস্থির হয়ে উঠেছে।

পরদিন অফিসে তালতলার চটি পায়ে এক ভদ্রলোককে দেখা গেল। ভোজপুরী হলুদ সিং এক পা এগিয়ে এসে 'কেয়া-বাৎ' বলে প্রায় সাত পা পেছিয়ে গেল। ভদ্রলোকটি সটান বড় সাহেবের ঘরে গিয়ে উঠলেন। হাতে তাঁর লম্বা চিঠি। ইংরেজ রাজত্ব তখন কঠিন হয়ে বসে রাজকার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তালতলা-মার্কা চটির শব্দে মুখ তুলতে একেবারে হক্‌চকিয়ে উঠল।

হাতের লম্বা চিঠিখানা বড় সাহেবকে দাখিল করে তার বিষয়বস্তু তিনি বিস্তারিত করলেন। ইংরাজ-রাজত্ব যেন নড়ে উঠল। কিন্তু পিনু সেন নড়লেন না, মাথা খাড়া করে ইংরাজ-রাজত্ব এবার জন্মের মত পরিত্যাগ করলেন। এতদিনের বন্ধন, এতদিনের মায়া কিছুতেই তাঁকে আর ধরে রাখতে পারলে না।

নীল দীঘির কালো জলে তখন মধ্য-গগনের সূর্য্য তার সহস্র কিরণ ছড়িয়ে ঝল্‌মল্ করছে। প্রশস্ত রাজপথ জনশূন্য, নগরীর সে কোলাহল নেই। কেবল ঈষৎ তপ্ত মৃদুমন্দ বাতাসে পথের ও দীঘির ধারের গাছগুলো ঝিরঝির করে কাঁপছে। মুক্ত আলোতে বেরিয়ে পিনু সেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটু দাঁড়ালেন। হেসে একটু মাথাটা চুলকোলেন। তারপর সামনের দিকে পা ফেলে জোরে এগিয়ে গেলেন।

নীল দীঘির পারে লাল সৌধের সিংহদ্বারের সামনে রায়বাহাদুরের বুঝি অপমৃত্যু ঘটল। পিনু সেন আর একটি বারও পেছন ফিরে দেখলেন না।

বাড়ীর ফটকের সামনে এসে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। বাড়ীটা যেন চেনাই যায় না। তাঁকেও চেনা যায় না। পত্রপুষ্পে শোভিত হয়ে হেসে নতুন বাড়ীখানা নতুন পিনু সেনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল।

পেন্‌সেন্-প্রাপ্ত পিনু সেনকে আজকাল বুড়ো ও প্রবীণরা বলেন—সেন মশাই, ধন্য আপনি। ছেলে ছোকরার দল শুধু বলে—বাহাদুর!

নূতন ধাঁধা

এক ফেরিওয়ালা হাঁসের ডিম বিক্রী করছে। একজন খদ্দের তাকে ডেকে বললে, তোমার ঝুড়িতে যত ডিম আছে তার অর্দ্ধেক দাও এবং আর আধখানা ডিম দাও। ডিম দিয়ে ও দাম নিয়ে ফেরিওয়ালা আবার ডিম চাই বলে হাঁকতে হাঁকতে চলল। পরে আবার একজন খদ্দের তাকে ডেকে ঠিক ঐ কথা বলে ডিম কিনল। তৃতীয় খদ্দেরও বললে যা আছে তার অর্দ্ধেক দাও এবং আধখানা ডিম দাও। ফেরিওয়ালা ঝুড়ি খালি করে দাম নিয়ে চলে গেল। বল তো ফেরিওয়ালার ঝুড়িতে ক'টা ডিম ছিল এবং কে ক'টা ডিম কিনলো ?

২৫শে বৈশাখের মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে।

* গত মাসের ধাঁধার উত্তর *

২ ঃ ১ এই সূত্র ধরে দেখা যায় যে সবুজ ও তার পরের লাল বাস আসার সময় লাল ও পরের সবুজ বাস আসার সময়ের ডবল। এখন সবুজ বাস ১২ মিনিট পর পর আসে; কাজেই সবুজ বাসের ৮ মিনিট পরে আসে লাল এবং লাল বাসের ৪ মিনিট পরে সবুজ বাস। এখন লাল বাস ১-৪৭ মিনিটে ওদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যায়, তাহলে সবুজ বাস যায় ১-৫১ মিনিটে, ও তারপর প্রতি ঘণ্টার ৩ মিঃ, ১৫ মিঃ, ২৭ মিঃ এবং ৩৯ মিনিট পর পর যায়।

* ফাল্গুন মাসের নতুন খেলার উত্তর *

১। মোহনচাঁদ গান্ধী ; ২। বাল্‌জাক্ ; ৩। হল্ কেন্ ; ৪। অবনীন্দ্রনাথ ; ৫। রবীন্দ্রনাথ ; ৬। শরৎচন্দ্র ; ৭। বঙ্কিমচন্দ্র ; ৮। সুকুমার রায় ; ৯। বিবেকানন্দ ; ১০। চেষ্টারটন ; ১১। চষার ; ১২। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ১৩। মিল্‌টন ; ১৪। নুট হামসুন ; ১৫। ক্রিষ্টোফার মার্লো ; ১৬। টেনিসন ; ১৭। ম্যাক্সিম গোর্কী ; ১৮। রোমাঁ রোলাঁ ; ১৯। কালিদাস ; ২০। চিত্তরঞ্জন ; ২১। মধুসূদন ; ২২। পার্ল বাক ; ২৩। জেন অষ্টেন ; ২৪। এমিল জোলা ; ২৫। বিদ্যাসাগর।

নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

নীলিমা, রূপালী ও মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ) ; অরুণ ও অলক চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা)।

একটি ভুল উত্তরদাতাদের নাম

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু (মেদিনীপুর)। গৌরী ও ঝরণা দেবী, আলিগঞ্জ।

দু'টি ভুল উত্তরদাতাদের নাম

আশীষনাথ রায় (পাটনা) ; শ্যামলকুমার মজুমদার (কলিকাতা)। রথীন্দ্রমোহন মৈত্র, রাজসাহী ; ঝরণা দত্ত, কলিকাতা।

তিনটি ভুল উত্তরদাতাদের নাম

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় (জামশেদপুর) ; শ্রীমতী ইলারাণী নিয়োগী (সান্তাহার) ; শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার সিদ্ধান্ত (রাইগঞ্জ) ; নীলিমা, নমিতা, অমল, নির্ম্মল ও পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী (নয়াদিল্লী) ; অজিতকুমার সেনগুপ্ত (গুঠিয়া) ; শ্রীযশোধন ভট্টাচার্য্য (বিষ্ণুপুর)। প্রদ্যোৎচন্দ্র কুণ্ডু, কলিকাতা ; সৈয়দ নুরল আলম, যশোহর ; সুকুমার চন্দ্র নাথ, জামসেদপুর ; রমলা মান্না, হাওড়া।

রংমশাল
নবম বর্ষ (২)
জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১

কর্ম্মীর মুক্তি

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়।

সর্ব্বঅঙ্গে ধূলা মাখি ধূলিভরা দীর্ঘপথ বাহি',
দিবা অবসান হ'লে খেয়াঘাটে পহুঁছিল রাহী।
কাতরে কহিল রাহী, "পারের কড়ি ত নাই সাথে
দয়া ক'রে পার কর, আসিয়াছি আমি খালি হাতে।
সারাটি জীবন শুধু খাটিয়াছি ধূলায় কাদায়,
কিছুই সম্বল নাই, ধূলা ছাড়া কিছু নাই গায়।"

কাণ্ডারী কহিল, 'বন্ধু, আগে তোমা ক'রে দেব পার,
নাইক পারের কড়ি, মিথ্যা কথা বলিও না আর।
সঙ্গে নাই, অঙ্গে আছে, অঙ্গ ভরা ও ধূলার চেয়ে,
দুর্ল্ভ পারের কড়ি কোথা পাবে এঘাটের নেয়ে ?
ও ধূলা ব্রজের রজ, জ্ঞান পুণ্য তুচ্ছ ওর কাছে,
তরীতে সবার আগে জানিও তোমারি ঠাঁই আছে।"

ভূতপত্রীর যাত্রা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ প্রথম মঞ্জিল ॥

॥ অথ মাসির বাড়ীর সাট ॥

॥ মূলগায়ন জুড়ি দোহার ॥

মূল গায়ন দিশা ঃ—হ'ল সন্ধিপূজা সমাপন—
গোধুলিতে গোষ্ঠে ফিরেন কৃষ্ণের গোধন ;
কৃষ্ণের মায়া বোঝা ভার,
মোহ হয় বিধাতার ;
বচ্ছরে একবার জগবন্ধুরও করতে হয়
মাসি পিসির ভবনে গমন—
অন্যে পরে কা কথা, অবুনাথ তো সামান্য জন ;
জগন্নাথের নাটঘরে শঙ্খ বাজায়ে বলে দাস গোবর্দ্ধন ॥

(অবু ও উদ্ধবের প্রবেশ)

অবু—কি মোয়াই খাওয়ালে মাসি অবুরে তাঁহার
চারসের পাল্কি ওজন একেবারে পার ॥
যেমন কপ্ করে মুখে দেওয়া, তেমন টপ্ করে গিলে নেওয়া,
এখন পাল্কি ছাড়া একপদ নড়া ভার।
উদ্ধব, বলতে পারো, পিসির ওখানে আহারাদির ব্যবস্থা কি প্রকার ?

উদ্ধব—শুনেছি দেবতার দুর্ল্লভ কচি কুমড়া দিয়ে কাঁকড়ার ঝোল সেথাকার।

অবু—চলনা, তুমিও সাথে আমার !

উদ্ধব—সে গুড়ে বালি মাসিকে শুনিয়ে তোমার সেই শেখানো ছড়া—
—"মাসি পিসি বনগাঁ বাসি—"

অবু—চুপ চুপ এখনি আসবে মাসী

উদ্ধব—এসে আর হবে কি শোনাতেই হয়ে গেছে কানমলা !

অবু—উদ্ধব, তুমি একটি গর্দ্দভ ; ঘরের ছাতে লিখে রাখলেই হত কানের কাছে কেন পড়া ?

উদ্ধব—কে জানে দাদা, আমি কি জানি অত লেখা পড়া।

অবু—মুস্কিল এখন মাসির সঙ্গে দেখা করা—লাঠি লণ্ঠনটা নিয়ে চট্‌পট্ যাক্ বেরিয়ে পড়া—পাল্কির জন্যে মিছে অপেক্ষা করা !

জুড়ি দোহার গীত

(উদ্ধব ও অবু)

দাদা চুপে চাপে বেরিয়ে পড়ো
কিবা আর চিন্তা কর,
পাল্কির আশা নেইকো আর।
দায় দোষ ক্ষমা কর,
হে মাসিমা, অবুর তোমার উদ্দিশ্যে নমস্কার।
মোয়া খেয়ে পেটটি ধামা,
বিদায় পাই হে মাসিমা—
এখন দেখি কি করেন পিসিমা আবার।
পাল্কি পাই ভালো, না পাই ভালো,
রইল পথে লাঠি লণ্ঠন সহায় আমার ;
খুঁটে বাঁধা খৈ মুঠা দুচ্চার ॥

উদ্ধব—দেখ দাদা, খয়ে বন্ধনে না পড় পিসির বাড়ী গিয়ে আবার।

অবু—উদ্ধব, তুমি একটি গর্দ্দভ—

উদ্ধব—দেখ, যাবার সময় ঐ নামটা করলে আবার—

(গীত অবুর—হোমরাও চোমরাও)

হোমরাও চোমরাও তোমরা বসে গোঁপ্ চোমড়াও—
রাম রাম ভাই আমি যাই।
সঙ্গে যেতে চাও তো চল তোমরাও,
—নেহি নেহি ভাই সাব তুম যাও।
ছেঁড়া জামায় কুন্তলীন, নেড়া মাথায় দেলখোস,
খুঁটে খৈ মোয়ার উৎকোচ,
—মনখোসে চলে যাই উদ্ধব ভাই
বিদাই দাও ॥

(উদ্ধবের বিদায় গীত)

ভাই দায় দোষ নাই, বলে খালাস উদ্ধব ঘোষ,
বল তো সঙ্গে যাই দুচার ক্রোস।

বেঁধে পথের সম্বল কাঁথা কম্বল দই পাতা দম্বল,
ঝোল সম্বলার হাঁড়ি, জল ভিঙ্গারি, মাতুর মশারি, বালাপোস,
সে সব দেশ ভালো নয় ভাই,
চাই বলতেই কিছু পেতে নাই,
—করে নাও এই বেলা ভাই পাল্কিটার খোঁজ,
নয়তো করতে হবে আফশোচ্ ।
আমার নাই দায় দোষ,
বলে খালাস উদ্ধব ঘোষ ॥

অবু—উদ্ধব ।
উদ্ধব—নাঃ থাক ও সব ঝন্ঝট—এমনিই বেরিয়ে পড় চটপট ।
অবু—দেখো ভাই, মাসিমা না করেন রোষ,—
উদ্ধব—কিছু ভেবোনা দাদা, আছেন কানপেতে—সেই যা তুমি বল—উদ্ধব ঘোষ !

(জুড়ি দোহার গীত—অবুর চলন বলন)

চলি হুম্পা হুমা লাঠি বাগিয়ে—বনগাঁ পেরিয়ে—ধপড় ধাঁই ধপড় ধাঁই
ভুত তাড়িয়ে—বনের ধার দিয়ে—হঁইয়ো মারি খবর দারি পিসির বাড়িতে—
মনসাতলা, চালতাতলা, শেওড়াতলা মাড়িয়ে !
—আছে মাঠের মাঝে শেওড়া গাছের ঝোপ,
অন্ধকারে কালো বেড়াল ফুলিয়ে আছে গোঁফ ।
—তা হোক !
ঘোড়ার জোর তারি কাছে—গোল চোখ তাকাতে আছে ।
—আছে তো আছে, খৈ আছে আমারও কাছে ।
ঘোড়ায় খায় খৈ, মানুষে খায় জৈ ।
ঐখানে শেষ হাঠের বাট—তার পরে ধুধু মাঠ—পড়েই আছে
দিশে হারিয়ে—হুম্পা হুমা মাঠ মাড়িয়ে-আলো জ্বালিয়ে ।

(প্রস্থান অবুর)

(ব্যাক গ্রাউণ্ড বাদ্য-পার্চ্চমেণ্টাল ব্যাণ্ড—
সিংহ-শার্দ্দূল নৃত্য)

গীত

দ্রুম্ দদ্দড় ধুম্ ধ্রুম্ধদ্ধর কিংপ্পোলো কিংপ্পোলে,
শিল পলো না নোড়া পলো—

খিল্ পলো খিল প'লো
মাসির ঘরে খিল প'লো ।
দ্রুম্পোলো দ্রুম্পোলো—
সিংদরজার আম কাঠের কপাট্ প'লো ॥

গীত উদ্ধবের

দাদা, পিসির বাড়ী থানটি খাসা,
পথের মাঝখানটি খালি ভুতে ভুতে ঠাসা ।
দিশি ভুতে ওপথে পাত পেড়ে খায়,
বিলিতি ভুত পিলেট কাঁটায়,
চুলা ধরায় আলেয়া শেয়াল,
আল্টপকা ভুত মাঠে তোলে দেয়াল,
লাগায় বিষম নট্খটি জটিবুড়ি যদি লাগপায়
—পথে আছে নদী কর্ম্মনাশা ॥

অবু—উদ্ধব, আমি মানি না ভুৎটুৎ সব, সাফ্ চলে যাবো পা চালিয়ে খাসা

গীত উদ্ধবের

উদ্ধব— দাদা অলজ্ঝার চারের কথা বুঝি জান নাই,
পিসির বাড়ী যাইতে তাহা পাই—
দশ যোজন পথ ধৈরা,
ছাহারা বালু আছে পৈরা,
তার মধ্যে গাছ বিরিক্ষি, বাস কি বস্তি কিছুই নাই ।
ও সে চরের ফেরে পড়লে পরে দিশা হারাই ;
অলজ্ঝা চারের তরে যেতে পারে একমাত্র ছাহেব সুবারাই ॥

অবু—আর আমার মত বাতিক গেরোস্তো মানুষরাই ।
উদ্ধব—খুলে বল্লেন সব উদ্ধব এখন তোমার যা মত কর ভাই,
শেষকালে আমারে আর গর্দ্দভ বোলো নাই ।
অবু—উদ্ধব, তুমি একটি গর্দ্দভ, যাবার মুখে আবার করলে ঐ নামটাই
যাই দুগ্গা বলে বেরিয়ে পড়ি—আর কথায় কাজ নাই ॥

(পাণ্ডার প্রবেশ)

পাণ্ডা— বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসএঁ,
নিশি আন্ধিয়ারি ঘন বারি বরিষএঁ,

হেন শুভখনে দেব জগড়নাথ হরি
জনমিলা শংখ চক্র গদা পদ্ম ধরি,
রোহনী অঠমী তিথিএঁ, যাত্রা শুভ জানিএঁ ॥
অবুবাবু নিড়ভয় যাত্রাং কুড়ু !
(প্রবেশ হুঙ্কার শিং শাদ্দুল সিং)

রও ! মৌসিমাতার সিংহুয়ারের তুই দারবান হুঙ্কার সিং শাদ্দুল সিং !
অবু—রইব কেন ? কে তোমরা হোমরাও চোমরাও—দেখিনি তো কোনদিন ?
দুই সিংগি—আনে ওয়ালা যানে ওয়ালা খাড়া রও !
অবু—আগাও কেন ? রও—কি চাও তাই কও—গোঁপ ফুলিয়ে কেন ভয় দেখাও ?
দুই সিংগি—পকেট ঝাড়া দাও।
অবু—পকেট কাটা দেখে নাও—খুঁটে খৈ মুঠা হাতে এই লাঠি লণ্ঠন—আর কি চাও ?
সিংগি—রাম রাম বাবুজী—
অবু—রাম রাম রাম দরানজী, এ হাতে লাঠি হ্যায় ও-হাতে লণ্ঠন হ্যায়—খুঁটে বাঁধা খৈ হ্যায়—নেই হ্যায় তুমি যা চাও।
সিংগি—যাও—

(মাসির প্রবেশ মোয়া হাতে)

মাসি—ও উদ্ধব, কি প'লো ? অবু প'লো নাকি ?
উদ্ধব—তোমার অবুচাঁদ সরে পলো মাসি।
মাসি—অ্যাঁ, এই সন্ধিকালে করতে গেল নাপানাপি দাপাদাপি—
খুঁজতে হলো দাও আমারে লণ্ঠন লাঠি !—এত বড় বাড়ি কোথায়
অন্ধকারে ঘুরে পলো নাকি—হারিয়েই গেল বাকি ?
উদ্ধব—সে ভয় নেই, সে নিজে গেছে তোমার লণ্ঠন লাঠি।
মাসি—তবেই খেয়েছে আমার মাথাটি।
উদ্ধব—মাসিমা, আমার নেই দায় দোষ
সে গেছে পিসির বাড়ী জামায় মেখে কুন্তলীন মাথায় মেখে দেলখোস।
মাসি—পিসির বাড়ির কথাটা বলাই তোমার হয়েছে দোষ।
উদ্ধব—যত দোষ উদ্ধব ঘোষ !
মাসি—ভালো চাওতো তারে খুঁজে এনে তবে নিস্তার তোমার উদ্ধব ঘোষ।
উদ্ধব—দেখি মাসিমা দৌড়াই দুতিন ক্রোশ।
মাসি—এই বাড়ির মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে, যা ভালো করে খোঁজ হুঙ্কার সিং !

শাদ্দুল সিং হয়ে বিদ্ধি খালি সিদ্ধি খাস্ আর ঘুমোস্ সিং দরোজা না পেরোয় অবু সাবধান হোস্। যাঃ কলুমঘকে জানা অবুচাঁদের পাওয়া যাচ্ছে না খোঁজ।
সিংগি—চল্‌তা মৌসীমা মৎ কিজীয়ে রোষ !
মাসি—দোষ করবে তো রোষ করবে না, যাও কালুমঘে নিতে বল গা খোঁজ।

(প্রস্থান সকলের)

—ইতি মাসির বাড়ির পালা—

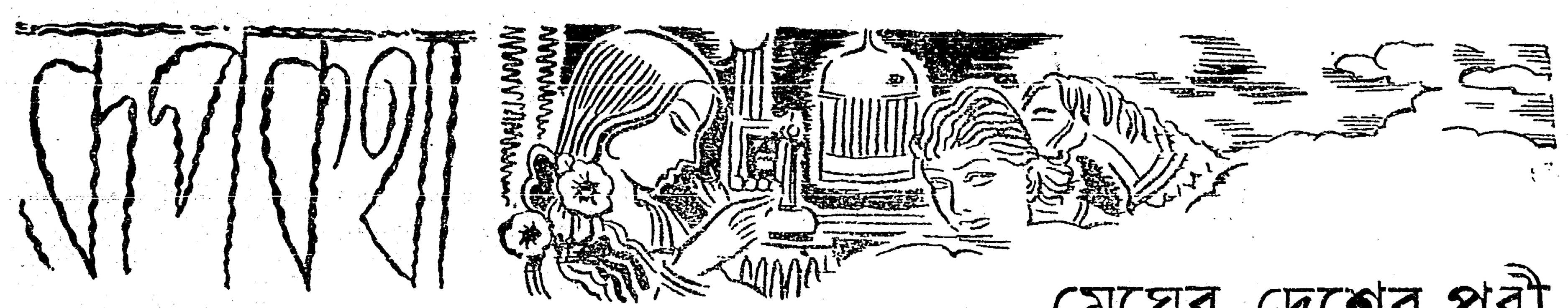

মেঘের দেশের পরী

শ্রীদেবব্রত ঘোষ

কল্পনা বসে ছিল জানালার পাশে, খোলা জানালার···।
দূরে মেঘের ওপারে পাড়ি দেবার আয়োজন কর্ছিলেন অরুণ দেব।···
···লাল হয়ে উঠেছে আশে পাশের মেঘ।···

···ছোট্ট মেয়ে কল্পনা···। দেখছিল ওই সাদা সাদা বকগুলো—সূর্য্যের লালিমায় রাঙা হয়ে উঠেছে যাদের ধবধবে ডানাগুলো।···

···গাছের ফোটা ফুলগুলো জানালায় উঁকি মারছিল···আর তাদেরই নিঃশ্বাসের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে কল্পনার নাকে।···

সারা আকাশখানি কুঞ্চিত মেঘের ঘোমটায় ঢাকা। শুধু একটি দিকে একটুখানি নীল আকাশ খোলা···।

আকাশটুকুর পানে চেয়ে থাকে কল্পনার দুটি ছোট, ডাগর চোখ।···
···হঠাৎ ও দেখ্‌ল···।
···দেখল বিস্ময়ের চোখে।··· ছোট একটা পরী নামছে আকাশ দিয়ে।···
কাছে এল সে কল্পনার···।
চোখে তার স্বপন কাজল।··· অংগে স্বপন আবেশ···।

কপালে লাল টীপ।...ডানা দুখানা সবুজ আকাশ দিয়ে গড়া।...

বলে—ঃ আসবে ?

...কল্পনা ঘাড় নাড়ে...।

তবে এস আমার সাথে।... দূরে লাল সূর্য্য টলমল করে। ওরা চলে আকাশ দিয়ে।...

পরী বলে—'এস, তোমায় কাজল পরিয়ে দি। স্বপন কাজল।'

পরী কল্পনার চোখে এঁকে দ্যায় কাজল।

ঃ টিপ পরিয়ে দেবে না ?

ঃ হ্যাঁ, দিচ্ছি।...

পরী নীচু হয়ে মেঘের ওপর বসে পড়ে।... হাতে তুলে নেয় এক মুঠো রাঙা রোদের গুঁড়ো।...

তারই এক টীপ নিয়ে পরিয়ে দেয় ওর কপালে...।

ঃ তোমায় ডানা দিই পরিয়ে ?

ঃ দাও।...

পরী পরিয়ে দেয় তাকে তখন দুটি হাওয়া ডানা...।

...ওড়ে ওরা দুজনে...

এ মেঘ থেকে ও মেঘ...

ও মেঘ থেকে এ মেঘ।...

মেঘের সারি শুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে যায় হাওয়া দুজনকে। মেঘ সায়র...।

ভাসতে ভাসতে তারা যায় আকাশের ও পারে।... মেঘ সায়র পেরিয়ে ওরা যায় মেঘের ডাঙায়।...

মেঘের ওপর বাড়ীগুলো।... মেঘের হরিণ আর গরুগুলো চিবিয়ে খায় কচি কচি মেঘ-ঘাস।...

...হাওয়া-লতা আঙ্গিনার, লতিয়ে উঠেছে ঘরের জানালা পর্য্যন্ত।...

ঃ আর কত দূর ?—কল্পনা জিজ্ঞেস করে।

ঃ এইত! আর একটুখানি!

...ওরা যায়।...

যায় ওরা।...

পার হয়ে মেঘের দেশের সমতল। বড় বড় গাছ। মেঘের গাছ।...

যায়, যায়, যায়। কত নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, দিঘী, ডোবা পার হয়ে যায়।...

উড়ে চলে ওরা।... মেঘের বন থাকে পেছনে। উপবন...। ক্ষুধার্ত্ত, হিংস্র বাজ-জন্তু ডাকে।...

সভয়ে ওড়ে কল্পনা আর পরী।...

ঃ এইত এলাম! এসেছি!—বল্লে পরী। মস্ত বড় মেঘের পাহাড়। তারই ওপর পরী-রাণীর প্রাসাদ।...

ঃ এখানে আর পাগলা বাতাস উড়িয়ে নিতে পারবে না আমাদের। ইচ্ছেমত নিজেরাই ভেসে বেড়াতে পারি।—পরী বলে উড়তে উড়তে।...

মস্ত বড় প্রাসাদ। প্রকাণ্ড উদ্যান।...

ওরা ঢুকলো সিংহদ্বার দিয়ে বাড়ীর ভেতর।... মেঘের কাচ দিয়ে গড়া মেঝে...।

মেঘের দেয়াল...

মেঘের ছাদ...। ওরা চলল এ ঘর থেকে ওঘরে।...

ততক্ষণে উঠেচে চাঁদ আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ...। ঝরে প'ড়ছে তা' থেকে জোছ্না পরী।...

ঘুম পরী...

স্বপন পরী...

জোছ্না পরী...

মেঘ পরী...

লাল, নীল, সবুজ, হলদে পরী...আর ফুল পরী...।

পরীরা গান ধরে।

বিজলী পরী চমকে ফেরে।...

...ঃ আমার ঘুম পাচ্ছে—বল্লে কল্পনা...।

ঃ এস।

স্বপন মাখানো জোছ্নার জাল বিছানো বিছানা।...

ঘুমের পালঙ্কে।...

ঘুমিয়ে পড়ে ও...।

ততক্ষণে বাইরে মেঘের ফুল গাছের পাতা বেয়ে ঝরে পড়্ছে টুপটাপ জোছ্না পরীরা।...

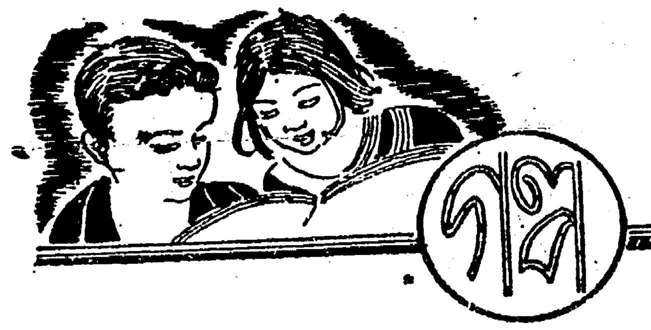

কারিকর

শ্রীসুকুমার দেসরকার

মা-মরা শিশুপালকে বাপ দিত গালাগাল আর ঠাকুদ্দা আস্কারা। ঠাকুদ্দা মারা যাবার পর বজায় রয়ে গেল গালাগালটাই।

বাপ বলে কুঁড়ের বেহদ্দ আর লোকে বলে জড়ভরত। শিশুপালের কিছু আসে যায় না। কাছিম যেমন বিপদের সময় খোলার ভেতর আশ্রয় নেয় শিশুপাল তেমনি আশ্রয় নিত নিজের মনের ভেতর। চাষার ছেলে লাঙ্গল ধরতে শিখল না; বাপের গালাগাল আর চড় চাপড়টা যখন নেহাতই অসহ্য হয়ে পড়ে তখন শিশুপালের একটা আস্তানা কামারশালা।

রূক্ষ চুল, পাথরের মত মুখ নিয়ে শিশুপাল যখন ঢোকে, সুরথ জিগেস করে "কিরে আজ আবার হয়েছে বুঝি?"

শিশুপাল বোকার মত তাকিয়ে থাকে।

"নে সাঁড়াসীটা ধর দেখি,"

বুড়ো সুরথ হাপরটা চালাতে থাকে আগুন গনগনিয়ে ওঠে।

"নে চেপে ধর" সুরথ হাতুড়ী চালায়, গনগনে লাল লোহা থেকে ফুলঝুরি ছেটকায়। থেকে থেকে দু ফোঁটা ঘাম গরম লোহার ওপর পড়ে চোঁ চোঁ করে ওঠে। বিশেষ কথাবার্ত্তার প্রয়োজন হয় না। বুড়ো আর বালকের মাঝখানে নেহাই আর হাতুড়ীর ঠোকা ঠুকি চলতে থাকে।

"এতবড় ছেলে হলি বাপ পিতামোর কাজে হাত দিসনি কেন রে?" সুরথ একদিন প্রশ্ন করেছিল।

শিশুপাল জবাব দেয়নি অনেকক্ষণ।

তারপরে, "তুই শুধু ভাঙ্গা লোহা পুড়ে লাঙ্গলের ফাল বানাস কেন?"

"তবে কি বানাব?"

"একটা রেলের গাড়ী বানাতে পারিস না?"

সুরথ হেসে ওঠে "দূর বোকা! লোহা পিটে রেলের গাড়ী বানান যায়? সে কত কল লাগে।"

"কলই'ত বানাতে হয়। মস্ত বড় বড় কল।" একটু ভেবে জবাব দেয় শিশুপাল।

সময় সমুদ্রের ঢেউ নিস্তরঙ্গ গ্রামের বুকে আছড়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়। সবুজ ধানের শীষ সোনালী হয়ে উঠে, কাস্তের হিস হিস, ছোট খাটো কলহ, মহামারী মড়ক,—গরুর গাড়ীর চাকার মতই গ্রামের জীবন মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে।

ঠাকুদ্দা মারা যাবার পর ঘরে আদর না থাকলেও আহার ছিল। কিন্তু সৎমা আসার পর থেকে পথই ঘর হয়ে উঠল শিশুপালের।

একদিন সকালবেলা কোমরের কসিটা ভাল করে এঁটে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল শিশুপাল। আগের দিন রাত্রে চুপি চুপি এসে খামারের একপাশে পড়েছিল সে। মাকে তার মনে পড়ে না কিন্তু ওই দাওয়ায় ঠাকুদ্দা বসে তামাক টানত। একবার সহরে গিয়ে একটা কলের গাড়ী এনে দিয়েছিল ঠাকুদ্দা। সে আনন্দ এখনও মনে আছে।

পথ।

রথবাড়ীর তেঁতুলতলা পার হয়ে কামারশালা। চিরদিনের অভ্যাস মত তার পা দুটো তাকে টেনে এনেছে পরিচিত আবেষ্টনীতে। এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়াল শিশুপাল তারপরে এগিয়ে চলল। পেছনে পড়ে রইল চেনা জগৎ। দুপাশে কচি ধানের উপর বাতাসের ঢেউ খেলান কলহাসি। নেহাই আর হাতুড়ির সমতালের ঠং ঠং ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। দেরীতে চষা দু একটা ক্ষেত থেকে বলদ তাড়নার আওয়াজ ভেসে আসছে—টি টি! ছেই ছেই!

সামনে নদী। ওপারে অজানা জগৎ।

"কি রে জড়ভরত, দাঁড় বাইবি?" পদ্মমাঝি শুধোয়।

এই প্রশ্ন এর আগে অনেকবার করে পদ্মমাঝি জবাব পেয়েছে "কলের নৌকা চালাতে পারিস না? দাঁড় টেনে মরিস কেন?"

"ব্যাটা চাষীর পোলা কল দেখাতে লেগেছে! তুই কল দিয়ে ক্ষেত চষতে পারিস না?"

"চষবইত!"

পদ্মমাঝি হো হো করে হেসে ওঠে।

কিন্তু আজ এক কথায় শিশুপাল রাজী হয়ে যায়।

"দুটি পান্তা খেতে দিবি?"

পদ্মমাঝির বিস্ময় চরমে ওঠে "কিরে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিস না ত?"

"দুটি পান্তা থাকেত দেনা! কতদূর যাবি?"

"হুগলী'তক। পাটকলে বোঝাই নেব।"

"পাটকল?" শিশুপাল খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে "পাটকল দেখতে দেয়? কত বড় বড় কল রে?"

"হেই এক একটা হাতীপানা।" হাসতে হাসতে জবাব দেয় পদ্ম "নে ভাতকটা খেয়ে নে, এখুনি ভাঁটা লাগবে।"

সেই জড়ভরত শিশুপাল পাটকলে কুলীর কাজে ভর্ত্তি হয়ে গেল। কুঁড়ের বেহদ্দ, যে

একদিনও লাঙ্গলে হাত লাগাতে চায় নি তার জীবনে কি যেন এক উত্তেজনা এসেছে। কল, কল! মানুষে বানিয়েছে এ সব দৈত্যদের? ওই যে একটা বোতামের চাপে হাজার হাজার মণ গাঁঠ আকাশ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়! প্রকাণ্ড এক একটা দানব যেন একটা মানুষের তোলা তর্জ্জনীর ভয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজ করে চলেছে।

রবিবার কলে ওভার-টাইম দিয়ে কাজ চলে। সেদিন বাছা বাছা জন কয়েক কুলী নেওয়া হয়। ছদিনের কাজের পর কলগুলোর মেরামতী কাজ চলে সেদিন। সেইদিনের হাজিরায় শিশুপালের সবচেয়ে উৎসাহ। তার সেদিনের লাভের অর্দ্ধেক কুলী সর্দ্দারকে কবুল করে প্রতি রবিবারেই হাজির থাকার ব্যবস্থা করেছে সে। একদিন খোদ ওয়ার্কস ম্যানেজারের মুখোমুখী পড়ে যায়।

"কেত্না টিকেট নাম্বার?" মুখখানা লাল করে ম্যানেজার সাহেব প্রশ্ন করেন।

সেলাম ঠুকে শিশুপাল জানায় ১০১৩।

ডাক পড়ে কুলী সর্দ্দারের "এই বাচ্ছা কুলীটাকে প্রতি রবিবারে ওভার টাইম দেওয়া হয় কেন?"

বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে কুলী সর্দ্দার জবাব দেয় "হুজুর এ ল্যাড়কা বহুৎ আচ্ছা কাম করে। মিশিনকা আদৎ এর আচ্ছা মালুম হয়েছে।"

ম্যানেজার সাহেব একটি ঘোঁৎকার ছাড়েন "বলে দিইনি যে একই লোক প্রতি রবিবারে ওভার-টাইম পাবে না?"

শিশুপাল কিন্তু দমে না। সে তখন থেকে রবিবারে গেটে টিকিট পাঞ্চ না করিয়েই ঢুকে আসে। অর্থাৎ বিনি মাইনেয় রবিবারগুলো খেটে যায়। কলগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে সে স্বপ্ন দেখে আর চালু কলগুলোর ঘর্ঘর শব্দ তার কানে প্রভুভক্ত কুকুরের আনন্দোল্লাসের মত লাগে। কলগুলোর ভাষা এবং ক্রমে ক্রমে তাদের রহস্য তার কাছে পরিস্কার হতে থাকে, সেই সঙ্গে কোথায় কোন কলের কি পরিবর্ত্তন করে বা নতুন কল বানিয়ে আরও কি কাজ করা যায়, তার আবছা ছায়া মাথায় ভেসে আসে। শিশুপাল যে কলগুলোর পরিচর্য্যা করে তেল দেয়, ঘসে মাজে সেগুলো যেন সাপ্তাহিক কাজে ভাল চলে। আর তার এই কল-পাগলামী সারা কারখানায় রটে যায়। দিনের আরম্ভে কলগুলোকে যখন প্রথম চালু করা হয়, সে সময়টা সে হাজির থাকতে কোনদিন ভোলে না। সেই প্রথম গম্ গম্ করে, তারপরে অসংখ্য স্পন্দন তুলে মেশিনগুলোর ঘূর্ণন যেন মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের মতই বিস্ময়কর ঠেকে।

এমনি একটা পুরোদমে কাজের দিনে শিশুপাল বড় ক্রেণটার নীচে কাজ করছিল। কলগুলো সোল্লাসে দানবীয় গর্জ্জন করে চলেছে। হঠাৎ তার মাঝখানে একটা অচেনা আওয়াজ

কানে এল তার। শিশুপাল একটা কুলী কিন্তু সে দাঁড়াতে পারল না। একছুটে সে ফোরম্যান কার্সন সাহেবের কাছে এল।

"সাহেব ক্রেণ মেশিনটা খারাপ হয়ে গেছে।"

কার্সন সাহেব দূর থেকে বাঁকা দৃষ্টিতে ক্রেণটার দিকে তাকিয়ে বললেন "কে বলেছে?"

শিশুপাল নিরুত্তর।

"কোন বলা?" সাহেব গর্জ্জন করে ওঠেন।

"ওই ওই শোন সাহেব!" শিশুপাল উত্তেজিত স্বরে বলে।

খানিকক্ষণ লাল চোখে তাকিয়ে সাহেব গর্জ্জে ওঠেন "ভাগো।"

শিশুপাল নির্ব্বিকার মুখে এসে আবার ক্রেণটার নীচে দাঁড়ায়। আবার সেই দানবীয় সোল্লাস গর্জ্জনের মাঝখানে একটা চীড়খাওয়া আর্ত্তনাদ। মেশিনের সবল ভাষার মাঝে একটা তন্তুছেঁড়া ক্রন্দন;

"সাহেব!" শিশুপাল প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলে "ক্রেণটা বন্ধ করে দাও।"

একটা বিরাট চড় তার ঘাড়ের ওপর এনে পড়ে আর পড়তে পড়তে শিশুপাল দৌড় লাগায় সোজা ওয়ার্কস ম্যানেজারের ঘরে।

"বড়া সাব!" শিশুপাল কাঁপছে।

ম্যাকডুগাল সাহেব মুখ তুলে তাকান "কেয়া হুয়া?"

"সাহেব বড় ক্রেণটা এখুনি বন্ধ করে দিতে হবে।" তার চোখে কাকুতি।

"কেন? ফোরম্যান কোথায়?"

"সাহেব তুমি একবার এস।"

খানিকটা ঔৎসুক্যে, খানিকটা শিশুপালের উত্তেজনায় ম্যাক সাহেব বড় ক্রেণটার কাছে এসে দাঁড়ান। চারিদিকে যথারীতি স্বাভাবিকতা ম্যাক সাহেবের বৃষস্কন্ধ টকটকে লাল হয়ে উঠতে থাকে—আগ্নেয়গিরির উদ্গারের আগের স্তব্ধতা। কুঞ্চিত মুখখানা শিশুপালের দিকে ফিরতে থাকে।

"ওই, ওই শোন সাহেব!"

ম্যাক সাহেব ততক্ষণে ফেটে গেছেন "জলদি! জলদি ইলেট্রিক কারেণ্ট কেটে দাও! বন্ধ কর বড় ক্রেণ!

সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা ফ্ল্যাশ্। সশব্দে ক্রেণটার বড় চেন ছিঁড়ে যায় আর প্রকাণ্ড একটা গাঁঠের নীচ থেকে মরণ-ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ভেসে আসতে থাকে। দৈত্যগুলোর গর্জ্জন থেমে গেছে। আকস্মিক স্তব্ধতা কার্নকে পীড়া দেয়।

অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে।

শিশুপাল হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিল। ম্যাক সাহেব বললেন "তুমি এটা ভেবে করছ'ত পাল ?"

ম্যাকডুগাল সাহেবের কানের দুপাশের চুলগুলোয় পাক ধরেছে, বৃষস্কন্ধে ঈষৎ শিথিলতা। শিশুপালের মধ্যের সেই কল-পাগলামী ম্যাক সাহেবই সৃষ্টির প্রেরণা বলে বুঝতে পারেন এবং তাঁর আশ্রয়ে শিক্ষায় বড় করে তোলেন।

"তুমি একজন ইঞ্জিনীয়ারের সমান মাইনে পাও" ম্যাক সাহেব বলে চললেন "তুমি চাইলেই এখনই তোমার মাইনে প্রায় ডবল হতে পারে। ভেবে দেখ পাল।"

"না মিস্টার ম্যাক" শিশুপাল জবাব দেয় "আমি আর মেশিন চালাতে চাইনা আমি চাই মেশিন তৈরী করতে।"

"ভারতবর্ষে এখনও মেশিন তৈরী হতে পারে না। কেন জমান অর্থ নষ্ট করবে ?"

"আমার দেশে আরও কি কি হতে পারে না, আর দশ বছর পরে তোমার কাছে জেনে যাব মিষ্টার ম্যাক।"

ম্যাক সাহেব হেসে ওঠেন "Well! you are a tenacious young man! (তুমি একটি জেদী ছেলে) আট বছর আগে তুমি যা করে আমাকে সেই ক্রেণটার সামনে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে আমি ভুলিনি।"

পশ্চিমে রেল লাইন যেখানটায় বাঁক নিয়েছে, যার ওপারে সুয্যি অস্ত যায়, পাতাহীন প্রায় নিঃস্ব শিমূল গাছটার মাথায় যেখানে অজস্র শকুনের আস্তানা, তারি নীচে ফাঁকা মাঠটার ঠিক মাঝখানে একটা উইয়ের ঢিপি তিল তিল করে মাথা তুলেছে, ওপরে একটুখানি নীল আকাশ মুখ নীচু করে সেদিকে তাকিয়ে থাকে, চারপাশে ছড়ানো গাছের দলকে বন বললেও বলা চলে। একদিন দেখা যায় শকুনেরা পালিয়েছে, শিমূলের শাখায় ভেঙ্গে পড়েছে ফুলের রাশ, উই ঢিপিটা হয়ে গেছে সমতল। মাঠে ভিদ্ খোঁড়া হচ্ছে।

সেই মাঠে ছোট্ট একটু টিনের চালায় শিশুপালের কারখানা বসল। তারপর বছরের পর বছর সময়ের সঙ্গে প্রাণপাত যুদ্ধ। বড় জিনিসের যারা স্বপ্ন দেখে, ছোট জিনিস অনেক সময় তাদের নজর এড়িয়ে যায় বটে কিন্তু তা কখনও প্রকৃত সৃষ্টিকারীদের বাধা দিতে পারে না। শিশুপালের নতুন করে এক শিক্ষা সুরু হোল। বড় বড় বিস্ময়কর মেশিনের দুরন্ত ছায়া যার মনে চমকে যাচ্ছে সে সেই প্রথম ম্যাক সাহেবের কথার সত্যতা বর্ণে বর্ণে অনুভব করল। আমাদের দেশে এখনও মেশিন হতেপারে না! মেশিনত দূরের কথা, মিস্ত্রীদের হাতের ভাল যন্ত্র একটা আমাদের দেশে হয় না। একটা ভাইস, একটা লেদ, একটা ড্রিল একটা ইস্ক্রুপ, এমন কি

একটা আলপিনের জন্যেও আমাদের বিদেশের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। শিশুপাল প্রথমে সুরু করল যন্ত্র তৈরী করতে—সহজ সরল ও সুবিধাজনক! সস্তা মাইনের কারিকরী দিয়েও বিদেশী মালের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করা কঠিন কিন্তু শিশুপাল দমল না। তাকে বৃহৎ সংখ্যায় সৃষ্টি করতে হবে, করতে হবে বিদেশের চেয়ে ভাল যন্ত্র, তবেই সে দাম কমাতে পারবে। শিশুপাল কারখানা বাড়িয়ে চলল।

এদিকে প্রথমে এল একটা চানাচুর-ওলা। ঠিক দুপুরবেলা কাজ থেকে অল্প যখন অবসর চানাচুরওলার ওপর কারিকরের দল মৌমাছির মত ভেঙ্গে পড়ল। তারপরে একদিন দেখা গেল বনের ভেতর অল্প ফাঁকা জায়গায় একটা চালা উঠছে। একদল উড়িয়াবাসী ভাতের হোটেল খুলেছে। দূর গাঁ থেকে প্রতিদিন আসা যাওয়া একদিন কারিকরদের অসুবিধা ঠেকতে লাগল। মানুষের আক্রমণে বন সুরু করল জমী ছাড়তে, উঠতে লাগল ঘর। গরুর পাল তাড়িয়ে একদিন আবির্ভাব হোল গোয়ালার, একটা নাপিত এসে জমেছে। প্রতি বছরেই সংগঠনের এক নূতন উপাদান দেখা দিতে লাগল। তারপরে একদিন এক মাড়োয়ারী এসে খুলে বসল একটা মুদীখানা। দেখতে দেখতে গড়ে উঠল এক গ্রাম।

শিশুপালের তখন নাম ছড়াচ্ছে। পালনগরের কারখানায় ভাল লোকের ভাল পায়সা আছে—এটা রটে গেছে বহুদিন।

সময় সমুদ্রের দশ বছরের ঢেউ চিহ্ন রেখে গেল মানুষের মনে, অভিজ্ঞতায়, আবাসে। শিশুপাল এতদিন শুধু ঢেলে গেছে, বাড়িয়ে গেছে, আহরণ করেছে বৃহত্তর সৃষ্টির উপায়। সঞ্চয়ের শেষ সীমায় এসে সে লাভের মুখ দেখতে পেল। কিন্তু আশা তার লাভে নয়, তাকে সৃষ্টি করতে হবে, গড়তে হবে—সে কারিকর। এইবার সে আসল মেশিন সৃষ্টি করতে পারবে।

এই সময় একদিন যখন শিশুপাল তার মেশিনশপে কি একটা নতুন গড়া মেশিন নিয়ে ব্যস্ত ছিল, একজন এসে খবর দিল--একজন সাহেব ডাকছে।

"নিয়ে আয় এখানে"। শিশুপাল আবার তন্ময় হয়ে গেছে।

"হ্যালো, পাল!"

"মিস্টার ম্যাক!" শিশুপাল লাফিয়ে উঠে ম্যাক সাহেবের হাতটা চেপে ধরল। সাহেবের চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে, প্রশস্ত কপালে পড়েছে কুঞ্চন।

"দেশে যাবার আগে তোমার কারখানাটা একবার দেখে যেতে এলাম। তুমি চমৎকার ছোট ছোট যন্ত্র বানাচ্ছো পাল। আমি আমার দশ বছর আগেকার কথাটা ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হব কিনা সন্দেহে পড়েছি।"

শিশুপাল হাসল "কিন্তু তোমার কথাটা প্রায় ঠিক মিস্টার ম্যাক।"

"ওটা কি করছ?" ম্যাক সাহেব শিশুপালের নতুন মেশিনটায় মন দিলেন। "Oh lovely! Caterpillar tractor না?

শিশুপাল ঘাড় নাড়ল "তুমি কবে ফিরবে মিস্টার ম্যাক?"

"আর ফিরব না পাল, আমি অবসর নিয়েছি। তোমার জন্যে সেখান থেকে কোন বিশেষ মেশিন পাঠাতে পারি?

"হ্যা ট্র্যাক্টরের কয়েকটা নতুন ডিজাইন।"

"তোমার তা দরকার হবে না।" শিশুপালের নতুন মেশিনটার দিকে তাকিয়ে ম্যাক সাহেব জবাব দেন।

তারপরে একদিন,—রাত তখন গভীর, কাল বৈশাখীর রুদ্র বাতাস যখন ক্ষেপে এসেছে হঠাৎ শোনা যায় "আগুন আগুন!"

শিশুপালের কারখানায় আগুন ধরে গেল আর দেখতে দেখতে বৈশাখী রুদ্র বাতাস সে আগুনকে নাচিয়ে নিয়ে গ্রাস করে ফেলল সব। শিশুপাল স্থানুর মত দাঁড়িয়ে দেখল সে ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা তার এত বছরের পরিশ্রম, এত সঞ্চয় এত আশা জ্বলে গেল তার চোখের সামনে। সেই অগ্নিবর্ণে ভেসে এল তার জীবনের ছবি—সেই চাষীর ঘর, সুরথের কামারশালা, সেই পদ্মামাঝির নৌকোয় বাড়ী ছেড়ে পালানো। তারপরে এই! সে কি হেরে গেল? এই ধ্বংসকেও কাজে লাগান যায় না? আবার যায় না গড়ে তুলে নতুন সৃষ্টি?

কয়েকজন কারিকর বলতে এসেছিল "কর্ত্তা সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।"

শিশুপাল জবাব দিল "ঢি ঢি! ছেই ছেই।"

লোকে বলে শিশুপাল পাগল হয়ে গেছে। কারখানা ধ্বংস—সেই কারখানা যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল পালনগর গ্রাম। গ্রামে আস্তে আস্তে ভাঙ্গন ধরল। প্রথমে গেল গোয়ালা। মাড়োয়ারী দোকান গোটাল। হোটেলে লোক হয় না। কারিকরের দল যাযাবর পাখীর মত ছেড়ে গেছে গ্রাম। নিঃস্ব শিমূল গাছটার ডালে শকুনেরা আবার আস্তানা গেড়েছে।

শিশুপালকে দেখা যায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পায়ে হেঁটে পাড়ি দিচ্ছে। আর চাষের ক্ষেতে বলদ দেখলেই সে বিড় বিড় করে বলে ওঠে "ঢি ঢি! ছেই ছেই।" আর রূক্ষ তপ্ত মাটি যখন সহস্র ফাটল দিয়ে হাঁফাচ্ছে সেই সময় আকাশের চোখের কোণ নবকৃষ্ণ হয়ে এল। শিশুপালকে একদিন দেখা গেল তুটো গরুর গলায় দড়ী বেঁধে টেনে নিয়ে পাল নগরের দিকে চলেছে। সেই দিন রাতে পালনগরের পোড়া মাঠে আবার আগুন জ্বলে উঠল—ধ্বংসের আগুন নয়, সৃষ্টির শিক্ষা। হাতুড়ী বেজে উঠল—ঠং ঠং!

বর্ষা এল ঝমঝমিয়ে, কঠিন মাটি দ্রব হয়ে গেল। আর শিশুপালের আছরিত বিস্তীর্ণ

মাঠের ওপর দিয়ে ঘর্ঘরিয়ে উঠল তার নিজের হাতের ট্র্যাক্টর। ছুটে এল চাষা, ছুটে এল কারিকর। কলে জমী চষা!

"ঢি ঢি! ছেই ছেই!" শিশুপালের মুখে শিশুর মত হাসি।

ধ্বংসকে জয় করতে হবে তার। শকুনের দল অপরিচিত শব্দ পেয়ে উড়ে গেল সশব্দে।

যতদূর দৃষ্টি চলে সবুজ ধানের মাথায় বাতাস শীষ দিয়ে চলেছে। ধানের সমুদ্রে নদীর মৃত্বু হিল্লোল। গাই তুটোর নির্ব্বিকার রোমন্থন, আর তুটো নবজাত বাছুর অকারণ আনন্দে লাফিয়ে ছিটকে যাচ্ছে। একজোড়া ফিঙে বাতাসের ওপর ধানের ঢেউয়ের নকল করে তির্য্যক উড়ে গেল।

শিশুপাল আবার গ্রাম বসাচ্ছে। চাষার ছেলেকে ফিরে পেয়েছে জমি।

দ্বিতীয়
কুকুর এবং বিড়াল

রামবাবুর শয়নগৃহে ঢুকে জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল। তারপর বললে, "সুন্দরবাবু, আপনি কি এ মামলায় আমার সাহায্য চান?"

সুন্দরবাবু বললেন, "সে কথা আর বলতে! আমার মাথার সঙ্গে তোমার মাথা মিললে আমরা তুজনে দিগ্বিজয় করতে পারি।"

জয়ন্ত হেসে বললে, "আপাতত বোধহয় দিগ্বিজয় করবার দরকার হবে না। আচ্ছা বলুন দেখি, আপনি যখন প্রথম এ ঘরে ঢোকেন, তখন জানালাগুলো কি খোলা ছিল?"

—"না, একটা জানলাও খোলা ছিল না। দরজাটাও ছিল ভিতর থেকে বন্ধ।"

—"তা'হলে সাপটা ঘরের ভিতরে ঢুকল কেমন ক'রে?"

মাণিক বললে, "হয়তো ঘরের কোন কোন জানলা খোলা ছিল, রামবাবু ঘরে ঢুকে নিজের হাতে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন।"

—"তাহ'লে গোখ্‌রো সাপটা পালালো কোন্ পথ দিয়ে ?"

—"হয়তো ঐ নর্দ্দামা দিয়ে ঢুকে সে আবার বেরিয়ে গিয়েছে।"

—"মাণিক, তোমার এ অনুমানটাও সত্য হ'তে পারে। কিন্তু রামবাবুর দেহের কোথাও সর্পদংশনের চিহ্ন নেই কেন ? গোখ্‌রো সাপের বিষ পান করলেও কারুর মৃত্যু হয় না, জানো তো ? ও বিষ রক্তের সঙ্গে না মিশলে মারাত্মক হয় না।"

মাণিক হতভম্বের মতন মাথা চুলকোতে সুরু করলে।

একতালায় যারা ভাড়া থাকত তারা তখন উপরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

তাদের একজনকে ডেকে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "ঘটনার দিন রামবাবু সাড়ে বারোটার সময়ে বাড়ীতে ফিরেছিলেন ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"সেদিন এখানে কোন সন্দেহজনক ঘটনা ঘটেছিল ?"

—"আজ্ঞে না।"

—"কোন শব্দ-টব্দ শুনেছিলেন ?"

—"আপনি জিজ্ঞাসা করছেন ব'লে এখন একটা কথা আমার মনে হচ্ছে। সে-রাত্রে রামবাবু হঠাৎ এত জোরে শোবার ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন যে আমরা সবাই চম্‌কে উঠেছিলুম।"

—"অত জোরে তিনি কখনো দরজা বন্ধ করেন না ?"

—"না। তিনি অত্যন্ত ধীর স্থির মানুষ।"

—"বেশ। এটা একটা ভালো সূত্র ব'লে মনে হচ্ছে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমার মতে এটা উল্লেখযোগ্য সূত্রই নয়!"

জয়ন্ত বললে, "কেন নয় ?"

—"এর দ্বারা কি প্রমাণিত হচ্ছে ?"

—"প্রমাণিত হচ্ছে যে, হঠাৎ কোন কারণে ভয় পেয়ে রামবাবু তাড়াতাড়ি সজোরে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন।"

—"হুম্। হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে।"

জয়ন্ত আবার লোকটির দিকে ফিরে বললে, "রামবাবুর পায়ে বিড়ালের আঁচড়ানোর দাগ পাওয়া গিয়েছে। তিনি কি বিড়াল পুষতেন ?"

—"না মশাই। বিড়ালকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন।"

—"এ বাড়ীতে আর কেউ বিড়াল পোষে ?"

—"কেউ না। তবে একটা বিষম খেঁকী হুলো বিড়াল খাবারের লোভে প্রায়ই এখানে হানা দেয় বটে।" লোকটি একবার থেমে আবার বললে, "ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলায় দোতালায় সেই বিড়ালটার আর্ত্তনাদও শুনেছিলুম।"

—"দোতালায় থাকেন ভৈরববাবু ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"বিড়ালটা আর্ত্তনাদ করছিল কেন ?"

—"তা আমি জানি না।"

—"রামবাবু তখন বাড়ীতে ছিলেন ?"

—"না। তিনি থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন।"

—"ভৈরববাবু ?"

—"তিনিও সন্ধ্যার পর বেরিয়ে গিয়েছিলেন।"

—"তারপর ফিরে এসেছিলেন তো ?"

—"হ্যাঁ, প্রায় শেষ-রাতে।"

—"শেষ রাতে ! কেন ?"

—"কোন্ আত্মীয়ের বাড়ীতে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল।"

—"আচ্ছা, এইবারে ভালো ক'রে মনে ক'রে দেখুন দেখি, সে-রাত্রে আর কোন ঘটনা ঘটেছিল কিনা ?"

—"আপনাদের কাজে লাগতে পারে এমন কোন ঘটনার কথা মনে পড়ছে না।"

—"তবু ভেবে দেখুন। যে কোন ঘটনা আমাদের কাজে লাগতে পারে।"

—"কিন্তু এ অতি বাজে ঘটনা। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। রাত তখন ছটোর কম হবে না। ঘুম ভাঙতেই শুনি, বাড়ীর পাশের খানার ভিতর থেকে একটা বিড়াল আর একটা কুকুরের তুমুল ঝগড়ার শব্দ আসছে। খানিক পরেই সব চুপচাপ।"

জয়ন্ত গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে, "আপনার আর কিছু মনে পড়ে ?"

—"আজ্ঞে না।"

উপস্থিত আরো তিনজন লোকের মুখ থেকে নূতন কোন তথ্যই জানা গেল না।

এমন সময়ে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল আর একটি নূতন মানুষ।

তার বয়স হবে বছর পঁইত্রিশ। শ্যামবর্ণ। দাড়ী-গোঁফ কামানো। দোহারা, দীর্ঘ চেহারা—দেখলেই তাকে বেশ বলিষ্ঠ ব'লে মনে হয়। জামা-কাপড়ে সৌখীনতার চিহ্ন। লোকটির

মধ্যে সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার হাসিখুসি-মাখা প্রশান্ত মুখ এবং অতি-বিনীত অমায়িক ভাবভঙ্গি।

সেখানে এসেই লোকটি বললে, "আমার নাম শ্রীভৈরবচন্দ্র বিশ্বাস।"

সুন্দরবাবু বললেন, "আপনার চেহারায় ভৈরবত্ব কিছুই নেই। আপনার নাম হওয়া উচিত ছিল সুশান্ত।"

ভৈরব চোখে-মুখে হাসির উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে বললে, "ও-রকম কথা আরো কেউ কেউ বলেছেন। কিন্তু এখন আর পিতার ভ্রম সংশোধন করবার উপায় নেই।"

জয়ন্ত বললে, "বাড়ীর দোতালায় আপনি থাকেন?"

ভৈরব যুক্তহস্তে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"শুনছি কলকাতায় আপনি নতুন এসেছেন?"

—"আজ্ঞে, ঠিক নতুন নই, মাস-তিনেক এসেছি। ছেলেবেলাতেও কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।"

—"আপনি কি করেন?"

—"আজ্ঞে স্যর, এইবারেই আপনি আমাকে বিপদে ফেললেন। কারণ, আমি কিছুই করি না।"

—"কিছুই করেন না!"

—"কিছু না স্যর, কিছু না। খালি ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াই দেশে দেশে। কখনো ভারতের ভিতরে, কখনো ভারতের বাইরে। এক দেশে বেশীদিন থাকলেই আমার অসুখ হয়। কলকাতাতেও আর আমার মন টিকছে না। স্থির করেছি, শীঘ্রই পিঠটান দেব।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! খাসা আছেন দেখছি! আমিও তো মাঝে মাঝে মনে করি, দুনিয়ার দিকে দিকে পথে পথে ছোটাই আমার পদযুগলকে—কিন্তু পারি না কেবল পাথেয়ের অভাবে।"

—"পাথেয় স্যর? ঐখানেই ভগবান আমাকে দয়া করেছেন। বাবা পরলোকে, কিন্তু তাঁর পরিপূর্ণ লোহার সিন্ধুকের চাবিটি রেখে গিয়েছেন ইহলোকেই। আমার ভাই-বোন কেউ নেই।"

সুন্দরবাবু বললেন, "মশাই, আপনার সৌভাগ্যে আমার হিংসা হচ্ছে।"

বিনয়ে ভেঙে প'ড়ে ভৈরব হাসতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, "ভৈরববাবু, ঘটনার দিন সন্ধ্যেবেলায় আপনার দোতালায় একটা বিড়াল আর্ত্তনাদ করেছিল কেন?"

ভৈরব হাসতে-হাসতেই বললে, "বড়ই চোট্টা বিড়াল স্যর, বড়ই চোট্টা বিড়াল! রোজ চুপিচুপি আমার খাবার খেয়ে চম্পট দেয়। সেদিন তাকে ধরতে পেরে আচ্ছা ক'রে উত্তম-মধ্যম দিয়েছিলুম।"

সুন্দরবাবু ব'ললেন, "বেশ করেছিলেন মশাই, আমার বাসাতেও ঐ-রকম একটা মহা-চোর ধুম্সো বিড়াল আসে। আজ পর্য্যন্ত কত বড় বড় চোর ধরলুম, কিন্তু সে বেটাকে কিছুতেই আর গ্রেপ্তার করতে পারলুম না!"

জয়ন্ত বললে, "সন্ধ্যের পর আপনি কোথাও নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন?"

ভৈরব বললে, "হ্যাঁ স্যর, এক বন্ধুর মেয়ের বিয়ে ছিল। ফিরেছি রাত সাড়ে তিনটেয়।"

—"অত রাত হ'ল কেন?"

—"বন্ধুর বাড়ী আগড়পাড়ায়। কাজকর্ম্ম চুকতেই রাত প্রায় একটা বেজে গেল। তারপর ট্যাক্সি চ'ড়ে এসেছি কলকাতায়।"

—"এখানে এসে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করেছিলেন?"

—"কিছু না স্যর, কিছু না! সব চুপচাপ। কোথাও একটি টুঁ শব্দ ছিল না!"

—"আচ্ছা, আপাতত আমার আর কিছু জানবার নেই। সুন্দরবাবু, এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন।"

সুন্দরবাবু বিরক্তি-ভরে বললেন, "হুম! প্রশ্ন করব না ছাই করব! এতক্ষণ প্রশ্ন ক'রে তুমি কি জানতে পারলে? জানা গেল খালি তো এই: একটা বিড়াল একজন মানুষকে আঁচড়ে দিয়েছে। একটা চোর-বিড়াল ধরা প'ড়ে চোরের মার খেয়েছে। একটা বিড়াল একটা কুকুরের সঙ্গে লড়াই করেছে। এ-সব জেনে আমাদের লাভ? খুনের মামলার সঙ্গে বিড়ালের ইতিহাসের সম্পর্ক কি?"

জয়ন্ত হেসে বললে, "যা বলেছেন! এ মামলায় বিড়ালের উপদ্রব বড় বেশী। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে!"

—"সন্দেহ? কিসের সন্দেহ?"

—"সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো একটা বিড়াল এসেই শেষটা আমাদের পথ বাৎলে দেবে!"

—"পথ বাৎলে দেবে? কেমন ক'রে? ম্যাও ম্যাও রবে চেঁচিয়ে?"

হা হা ক'রে হেসে উঠে ভৈরব বললে, "আপনি বেশ মজার কথা বলেন!"

সুন্দরবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "মশাই, মজার কথায় আসামী গ্রেপ্তার হয় না! চল জয়ন্ত, থানায় যাই। কী যে ছাই রিপোর্ট লিখব, তাই এখন ভাবছি।"

মাণিক বললে, "কিছু ভাববেন না সুন্দরবাবু, কিছু ভাববেন না! রিপোর্টে লিখুন তিন বিড়ালের কাহিনী।"

—"যাও যাও মাণিক, বাজে বোকো না—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না!"

সকলে নেমে বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, "এইটেই বুঝি খানা ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"এর ভিতর থেকেই বিড়াল-কুকুরের ঝগড়ার শব্দ শোনা গিয়েছিল ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

খানাটা হাত-আড়াই চওড়া। লম্বায় অনেকখানি। অন্য প্রান্তটা আধা-অন্ধকারে অস্পষ্ট। তলদেশে আধহাত চওড়া একটি খোলা ড্রেণ। এখানে-ওখানে দুর্গন্ধময় জঙ্গল ছড়ানো।

জয়ন্ত খানার ভিতরে প্রবেশ করলে বিনাবাক্যব্যয়ে।

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, ও কি হে ?"

জয়ন্ত অগ্রসর হ'তে হ'তে বললে, "খানার ভিতরটা একবার বেড়িয়ে আসি।"

—"ঐ মেথরের পথ কি বেড়াবার ঠাঁই ?"

জয়ন্ত জবাব দিলে না।

ভৈরব বললে, "স্যর, মাপ করবেন। কিন্তু আপনার বন্ধুটির হাব-ভাব যেন কেমন কেমন !"

—"হ্যাঁ, জয়ন্তের মাথায় একটু ছিট আছে। নইলে ওর আর সব ভালো।"

—"খানার ভিতরে গিয়ে উনি কি দেখতে চান ?"

—"ভগবান জানেন।"

মিনিট-কয় পরে জয়ন্ত একটা মৃত বিড়ালকে ও একটা মৃত কুকুরকে লাঙ্গুল ধ'রে টানতে টানতে খানার বাইরে নিয়ে এল।

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে রইলেন, বিপুল বিস্ময়ে তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুলো না।

মাণিক বললে, "জয়, আজ কি তুমি ধাঙড়ের কর্ত্তব্য পালন করতে চাও ?"

জয়ন্ত উৎফুল্ল স্বরে বললে, "উহুঁ, এই মরা কুকুর আর বিড়ালকে আমার পরীক্ষাগারে নিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে পরীক্ষা করতে চাই।"

—"কি আশ্চর্য্য, কেন ?"

—"আমার বিশ্বাস, এরা মারা পড়েছে বিষের চোটে।"

—"বেশ তো, তার জন্যে তোমার মাথাব্যথা কেন ?"

—"আমি জানতে চাই, সেটা কি বিষ ? হয়তো একই গোখ্‌রো-সাপের বিষে মৃত্যু হয়েছে রামবাবুর, আর এই বিড়াল-কুকুরের।" ক্রমশঃ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাবী এসেছিল তার বন্ধু শীলার বাড়ী। রাস্তায় তার গাড়ী দাঁড়িয়েছিল গিয়ে উঠ্‌লো। তার শ্বশুর কমলবাবু এলাহাবাদের সবচেয়ে বড় উকীল, আর স্বামী তপন পুলিশের সাব্-ইন্‌স্পেক্টর।

শুধু এখানে এসে নয়, অনেকদিন থেকেই বাবীর প্রদীপের কথা মনে পড়ে, খবর না পেয়ে মন কেমন করে। কিন্তু উপায় নেই খবর নেবার, যে বুড়ো দাদু ! সে নাকি কাউকে কিছু বল্‌বে ?

ইচ্ছে ছিল তার প্রদীপের কাছে দার্জিলিংএর গল্প শুন্‌বে—ঐখানে যাওয়া পর্য্যন্ত তার জানা ছিল। ইচ্ছে ছিল তার, প্রদীপকে এলাহাবাদের কথা শোনাবে, কদিনের অভিজ্ঞতায় যা জেনেছে।

তাই যখন গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা শুক্‌নো হাওয়া পিচ্ ঢালা পথের ওপর এসে পড়ছে ঝাউগাছের পাতাগুলোকে কাঁপিয়ে, তখন ব্রাউন রংএর কারে আরাম ক'রে ব'সে অনেক দিনের পুরোণ বন্ধুকে মনে করা ভালোই লাগ্‌বার কথা। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস—কোথায় কে চ'লে যায়।

ছোটমেয়ের মনে এই করুণ আর্ত্তনাদ, এই গভীর তত্ত্বকথা, বড় মেয়েদের চেয়ে যে কিছু কম ক'রে বাজে তা নয় ! বরঞ্চ ছোটমেয়েদের চোখের পাতা বড় মেয়েদের চেয়ে বেশী ক'রে ভিজে ওঠে আরো সহজেই !

চেয়ারে মুখ ঘ'সে ঘ'সে অনেকক্ষণ পরে মুখের বাঁধন প্রদীপ যখন আলগা করলো, তখন বাবী তার বাড়ীতে পৌঁছে গেছে। গিয়ে বিকেলবেলার স্নান সেরে চায়ের টেবিলে বস্‌বার আয়োজন করছে।

তবু প্রদীপ জান্‌লার কাছে গিয়ে চীৎকার ক'রে ডাক্‌লো—বাবী ! বাবী !

কোথায় বা বাবী? সে বাড়ীতে ছুটি মেয়ে থাকে শীলা আর বুলা তাদের বাবা আর মার সঙ্গে। সকলেই গেছে লক্ষ্ণৌএ বেড়াতে, বাবীও এসে শূন্য বাড়ী দেখে ফিরে গেল।

প্রদীপের হাত পা তখনো বাঁধা। তিন চার বার ডেকে যখন কোনো সাড়া পেলেনা, আর বুঝ্‌লে বাড়ীটা খালি, তখন সে হাল ছেড়ে দিলে।

ছুদিন ধ'রে তার শরীরের ওপর দিয়ে ত কম ধস্তাধস্তি যায়নি! জখম হয়েছে জখম করেছে!

সে প্রদীপ আর নেই। সেই ভয়ে মুষ্‌ড়ে পড়বার ছেলে! যতই না বিপদ ঘটুক্, মাথা স্থির রাখ্‌তে সে খুব পারে, এখন যে তার গায়ে জোর এসে গেছে! গায়ের জোরেই ত' মনের জোর। আর মনের জোর থাক্‌লে গায়ের জোরের অভাবই হয় না। প্রদীপ আজ মরীয়া।

তবু যতই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আস্‌তে লাগ্‌লো, ততই যেন তার মনে নাম্‌লো ক্লান্তি আর অবসাদের ছায়া।

অন্ধকারের মধ্যেই চিরঞ্জীলাল এলো তার কাকাকে সঙ্গে নিয়ে। বলে গেল তাকে আবুপাহাড়ে নিয়ে গিয়ে বন্দী ক'রে রাখা হবে। তার দাছ যদি আশিহাজার টাকা না দেন ত না খাইয়ে শুকিয়ে তাকে মারা হবে।

কি ভাগ্যি অন্ধকারে লক্ষ করলোনা প্রদীপের মুখ খোলা। প্রদীপও সেই ভয়ে কোনো জবাব দিলেনা, নইলে জবাব দেবার জন্যে তার মুখ যাকে বলে নিস্‌পিস্ করছিল। বল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছিল—টাকা দেবে না আর কিছু!

কিন্তু খানিক পরে খাবার নিয়ে এলো যে লোকটা—ছুষ্‌মন গোছের লোকটা আলো নিয়ে— সে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে—মুখের বাঁধন খুলে গেছে? তা যাক্ গে। ধারে কাছে কোথাও বাড়ী নেই, একখানি যা আছে, তাতে লোক নেই। চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কোনো আশা নেই।

খাবার আর কি? একবাটি ছুধ আর সন্দেশ।

বল্‌লে—আমি ধরছি, খেয়ে ফ্যাল্। প্রদীপ বল্‌লে—আমি খাচ্ছি, দিয়ে ফ্যাল্। বিষটিস্ মিশোশনিত?

বিষ ছুদিন বাদে মেশাব।

ছুদিন বাদে আর সময় পাবি কি? তখন আমিই তোদের ফাঁসীকাঠে চড়াব।

বলিস কিরে স্যাঙাৎ? ব'লে লোকটা চতুষ্পাটি দাঁত বার ক'রে হা হা ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌লো।

রাতটা যে কী কষ্টে কাট্‌লো, বলবার নয়। প্রদীপের কেবলি মনে হচ্ছিল, চরম ছুঃখের রাত্রির পরে সুখের প্রভাত আসে—প্রণববাবুর কাছে শুনেছে যে কথা।

তার মন যেন গান গেয়ে উঠ্‌ছিল—

ছুঃখের বেশে এসেছ ব'লে
তোমায় নাহি ডরিব হে।

ভোর তখনো হয়নি—রাত্রি শেষের প্রহর। হঠাৎ পাশের বাড়ীতে আলো জ্বলে উঠ্‌লো, ফিরেছে ওরা লক্ষ্ণৌ থেকে।

সিঁড়িতে লোকজনের আনাগোনার শব্দ, জিনিসপত্র এখানে ওখানে রাখার আওয়াজ।

ক্রমশঃ তিনতলায় প্রায় ওর ঘরের সাম্‌নাসাম্‌নি নারীকণ্ঠের কলশব্দ।

আকাশে তখনো শুকতারা জ্বল্‌ছে।

প্রদীপ ডাক্‌লো—বাবী!

শীলা বল্‌লে বুলাকে—কে যেন বাবীকে ডাক্‌লো। পাশের বাড়ীতে কেউ বাবী আছে নাকি? বাবী নাম কি এত সাধারণ হ'য়ে গেছে? বাবী ত জানি একজন।

আমি সেই বাবীকে ডাক্‌ছি। বল্‌লে প্রদীপ।

বারান্দায় মুখ বার ক'রে শীলা বল্‌লে—কে আপনি?

আমি প্রদীপ, বাবীকে ডেকে দিন্।

বাবী ত' এ বাড়ীতে থাকে না!

যেখানে থাকে খবর দিন্। বলুন প্রদীপ ডাকাতের হাতে পড়েছে।

ডাকাত? ওবাড়ীতে ডাকাত কোথায় এলো? ওটা ত' আলিমের বাড়ী। লোকটা অবশ্য খুব পাজী। কিন্তু ওখানে আপনি এলেন কি ক'রে?

অত কথা বল্‌বার আমার সময় নেই। যে পাহারা দিচ্ছে, এখনো তার নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ জেগে উঠ্‌লে মুস্কিল। আপনি শুধু বাবীকে খবর দিন্। সেই আমায় বাঁচাতে পারে। ফোন্ আছে ত' আপনাদের বাড়ীতে?

তা আছে। কিন্তু এই ভোররাত্রে ফোনে বাবীকে ডাক্‌ব? আলো হ'তে দিন্

আলো হ'তে দিলে দেরী হ'য়ে যাবে।

আমার বাবাকে জানাই?

কোনো লাভ নেই।

বাবী ছেলেমানুষ, পরের ঘরের বৌ।

হোক্ গে, সেই পারবে শুধু আমাকে বাঁচাতে আর কেউ না। তাকেই খবর দিন্।

কি বল্‌ব?

বলুন, তোমার প্রদীপ বিপদে পড়েছে।

এই বল্‌লেই হবে ?

এই বল্‌লেই হবে।

কত যে ছেলেমানুষ প্রদীপ এই কথাতেই বোঝা গেল। পৃথিবীতে প্রদীপরা বিপদে পড়ে, কিন্তু বাবীরা সব সময়ে এসে পড়তে পারে না, যতই কেন না অনেক দিনের ভাব থাক্‌! বাবীরা ত' প্রদীপদের মতন স্বাধীন নয়। তা হোক্‌ কিন্তু বিপদে প'ড়ে প্রদীপের বাবী ছাড়া আর কোনো কথা মনে পড়লো না।

শীলারা অত ছেলেমানুষ নয়। তাদের বাবাকে সব কথা বল্‌লে আগে। তিনি লোকজন নিয়ে গিয়ে দেখ্‌লেন, সদর দরজায় তালা আঁটা। অথচ তিনতলায় লোক রয়েছে। আলিমের বাড়ী জাল জুয়াচুরীর জন্যে কুখ্যাত। এটা আগে শরৎ সরকারের ছিল। সে তার বড় ভাজকে ঠকিয়ে এটি আত্মসাৎ করে। তারপরে বিপদে প'ড়ে বেচে দেয় আলিমকে, হিন্দুমুসলমান মাড়োয়ারী বারেন্দ্র রাঢ়ী কয়েকটি বদ্‌মাইস্‌ লোক মাঝে মাঝে এখানে এসে নানারকম ব্যবসা চালায়—জাল নোট থেকে জাল দলিল তৈরী পর্য্যন্ত। দু একটা দল ধরা পড়েছে। আজ আবার কী নতুন কুকীর্ত্তি করছে, শিবকালীবাবু ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

শীলা বুলাকে বল্‌লেন, পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

শীলা বল্‌লে—কিন্তু বাবা, ছেলেটি বলেছে বাবীকে খবর দিতে। তাই দাও না। বাবীর স্বামীও ত পুলিশের লোক। তিনি এসে যা হয় করবেন!

সত্যি কথা। শিবকালীবাবুর মনে হ'ল—মন্দ বলেনি। বল্‌লেন—করো তোমরা ফোন। আর দেরী কোরোনা। রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এলো।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো, তবু বাবীর ঘুম ভাঙেনা।

এ পাশ ওপাশ ক'রে স্বপ্নের জের আরো খানিকটা টান্‌তে চায়।

ঘুমের ঘোরে একটি সুন্দর স্বপ্নের মধ্যে আজ সে প্রদীকে দেখেছে, চঞ্চল ক্লান্ত প্রদীপ। কী যেন তাকে বল্‌তে চায়, অথচ কথা যেন তার বন্ধ হ'য়ে গেছে। একটা চমৎকার ফুলবাগানের পাখীর গানের মধ্যে যে স্বপ্ন আরম্ভ, তার এমন পরিণতি কেন?

চম্‌কে উঠে পাশ ফিরে সে আর একটা ভালো স্বপ্ন দেখবার আয়োজন করছে, সেই ভালো স্বপ্নটা কিছুতেই পরিষ্কার হ'য়ে ফুটছে না। বাধার পর বাধা। স্বপ্নে আবার এলো প্রদীপ, একটা নদীর ওপার থেকে তাকে ডাকছে, কিছুতেই যাবার উপায় নেই। ঝড়ে নদী ফুলে উঠেছে, বাবীর মন দুলে উঠেছে, কিন্তু প্রদীপ তবু চেঁচিয়ে চলেছে।

ঘরের কোনে ফোন্‌ বেজে উঠ্‌লো।

তপনের খাটের কাছে। সেই উঠে আগে ধরলো। বল্‌লে কে?

উত্তর এলো—আমি শীলা, বাবীকে চাই।

কী ব্যাপার?

ব্যাপার তাকে বল্‌ব।

ও, দিচ্ছি। বাবীকে ডাক দিলে তপন।

ফোন ধ'রে বাবী শুন্‌লে—আমি শীলা, বাবী শোন্‌, আমাদের পাশের বাড়ীতে সেই নোটোরিয়াস্‌ বাড়ীতে প্রদীপ ব'লে একটি ছেলে বন্দী হ'য়ে আছে—

বাধা দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো বাবী—প্রদীপ?

হ্যাঁ, সে বল্‌ছে তোকে বল্‌তে—তোমার প্রদীপ বিপদে পড়েছে। কে রে তোর? ভাই টাই কেউ বুঝি?

ভাইয়ের চেয়েও বেশী। আমার অনেক কালের বন্ধু। আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি।

তখনি তপনকে ডেকে বল্‌লে, প্রদীপ বিপদে পড়েছে, সেই প্রদীপ, যার কথা তোমায় অনেক বলেছি। বন্দী আছে শীলাদের পাশের বাড়ী। উদ্ধার করো তাকে। গাড়ী বার করো।

তপনের বয়স এবং অভিজ্ঞতা দুই-ই হয়েছে। সে অত ভাবপ্রবণ নয়। বল্‌লে—দাঁড়াও, ব্যস্ত হয়োনা। থানায় ফোন ক'রে সব ব্যবস্থা করছি, ব'লে দিচ্ছি বাড়ীটার ওপর নজর রাখ্‌তে। যেন নিয়ে স'রে না পড়ে। আমি একটু বেলায় গেলেই হবে, চা-টা খেয়ে।

বাবী ওকে কিছুতেই বুঝিয়ে পারলো না, এক্ষনি যেতে হবে, নইলে অঘটন ঘ'টে যেতে পারে।

তপন আগে থানায় ফোন করলো। আকাশে তখন কালো মেঘ উঠেছে, এলো চারিধার অন্ধকার হয়ে।

সকালবেলার সূর্য্য দেখা গেল না।

ঝড় আর জলে এলাহাবাদ শহর স্নান করতে লাগ্‌লো।

ওদের মোটর যখন জলে ঝাপ্‌সা যমুনাতীরের রাস্তা ধ'রে কালো অন্ধকারের মধ্যে সেই বাড়ীটার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো, তখন থানা থেকে সিপাহী এসে গেছে, কিন্তু সদর হাঁ-হাঁ করছে খোলা, তিনতলা অবধি সব শূন্য।

বাবীর চোখে তখন আগুন জ্বল্‌ছে।

বল্‌লে, আমি বলেছিলাম আর একটু তাড়া করতে না? দেরীর জন্যেই সব পণ্ড হ'য়ে গেল।

তপনও অপ্রস্তুত।

বল্‌লে—এলাহাবাদ থেকে বেরিয়ে যাবার অনেক রাস্তা আছে। সব রাস্তায় পাহারা

রসাচ্ছি। যদি শহর থেকে এখনো বেরিয়ে গিয়ে না থাকে তাহলে ধরা পড়বে। আর যদি আর কোনো বাড়ীতে গিয়ে ঢোকে, তাহ'লেই ঝঞ্ঝাট বাড়াবে।

ফোন হাতে নিয়ে ব্যবস্থা করতে দেরী হল না।

বাবী আর শীলা গল্প করতে বস্‌লো, একটুখানির জন্যে এতটা কাণ্ড হ'য়ে গেল।

তখনো দিগন্ত অন্ধকার ক'রে বৃষ্টি ঝ'রে পড়ছে, তখনো আমের বনে জামের বনে ঝড়ের মাতামাতি।

থানা থেকে খবর পেয়ে প্রণব গিয়ে ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছে রেলপুলিশের সঙ্গে।

জলপুলিশ নদীর ধারে পাহারা দিচ্ছে।

সেই দুর্য্যোগের দিনে বাবীর মনের দুর্য্যোগের তুলনা হয় না, তুলনা হয় না বিন্ধ্যাচলের শূন্যপুরীতে বিশ্বেশ্বরের চঞ্চলতার। মানুষের জীবনে এক একটা দিন এমন বিশ্রী আসে, যে সেদিনের কাহিনী সারা জন্মে ভোলা যায় না, কিন্তু আরামকেদারায় ব'সে ছাপার অক্ষরে যারা সে ইতিহাস পাঠ করে, তারা ভাবে রোমাঞ্চটা আরো কেন ভয়ঙ্কর হল না!

কলমের একটি খোঁচায় এলাহাবাদ থেকে আবুপাহাড় চ'লে যাওয়া যায়, কোথায় গঙ্গাযমুনাসঙ্গম আর কোথায় রাজপুতানার আরাবল্লী পর্ব্বতমালা।

কিন্তু যে বিধাতার লেখনীতে পৃথিবীর উপন্যাস তৈরী হয়, তিনি আরো অসাধ্যসাধন করতে পারেন মুহূর্ত্তের মধ্যে, উৎসবমুখরিত পম্পেয়াইয়ের ধ্বংসস্তূপে সে কথা গাঁথা আছে।

আমার এ ছোট কাহিনীর আর বেশী দূর নেই। যারা উৎসুক হ'য়ে উঠেছ, যারা শ্রান্ত হয়ে উঠেছ, তাদের আর অপেক্ষা করতে হবেনা। অভিসপ্তবংশের যবনিকা নেমে এলো ব'লে।

বৃষ্টি তখন একটু ধরেছে, আকাশ ঈষৎ পরিষ্কার হয়ে আস্‌ছে, একটা রূপালী উজ্জ্বল আলো জলেস্থলে ঝলমল ক'রে উঠেছে।

বাবী ব'সেছিলো উৎকর্ণ হ'য়ে শীলা বুলাকে দুইপাশে নিয়ে।

গ্রামের সঙ্গিনী হাসু, রানু, বিভা, অর্পণা, ইন্দিরা, গৌরী, অঞ্জলি, বাসন্তী; মায়া, মঞ্জুশ্রী, নমিতা, গীতার কথা ভেবে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করছে, কোথায় তারা কতদূরে! কিন্তু সকলকে ছাপিয়ে প্রদীপ।

খবর এলো—বেনারস যাবার রাস্তায় লাল পোল থেকে নাববার মুখে সন্দেহবশতঃ একটা মোটর আট্‌কানো হ'য়েছিল, তারা স'রে পড়বার চেষ্টা করতে পুলিশ গুলি ছোঁড়ে, মারা গেছে দাগী গুণ্ডা চিরঞ্জীলাল, জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেছে সঙ্গের ছেলেটি মাথায় চোট্ লেগে। এতক্ষণ আছে কি নেই। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে ভীষণ।

পড়ি-কি-মরি করে বাবী এসে বস্‌লো গাড়ীতে, তপন ষ্টার্ট দিলে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

মহাচীনের ছেলেমেয়ে

রঞ্জিতভাই

আমার চীন-সুহৃদ বন্ধু পারুলদিদি:

১৯৩৭ সালের এক গভীর অন্ধকার রাত।

সেই নিশুতি রাতের আবছায়ায় সারি সারি ছায়ামূর্তি মি-কি'র দিকে এগিয়ে চলেচে। পাহাড়ে পথ, প্রতি পদেই মৃত্যুর সম্ভাবনা! আবছা অন্ধকারে চীনা গরিলা দল বুকে হেঁটে চলেচে—কালো আকাশের বুকে জাপ বিমানের হানা, চারদিকে জোরালো ফ্লাশ-লাইটের আলো, মাঝে মাঝে দুয়েকটা মেসিন গানের কাতরানি ভেসে আসে।

এম্নি সময় কাছেই একটা বোমা ফাটলো—বুম্—ম্—ম্—!

মিশেয়া চাপা গলায় বললে: আর সময় নেই—শীগ্‌গির ছোটো—সাবধান!

ছায়ামূর্তিরা এগিয়ে চললো। সংখ্যায় এরা মাত্র বিশ জন। আমার মনে পড়লো হারানো দিনের কথা, রূপকথা দিয়ে ঘেরা সেসব অপরূপ কাহিনী···আজ কতোদিন পরে আবার গ্রামে ফিরে এলাম, ক—তোদিন? অনেকদিনের পুরানো স্মৃতি আমার মনের আড়ালে উঁকি মারলো—আমার মা বাবা ভাই বোনেদের মধুর স্মৃতি····

হঠাৎ লিয়াং সো আর্তনাদ কোরে উঠলো: ওকি?

সবাই চমকে চেয়ে দেখলাম সামনের গ্রামখানা দাউ দাউ কোরে জলচে। দূরে কাদের পৈশাচিক হাসি শোনা গেলো: হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—! আতংকে গ্রামের লোকেরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো, কোলের শিশুকে নিয়ে মা ছুটলো (আমার মা কোথায়? বোন লিজা?) কিন্তু সংগে সংগেই জাপ-মেসিনগানের আর্তনাদ শোনা গেলো দূরে: শট্—শট্—শট্‌শট্—শট্—!

মিশেয়া দাঁতে দাঁত চেপে বললে: প্রতিশোধ চাই! এসো—

তারপর? সেই রাত্রেই আমাদের গেরিলা-দল জাপদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সবাইকে খুন করলে। মিশেয়া জাপ-সেনানায়কের বুকে তার ধারালো বেঅনেট গেঁথে টান মেরে ফেলে দিলো সেই রক্তাক্ত দেহখানা আগুনের মধ্যে—।

—জয় মহাচীনের জয়! সবাই চীৎকার কোরে উঠলো।

কিন্তু আমার মা? বোন লিজা? তাদের আর পাওয়া গেলো না ভাই। অনেক কষ্টে আমার মায়ের একখানা রক্তাক্ত হাত, লিজার ছেঁড়া স্কার্টখানা পেলাম সেদিন। মনে মনে তাই প্রতিজ্ঞা করলাম: এ নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিশোধ চাই!

এই হোলো আমাদের সাত বছরের কাহিনী—দুরন্ত ও নির্ভীক!

* * * * *

১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে—

মহাচীনের আকাশে আকাশে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়লো। পূর্বাঞ্চলের বন্দরে বন্দরে সহরে নগরে জাপ-বিমানের হানা পড়লো······হাজার হাজার অসহায় শিশু কিশোর ধ্বংসপুরীর নীচে গোঙিয়ে উঠলো মৃত্যুর

হানায়—! বাকী সব পালাতে স্বরু করলে পূব থেকে পশ্চিমে। সমুদ্রের ধারে যেসব সহর ও বন্দর ছিলো, সেখানকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মহাচীনের পশ্চিমপ্রান্তে ছুটে এলো। কত গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে··· বন জংগল ও উত্তুংগ পাহাড় অতিক্রম কোরে···কতো মাঠ-বন-নদী প্রান্তর পার হয়ে তারা ফিরে এলো স্বাধীন চীনার বুকে,—শুধু শত্রুর হাত থেকে মুক্তির জন্য! তাদের সাহায্যের জন্য 'নবীন চীনের' গার্ল স্কাউটেরা এগিয়ে এলো। দলে দলে এম্নি হাজার হাজার কিশোর চাংশা থেকে ইউনানের রাজধানী কুন্‌মিঙে বর্মা রোড দিয়ে ৮০০ মাইলের পথ ১২৫ দিনের মধ্যে এখানে এসে জড়ো হোলো। এদের মধ্যে সবাই ধনীলোকের সন্তান, যারা ছেলেবেলায় পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় মানুষ। আর যারা চিরকাল সুখশয্যায় সোনালী স্বপ্ন দেখে এসেচে!

কিন্তু দেশের ডাক যেদিন এলো, সমস্ত বিলাসিতা ও আরামকে বিসর্জন দিয়ে তারা সৈনিক হয়ে যুদ্ধে যোগদান করলে। আজ আর সেসব কিশোর দল সাংহাই ও হংকং এ ফিরে যেতে পারবে না, পিকিঙে আধুনিক হাল্‌ফ্যাসানের আকাশ-ছোঁয়া বাড়ীতে ঘুম দিতে ও পারবে না—সেকথা তারা জানে। তাই আজ মাঠে-ঘাটে গাছের তলায় 'ক্যাম্প' ফেলে সাধারণ খাদ্যের ওপর জীবনধারণ কোরে দিন কাটায়! নিতান্ত প্রয়োজন মতো জামাকাপড় পরে, খড়ের চালের ছোট ছোট কুঁড়েঘরে বাস করে। তাদের কাছে কোনোদিন নালিশ অথবা অভিমানের কথা শুনতে পাবে না। মহাচীনের ছেলেমেয়েরা আজ আরাম ও বিলাসিতা ভুলে গিয়েচে—প্রতিটী ছেলেমেয়ে 'ক্যাম্পের' কাঠের-তৈরী কঠিন বিছানায় ঘুম দেয়।

অন্যসব দেশের ইস্কুলের মতো মহাচীনে কোনোরকম ইস্কুল-বাড়ী নেই। কাজেই নানান দেশের ছেলেমেয়েরা গ্রামে সহরে ছড়িয়ে পড়ে—যেখানে তারা ভাঙ্গা মন্দির কি পুরানো গ্রাম্য ইস্কুল পায়—সেখানেই ইস্কুল বসায়। অন্যান্য সভ্য দেশে যাতায়াতের অনেক সুবিধা, অনেক রকম গাড়ী ঘোড়া মোটর বাস আছে। কিন্তু মহাচীনের এই বন-পাহাড়-প্রান্তর-সর্বস্ব বিশাল উপত্যকার অধিবাসীদের ছেলেমেয়েদের দু'তিন মাইলের পথ পায়ে হেঁটেই চলে আসতে হয়, আবার সেই সুদীর্ঘ দুর্গম পথ ভেঙ্গে সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরে আসতে হয়। সুতরাং ভোরবেলাকার সোনালী সূর্য পাহাড়ের ওপরে উঁকি মারবার আগেই তাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়। বেলার শেষে ইস্কুলের ছুটী। অবশ্য তাদের সংগে দুপুর বেলার খাবার থাকে: বাড়ীর ভাই বোনেরা অতি যত্ন কোরে শুকনো রুটী, দুটী ভাত আর মাংসের হাড় ভরা ঝোল দিয়ে দেয়—সবাই মিলে সেসব খাবার খেতে ওদের খুব মজা।

কিন্তু শিক্ষার এম্নি আগ্রহ ও প্রসার মহাচীনে আগে ছিলো না। কেমন কোরে হোলো তাই বলি শোনো:

অনেক বছর আগের কথা। ১৯০৫ সাল!

সেসময় মহাচীনে প্রথম শিক্ষা-আন্দোলন স্বরু হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার ফুল্‌কী তখন সবেমাত্র এদেশের বুকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে—ক্রীশ্চান মিশনারীর দল কিশোর মনের অন্তর বাহির-কে টেনে অনুপ্রেরণায় জাগিয়ে তুলেচে। সমস্ত দেশটা যেন ঘুমন্তপুরী থেকে জেগে উঠলো—ঘরছাড়া দিকহারা কিশোর দল অন্তরে অন্তরে নিজের দেশকে অনুভব করলে—দেশকে চিনলো, দেশকে ভালোবাসলো—আনন্দ ও সেবা হোলো তাদের আদর্শ···জাতি পেলো নবীন হাতের পরশ। কিন্তু সেদিন তারা মিশনারীদের চিনতে পারেনি—।

এম্নিভাবে বিশ বছর কাটলো······

আরো কয়েক বছর পরে। মে মাস, ১৯২৯ সাল।

গত মহাসমরের অনুপ্রেরণা সঞ্চয় কোরে মহাচীনের আকাশ থম্‌থম্ করচে।

শোনা গেলো: পিকিঙে মহাচীনের কিশোর-দলের একটী জনসভা হবে। হাজার হাজার চীনা ছেলেমেয়ে মাঠে এসে জমায়েৎ হোলো। চীনার দেশকর্তারা দেখলেন: ভারি মুস্‌কিল্! এ যে রাজদ্রোহিতা! (আপনার দেশকে ভালোবাসা কি রাজদ্রোহিতা, পারুল?) যাক্—। সংগে সংগে চলে এলো সশস্ত্র চীনা পুলিশ বাহিনী। কিশোর জনসভার ওপর গুলী চললো নির্মমভাবে···শত শত কিশোর ছেলেমেয়েদের বুকে গুলী বিঁধলো! তাদের তাজা রক্তে চীনার গেরুয়া মাটী রাঙা হয়ে উঠলো!

ইতিমধ্যে সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে 'কুয়োমিণ্টাং-দল' গড়ে উঠেচে। সান ইয়াৎ সেনই নব্যচীনের জন্মদাতা। ১৯২৩ সালে সান ইয়াৎ সেনের প্রচেষ্টায় ক্যাণ্টন সহরে প্রথম জাতীয় গভর্মেণ্ট গড়ে ওঠে। তারপর সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর মার্শাল চিয়াং কাইশেক নিজের প্রভাব বিস্তার করতে লাগলেন। তখন মহাচীনে গৃহ বিবাদ চলেচে সাম্যবাদীদের সংগে। ঠিক এম্নিসময় ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া ও জিহোল গ্রাস করলে।

এই শোনামাত্রই চারদিকে বিদ্রোহের গুঞ্জন শোনা গেলো—

এই মহাসুযোগ পেয়ে চিয়াং কাইশেক কুয়োমিণ্টাং-দলের (kuomintang yonth corps) নেতারূপে সমগ্র চীনার ছাত্র সমাজকে ক্ষেপিয়ে তুললেন। দেশের কিশোর বীরদের বুকে আগুন জ্বলে উঠলো! সবাই তখন গৃহবিবাদ ভুলে গিয়ে বাইরের শত্রুকে ধ্বংস করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো। নান্‌কিঙে নোতুন গভর্মেণ্ট সৃষ্টি হোলো—আর দেশের নেতা হোলেন মার্শাল চিয়াং কাইশেক! তারপর থেকেই মহাচীনের শিক্ষা সংগঠন অগ্রগতির পথে ছুটলো। সে অভিযানের জয় হোলো মাঞ্চুরিয়া দুর্ঘটনার পর।

গ্রীষ্মকাল, ১৯৩৫ সাল।

উত্তর চীনার সহরে সহরে ভীষণ আতংক সৃষ্টি হয়েচে···জাপানীরা নাকি মহাচীন দখল করতে আসচে! সেই শুনে কুয়োমিণ্টাং দল প্রতিবাদ জানালো: চীনার কোনো অংশেই বিপ্লবীদের স্থান দেওয়া হবে না। চারদিকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো···সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পেকিঙে এসে এক জনসভার আয়োজন করতে লাগলো। সে খবর পেয়েই চীনা পুলিশ বাহিনী পেকিঙ সহরের ফটক বন্ধ কোরে দিয়ে হুকুম দিলো যে, দেশের কোনো ছাত্রছাত্রীকে এই সহরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

ছাত্রদল সমস্বরে চীৎকার কোরে উঠলো—আমরা জনসভা করবোই!

পুলিশ বাহিনী উত্তর দিলো: তাহলে গুলী চালাব।

—চালাও! চালাও! ছাত্রদল এবার ক্ষেপে উঠলো—মৃত্যুকে আমরা ভয় করিনে—ভাঙ্গো, ভাঙ্গো—ফটক ভেঙ্গে ফেলো···১৯২৯ সালের ঘটনা তারা ভোলেনি।

এমন সময় এক ভারি মজার ব্যাপার ঘটলো। সেই ফটকের ছোট্ট একটী ছিদ্র দিয়ে একজন লিকলিকে চীনা মেয়ে পুলিশ বাহিনীর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো···ভেতর থেকে ফটক খুলে দিলো, কিন্তু সে নিজে বাঁচলো না। জনসভা শেষ হোলো, কিশোর দলের জয় হোলো!

একটা সমগ্র দেশ, সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ এম্নিভাবেই জাগে ভাই।

১৯২৭ সালে সান ইয়াৎ সেন ক্যাণ্টন সহরে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গড়ে তোলার পর চীন সরকার শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন। প্রথম সম্মেলন হয় ১৯২৮ সালে। নব্যচীনের জন্মদাতা সান ইয়াৎ সেনের বাণী প্রচার করবার জন্য কুয়োমিণ্টাং দল সেদিন এই আদর্শ গ্রহণ করে: "San Min Chu I"—সাম্য, জাতীয়তা ও সামাজিক বিচার।

এই আদর্শ অনুযায়ী ১৯২৯ সালে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রচার করেন যে: 'মহাচীনের শিক্ষা সংগঠন নির্ভর করবে জনসাধারণের তিনটী নীতির ওপর (three principles of the people—জাতীয়তা সাম্য ও সামাজিক বিচার) যার প্রভাবে জাতীয় জীবন ও সমাজ নোতুন রূপ নেবে, জীবনযাত্রা নোতুন পথে ছুটবে, জাতি বেঁচে থাকবে যুগ যুগান্ত ধরে—দেশ পাবে অবাধ স্বাধীনতা, জনসাধারণ পাবে রাজনৈতিক দাবী—শিক্ষাসমস্যা দূর হবে আর বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমৈত্রী স্থাপন হবে।'

দ্বিতীয় সম্মেলন হয় ১৯৩০ সালে। এই সম্মেলনে প্রাথমিক ও জনশিক্ষার আন্দোলন হয়। তারপর সেই শিক্ষা সম্মেলনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক হয় যে:

ছয় থেকে বারো বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। এর মধ্যে দুই রকম শ্রেণী: নিম্ন শ্রেণীতে চার বছর পড়তে হবে, আর উচ্চ শ্রেণীতে ছয় বছর। আবার বারো বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ কোরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও অন্য বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে। প্রাথমিক শিক্ষার পর ছয় বছর মাধ্যমিক শিক্ষা। এর মধ্যেও দুই রকম শ্রেণী—উচ্চ ও নিম্ন। তাছাড়া বৃত্তিশিক্ষালয় নর্মাল বিদ্যালয় ও শ্রমজীবি বিদ্যালয় থাকবে। তারপর কিণ্ডার গার্টেন ট্রেনিং ইস্কুল, বিশেষ নর্মাল ইস্কুল, বৃত্তিশিক্ষা কলেজ ও সবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে চার পাঁচ বছর পড়তে হবে এবং শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা হবে। তারপর পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগ। অন্যদিকে আবার বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা। বারো থেকে পঞ্চাশ বছরের নানাশ্রেণীর নরনারীর জন্য গণবিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাই—সেখানে তাদের সুযোগ ও সুবিধামতো জনগণ শিক্ষালাভ করবে। প্রাথমিক শিক্ষার আগে কিণ্ডার গার্টেন ও নার্সারি ইস্কুল খোলা হবে।

মোটামুটি এই হোলো মহাচীনের শিক্ষাব্যবস্থার কথা—

মহাচীনের জনসংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে হয়ত সবচেয়ে বেশী। প্রায় ৪৫ কোটি ৫০ লক্ষ। যুদ্ধের আগে মহাচীনের শিক্ষা সংগঠন সমিতি প্রত্যেক প্রাথমিক, উচ্চবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার নিলেন। কেননা সে সব ইস্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের বাপ-মায়েরা উত্তর চীনার অধিকৃত অঞ্চলে বন্দী ছিলেন। সেজন্য আমাদের গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ছাত্রকে জামাকাপড়, খাবার, আশ্রয় ও সবরকম শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েচে। অন্য সব দেশে শিক্ষার জন্য যতো লক্ষ পাউণ্ড ডলার—মার্ক খরচ হয়—আমাদের দেশে তার চেয়ে অনেক কম। কেননা সব শিক্ষাই যে অবৈতনিক!

আজ নবীন চীনার ছেলেমেয়েরা মহাচীন শিক্ষা সংগঠন প্রণালীর ক্রমোন্নতি ও বিশ্বমানবতার স্বীকৃতিতে আমাদের অতীত অন্ধকারের দেশ ও সমাজকে ভেঙ্গে চুরে এক অখণ্ড নূতন চীনজাতি গড়ে তুলেচে—সর্বপ্রকার প্রাদেশিকতা ও দলগত সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন সেই মনোভাব চীনার জাতীয়তার জন্য, দেশের জন্য—ধর্ম ও সংস্কারের বেড়া ভেঙ্গে এক হয়ে মিশে গেলো! তাই আজ আমাদের শ্লোগান হোলো: The state comes first: the nation is above all! সবার আগে দেশ, সবার উর্দ্ধে জাতি! কাজেই দেশের কৃষি ও শিল্প সমাজের বদলানো—শিক্ষার নোতুন আদর্শে মহাচীন জাগলো। আজ প্রায় ৪৫ কোটি চীনা নরনারী জাপানীদের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করচে—কিন্তু সেজন্য আমাদের ছাত্রসমাজ কতো কষ্ট সহ্য করেচে জানো? খোলা মাঠের ধারে ছাউনি ফেলে একই ঘরে হয়ত তিন-চার পরিবার বাস করে, সেখানেই নিয়মিত ইস্কুল বসে, খেলাধূলা ও গান হয়। তাদের সবাই এক একজন গেরিলা সৈনিক! আমাদের দেশের শিক্ষার আমূল পরিবর্তনই সেজন্য দায়ী বলতে পারো—যে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এক নবতন সমাজ গড়ে উঠতে পারে, যে শিক্ষার ফলে একটা সমগ্র জাতি ও দেশ জেগে উঠতে পারে—নীরস ও প্রাণবান হতে পারে!

মহাচীনে যন্ত্রশিল্পের প্রচলন হওয়াতে দেশের প্রচুর আর্থিক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সেজন্যও করতে হয়েছিলো আন্দোলন। সে আন্দোলনের ঢেউ তুলেছিলো ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা—ইস্কুলের পুঁথিবিদ্যাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য কোরে তারা তৈরী করলে কারখানা ও নানান কেন্দ্র। তাদের একমাত্র শ্লোগান হোলো: Turn every school into a factory and every student into a labourer! প্রত্যেক ইস্কুল হোক্ কারখানা আর প্রতিটি ছাত্র হোক্ এক একজন শ্রমিক!

আজ সেই শক্তির ফলেই সারা চীন জুড়ে জনগণের এক বিরাট প্রতিরোধ প্রতিভার মহাপ্রাচীর গড়ে উঠেছে—এ প্রাচীর মহাচীনের সুবিখ্যাত মহাপ্রাচীরের চেয়েও শক্তিমান। সর্বদেশের জনসাধারণ এই গণ-আন্দোলনে যোগ দিয়েচে, আর সব জাতির কাজের মধ্যেও সেই পৃথিবী-জোড়া গণ-ঐক্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এই জনসমুদ্রের জোয়ার রুখবে কে বলো?

অনেক দিন আগের কথা—

ফিরে চলো মহাচীনের শিক্ষা সংগঠনের ও কিশোর আন্দোলনের গোড়ার দিকে,—সোভিয়েট রাশিয়ার পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মতো আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনা কী ভাবে আন্দোলন হয়েছিলো, কেমন কোরে প্রতিটী ছেলেমেয়ে দেশমাতৃকার আদর্শ সন্তান হয়ে উঠেচে—কেমন কোরে মহাচীনের পঞ্চম বার্ষিকী জাতীয় কিশোর শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রতিটী চীনা ছাত্র সৈনিক নির্ভীকভাবে বুক ফুলিয়ে বলেছে: আমার দেশ! আমি তোমায় ভালোবাসি!—কীভাবে গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা ও তাদের বাপমায়েরা লিখতে পড়তে শিখেচে, মানুষ হয়েছে—সে সব কাহিনী আজ জেনে নাও।

জাতীয় কিশোর শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম বছরে প্রতি জেলায় একটী কোরে শিক্ষাকেন্দ্র, আর জনবহুল গ্রামাঞ্চলে একটী কোরে নাগরিক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হবে। সুতরাং চতুর্থ বছরের মাঝামাঝি মহাচীনের (ছয় থেকে পনেরো বছরের) ছেলেমেয়েরা, এবং শতকরা ৩০ জন (পনেরো থেকে চল্লিশ বছরের) অশিক্ষিত গ্রামের চাষী ও মজুর ইস্কুলে ইস্কুলে লিখতে পড়তে শিখতে পারবে। অবিশ্যি এর আগে যে একটা বিশ বছরের পরিকল্পনা করা হয়, সে-পরিকল্পনা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বয়স ছয় থেকে দশ বছর করা হয়। ১৯৩৫ সাল থেকে কাজ সুরু হয়েচে—কাজেই আশা করা হায় ১৯৫৫ সালের মধ্যেই মহাচীনের সমগ্র জনসাধারণ শিক্ষিত হয়ে উঠবে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পরিকল্পনার মেয়াদ ফুরোলে আবার নোতুন কাজ সুরু হয়। অথচ এই জনশিক্ষা-আন্দোলন কেমন কোরে হোলো জানো, পারুল?

শিক্ষা সংগঠনের নিয়ম মাফিক প্রতিটী (পনেরো থেকে আঠারো বছরের) ছেলেমেয়েদের তিন মাস কোরে সামরিক শিক্ষা নিতে হয়। এই সামরিক শিক্ষার সময় নির্বাচন করে ছেলেমেয়েরাই। কিন্তু যতদিন তার সামরিক শিক্ষা শেষ না হবে, ততদিন তাকে কোনোরকম উপাধি দেওয়া হয় না। প্রথম ক্লাশ সুরু হয় ভোর চারটে, আর শেষ হয় ভোর সাতটায়। তারপর ব্যায়ামাগারে শরীর চর্চা, মাঠে মাঠে ছুটোছুটী করা, রেসিং, সাঁতার, বাইচ্ খেলা, এবং পাহাড়-চড়া। প্রত্যেকের সংগে থাকে রাইফেল আর মেসিনগান। পথের ধারে কি কোনো পার্কে 'ক্যাম্প্' ফেলে শিক্ষকেরা যুদ্ধনীতি সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। তারপর গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বিকেলবেলা সেখানকার ছেলেমেয়েদের সংগে হাসি ঠাট্টা গল্পগুজব চলে। এম্নিভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ও দেশের অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরে সে সব দুরন্ত কিশোর বাহিনী জাতির ও দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলেছে—দেশকে দিয়েছে অগাধ ভালোবাসা!

আজ শুনলে অবাক হবে নিশ্চয় গত পাঁচ বছর আগেও সিন্‌কিয়াঙের ৪০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৯০ জন ছিলো অশিক্ষিত। কিন্তু আজ সেসব অঞ্চলের প্রত্যেকেই লিখতে পড়তে জানে। ১৯৩০ সালে চীনদেশের ৪২ কোটি লোকের মধ্যে শতকরা ৮০ জন ছিলো নিরক্ষর। তারা ক্ষেতের ধান কি ছোটোখাটো কুটীরশিল্প কোরে জীবন কাটাতো। তাদের দারিদ্র্যের তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও মিলবে না। কিন্তু তারাও একদিন শিক্ষিত হোলো। মানুষ হোলো!

মহাচীনের উত্তর প্রান্তে কুন্‌মিঙে এক বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ছোট ছোট ছবির মতো খড়ের চালের বাড়ী সব, সবুজ বাঁশ আর মাটি লেপা ছাত্রনিবাস ও ইস্কুল; ছাত্রেরা কাঠের তৈরী ঘরে ঘুমায়, সেইখানেই পড়াশোনা করে, আলাপ-আলোচনা করে। তারপর অবসর সময়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে প্রত্যেক বাড়ী থেকে পুরানো পেরেক কাঠ লোহার ভাঙ্গা টুকরো, ছেঁড়া কাগজ, কাঁচের ভাঙ্গা খেলনা পুতুল ইত্যাদি কারখানায় জমা কোরে আখে। সেইসব ইস্কুলে কনফুসীয়, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতের ছাত্র থাকে, অথচ কোনো ধর্মবিরোধ নেই! প্রতি সোমবারে ইস্কুলের কাজ হবার আগে ছাত্রেরা একজায়গায় জড়ো হয়ে জাতীয় সংগীত গায় ও সান ইয়াৎ সেনের "উইল" আবৃত্তি করে। সেই "উইলে" সান ইয়াৎ সেনের সুবিখ্যাত তিনটী নীতি আছে: সাম্য, জাতীয়তা ও সামাজিক বিচার। এম্নিভাবে প্রত্যেক ছাত্র সপ্তাহের এই একটি দিন রাষ্ট্র নেতাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

আজ মহাচীনের ১০ কোটি ছেলেমেয়ে বয়স্কাউট ও গার্ল গাইড্ চীন-জাপান যুদ্ধে সহায়তা করছে। প্রাথমিক ইস্কুলের হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা আধুনিক নিয়মে বয়স্কাউট ও গার্ল গাইড্-শিক্ষা পায়। তাদের শ্লোগান হোলো: কাজ চাই! আত্মপ্রকাশের পথ উন্মুক্ত চাই—আমাদের সেবা ও ভালোবাসা দিয়ে দেশকে বাঁচানো চাই! কাজেই আজ জাতীয় বয়স্কাউট সংঘের ১৫ হাজার ছেলেমেয়ে যুদ্ধের নানা বিভাগে দিন নেই রাত নেই অবিশ্রাম কাজ করছে—সংবাদ প্রচারে, ডাকঘরের কাজে, রপ্তানি ও আমদানীর ব্যাপারে, আশ্রিত শিশু কিশোর রক্ষার জন্য শিশু-সদনের কাজে, চিকিৎসা সাহায্যে হাসপাতালে ও সেবাকেন্দ্রে, প্রাথমিক চিকিৎসায়, এবং আরো অনেকরকম কাজে তারা আত্মনিয়োগ করেছে। আজ মহাচীনের এই সমাজ সভ্যতার অগ্রগতির মূলে আছে আমাদের দুরন্ত কিশোর দলের অসীম অনুপ্রেরণা, অগাধ উদ্যম কর্ম-সহিষ্ণুতা, গভীর দেশপ্রেম। দেশ আমাদের চায় যে! যে দেশে জন্মেছি সে দেশ আমার!

সেদিন ফুকিয়েঙে খবর এলো! নানকিঙের পশ্চিম প্রান্তে জাপানীদের এক গুপ্তবাহিনী লুকিয়ে আছে। রাত্রির অন্ধকারে আমরা কয়জন বেরিয়ে পড়লাম। কয়েক মাইল পথ—পাহাড়ের আড়ালে ওদের শিবির দেখতে পেলাম অনেক দূর থেকে—কালো মৃত্যুর মতো!······তারপর চললো যুদ্ধ। ওদের চলার পথের সামনে যে প্রকাণ্ড সেতুখানা ছিলো, ডিনামাইট দিয়ে তাকে উড়িয়ে দেওয়া হোলো। তারপর নদীর জলে ডুব দিয়ে অন্ধকারের আবছায়ায় আমরা এগিয়ে চললাম···ওদিক থেকে হঠাৎ জাপানী মেসিনগানের ঝাঁক উড়ে এলো—আমরা জলে ডুব দিলাম। সংগে সংগে মাথার ওপর জাপানী বোমারু বিমান ঘর্ঘর শব্দে ছুটে এলো···বোঁ-বোঁ-বোঁ—

বুম্! বুম্!—বুন্—ম্—ম্—! চারদিকে বোমা ফাটতে লাগলো অবিশ্রান্তভাবে।

মিনোয়া বললে: ডুব দাও!—ডুব দাও!

লিয়াং সো চেঁচিয়ে উঠলো—হাত বোমা ছোড়ো সামনে—

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে গোঙিয়ে উঠলো জলের মধ্যে—। মেসিনগানের গুলী ওর বুক ভেদ কোরে চলে গেছে! আমরা তাকে তীরে নিয়ে এলাম। মৃত্যুর আগে তার কথা আজো আমার মনে পড়ে—

······"আমরা চীনার কিশোর-দল। সমুদ্রের পারে পারে আমাদের স্বপ্ন-সওয়ার ছুটে চলে—আমরা দুরন্ত, আমরা নবীন কিশোর! আমার দেহের রক্ত কণিকার শেষ বিন্দুটী কোনোদিন ব্যর্থ হবে না···তোমরা এগিয়ে যাও চ্যাং—আমার কোটি কোটি ভাই বোন আজ বাঁচুক। স্বাধীনতার জয় হোক্—!"

মিনোয়া বললে: এর প্রতিশোধ আমরা একদিন নেবো লিয়াং। লিয়াং সেই শেষবারের মতো বললে—"হাঁ বন্ধু, প্রতিশোধ নেওয়া চাই! একদিন এই মহাচীনে আমি জন্মেছিলাম—এই মাটীতে, এই আকাশের নীচে। যাদের সংগে আমার দেখা হোলো না—তাদের আজ আপন কোরে ডেকে সেই অনাগত মানুষের ললাটে বন্ধুত্বের জয়টীকা এঁকে গেলাম। আমার ভাষা চীনা, আমার দেহে চীনা পোষাক, আমার দেশ মহাচীন। বিশ্বমানবের সংগে আমার আত্মা এক—তোমরা ভাই এগিয়ে যাও। আমরা যে হারানোদিনের বন্ধু—নোতুন কোরে আবার একদিন নোতুন দিনের ভোরবেলায় আমরা মিলবো—আবার আমি আসবো!—আসবো এই মহাচীনে!

বিদায়—বিদায়!"

বন্ধু

চ্যাং ম্যাং চু

জানেন তো—

অল্পবয়সে বীমা করিলে চাঁদা কম লাগে—নিয়মিত সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং পরিণত বয়সে এককালীন নগদ টাকা হাতে আসে। নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানেই জীবন বীমার ব্যবস্থা করা উচিত কেননা সেখানে বীমাকারীদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। বীমা করিবার পূর্ব্বে বাংলার সর্ব্বপুরাতন বীমা প্রতিষ্ঠান **হিন্দু মিউচুয়াল** লাইফ এসিয়োরেন্সএর কথা সর্ব্বাগ্রে মনে আসে, কেন না এই প্রতিষ্ঠান অর্দ্ধশতাব্দীর উপর বাংলার ঘরে ঘরে বাঙালীর গৃহে ও প্রবাসে অগণিত দাবীর মুদ্রা প্রদান করিয়াছে।

*** হিন্দু মিউচুয়াল হাউস ***

১৪, ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা।

> **আনন ঘোষালকে চেনো ?**
>
> সত্যিকারের ছদ্মবেশী ডিটেক্‌টিভ্, যাঁর সতর্ক দৃষ্টি পাহারা দেয় কলকাতা সহরে ও সহরতলীতে, বাংলার গ্রামে গ্রামে, তাঁরই নিজের অভিজ্ঞতার কয়েকটি বিচিত্র কাহিনী রংমশালে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এইটি তার দ্বিতীয় কাহিনী।

বিড্‌গেম্ব্‌লিঙ

আনন ঘোষাল

তোমাদের এবার একরকম অদ্ভুত খেলার একটা গল্প বলব। এই সর্ব্বনেশে খেলা খেলে ঠগীরা এবং অতি বড় শেয়ানা মানুষকেও সহজে ঠকিয়ে তাদের সর্ব্বস্বান্ত করে। এই সব ঠগীদের দল আজ শুধু সারা ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবীময়ই খেলা দিয়ে লোক ঠকায়। এই বিশেষ খেলাটার নাম বীচী খেলা, ইংরাজীতে একে বলে Bead Gambling; অবশ্য বীচী ছাড়া তাসের দ্বারাও এই খেলা খেলা চলে। তোমরা শুনে নিশ্চই গর্ব্ব অনুভব করবে না যে বাংলা দেশেই এই খেলার প্রথম উৎপত্তি হয়। খেলাটা আগাগোড়া বাঙালী জমিদারবংশধরদের মস্তিস্ক-প্রসূত। সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার পরও পূর্ব্ব চাল বজায় রাখবার জন্যে তারা এই খেলার প্রচলন করে' পয়সা উপায় করত। এখন অবশ্য খেলাটা পৃথিবীময় পেশাদারী ঠগীদের হাতে চলে গেছে। নীচের গল্পটা থেকে খেলাটার স্বরূপ তোমরা বুঝতে পারবে এবং সেই সঙ্গে তোমরাও এই সব ঠগীদের পরবর্ত্তীকালে সহজেই চিনে নিয়ে পূর্ব্বাহ্নেই সাবধান হবে। গল্পটী সত্য ঘটনা প্রসূত, কিন্তু নামগুলো বদলানো। বলি শোন—

ম্যাট্রিক পাশ করার পরই স্বপনকুমারের ইচ্ছা হল ব্যবসা করবার। ব্যবসা না শিখে ব্যবসা করতে যাওয়া পাগলামীর নামান্তর, কতলোকে কত রকমে তাকে নিরস্ত হতে বলে কিন্তু স্বপন তাদের কথায় কান দেয় না। সকলেই জানে ব্যবসা করতে গেলে তিনটী জিনিস চাই—সময়, সুবিধে ও পয়সা। স্বপনের সময়ও আছে, পয়সাও আছে, ছিল না শুধু সুবিধে, তাও স্বপনের কপালে বহুদিন পরে একটা সুবিধে জুটল।

সেদিন ছিল রবিবার, সকালের দিকে নিবিষ্ট মনে স্বপন ব্যবসা সম্বন্ধে একটা বই পড়ছিল, হঠাৎ বন্ধু রমেন ঘরে ঢুকে বইখানা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল—তুই হচ্ছিস একটা নিরেট, জানিস না কি ব্যবসা এমন একটা জিনিস যা বই পড়ে শেখা যায় না। শোন, একটা কাঠের ব্যাবসা করবি? দ্বীপেন চৌধুরী বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সম্প্রতি আলাপ হয়েছে, ভদ্রলোকের 'স্কিম'-গুলো ভারি চমৎকার। তাঁকে তোর এখানেই আসতে বলেছি। এই এলেন বলে।

তুই বন্ধুতে এমনি আলাপ চলছিল, কয়েকমিনিট পরে সেখানে হাজির হলেন দ্বীপেন চৌধুরী। দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ দেহ, চোখে মুখে তার প্রতিভার ছাপ, ভদ্রলোককে অভিবাদন করে' স্বপন জানাল—আপনার জন্যেই আমরা অপেক্ষা করছি। সব কথা রমেনের কাছে শুনলাম, তা ফাইনেন্স আমি ক রতে পারি। কিন্তু কাজকর্ম্ম যা তো আপনাকেই করতে হবে। শুনলাম দশ বছরের অভিজ্ঞতা আপনার।

দ্বীপেন চৌধুরী স্বপনের আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ নয়নে একবার দেখে নিয়ে আসন পরিগ্রহণ করে' স্বপনকে বললেন—দেখুন আমি বাঙ্গালী হলেও একটা জিনিস আমার মধ্যে নেই, যেটা ব্যবসায়ে বিশেষ প্রয়োজন। আপনাকে সেই কাজটার শুধু ভার নিতে হবে। অর্থাৎ কিনা, আমি ভাল লিখতে পারি না, আর পারি না ভাল বলতে। আমি পারি শুধু কাজ করতে, ষাঁড়ের মত সারাদিন খাটতে, যেটা কিনা সকল বাঙালীর আসে না।

স্বপন হেসে বললে, তা হলে বলুন আপনি আসলে বাঙালীই নন। আমি অবশ্য আগের কাজ তুটোয় ওস্তাদ। বলতেও পারি, লিখতেও পারি; পারি না শুধু কাজ করতে। বলা ও লেখার ভার আমিই নেব, যদি আপনি কাজের ভার নেন।

তা হলে ত কথাই নেই। দেখুন তাহলে আজকেই আপনাকে যেতে হয় আমার সঙ্গে। বদলাপুরের কুমার কোলকাতায় এসেছেন। অনবরত হুণ্ডি কেটে টাকা ওড়াচ্ছেন, মদ খাচ্ছেন আর বিষয় বিক্রী করছেন জলের দরে। শুনলাম বীরভূমে তাঁর শালবন আছে। সেটা তিনি পাঁচ হাজারে বিক্রী করবেন, চলুন আজই বায়না দিয়ে আসি। সম্পত্তিটার আসল দাম বিশ হাজার।

স্বপন ছিল বাপ মার একমাত্র ছেলে। পিতার মৃত্যুর পর সেই হয়েছে তাঁর বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। সিন্ধুক থেকে পাঁচ হাজারের একটা বাণ্ডিল বের করতে তার বেশী দেরী হল না। তা ছাড়া জঙ্গলটা সে নিজের নামেই কিনবে। একটা সম্পত্তিত বটে। এর মধ্যে চিন্তারও কিছু ছিল না। ভদ্রলোক হচ্ছেন বন্ধু রমেনের পরিচিত। তিনি যখন বলছেন জঙ্গলটার আসল দাম বিশ হাজার, তখন কি আর কথা আছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে স্বপন আগ-পাছ সকল ভাবনাই ভেবে নিল; তারপর বন্ধু রমেন ও দ্বীপেন বাবুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেই বোকা উড়নচুড়ে মাতাল জমিদারের বাড়ীর উদ্দেশে। রাস্তার মোড়েই ছিল একটা ট্যাক্সি। ট্যাক্সিখানায় সদলে উঠল, দ্বীপেন হুকুম করল—চালাও;—নং শোভাবাজার।

যান্ত্রিক যুগে পৃথিবীর ন্যায় কোলকাতাও ছোট হয়ে গেছে। কালিঘাট শ্যামবাজার আজিকার দিনে এপাড়া ওপাড়া। মিনিট পঁচিশের মধ্যেই ট্যাক্সিখানা এসে দাঁড়াল একটা থামওয়ালা পুরাণ বাড়ীর সামনে। বাড়ীটা পুরাণ হলেও আদব কায়দা বিহীন নয়; গেটের সামনেই 'মোছ'-ওয়ালা উর্দ্দিপরা দরোয়ান তখনও পাহারা দিচ্ছে। লোকজনের যাওয়া আসারও কামাই নেই।

বাড়ীটা এত পরিচিত যে তুরাগত ট্যাক্সি চালকের পক্ষেও সরাসরি বাড়ীর গেটে গাড়ী দাঁড় করাতে দেরী হয় নি। সসম্ভ্রমে গাড়ীর দরজটা খুলে দিয়ে ট্যাক্সিওয়ালা জানালে—আ-গিয়া সা'ব। এহি বদ্‌লদা বাবুলোককো কোঠি। বহুত সরিফ আদমি লোক। মেরা মুল্লুক মে ভি, ইন্‌কো জমিন্দারী হ্যায়।

স্বপন ভাবল, কত বড় জমিদাররে বাবা। বেহারেও এদের জমিদারী আছে? সসম্ভ্রমে তিন জনে এগিয়ে আসছিল, হঠাৎ হাঁ হাঁ করে দরোয়ানটা ছুটে এসে রুখে উঠে বলল—আরে আরে। এ কি মামুলি কোঠি আছে। যান কোথায় হাপনারা? আগে এত্তালা দেন ম্যানেজার বাবুকে খোবর ভেজি, তব্ ত—।

ইতিমধ্যে ট্যাক্সি ড্রাইভার, দরোয়ান, দ্বীপেন ও চৌধুরীর মধ্যে ইসারায় ও চোখে চোখে অনেক কথাই হয়ে গেল, কিন্তু তার একটা ইঙ্গিতও স্বপনের চোখে ধরা পড়ল না। ততক্ষণে সে দ্বীপেন চৌধুরীর একজন ভক্ত হয়ে পড়েছে। একবার বিশ্বাস জন্মালে সে বিশ্বাস সহজে যায় না। দ্বীপেনবাবুর ইসারা মত দরোয়ানের হাতে একটা টাকা দিতেই, দরোয়ান খাতির করে, তাদের একটা বৈঠকখানায় নিয়ে গেল শুধু তাই নয় দেওয়ান সাহেবকেও একটা এত্তালা পাঠিয়ে দিল।

ঘরটার এখানে ওখানে লাল নীল রঙের কলম ওয়ালা ঝাড়লণ্ঠনগুলো এই ইলেকট্রিকের যুগেও টাঙান ছিল। পুরাণ সোফাটার উপর বসে স্বপন অনেক কথাই ভাবছিল, হঠাৎ সেখানে হাজির হলেন, খোদ ম্যানেজার সাহেব। পরিধানে তাঁর পুরান যুগের চাপকান, মাথায় গোল টুপি। ঘরে ঢুকেই তিনি বলে উঠলেন—এই যে চৌধুরীমশাই। সেই শালবনটার জন্যে ত? আমার শতকরা ১০৲ টাকা কমিশন চাই। চুপি চুপি নেব,

আগেই বলে দিচ্ছি কিন্তু। উত্তরে চৌধুরীমশাই কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তা আর তাঁর বলা হল না। হঠাৎ এক রুগ্ন, শীর্ণ বৃদ্ধ তীব্রগতিতে ঘরে ঢুকল। তারপর দেওয়ানজীর পা দুটো জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলে চলল—বাবুকে আর উৎচ্ছন্নে দেবেন না চক্রবর্ত্তীমশাই। ধর্ম্মে সইবে না। ছোট থেকে কোলে পিঠে মানুষ করেছি, আর সইতে পারছিনি আমি। জঙ্গলটা আর বিক্রী করাবেন না। কর্ত্তাদের আমল থেকে বছরে ওটা থেকে হাজার টাকা আয় হয়। সবই ত গেল, অন্তত ওটা থাক। মোদের অনেক স্মৃতি রয়েছে ওতে চক্রবর্ত্তীমশাই। আপনি জানেন না সব কথা।

দূরে একটা মোটরের আওয়াজ হল। হঠাৎ একখানা পুরাণ মোটর গাড়ীবারাণ্ডার তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ী থেকে নেমে এলেন একজন স্থুলকায়া মহিলা। পরণে তাঁর গরদের কাপড়। গা ভরা তাঁর গহনা। সঙ্গে একজন দাসী। মহিলাটী দাসীসহ বৈঠকখানার পাশ ঘেঁসে অন্দরের দিকে চলে গেলেন। তাঁর দিকে লক্ষ্য পড়া মাত্র দেওয়ানজী শশব্যস্তে বৃদ্ধকে উঠিয়ে নিয়ে বললেন—ওঠ্ ওঠ্ বুনো, রাণীমা এসে গেছেন। বাবু না শুনলে আমি আর কি করব বল্, যা, যা, ভিতর যা। রাণীমাকে বলিস্না যেন কিছু; শেষে আত্মহত্যা করবেন তিনি, ভাবিস কেন তুই। এখনও ত নগদ দেড়লক্ষ আছে। যা যা ভিতরে যা—।

রুদ্ধ আক্রোশে দেওয়ানজীর দিকে একটা রুদ্র কটাক্ষ হেনে বৃদ্ধ বুনো স্থান ত্যাগ করল। তার দিকে একবার চেয়ে দেখে দেওয়ানজী বলল—বাঁচা গেল বাবা। ভাল আপদ বটে। মরেও না ত।

পুরাণ চাকর বুনো চলে যাবার পর, চেয়ারটা একটু টেনে এনে চৌধুরীমশাই দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? কুমারকে কি মিত্রিকে দিয়েই ফাঁসাচ্ছ না আর কাউকে পাকড়েছ?

মুখটা চৌধুরীর কানের কাছে সরিয়ে এনে, দেওয়ানজী চাপাগলায় উত্তর দিলেন—মিত্রির কাছে বার বার হেরে তার সঙ্গে আর খেলতে রাজী নন। খেলাটা বোসকে শিখিয়েছি, খেলছে সে এখন। আমার কমিশন শতকরা ২৲ টাকা।

দেওয়ানজী আর চৌধুরীর কথাবার্ত্তার মধ্যে বোঝা গেল, জমিদারটা বোকা, আর মাতাল। ভয়ানক জুয়া খেলে। দেওয়ানজী নিজের লোক পাঠিয়ে দেন খেলবার জন্যে। জমিদার তা জানতে পারে না। দেওয়ানজী একরকম তাসের ফাঁকি জানেন। এই ফাঁকিটা তিনি তার লোকদের শিখিয়ে পাঠান। ফাঁকি না ধরতে পেরে জমিদার প্রত্যেক দিনই হাজার হাজার টাকা হেরে যান, ইত্যাদি।

স্বপন ও তার বন্ধু রমেন অবাক হয়ে এদের কথোপকথন শুনছিল। কতরকম না জীব পৃথিবীতে আছে, এদের সম্বন্ধে তাদের মন বেশ একটু কৌতুহলীও হয়ে উঠল। উভয়ে নিবিষ্ট মনে এদের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল, হঠাৎ চৌধুরী মশাই কথার সূত্রটা কেটে দিয়ে বললেন—একদিন এসে খেলাটা শিখে যাব। এখন জঙ্গলটা ত ঠিক করে দিন, কালকেই ওটা রেজেষ্টারী করতে হবে। জুয়োয় জুচ্চুরী চলে, কিন্তু ব্যবসায় ও সবের স্থান নেই।

(আগামী বারে সমাপ্য)

চলন্তিকা

এ মাসে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য আনন্দ সংবাদ কি বলো তো? এ প্রশ্ন যদি তোমাদের কেউ করেন তাহ'লে তোমরা সবাই এক বাক্যে সমস্বরে বল্‌বে: **মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি লাভ!** মহাত্মাজী জেলে কিছুদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগছিলেন—তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় তাঁকে ব্রিটিশ সরকার গত ৬ই মে মুক্তি দিয়েছেন। সমগ্র ভারত ও বিশ্বের শান্তি-কামী বন্ধুরা তাঁর দ্রুত রোগমুক্তির জন্যে প্রার্থনা করছেন—এ প্রার্থনার সঙ্গে বাংলার সমস্ত কিশোর কিশোরীর অন্তরের আন্তরিক যোগ আছে—এ আমরা জানি। কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে গান্ধীজীর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বাণী হচ্ছে: ভারতকে স্বাধীন দেখবার জন্যে আমি আরো দীর্ঘ দিন বাঁচতে চাই।

প্রার্থনা করি তাঁর শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

গত ১৩ এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক, সাংবাদিক ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সরকার পরলোক গমন করেছেন। এদেশে সংবাদ পত্রের পরিচালনা করা ও সম্পাদনা করা বিশেষ সুখের নয়। পদে পদে আছে বিপদ ও বিপত্তি। রাজরোষের বেড়াজাল চারদিকে। এই সহস্র রকমের বন্ধনের মধ্যেও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার নির্ভীক ভাবে দেশের সেবা করে গেছেন সংবাদ পত্রের মধ্য দিয়ে। এ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু দেশের ও সমাজের জীবনের একটি অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করি ও শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সহানুভূতি জানাই।

নব বর্ষের প্রারম্ভে ১৪ই এপ্রিল তারিখে বোম্বায়ে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে গেছে। বোম্বাইয়ের ডক্ এলাকায় এক এলাহি কাণ্ড ঘটে। প্রকাশ, ডকে অবস্থিত একটি জাহাজে আগুন লাগে। সে জাহাজ খানিতে গোলা বারুদ ভর্ত্তি ছিল। তাতে আগুন লাগার পর দুটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় এবং আগুণ চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ডক্ এলাকার কাছেপিটের বাড়ী ছাড়াও দু তিন মাইল দূরের বাড়ী গুলিও রেহাই পায় নি। দীর্ঘ দিন ধরে আগুন জ্বলতে থাকে। বিস্ফোরণের কারণ নির্ণয়ের জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হ'য়েছে। হতাহত হ'য়েছে বহু জন। বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের ছাপমারা আটাশ পাউণ্ড ওজনের একটি সোনার তাল একজনের বাড়ির চার তলার ছাদ ফুড়ে তিন তলার ঘরে এসে পড়ে। ভারতে এ রকম বিস্ফোরণ ও দুর্ঘটনা আর কখনও হয় নি। বোম্বাইয়ের এই বিপদে বাংলা দুঃখ প্রকাশ করছে ও সহানুভূতি জানাচ্ছে।

চাণক্য শ্লোকে পড়েছি: রাজার সম্মান কেবল মাত্র নিজ দেশে—আর বিদ্বানের সম্মান সর্ব্বত্র। এই উক্তির সারবত্তা জান্‌তে পারা গেছে সম্প্রতি। ব্রিটিশ সরকার ভারত থেকে সাত জন বৈজ্ঞানিককে বিলাত ভ্রমণের জন্যে নিমন্ত্রণ করেছেন। এই সাত জনের মধ্যে আছেন—তিন জন বাঙালী (১) ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র, (২) সার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও (৩) ডক্টর মেঘনাদ সাহা। প্রার্থনা করি এঁদের বুদ্ধি ও প্রতিভা বাংলা ও ভারতকে সব দিক দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাক সম্পূর্ণতার দিকে।

কুমারী ভালসা মাথাইকে নিয়ে ভারত ও আমেরিকার যে দুশ্চিন্তা হয়েছিল তার খবর তোমরা পেয়েছিলে। ভারতের মেয়ে আমেরিকায় গিয়েছে পড়তে। একদিন হঠাৎ নিরুদ্দেশ—সে খবর তোমরা বৈশাখের চলন্তিকায় পেয়েছ। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে যে ভালসা মাথাই আত্মহত্যা করেছেন। হাডসন নদীতে তাঁর মৃত দেহ পাওয়া গেছে ক'দিন পর। দেহে আঘাতের চিহ্ন না থাকায় ও শব ব্যবচ্ছেদ করার পর জানা গেছে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তার পোষাক ও হাতের ঘড়িটি দেখে তাকে চেনা গেছে।

খেলার খবর শোনো। কলিকাতা হকি লীগের প্রথম বিভাগের খেলায় পোর্ট কমিশনার ২৯ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব ২৮ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় হ'য়েছে। হকি খেলায় সব চেয়ে কারা বেশী প্রসিদ্ধ ছিল জানো ?—কাস্টমস্। এবার কিন্তু তারা দ্বাদশ স্থান পেয়েছে। হকি খেলায় বেটন কাপ জিতেছে বি, এন, আর, গোয়ালিয়রের জিওয়াজী দলকে হারিয়ে। এই নিয়ে বি. এন. আর চার বার কাপ পেলো। হকির পালা ফুরিয়েছে, সুরু হয়েছে ফুটবল খেলা। লীগের খেলা সুরু হয়েছে। অনেক খ্যাতনামা খেলোয়াড় দল বদল করেছেন। কার নাম ছেড়ে কার নাম করবো ?—মাঝে যে দুটি উল্লেখ যোগ্য খেলা হয়েছে তাতে শিল্ড বিজয়ী ইষ্ট বেঙ্গল মহামেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে হার স্বীকার করেছে। মহামেডানদের খেলা উচ্চস্তরের হয়েছিল। অথচ এই দুরন্ত দল বাংলার সব চেয়ে প্রিয় দল মোহনবাগানের কাছে আর নূতন মিলিটারি টীম এণ্টিলোপ্‌সের কাছে হার স্বীকার করেছে। খেলার রকম ফের দেখে মনে হয় এবারে খেলা জমবে ভালো।

কিছু দিন আগে ২রা মে শ্রীরঙ্গমে (কলিকাতায়) তোমাদের সুপরিচিতা শ্রীইন্দিরা দেবী ছোটদের জন্যে ছোটদের দিয়ে নব বর্ষ আনন্দ উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। এতে অভিনয় ছাড়া নাচ গান ও বিচিত্রার আয়োজন ছিল। এ ধরণের অনুষ্ঠান এ দেশে এই প্রথম। আমরা এই উৎসবে উপস্থিত ছিলাম। ছোট্ট বন্ধুদের সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। ইংরাজী নাটিকা অভিনয়ে আমাদের ভালো লেগেছে শ্রীমান অলকের, ছোট্ট মেয়ে মঞ্জুশ্রী ও ফুল্লরার সহজ প্রাণবন্ত অভিনয়। কুমারী নীলিমার মতো ওস্তাদ মেয়েও কম, কিছুতেই সে বাদ যায় নি। বাংলা মায়ের বন্দনার পরিকল্পনাটি সুন্দর। ছোট্টরা ছাড়া খ্যাতনামা গায়ক শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক, শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও অল ইণ্ডিয়া রেডিওর হাস্য কৌতুকের রাজা অজিত চট্টোপাধ্যায় ছোটদের আনন্দ দিতে কসুর করেন নি। অনুষ্ঠানে ত্রুটি ছিল, হৃদয়গ্রাহী নাটিকা দু'টি পর পর অভিনীত হওয়া সব চেয়ে বড়ো ত্রুটি। শিশুদের সঙ্গে শিশু-সাহিত্যের নাম করা লেখকদেরও দেখলুম। নববর্ষ উৎসব সবাইকে আনন্দ দিয়েছে। শ্রীইন্দিরা দেবীকে এ জন্যে আমরা সাধুবাদ দিই ও প্রশংসা করি। পূজোর আগে এই ধরণের আর একটি অনুষ্ঠান করলে কেমন হয় ?

মরীচিকার ম্যাজিক

শ্রীপ্রদীপ সেন

যখন আলাদা আলাদা রকমের বায়ুর স্তর একসঙ্গে আমাদের চোখকে ঠকায়, তখনই বেশীর ভাগ মরীচিকার সৃষ্টি হয়। মরীচিকায় যে সব জিনিষ দেখা যায় কয়েক মাইল, কয়েকশত মাইল বা কয়েক হাজার মাইল দূরে সত্যিই সে রকম জিনিষ থাকে। ঐ সব জিনিষগুলি থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি বায়ুস্তরের মধ্যে দিয়ে সোজাসুজি না এসে বাঁকাভাবে প্রতিফলিত হওয়ায় মরীচিকায় জন্ম নয়।

পরিষ্কার জলের মধ্যে একগাছা লাঠির খানিকটা ডুবিয়ে রাখলেও ঐ একই জিনিষ হয়। জলের মধ্যে লাঠির যে অংশটুকু ডুবানো হয়েছে, মনে হবে সেটা যেন বেঁকে গেছে। এরকম হওয়ার কারণ—জল বাতাসের চেয়ে ঘন হওয়ায় আলোকরশ্মিগুলি বিভিন্ন প্রকারের দুইটি মধ্যমের মধ্যে দিয়ে যেতে বেঁকে যায়।

বিখ্যাত আবিষ্কারক পিয়েরী যে ধরণের মরীচিকাগুলি দেখেছিলেন, সেগুলি প্রায়ই জলের ওপর দেখা যায় এবং সেগুলিতে দূরের জিনিষগুলিকে তাদের প্রকৃত অবস্থান থেকে আরও কাছে বলে মনে হয়। মরুভূমি এবং মালভূমির উপর যে মরীচিকাগুলি ছায়া-হ্রদের সৃষ্টি করে, সেগুলি নিতান্ত সাধারণ রকমের মরীচিকা। নিউবিয়ার মরুভূমিতে যে অসংখ্য হ্রদ আছে সেগুলিতে দিগন্তের ওপারের পাহাড়তলির ছায়াও প্রতিফলিত হয়।

সাধারণ রকমের মরীচিকাগুলি প্রায়ই বায়ুমণ্ডলের অবস্থাবিশেষে দেখা যায়। কিন্তু কয়েকটি মরীচিকা স্থায়ী—এগুলি দিনের পর দিন একই ভাবে দেখা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব্ব আরিজোনায় একটি পাহাড়ে রাস্তার পাশে একটি প্রাচীন ও শুকনো হ্রদের গহ্বর আছে। কিন্তু মোটরযাত্রীরা এখনও সেই পথে যেতে যেতে তাদের সুমুখে বিরাট জলরাশি দেখতে পায়। কিন্তু তার পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেলেই সেটা যায় অদৃশ্য হয়ে।

আর একরকম মরীচিকায় কোন জিনিষকে তার আসল অবস্থান থেকে অন্যদিকে বলে মনে হয়। এরকম মরীচিকা প্রায়ই দেখা যায় না, তবে শোনা যায় যে একবার একটি জাহাজ এক পার্ব্বত্য উপকূলের কাছ দিয়ে ভেসে চলছিল। ঠিক সেই সময় মনে হচ্ছিল যে একই ধরণের দু'টি জাহাজ পরস্পরের উল্টোদিকে ভেসে চলেছে।

কিন্তু অসাধারণ মরীচিকাগুলিতে আরও আশ্চর্য্য জিনিষ দেখা যায়। এতে মনে হয় যেন আসল জিনিষটি আকাশের উপর উল্টো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পৃথিবীপৃষ্ঠে ভাসমান জাহাজকে মনে হয় যেন আকাশ দিয়ে ভেসে চলেছে। এটা এত স্পষ্ট দেখা যায় যে, দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে এর খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি স্পষ্ট দেখা যাবে। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সময় একবার দেখা

যায় বৃটিশ নৌবহর যেন আকাশ দিয়ে ভেসে চলেছে। নিউইয়র্কের বন্দর থেকে একবার দেখা গিয়েছিল যেন আসল নিউইয়র্ক শহরের ওপর আরেকটি নিউইয়র্ক শহর আসলটির মাথায় ভর দিয়ে শূন্যের ওপর দাঁড়িয়ে ররেছে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে দূর থেকে একবার ভ্রমণকারীদের মনে হয়েছিল প্যারিস শহর যেন শূন্যে উল্টো হয়ে ঝুলে রয়েছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসবাসীরা আশ্চর্য্য হয়ে একদিন দেখল যে আসল 'আইফেল টাওয়ারে'র মাথার উপর যেন আরেকটি 'আইফেল টাওয়ার' উল্টো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে!

অষ্টাদশ শতাব্দীতে একবার একটি জাহাজ ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় নিউইয়র্কের দিকে আসছিল। একদিন বিকেলে ভীষণ ঝড়ের পর দেখা গেল যে জাহাজটি যেন শূন্য দিয়ে ভেসে চলেছে। জাহাজের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জিনিষ এত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল যে, সেটি সত্যকারের জাহাজ কিনা সে বিষয়ে কারুর কোন সন্দেহ হয়নি। সেইটিই সেই জাহাজের শেষ দেখা—এরপর আর তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ফরাসী-প্রুশিয়ান যুদ্ধের সময়ে উত্তর সুইডেনের কয়েকজন পর্য্যবেক্ষক দেখেছিলেন যে শূন্য দিয়ে মরীচিকা সৈন্যদল 'মার্চ্চ' করে চলেছে। কয়েকশো মাইল দক্ষিণে যে সৈন্যদল যুদ্ধ করছিল, এদের সাজপোষাক ছিল অবিকল সেই সৈন্যদলের মতই।

অনেক সময়ে যুদ্ধের ফলাফল মরীচিকার ওপরই নির্ভর করেছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্যদল একবার তুর্কীবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। জেনারেল মভের বাহিনীর একজন সৈন্য, জি ই, হিউবার্ড এ সম্বন্ধে এক বর্ণনা দিয়েছেন—"আমাদের সৈন্যরা তুর্কীদের ট্রেঞ্চে পৌঁছে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। আমাদের গোলন্দাজবাহিনীর কামানের পাল্লার মধ্যেই তুর্কীরা ছিল। নদীতে একটা গোলাবর্ষণকারী নৌকোর মধ্যে থেকে কয়েকজন লোক যুদ্ধটি পর্য্যবেক্ষণ করছিল। হঠাৎ আমাদের কামানগুলি, তুর্কীরা পাল্লার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও গোলাবর্ষণে ক্ষান্ত হল দেখে পর্য্যবেক্ষকরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হল। ব্যাপার হয়েছিল কি, গোলন্দাজদের লক্ষ্যবস্তু হঠাৎ তাদের চোখের সামনে থেকে মরুভূমির দিগন্তে মরীচিকার আবির্ভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। সৌভাগ্যক্রমে ঐ একই কারণে তুর্কীরাও গোলাবর্ষণ বন্ধ করে।"

আরেক রকম মরীচিকাতে কোন জিনিষের আসল আকৃতিকে অত্যন্ত বড় বলে মনে হয়। একদল ফরাসী সৈন্য আলজিরিয়াতে অনেক দূরে একবার বিরাট আকৃতির এক ঝাঁক ফ্লেমিঙ্গো পাখী দেখতে পায়। ক্রমে তাদের এত বড় মনে হয়ে উঠল যে তাদের আরব অশ্বারোহী বলে মনে হতে লাগল। ব্যাপার কি জানবার জন্যে একজন স্কাউটকে পাঠানো হল। শীগগিরই সৈন্যেরা দেখল যে, ঘোড়াদের পাগুলো এত বেশী লম্বা হয়ে উঠল যে, ঘোড়ারা এবং তাদের চালকরা ভীমাকার দৈত্যের মত বড় হয়ে উঠল। এই সময় একটা ঘন মেঘ এসে সূর্য্যকে ঢেকে ফেলাতে অশ্বারোহীদের স্বাভাবিক আকৃতি দেখতে পাওয়া গেল।

আবার, এক মরুভূমিতে একদল গরুবাছুরকে পাহাড়ের গা বেয়ে আসতে দেখা গেল। হঠাৎ একটা গরু আরেকটি গরুকে মুখে করে নিয়ে চলতে লাগল। আরেকটি জন্তুকে দেখা গেল উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে পড়ে গিয়েই তক্ষুনি আবার উঠে পড়ে দিব্যি হাঁটতে লাগল। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, পাহাড়ের ওপরে গরুবাছুরের দলের দৃশ্য একটা পিঁপড়ের বাসার প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়!

বিমানচালকগণ মাঝে মাঝে শূন্যে মরীচিকা দেখতে পান। মেজর ফ্রেডারিক মার্টিন একবার বিমানযোগে পৃথিবী প্রদক্ষিণে বেরিয়ে একজায়গায় দেখলেন সামনে বিরাট পর্ব্বতমালা দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেই তিনি সেটিকে এড়াবার জন্য বাঁদিকে বেঁকেছেন, অমনি দেখেন যে তিনি একেবারে পর্ব্বতমালার মুখোমুখী এসে গেছেন। এক মরীচিকার জন্যই পর্ব্বতমালার অবস্থান তার আসল জায়গা থেকে অনেক ডান দিকে মনে হচ্ছিল। বিমানটি পাহাড়ের ওপর পড়ে চূরমার হল, কিন্তু বিমানচালক সাংঘাতিক আঘাতের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।

বিখ্যাত মার্কিণ বিমানবীর কর্ণেল লিণ্ডবার্গ প্যারিসে যাবার মুখে আইরিশ উপকূলে পৌঁছবার আগে কয়েক হাজার মাইল ধরে অনবরত মরীচিকার সামনে পড়েছিলেন। তিনি পর্ব্বত, উপত্যকা প্রভৃতি এমন নিখুঁতভাবে দেখতে পেরেছিলেন যে, তিনি বুঝতে পারেন নি যে তিনি সত্যিকারের উপকূল থেকে অনেক দূরে রয়েছেন।

মরীচিকা থেকে অনেক সময়ে ভূতুড়ে সব ছায়া দেখা যায়। একটি মহিলা ও তাঁর স্বামী একবার এক মরীচিকার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে গিয়ে নৌকোশুদ্ধ প্রায় জলে ডুবেছিলেন। মহিলাটি এইভাবে এক বর্ণনা দিয়েছেন—"বিকেল ৫টার সময়ে হঠাৎ দেখি একটা দৈত্যের মত প্রকাণ্ড জাহাজ পেছন থেকে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। আমার স্বামী, যাতে সেই জাহাজটা আমাদের বাড়ে এসে না পড়ে, সেইজন্য নৌকোটিকে তীরের দিকে তাড়াতাড়ি চালিয়ে নিয়ে চল্লেন। প্রায় দশ মিনিট ধরে জাহাজটা আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। ক্রমে সেটা এত কাছে এসে পড়ল যে আমরা তার চালককেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তখন জাহাজটি যেমন হঠাৎ দেখা দিয়েছিল, তেমনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন একটি ছোট সাধারণ আকারের জাহাজ দিগন্তে দেখা দিল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মরীচিকা কেবলমাত্র মরুভূমি বা সমুদ্রেই দেখা যায় না। যেখানেই অবস্থা অনুকুল হয় এবং বায়ু উত্তপ্ত হয়ে কোন জিনিষের ছায়া ভুল জায়গায় প্রতিফলিত করে, সেখানেই এরকম হয়। এবং যে সব কঠিন জিনিষ মরীচিকাতে প্রতিফলিত হয়, সেগুলি মায়া নয়, সত্যিকারেরই সেগুলির অস্তিত্ব থাকে, তবে ঠিক যে জায়গায় মনে হয় সে জায়গায় নয়।"

এই বৈঠকে বেশীর ভাগই ছাপা হয় গল্প কিংবা কবিতা। এবারে আমাদের দুটি কিশোর বৈঠকীদের লেখা দুটি প্রবন্ধ তোমাদের উপহার দিলাম।

—সম্পাদক, রংমশাল

পিঁপ্ড়ে

কল্যাণ কুমার সেন গুপ্ত, [গ্রাঃ নং ১৩৭৮]

মণ্টু একদিন দ্যাখে যে তাদের ভাঁড়ার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে বহু পিঁপড়ে বেরিয়ে আসছে। তার কো'নো কৌতূহলই হলনা যে পিঁপড়েগুলো কি করে। তোমরা অনেকেই হয়ত মণ্টুর মতন। সামান্য কীট-পতঙ্গ, এদের বিষয় কোন খবর রাখবারই দরকার মনে করেনা। কিন্তু জান কি যে মানুষের ঘরকন্নার চেয়ে পিঁপড়েদের ঘরকন্না কত গোছাল? তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি কখনো হয়না। তবে, দুই পিঁপড়ের দলের মধ্যে খুনোখুনি যুদ্ধ প্রায়ই লাগে। এরা রীতিমতো নিয়মানুযায়ী কাজ করে। এদের কথা যদি শোন, তোমরা অবাক হয়ে যাবে। আজকে আমি এদের কথাই বলবো।

পিঁপড়েদের মধ্যে তিনশ্রেণীর পিঁপড়ে আছে। যেমন :— স্ত্রী, পুরুষ ও শ্রমিক। সাধারণতঃ শ্রমিক পিঁপড়েদেরই আমরা দেখতে পাই, স্ত্রী ও পুরুষ পিঁপড়ে বাইরে বড় একটা আসেনা। গোড়াতে এই পুরুষ ও স্ত্রী পিঁপড়ের দুইজোড়া ডানা থাকে তোমরা দেখে থাকত পার। পিঁপড়েরা কেমন করে পথ চলে জান? এদের মাথার সামনে দুটো শুঁয়া মতন আছে তাদের বলে অ্যান্টেনা (Antenna)। এই অ্যান্টেনার সাহায্যে এরা পথ চিনে চলে। এদের মাথার উপর দুটি পুঞ্জাক্ষি (Compound eye) আছে। চোখে দেখে পথ চলতে এরা অভ্যস্ত নয়। একসারি পিঁপড়ের কয়েকটিকে সরিয়ে সে জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেললে দেখবে যে পরের পিঁপড়েগুলি দিশেহারা হবে পড়েছে ; কারণ তারা আর গন্ধ পাচ্ছেনা। পিঁপড়েরা খুব একতাবদ্ধ নিজেদের বাড়ি থাকলে কখনই অন্য দলের বাসায় গিয়ে পড়েনা। শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে মানুষের মত পিপড়েদের চাকর মুটে আছে। এদের মধ্যে আবার প্রহরী বা যোদ্ধাও আছে। এরা ঘর দুয়ার রক্ষা করে। কোনো দুইটি দলের মধ্যে যুদ্ধ হলে যুদ্ধের পর জয়ীরা পরাজিতের ঘরে গিয়ে ডিম ও বাচ্চা নিয়ে আসে পরে তাদের নিজেদের দলভূক্ত করে নেয়। স্বভাবের দিক দিয়ে তিন শ্রেণীর পিঁপড়েই আলাদা। পুরুষ পিঁপড়ে কোন কাজ করেনা কেবল ঘরে বসে থাকে। রাণী পিপড়ে বা স্ত্রী পিঁপড়ে খালি ডিম পাড়ে। ডিম পেড়েই খালাস, ডিম বা সন্তানের খোঁজ সে কখনো নেয়না। শ্রমিকেরাই এদের লালন পালন করে। পিঁপড়েরা বেশ পরিষ্কার। খাওয়ার পর কিছু কুটো ঘরে পড়ে থাকলে সব শ্রমিক পিঁপড়েরাই বাইরে ফেলে দিয়ে আসে। আগেই বলেছি যে এতগুলি প্রাণী এক বাসায় থাকে অথচ তাদের মধ্যে কখনও মারামারি হয়না। পিঁপড়েরা শব্দ করতে পারে? পারেনা বোধ হয়? তবে জেনে রাখা ভাল যে লোবোপেল্টা নামের (Lobopelta) নামের পিঁপড়েরা বেশ শব্দ করতে পারে। পিঁপড়েদের যে "গরু" আছে তা বোধ হয় জানোনা। ঠিক গরু নয় তবে একজাতের পোকা তারা পোষে

যাদের গা থেকে একরকম মিষ্টি রস পাওয়া যায়। আবার পিঁপড়েরা এই গরুর জন্য গোয়াল ঘরও নির্দ্দিষ্ট করে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার শুনে রাখ যে পিঁপড়েরা দস্তর মতো কৃষিকার্য করে। এরা এদের বাড়ীর সামনে একরকম ছাতা জাতীয় উদ্ভিদের বীজ কণিকা এনে ছড়িয়ে দেয়। যখন ছাতা হয় তখন সবাই মিলে পরমানন্দে খায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজাতের অদ্ভুত পিঁপড়ে আছে। এদের খাদ্য সঞ্চয় প্রণালী বড়ো অদ্ভুত। প্রথমে নিজেদের দলের কয়েকটি পিঁপড়েকে নিয়ে অদ্ভুত উপায়ে এরা তাদের হজম শক্তি নষ্ট করে দেয়, তারপর খুব মধু খাওয়াতে থাকে। এখন এই যে মধু তারা খেলে সেটা হজম না হয়ে তাদের পেটেই জমে রইল। এরকমভাবে এক একটি পিঁপড়েমর পেট এক একটা মধুভাণ্ডে পরিণত হল। দরকার মত সব পিঁপড়ে এদের পেট কুড়ো করে জমান মধুটুকু খায়। আফ্রিকাতে একরকম ভীষণ বড় পিঁপড়ে আছে যাদের কামড়ে অনেক সময় মানুষ পর্য্যন্ত মরে যায়।

পিঁপড়ের ছোট ছোট ডিম থাকে দেখেছ। সেই ডিম কেটে যখন বাচ্ছা বেরোয় তখন তাকে বলে শূককীট (Larva)। এই শূককীট ভীষণ পেটুক থাকে। খেতে খেতে সে নিজের দেহের চারধারে নিজের লালা দিয়ে একটি শক্ত আবরণ তৈরী করে। এই অবস্থাকে মূককীট (Pupa) বলা হয়। সময়মত ঐ আবরণ ফাটিয়ে পূর্ণাঙ্গ পিঁপড়ে বেরিয়ে আসে। পিঁপড়ে ছোটবড় নানা রকম হয়ে থাকে। তোমরা হয়ত দেখেছ যে আমগাছে একরকম লাল পিঁপড়ে থাকে। এদের বলে 'কাঠ পিঁপড়ে'। এদের বাসা খুব সুন্দর। কতগুলো আমপাতা জুড়ে জুড়ে তার মধ্যে রাণী পিঁপড়েটিকে রেখে দেয় ও সে সেখানে ডিম পাড়তে থাকে। এই লাল পিপড়ের ডিম দিয়ে মাছ ধরার টোপ হয়। এই তো গেলো গেছো বা কাঠ পিঁপড়ে। তোমরা, "ডেঁয়ো" পিঁপড়ে নিশ্চয়ই দেখেছ। এরা খুব বড় বড় হয়, এবং এদের রং হয় কালো। এই পিঁপড়েদের কামড়ে রক্ত পর্যন্ত বেরিয়ে আসে। ওরা সাধারণতঃ মাটিতে ঘর করে বাস করে। আবার কতগুলো পিঁপড়ে আছে যারা মাটিতে, গাছের কোটরে বা ফলের মধ্যে বাস করে। ওরা সময় সময় পুরানো বাসস্থান পরিত্যাগ করে নূতন বাসস্থান তৈরী করে' তাতে চলে যায়।

পুরুষ বা স্ত্রী পিঁপড়ে পূর্ণদেহ নিয়ে জন্মাবার পরই আকাশে উড়তে থাকে। তাদের বেশীর ভাগেরই আয়ু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়না। তারা টিয়ে, শালিক ইত্যাদি শত্রুর হাতে মারা যায়। কোন কোন রাণী পিঁপড়ে আকাশ থেকে মাটিতে পড়ার পর গর্ত খুঁড়ে বাসা তৈরী করে ডিম পাড়তে থাকে। এই সময় রাণীটির কোন খাবার জোটেনা। নিজের দেহের চর্ব্বি শোষণ করে বেঁচে থাকে। এক একটি রাণী পিঁপড়ে ১৫।১৬ বছর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে। শ্রমিক পিঁপড়েরা বেশীদিন বাঁচেনা। শ্রমিকেরা মরা পিঁপড়ের দেহ বাইরে ফেলে দিয়ে আসে। কোনো কোনো পিঁপড়ে আবার মৃতদেহ সমাধিস্থও করে। সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যায় যে পিঁপড়েরা কিরকম একতাবদ্ধ। একটা মাছিমেরে একটি পিঁপড়ের দলেয় মধ্যে ফেললে দেখবে যে একটি পিঁপড়ে গিয়ে কয়েকজনকে খবর দেবে। তারপর সবাই মিলে মাছিটিকে টেনে নিয়ে যাবে। এখানেই আমার পিঁপড়ের কথা শেষ হল।

সাহিত্যিক গোর্কী

শ্রীহৃষিকেশ দে (গ্রাঃ নং—৭৫৩)

গোর্কীর সম্বন্ধে দু'টি কথা—

নতুন না হ'লেও, অনাবশ্যক না-ও হ'তে পারে।

নবীন রুষিয়ার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কী এবং তার "মা" বইএর নাম তোমরা সবাই-ই শুনেছ, এ বোধহয় আমি আন্দাজেই ধরে নিতে পারি। অনেকে হয়তঃ বইখানি পড়েওছ। ও'বইখানাকে

নিঃসন্দেহে পৃথিবীর একখানা শ্রেষ্ঠ বই বলে ধরে নেওয়া যায়। শুধু "মা" নয়, গোর্কীর অন্যান্য বই-ও বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে সম্মান পেয়েছে।

কিন্তু গোর্কীর প্রথমজীবন অত্যন্ত দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর "টুয়েন্টি সিক্স মেন্ এ্যাণ্ড এ গার্ল" বই তাঁকে প্রথম প্রসিদ্ধ করে তুলে জনসাধারণের চোখে। তারপর থেকে গোর্কীর সাহিত্যিক প্রতিভা সমস্ত জগতের শ্রদ্ধার বস্ত। বার্ণাড শ তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "বিংশ শতাব্দীর বায়রণ" (Byron of the Twentieth Century). দার্শনিক রাসেল তাঁর নাম দিয়েছেন "Poect of the vagabond"

ছোটবেলা থেকেই, লেখ্‌বার জন্যে বালক গোর্কীর একটা আগ্রহ ছিল। তিনি কি করে গল্পের 'প্লট' ঠিক কর্তেন জানো? লোকের মুখে যেসব প্রবাদ-বাক্য শুনতেন, তাই নিয়ে গল্প লেখা ছিল তাঁর বাতিক। অবশ্য, সে সব গল্প যে অধিকাংশই হয়েছিল বাজে, তা তিনি নিজেই বলেছেন। তাঁর ছোটবেলার আরেকটা অভ্যাস হচ্ছে, কোন কথা ভাল লাগলে, অমনি সেটা টুকে রাখা, তা' সে বুঝুন আর না-ই বুঝুন।

সে সময় তিনি কবিতা লিখ্‌বারও চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, কবিতা ছোটবেলা থেকে তাঁর ভালো লাগ্‌ত। ভালো কবিতা পেলেই তিনি মুখস্থ করে ফেল্‌তেন। ছোটবেলায় তাঁর ধাইমার কাছে তিনি যে ঘুমপাড়ানী গান শুনেছিলেন, পরবর্তীকালেও গোর্কী তা ভুলে যান্ নি।··· স্কুলের বাঁধাধরা পড়াশুনার চাইতে বাইরের বই-ই ছিল তাঁর বেশী প্রিয়। গোর্কী বিদেশী-সাহিত্যের অনুবাদও খুব আগ্রহের সংগে পড়্‌তেন। সে সময় তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বই ছিল "বাইবেল"।

১৮৯২ সালে গোর্কীর প্রথম বই ছাপা হয়ে বেরোয়। তারপর থেকে তিনি প্রায়ই সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রিকাগুলিতে ছোট ছোট গল্প লিখ্‌তে সুরু করেন। গোর্কী এক জায়গায় বলেছেন যে, প্রথম প্রথম ছোট গল্প লিখ্‌তে তাঁর নাকি খুব বেশী ভাল লাগ্‌ত না। কিন্তু পরে তিনি বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে, ছোট গল্প লিখ্‌তে অভ্যাস না করলে, কখনো ভালো সাহিত্যিক হওয়া যায় না। কারণ, ছোট গল্পই লেখককে শব্দচয়ন ও ভাষার সংযম শিক্ষা দেয়।

ইতিহাসের কোন ঘটনা, বা প্রকৃত মানুষের জীবনের কার্যাবলী অবলম্বনে উপন্যাস লেখাই ছিল তাঁর অধিকতর প্রিয়। পাঠক-সমাজের মন-রেখে গল্প লেখা তাঁর নীতিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁর মত হচ্ছে, "চিন্তা ও অনুভূতি"র দ্বারা তিনি যা' বুঝ্‌বেন, তাই লিখ্‌বেন। গোর্কীর রচনার আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে, "সত্য" জিনিষটা তাঁর গল্পে অতি স্পষ্টই আত্ম-প্রকাশ করে পাঠকের চোখের সাম্‌নে ফুটে ওঠে।

গোর্কীর বইগুলি আমাদের প্রিয়, কারণ সেগুলি আমাদেরই চিরপরিচিত লোকের চিত্র। সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনই তাঁর রচনার চরিত্রগুলিকে জীবন দান করেছে। যাঁদের সংগে তিনি মিশেছেন, তন্ন তন্ন করে যাদের মনের কথা তিনি জান্‌তে পেরেছেন, যাদের অন্তরের অনুভূতিকে তিনি বুঝ্‌তে পেরেছেন, তাঁর রচনায়, গল্প-উপন্যাসেও তাদেরই তিনি অংকিত করেছেন নিজের লেখনীর সাহায্যে।···কোন বিশেষ চরিত্রের একটি লোককে ভালভাবে বুঝ্‌তে চেষ্টা করেছেন। ঐরকম সূক্ষ্ম-বিচারের জন্যেই তাঁর বইএর চরিত্রগুলি হয়েছে সম্পূর্ণ জীবন্ত। এ বিষয়ে তাঁ'কে আমাদের শরৎচন্দ্রের সাথে তুলনা করা যায়। শুনেছি, শরৎচন্দ্রও নাকি অনেক সময় চিঁড়ার পুটুলি কাঁধে করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন উপন্যাসের চরিত্রের সন্ধানে।

লেখার নেশা চাপ্‌লে, গোর্কী লিখ্‌তে পার্তেন অনেকক্ষণ। তাঁর "The Birth of the Man" নামক বইখানা মাত্র তিন ঘণ্টায় লেখা।

কোনকিছু লিখ্‌বার আগে আগাগোড়া ভেবে চিন্তে অগ্রসর হওয়া ছিল গোর্কীর স্বভাববিরুদ্ধ। তাঁর মতে, আগেই 'প্লট' ভেবেচিন্তে গল্প আরম্ভ করলে, গল্পের চরিত্রগুলি হয়ে উঠ্‌বে অস্বাভাবিক এবং আড়ষ্ট। তার চেয়ে, লিখ্‌তে লিখ্‌তে গল্পকে আপনি-ই ঠিক হতে দেওয়া উচিৎ; এ'কে চরিত্রগুলি নিজেই স্বাভাবিক ভাবে ফুটে উঠ্‌বে, এবং তার ফলে গল্পও নাকি বেশ জমে উঠ্‌বে বলে তার বিশ্বাস।···

তাঁর প্রতিভা শুধু গল্প ও উপন্যাস রচনায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না। "The Lower Depths" নামে নাটকখানি, এবং "Reminiscences of My Youth" শীর্ষক প্রবন্ধের বইটি তাঁর সাহিত্যিক কীর্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।···তাঁর প্রত্যেকটি বই-এ, নিপীড়িত, শোষিত, হতভাগ্য সম্প্রদায়ের প্রতি যে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি প্রখর হয়ে আছে, "গোর্কী-সাহিত্যে"র তাই প্রধান বিশেষত্ব।···

অসি ও মসীর যুদ্ধে 'মসী' কতখানি শক্তিশালী, গোর্কী তাঁর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাশিয়ার জার-অত্যাচারিত জনসাধারণের বিপ্লবের সাফল্যের মূলে গোর্কীর দান কতখানি, তা বলা বাহুল্য মাত্র। অত্যাচারের পর অত্যাচারে কণ্ঠ যাদের' রুদ্ধ, যন্ত্র-দানবের বিরাট ক্ষুধায় আহুতি দিতে গিয়ে যারা নিঃস্ব, অন্তর যাদের নিষ্পেষিত শক্তিশালীর সেই কঠিন শাসনে, তাদের মূক অন্তরে ভাষা দেওয়াই ছিল গোর্কীর জীবন-ব্রত।···শত-সহস্র নিরপরাধ শ্রমিকের অত্যাচার-ক্লিষ্ট অন্তরের অভিশাপবাণীকে তিনি রূপ দিয়েছিলেন তাঁর লেখনীর সাহায্যে। বলাবাহুল্য, রাশিয়ার তদানীন্তন জার-সরকারের নিকট এজন্যে তাঁকে বহু ভাবে অত্যাচারিত হতে হয়েছিল। কিন্তু সে বিরাট সাহিত্য-প্রতিভাকে, সেই দীপ্ত অন্তরকে কিছুতেই রুদ্ধ কর্তে কেউ সক্ষম হয় নি। অন্তরীণে আবদ্ধ থেকেও, তিনি জগতকে দু'খানা গ্রন্থ উপহার দেন।

খুব ছোট বেলায় পিতাকে হারানোর ফলে, মায়ের সংগে তিনি মাতামহের গৃহেই বাস কর্তেন। কিন্তু মাতার মৃত্যুর পর, তিনি বিরাট বিশ্বে তাঁর আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। গোর্কীর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কোন বই পড়্‌লে, তোমরা দেখ্‌তে পাবে, তাঁর জীবন কি বৈচিত্র্যময়। অর্থ-সংগতিহীন, সহায়-সম্বলশূন্য ষোল-সতের বছরের এই ভাগ্য-বিড়ম্বিত বালক যে কি ভাবে কত কষ্টে শুধু বেঁচে থাক্‌বার জন্যে কি দুর্দমনীয় চেষ্টাই না করছিল, সে কথা ভাব্‌লে, আমাদের অবাক হ'তে হয়।···নিজের জীবনে দুঃখের সাথে গভীরভাবে পরিচয় হয়েছিল বলেই বুঝি পরবর্তিকালে তাঁর রচনায় দুঃখময় জীবন এত জীবন্ত।

জীবনে বহুদিনই তিনি ভাগ্য-বিড়ম্বিত অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বহু অনাহার-পীড়িত দিবারাত্রি তাঁর জীবনের উপর দিয়ে গিয়েছে। রাশিয়ায় যখন বিপ্লবের বহ্নি জ্বলে উঠ্‌লো, সেদিন গোর্কী ছিলেন রাশিয়ার নেতা লেনিনের পাশেই। তাঁর সাহিত্যিক-প্রতিভা শুধু কল্পনা-বিলাসেই সীমাবদ্ধ ছিল না, দেশের কাকুতি তা'তে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।

যৌবনের দুর্ভাগ্যের জের এনে দিল বৃদ্ধ বয়সে তা'কে দুরন্ত ক্ষয়রোগের কবলে। সোভিয়েট জনসাধারণ তাঁর নামে উৎসর্গ করেছিল যে নগরটি তাদের শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ, সেই "গোর্কী নগরে"ই ১৯৩৬ অব্দের ১৮ই জুন এই আজীবন ভবঘুরে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

গোর্কীর ব্যক্তিগত জীবন আমার আলোচ্য না থাকায়, শুধু তাঁর সাহিত্যিক জীবন সম্বন্ধেই তোমাদের একটু আভাষ দিলুম; তোমাদের মধ্যে অনেকেরই তো লিখ্‌বার অভ্যাস আছে, গোর্কীর সাহিত্যিক ধর্মকে তোমাদের জীবনে প্রতিফলিত করে তোল। দেশের দুঃখ-দুর্দশায় তার সাহিত্যিকের কর্তব্য যে কত বড়, গোর্কীর জীবন থেকে আমরা সেই শিক্ষাই পাই।···এ'সম্বন্ধে, আমাদের দেশে কেবলমাত্র শরৎচন্দ্রের নাম করা যেতে পারে। তোমরা কি এ' অভাব মেটাবে না?

আনন্দরঙিন দিনগুলি

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাহিত্যভূষণ

আঠার বছর পূর্বে সাজাদপুর একদিন আনন্দে জেগে উঠেছিল শিল্পগুরু অবনীন্দ্র নাথের আগমনে, আজ আবার সাজাদপুরবাসীর মধ্যে শুভাগমন করছেন সাহিত্যসম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী। এ শুভ সংবাদ বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে গেল ছায়া ঘেরা পল্লীর আকাশে বাতাসে। অনাহারক্লিষ্ট পল্লীবাসীদের মুখে ও একটা অদূরাগত আনন্দের আভাস জেগে উঠ্‌লো।

অনুরূপা দেবী আস্‌বেন, একথা ভেবে নিজের মনেও কম আনন্দ হয় না। আঠার বছর পূর্বে যখন অবনীন্দ্রনাথ সাজাদপুরে এসেছিলেন, তখন ছিলাম ছোট। বয়স ছিল কম, মন ছিল কাঁচা। সংসারের কোনও জটিলতা দেহের মধ্যে বাসা বাঁধেনি। রঙিন পাখাওলা প্রজাপতির মত চঞ্চল ভাবে উড়ে বেড়াতুম। কিন্তু এখন বড় হয়েছি বয়সের দিক দিয়ে, মনেও নানারকম সাংসারিক অভাব অভিযোগে বেশ একটা ভারি রকমের বোঝা চেপে আছে। তাই একটু আনন্দের সন্ধান পেলেই শত বাধা বন্ধন উপেক্ষা করে মন ছুটে যায় সেখানে।

দশ বছর আগে যখন 'মন্ত্রশক্তি' নাটক করেছিলাম, তখন 'বানীর' চরিত্র দেখে মনে হয়েছিল, হিন্দুর আদর্শ নারী যিনি সৃষ্টি করেছেন, কত বড় আদর্শ মহিলা তিনি। তারপর যত বারই তাঁকে দেখেছি, মনে হয়েছে, মূর্তিমতী বীণাপানি বাংলায় এসেছেন।

তারপর হিমম্লান স্তব্ধ রাত্রিতে অনুরূপা দেবীর পাল্কী এসে দাঁড়ালো ব্যানার্জি কাছারীর প্রাংগনে। তিনি পাল্কী থেকে নামলেন, প্রণাম করতেই সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লেন : কেমন আছ।

বল্লাম : ভাল আছি মাসীমা, পথে আপনার কষ্ট হয়নিতো।

মাসীমা হেঁটে যেতেযেতে বল্লেন : কষ্ট আমার কিছু হয়নি. তবে একটু কষ্ট হচ্ছিল এই বাগ্দীদের দিকে তাকিয়ে। বাগ্দীরা এককালে ছিল বাংলার রক্ষক। বাগ্দী সৈন্য ছিল বাংলার নরপতিদের প্রধান সম্বল, আর বাগ্দী ডাকাতের নামে কাঁপতো সমস্ত দেশ, তাদের আজ এমনি মরণদশা। যে বাগ্দীর রাগ ছিল বাঘের রাগের মত আজ তারা নির্জীব হয়ে পড়েছে ভেড়ার পালের মত।......

আনন্দের উজ্জ্বলতার মধ্যে যেন একটু বেদনার মেঘছায়া ঘনিয়ে এলো।

প্রণামের পালা শেষ হয়ে আরম্ভ হল পরিচয়ের পালা। ভারতী বৌদির বাড়ীতে মাসীমার থাকবার স্থান দেওয়া হয়েছিল সেখানেই সমবেত হলো বাণী সম্মিলনীর সভ্য ও সভ্যারা।

রাত্রি তখন দশটা। মাঘের শীতে যেন ঝিমিয়ে পড়েছে রাতের আকাশ। গাছপালা নিস্পন্দ নিথর, সমস্ত আবহাওয়ায় যেন ছড়িয়ে পড়েছে স্বপনের মায়া। একে একে সমস্ত সভ্যরা বিদায় নিলেন ছুটি হলনা শুধু আমার, ভারতী বৌদির আর শিবানীর। মাসীমার কাছে বসে বসে আমরা গল্প শুন্‌তে লাগলুম। ছোট বেলায় যেমন বাবা মায়ের কাছে রূপকথার অদ্ভুত 'শাস্তর' শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়তুম, আজো তেমনি সব 'শাস্তর' বল্‌তে লাগলেন আমাদের বাংলার সকলের মাতৃতুল্যা মহীয়সী মহিলাটি, তবে এ গল্পে ঘুম আসে না, ঘুমন্ত শরীর উত্তেজনায় চাড়া দিয়ে ওঠে, মুহূর্ত্তে মন হয়ে ওঠে বিদ্রোহী, সভ্য জগতের বিরুদ্ধে।

পরদিন সকাল বেলা তিনি আমাদের সংগে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ী দেখ্‌তে গেলেন। কুঠিবাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে মাসীমা বল্লেন : রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত গ্রাম তোমাদের কত গৌরবের।

নরেনদা বল্লেন : সামনে যে মাঠ দেখছেন এটা কিন্তু চিরকালই এমনি ছিল না, এখানে ছিল, রবীন্দ্রনাথের সখের বাগান। আমি বল্লাম : শুনেছি কবিগুরু নিজে বাগানের তদারক করতেন, নিজে হাতে গাছে জল দিতেন।

মাসীমা বল্লেন : হবেই তো, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা কত বিরাট, তার কতটুকুই বা আমরা জানি। কলসীতে জল ভরতে গেলে, যে জলটুকু উপছে ওঠে সেইটুকুই গড়িয়ে পড়ে বাইরে, তার বেশী তো নয়। কলসীর সবটা জলই যেমন নিঃশেষ হয়ে যায় না; রবীন্দ্র প্রতিভাও ঠিক তেমনি, সবটুকু বোঝা বড় শক্ত।

কুঠিবাড়ীর সব কিছু দেখা হলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল আমাদের সম্মিলনীর নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার 'পৃথ্বীশপাঠপীঠে'। মাসীমা আমাদের গ্রন্থাগার দেখে খুব খুসী হয়ে বল্লেন : তোমরা কেউ কলকাতা গেলে আমার কাছে যেয়ো, তোমাদের লাইব্রেরীর জন্য কয়েকখানা বই দেবো।

আমি বলেই ফেল্লাম : চমৎকার, আপনাদের দেওয়া বই আমাদের লাইব্রেরীর একটা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

এখান থেকেই তাকে আমাদের বাণীসম্মিলনীর দুগ্ধ বিতরাণাগার এবং কুইনিন বিতরণকেন্দ্র দেখানো হল। দলে দলে ছোট ছোট কংকালসার অর্দ্ধনগ্ন ছেলেমেয়েরা কেউ মেটে হাঁড়ি, কেউ এলুমিনিয়ামের ভাঙাবাটি, কেউ বা পথে পরিত্যক্ত দধিভাণ্ড নিয়ে এসে ঘরের সামনে দাড়াচ্ছে, মুখ তাদের শুষ্ক, মলিন, শরীর অবসন্ন। এক গ্লাস দুধ পেয়ে তাদের সেই মুখেও কেমন তৃপ্তির হাসি। মনে হল, হায়রে, এরাইতো দেশের ভবিষ্যৎ বংশধর। এদের না বাঁচাতে পার্‌লে দেশ যে শ্মশান হয়ে যাবে, এদের বুকে প্রাণ না জাগালে দেশের বুকে যে প্রাণ জাগবেনা। এদের মধ্যে থেকেই আবার হয়তো গজিয়ে উঠ্‌বে বাংলার বীর সন্তানেরা।

সাহিত্য সভায় প্রায় পাঁচ হাজার লোক হয়েছিল, বাণীসম্মিলনী তাঁদের সবাইকে উপযুক্ত ঠাঁই দিতে পারেনি, এমনি অবস্থা। মাসীমা বল্লেন : গ্রামে সাহিত্যসভায় এত লোক হয়?

দর্শক এবং শ্রোতাদের ভেতর বেশীর ভাগ লোকই ছিল ভিন্ন গ্রামের। তাঁরা দেখ্‌তে এসেছিলেন বাংলার সাহিত্য-সম্রাজ্ঞীকে, শুন্‌তে এসেছিলেন তাঁর মুখের অমূল্য বাণী। শীতের ম্লান জ্যোছনায়ও সেদিন দেখা দিয়েছিল আনন্দের উজ্জ্বলতা।

পরদিন মহিলা সভাশেষ করে অনেক রাতে মাসীমা বাসায় ফিরলেন।

মাসীমা বল্লেন : গ্রামের মেয়েদেরো বক্তৃতা শুনবার বেশ ধৈর্য্য আছে। আমি কোনও এক মফঃস্বল সহরে গিয়েছিলাম। সেখানে লোকেরা এত বেশী গোলমাল করলে, যে আমার কিছুই বলা হলো না। আমি শেষে বল্লাম : আপনারা যদি আমাকে দেখ্‌তে এসে থাকেন, তবে দেখা হয়ে গেছে আমি চলে যাই, আর যদি আমার কাছে কিছু শুন্‌তে চান তবে একটু ধৈর্য্য ধরে শুনুন। কিছুতেই সভা করতে পারলুম না সেদিন।

এই সময় কয়েকটি মহিলা এলেন। নানা রকমের আলাপ চললো তাঁদের মধ্যে। কথা প্রসংগে অনুরূপা দেবী বল্লেন : দেখো, আজ কালকার মেয়েরা হিন্দুধর্মের আচার নিয়মগুলিকে কুসংস্কার বলে অবজ্ঞা করে, কিন্তু সব কিছুই তো কুসংস্কার নয়। যেমন, ধরো, ভোরে উঠে গোবর ছড়া দেওয়া, ঘর নিকানো, সন্ধ্যাবেলায় ধূপ ধুনো দিয়ে শাঁখ বাজানো, এর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। শুধু ধর্মের দিক থেকে নয় স্বাস্থ্যের দিক থেকেও। ধর্ম বল্‌তে তোমরা কি বোঝ? যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে তাই ধর্ম। এবং সেইজন্যেই আমাদের শাস্ত্রকারেরা এই সব আচার নিয়মগুলিকে ধর্মের দোহাই দিয়ে মান্‌তে বাধ্য করে গেছেন।

একটি মহিলা বল্লেন : চমৎকার কথা। মাসীমা বল্লেন : জানতো, আমার ঠাকুরদাদা কম রক্ষণশীল ছিলেননা। পালকী শুদ্ধ গঙ্গাস্নান করতে হতো আমাদের বাড়ীর মেয়েদের। ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়ীর নিয়ম ছিল মেয়েরা পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে প্রত্যেকে এক ঘড়া করে গঙ্গাজল আনবে, পুজোর ঘরে জোগাড়

আমাদেরই দিতে হতো। আমরা স্তোত্র পাঠ করতাম এবং ব্যায়াম করতাম। তোমরা যে স্ত্রী স্বাধীনতার কথা বলো, স্ত্রী স্বাধীনতার কথা আমাদের দেশে কি করে ওঠ? আমাদের দেশের পুরুষরাই পরাধীন পুরুষদের হাতেই অস্ত্র নেই, সে ক্ষেত্রে মেয়েরা পথে বেরিয়ে আত্মরক্ষা করবে কি করে বলতো।......

অনুরূপা দেবী সাজাদপুর পল্লীবাসীদের আগ্রহে এবং অনুরোধে আরোও চার পাঁচদিন আমাদের এক নূতন কোলাহলে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। আনন্দের হাট বসেছিল সাজাদপুরের পল্লী প্রান্তরে। নগণ্য বলে তিনি কাউকে দেখা দিতে নারাজ হন্‌নি, যে ডেকেছে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তার বাড়ীতেই গেছেন, কোন অভিমান দেখিনি, খ্যাতির গর্বে তিনি সাধারণ মানুষের ওপরে ওঠেন নি। সাজাদপুরের একটি মুসলমান ছেলে তাঁর খুব ভক্ত হয়ে উঠেছিল, তিনিও ছেলেটিকে স্নেহের চোখে দেখেছিলেন, কলকাতা গিয়ে ছেলেটিকে তিনি একখানা স্বলিখিত পুস্তক পাঠিয়ে দেন। এ সৌভাগ্য কয়জনার ভাগ্যে ঘটে! আমরা তাঁর স্নেহকোমল হস্তের অনেক উপহার পেয়েছি, যা দিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছি। এ উচ্ছ্বাস নয়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আকুল আগ্রহ নয়, মায়ের পায়ে ছেলের প্রণাম নিবেদন।

আমাদের লাইব্রেরী

ভয়ংকর আফ্রিকা—শ্রীরামনাথ বিশ্বাস। মূল্য ২।০

রামনাথবাবুর ভূপর্য্যটন যে একটা নতুন রকমের ব্যাপার 'ভয়ংকর আফ্রিকা' পড়তে পড়তে প্রথমেই সেই কথাটা মনে পড়ে। এরকম ধরণের পর্য্যটনের বই আমি আগে কখনো পড়িনি। বইখানা পড়লেই বোঝা যায়, রামনাথবাবু একগুঁয়ে লোক; কারুর কাছে কখনো মাথা হেঁট করেন না। লোকটি কিন্তু সরল এবং অভিমানী। তাই কারো বাড়ী অতিথি হলে তাঁকে খামকা যদি প্রশ্ন করা হয়—"মশায়, আপনার ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি" তাহলে তিনি জলগ্রহণ না করেই সে বাড়ি ত্যাগ করবেন। বইটা পড়লেই পর্য্যটকের চরিত্রটি চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে। রামনাথবাবু বইএর কোথাও নিজেকে লুকিয়ে রাখেন নি; নিজের অজান্তেই নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যে সেই সরল স্পষ্ট সতেজ ভঙ্গীতে মুগ্ধ হতে হয়। এই কারণেই রামনাথবাবুর পর্য্যটনের ইতিহাসখানা একেবারে নতুন রকমের হয়েছে।

বইখানাতে লেখার দোষ কিছু কিছু আছে। কোনো প্রসঙ্গ আরম্ভ করে লেখক প্রায়ই ভুলে যান কি দিয়ে প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছিল। এটা তাঁর উত্তেজনাশীল চরিত্রের লক্ষণ—এবং এত স্বাভাবিক যে রাগ করা চলে না।

আফ্রিকার উৎকট বর্ণ-বিদ্বেষ, ওদেশের ভারতীয় বাসিন্দাদের আচার ব্যবহার, জীবনযাত্রা এ সবই রামনাথবাবুর স্বাধীন প্রকৃতিকে পীড়া দিয়েছে। আজ পঁচাত্তর বছর ধরে যে ওখানে দলে দলে ভারতীয় গিয়ে বাসা বেঁধেছে, তারা ব্যবসা আর বাণিজ্য নিয়ে আছে, কেউ কেউ সোনার তাল আর গুপ্তধন খুঁজেও ফিরছে এত খবর আমরা কে-ই বা জানতুম? আফ্রিকার জঙ্গলের হাতী আর সিংহের সন্ধান আমরা রাখি—কিন্তু—ডু-ডু পোকার? যাঁরা নখের মধ্যে ঢুকে পড়লে এক নিগ্রোরা ছাড়া আর কেউই তাদের খুঁটে বার করতে পারে না? আফ্রিকা যে অতি মনোহর দেশ, নিগ্রোরা যে এমন চমৎকার মানুষ এরই বা সংবাদ আমাদের কে দিয়েছে? এই বইখানি তাই আমি সকলকে পড়তে অনুরোধ করি।

বন্ধুরা!

জৈষ্ঠের প্রখর রোদে বাইরের পৃথিবী যখন পুড়ে যাচ্ছে, দরজা জানালা বন্ধ করে আমি ভিতরে বসেছি, সামনে তোমাদের রাশীকৃত চিঠি। কখনও কখনও খড়খড়ি তুলে বাইরের রাজপথটা একবার দেখে নিচ্ছি, দু'একটা প্রাইভেট কার অথবা ট্যাক্সি হুস করে চলে যাচ্ছে, কখনও বা ক্লান্ত ঘর্ম্মসিক্ত চালক তার রিক্সাখানিকে নিয়ে মন্থর পায়ে ঠুং ঠুং শব্দ করে চলেছে, মুখে যেন 'আর পারিনা' এই ভাব। কিন্তু তারপরেই দেখছি অবিরাম গতিতে এবং বীরদর্পে চলেছে মিলিটারী লরীগুলি। কিরকম অসামঞ্জস্য লাগেনা? তোমরা এখন কি করছো? স্কুলের সব ছুটি, যাদের পরীক্ষার ব্যপার ছিল তারাও রেহাই পেয়েছে—কেউ হয়তো বন্ধ ঘরের মধ্যে ঘুম দিচ্ছে, কেউ হয়তো দু'একটা গল্পের বই নিয়ে এপাশ ওপাশ করছে, রোদটা পড়লেই বাঁচি একটু খেলতে পাওয়া যাবে' এই মনোভাব, আর যারা শোয়া বসা পছন্দ করেনা তারা এঘর ওঘর করে মায়েদের কাছে অনর্থক বকুনী খাচ্ছে কেমন না? কিন্তু আমি বসেছি তোমাদের সুন্দর সুন্দর চিঠিগুলির জবাব দিতে। প্রথমেই পেয়েছি পেনসিলে বড় বড় অক্ষরে লেখা একটা চিঠি পিসিমা হবার তাগাদা নিয়ে, লিখেছে—

বাণী রাণী

নাম নেই পুরো, ঠিকানা বা গ্রাহক নম্বর কোনও কিছু নয়—কিন্তু তা করলে কেমন করে পিসিমা হওয়া যায়? তোমার নাম যদি বাণী না হয়ে অন্য কিছু হতো পিসিমা হতে পারতাম কিন্তু যার নাম বাণী তার 'দিদি' ছাড়া কিছুই হতে পারিনে— জানো ভাই?

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য (মোগলসরাই) ১৩০৯ রংমশাল আগে ছাপা হয়েছে সুতরাং সে খবর তার বহুপূর্ব্বেই তোমরা পেয়েছো তার আলোচনার কি দরকার আছে? নতুন বৈশাখের রংমশাল তোমার তো সবই ভাল লেগেছে দেখছি। মনোনীত গল্প বা লেখার সন্ধান পেতে হলে পরিচালক মশাইকে লেখা সব চেয়ে ভালো। সব কটা নাম একসঙ্গে যোগ করে নেওয়া বা কোনও সমিতির নাম দেওয়া হলে এক গ্রাঃ নম্বরে চলবে। তোমরা অনেককেই ধ্বনি প্রতিধ্বনির কথা লিখেছ কিন্তু যাদের লেখা দেবো বলেও দিইনি—তাদের লেখা নেওয়া হবেনা, নতুন কিছু মতামত পেলে প্রকাশ করবো। **বাসন্তী রাণী দেবী** (গুণাইগাছা) গ্রাহক নম্বর নেই। এই ব্যাপারে তোমাদের কাছে হার মেনেছি আমি। অজানা সাহিত্য পরিষদের বিষয় কিছু জানতে হলে এলগিন রোডে তোমরা সোজা লিখবে। কেবল ২য় বর্ষের পুরো সেট পাওয়া যাবে, দাম ৫৲। অন্য বছরের পুরো সেট পাওয়া যাবেনা। **ঝরণা দত্ত** নতুন বিভাগ এখন বর্ত্তমানে সম্ভব নয়। ধাঁধাটা ভাই বড় পুরানো—নতুন দেখে পাঠাও কিছু। নতুন রংমশাল ভাল লেগেছে একথা অনেকেই লিখেছে। **জ্যোতির্ম্ময় হিরণ্ময় ঘোষ দস্তিদার** ঢাকা (১৯৪১) রাজা কেন করবো বলোতো? উত্তর দেবার কিছু থাকলে যে অবশ্যই দেওয়া হয় একথা অনেকবার বলেছি। ছোটদের বিভাগ নিয়ে বেশ যুক্তিপূর্ণ লেখা পেলেই প্রকাশ করবো অযথা আক্রমনের কোন সার্থকতা নেই। **জ্যোতির্ম্ময়** (১১১৭) ইন্দিরা দেবীর মারফৎ চিঠি আমার কাছে পৌছেচে। উৎসব মন্দ হয়নি, তোমাদের জন্য এবং তোমাদের উপযুক্ত অনুষ্ঠান হয়েছিল এলে আনন্দ পেতে। **অধীররঞ্জন দাস** (বরিশাল)

১৩৪২ তোমাদের প্রত্যেকের চিঠীতে এককথা নূতন রংমশাল ভালো লাগলো। জানোতো তোমাদের ভালো লাগলে আমাদের কত ভাল লাগে। তোমার কথা যথা স্থানে পৌছে দিয়েছি। **মণিমালা** (ভবাণীপুর) ৫৭৭ আন্তরিক দুঃখিত ভাই তোমাদের পারিবারিক দুর্ঘটনায়। অন্য কথা যা লিখেছ তার উত্তর হচ্ছে সব ঠিক হয়ে যাবে। **সাধনা রেণুকা বিশ্বাস** (চট্টগ্রাম) ১৬৬১ আমার মনে হয় তোমারা অজানা পরিষদে নিজেরা চিঠি লিখে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখো তাতে কাজের সুবিধা হবে। তোমাদের আন্তরিক প্রীতি আমিও অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছি ভাই। **জ্যোতির্ম্ময়** (তেলেনীপাড়া) ১১১৭ তোমার সুন্দর, যুক্তিপূর্ণ চিঠিখানি ভালো লাগলো— ইচ্ছা হচ্ছিল ভাই বোনদের উপহার দিতে। **অশোক গুহ** (বরিশাল) ২০৪৩ তোমার দু'টি চিঠি গদ্যে এবং পদ্যে পেয়েছি শ্রীরঙ্গমের অনুষ্ঠান তোমার ভালো লেগেছে ইন্দিরাদেবীকে জানিয়ে দিয়েছি। ঠিকানার কথা যা লিখেছ তাই হবে। **রমলা সাহা** (মাজু) ২০৮৯ রাগ করতে নেই, লেখা পাঠাবে পরিচালক মশাইকে, একখামে দিলেও সব আলাদা কাগজে লিখবে। ধাঁধাও তাই। **বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়** (হাওড়া) আমি তোমার লেখা সম্বন্ধে জেনেছি, সেটি ঠিক আছে এবং প্রকাশ করবার ইচ্ছা ও আছে। তোমার আদর্শ জয়যুক্ত হোক। মিনতি চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি ভূষণ চক্রবর্ত্তী, মঞ্জুমালা সরকার, সত্যেন্দ্র নাথ কাঞ্জী, শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অজিত ভট্টাচার্য্য, ইলারাণী বসু, প্রীতিকণা কর, সত্যব্রত ও দেবব্রত ঘোষ, সমরেন্দ্র নীলিমা উমা চক্রবর্ত্তী এবং প্রতিভা রঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় (কবিতায় লিখা চিঠি) পেয়েছি।

সকলে আমার প্রীতি ও স্নেহ নিও

তোমাদের

দিদিভাই

নূতন ধাঁধা

(১) দু'জন লোক পাশাপাশি চলেছে। তাদের মধ্যে একজন ছোট, আরেকজন বড়। যে ছোট, সে হচ্ছে বড়'র ছেলে। বড় কিন্তু ছোট'র বাবা নয়। বলতো এ কি রকম করে হয়?

(২) একজন প্রত্নতাত্ত্বিক বলেছেন যে তিনি একটা প্রাচীন মুদ্রা পেয়েছেন, তাতে লেখা আছে যে সেটা খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৪৯ সালে তৈরী হয়েছে। তিনি হয় মিথ্যা বলেছেন নয় ধাপ্পা দিচ্ছেন। কেন?

(৩) দু'জন বাবা ও দু'জন ছেলে প্রত্যেকে একটা করে হাঁস মারল। তাদের মধ্যে কোন হাঁসকেই দু'জন গুলি করে নি। কিন্তু মোটে তিনটে হাঁসকে মারা হ'ল বলতো কেন?

বৈশাখ মাসের ধাঁধার উত্তর আষাঢ় সংখ্যায় বাহির হ'বে।

রংমশাল

নবম বর্ষ (৩) আষাঢ় ১৩৫১

একাচোরা

অজিত দত্ত

ব্যাঁকাচোরা রাস্তায় একাচোরা সেন
হোগ্‌লার বেড়া এঁটে একলা থাকেন।
রাস্তায় পা দিলেই সস্তা খাতির
পাড়াতুতো খুড়ো জ্যাঠা ভাগ্নে নাতির—
একটুকু আস্কারা যদি দেওয়া যায়
বাড়িতে চড়াও করে' বসে আড্ডায়
একাচোরা মশায়ের সয়না এ-সব,
পাঁচজন লোক ডেকে নাচ-তাণ্ডব।

বন্ধু ও বান্ধব সন্ধান করে'
রাতদিন সাতপাড়া ঘুরে' যারা মরে,
যারা যায় সিনেমায় আর পার্কে
তারা ছাড়া দুনিয়ায় বোকা আর কে?
সময়ের করে লোকে বাজে খরচা
আত্ম-জাহির আর পরচর্চা—
সেই হেতু সুচতুর একাচোরা সেন
দরমার বেড়া এঁটে ঘর্মে ভেজেন।

ব্যাঁকাচোরা রাস্তার একাচোরা সেন
সবার মান্য আর ধন্য বটেন।
ছেলেমেয়ে করে যদি হৈ-হুল্লোড়
দুদ্দাড় খেলাধূলো রাতদিন ভোর
বাপ-মা শিক্ষা দিয়ে বলেন তবে,
'ওঁর মতো শান্ত ও শিষ্ট হবে।
হোমরা-চোমরা আর গোমরা বটেন
স্বদেশের গৌরব একাচোরা সেন।'

ভুতপত্রীর যাত্রা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—কালুমঘের পালা—

॥ আরাম চটির সাট ॥

জুড়ি দোহার গীত—

তুলাগাছে কুড়গাল বৈকালে পড়ে ছাও,
কালুমঘ শয়ন ছাড়ে চৈতন করে গাও।
রাখোয়াল নয় সে তুপুরিয়া ডাকাত,
গাওয়ানে রক্ত নিয়া ধোয় মুখ হাত ॥
তুলাগাছে কুড়গাল বৈকালে কাড়ে রাও,
আহে বাঘে আর মঘে দেখি একুই প্রকার,
ঝাঁটা গোঁফ চাটে আর কাঁচা গোস্
করে পার—
হাঁহে ছেলেধরায় শিশু ডরায়, আগুনে
ডরায় পশু,
ছাগল বাঘেরে ডরায়, জনেরে ডরায়.
পাগলা নশু ॥

॥ নশু পাগলার প্রবেশ ॥

॥ গীত ॥

ভাই, কালুমঘে কে না ডরায়, যে আছে
যেথাকার ?
বাবা ও কথায় কাজ নেই—চুপচাপ্
থাকাই সার।
জেনো, গহন কাননে কিম্বা পর্ব্বত কন্দরে
ভয়াল উল্লুক ভাল্লুক কালুমঘে খুব
ভয় করে।
গভীর সাগরে কিম্বা নদীর অন্দরে
হাঙ্গর কুম্ভীরাদি যদি বাস করে
কালুমঘে তাদেরও জালে ধরে।
ও সে মেঘেতে তড়িৎ যেন ইন্দ্রের অশনি
খামকা তেড়ে ঘাড়ে পড়ে যখনি—
তখনি কর্ম্ম কাবার করে।
ও সে খায় বাঘের কাবাব, গাণ্ডারের
কোপ্তা, সিংহের ভত্তা
কেবা তার কি করে।
অলজ্যার চরটা জাইগীর তার, ও সে
খাজনা আদায় করে
বর্গীরও ঘরে বর্গাদারেরও ঘরে ॥

॥ চোপ্দারের প্রবেশ ॥

॥ গীত ॥

চুপ্ ও চুপ্—চপ্ ও চপ্ ;
তুলাপটির আরাম চটিতে বারাম দিতে
এসতেছে কালুমঘ
ওরফে কালুরায় ভুপ্।

মহরার হৈহয় কাননও হাহাহু।৵
চুপ ও চুপ্ ॥
আগুসার কালো পল্টনের কেলো সারদার
জাঁদরাল হেঁড়াল
জহ্লাদ কোটাল জমাদার দফাদার
মোটাল সোটাল বার্ঘডাঁসা গাণ্ডার
সারে সার সেফাই শান্ত্রি তালপাতার
ঢাল তলোয়ার।
দেয়ান মুনসী কার্পরদাজ
খানসামা স্বরূপ।

॥ কালো সর্দ্দারের প্রবেশ ॥

লেফ্ট্ রাইট অফ্ লাইট্
ষ্ট্যাণ্ড অপ্, সিট ডাউন
মাড্রাস্ ব্যাণ্ড স্লাইট্ স্লাইট্ ॥
(মৃদু বাদ্য—মাদ্রাজী ব্যাণ্ড)
ঝাং কিড়ি কিড়ি ঝাং
চাং চাং মোচাং চাং মোচং—পাণ্টলু
গুড়ু গুড়ু
ধিরিকিটি ধিরিকিটি ঝাং ঝাং
সর্দ্দার ঝিঁঝিপোকার লম্বা তুই ঠ্যাং
ভেংচে ভেংচে চিনাবাজার
চাইনা ম্যান।
কালু। একপল চারি বিপল বাকি
সাম হতে
মাসি বাড়ী হতে কে যায় পিসি
বাড়ীর পথে ?
হস্তেতে লণ্ঠন লাঠি ধরে
কি কারণ ?
স্বরূপ জানিতে চাই সত্য বিবরণ !

স্বরূপ। একা মর্দ্দ যায় ময়দান কর্ত্তে ফতে
ইয়ার মদ্দগার কেউ নাই সাতে।
না হয় বৈদেশী না হয় তপসী
খুঁটে খৈ বেঁধে দিয়েছেন মাসী।
রং-বেরং লন্ঠনের কাঁচ
ঠন্ঠনের চটি পায় হাতে লাঠি গাছ।
কালু। বর্ণনে হুবহু তাজা তাজা
অবিন ঠাকুর ছবির রাজা।
কোথা হতে কে আইল তুসমন
ভুরুৎ ভট্চাজ্ করতো গনন।

ভুরুতের গণনা।

মিরি মস্তরী কর অতারদ তারা
কোমর জোহেরা জেছেন এ সাত ছেতারা।
মিল্ বৃষ সিংহ কর্কট করিলাম গনন
মাসিমাতার বাড়ী ছেড়ে করিছে গমন
হুঙ্কার সিং শাদ্দুল সিং তুজনে দর্শন
করেছে তারা।
কালু। আজ কোন তিথি খুলে দেখতো
পাজি ?
ভুরুৎ। মাস পুন্নমিতি শিয়রে সংক্রান্তি !
হালু। অ্যাঁ বলকি ! শিয়রে সংক্রান্তি !
ভুরুৎ। বাকি আছে বিয়াল্লিস কড়া তুই
ক্রান্তি।
মুনসী। কাঁটাতে ঠেকে যে তেয়াল্লিস
কড়া তিন ক্রান্তি !
ভুরুৎ। আমার গনা মুলোদান্তি।
মুনসী। আমার গনা শূলোদান্তি।
কালু। রেখে দাও পাঞ্জি কুলোকানি
ধুলোদান্তি!

দেয়ানজী, দেখি তোমার কানটি
বেওফা চাকর হৈতে ভালাই হয়
কার (কর্ণমর্দ্দন) ?
হাহাহুহু। হাহাঃ হাহাহুহু (হাস্য)।
দেয়ান। আহা উহু কি করেন করতার
কান বস্কি কর যদি করে থাকি
খাক্‌ছার।
মুনসী। কানাকানিতে কি কাজ আর ?
খোলোষা করিয়া জানাও হজুরে
জমাদার।
কালু। মারিতে চায় অলজ্ঝার জাইগীর
আমার,
কত হাত বুকের ছাতি তার ?

॥ জমাদারের গীত ॥

হজুর, ওজুদ তার পিল মস্ত
জাবান দরাজ খুল্লা মস্তক ;
ধুতি পইনেছে সাড়ে একগজ—কোঁচা ইস্তক,
পাঁচগজ জামা বোতাম ছুট্‌
খালি বুক,
জ্বাতির বহর এতেই বুঝ্‌ করেন—কয়
গিরা পরসস্ত !
কালু। ওফা তার কতটা দফাদার ?

॥ দফাদারের গীত ॥

একদফা তজ্‌বিজ্‌ করে দেখা গেল ভাব-
গতিক—
ক্ষণে পায় সম্বিৎ ক্ষণে রয় মোহশ্চিৎ।
দুই দফা দেখা হল তজ্‌বিজ্‌ করে
রিত্‌ ভিত্‌—
তার নিজেরই চীজ নিশ্চিৎ।

তিন দফা দেখা গেল ভাব সাব
তজ্‌বিজ্‌ করে—
আসল হাঘরে।
ভুরুৎ। নিশ্চিৎ নিশ্চিৎ।
কালু। শিয়রে সংক্রান্তি এবারে নিশ্চিৎ।
মুনসী। আর কিছু নাই অনিশ্চিৎ।

॥ গীত—মুনসী প্রমুখ সকলের ॥

কাঁটায় কাঁটায় শিয়রে সংক্রান্তি এবার
কাঁটা দেয় গাটা আমার।
গোস্পদ পারায়ে,
গোধুলি মাড়ায়ে, কে চলে আগায়ে—
মারিতে গাণ্ডার লুটিতে ভাণ্ডার ?
নিধিরাম সর্দ্দার—না ঢাল, না
তরবার ;
ফিরে এলো কি আবার ?
বোঝা ভার কি হতে কি হয়
আবার !
কালু। ঐ নাম আবার ?—বল বিধিবাম
সর্দ্দার ; আর কেউ নয় আমার বোধ
হয় ফুলিস্‌ চিত্রগুপ্তের পুলিশ
কমিশানার
সন্ধানে এসেছে আমার।
শিয়রে সংক্রান্তি দেখকি আর !

॥ গীত বাদ্য—কালু রায়ের দাপট ॥

এরে চাঁড়ালু মাড়ালু কালী করালু সুবাদার—
দেখ কি আর !
সাজাও কালো পল্টন
থাকে থাকে পাকে পাকে তাকে কর বেষ্টন
ফাঁক না থাকে যেন মাছি গলিবার।

বেঁটে বঙ্কট এঁটে লঙ্গট্‌ হও আগুসার
বাটে সংকট বাধাও অলজ্ঝার।
উলঙ্গ করতে চায় অলজ্ঝার মিস্তিরী
উল্‌টাতে চায় মঘের মল্লুকের হিস্টিরী
কেসে বিতিকিচ্ছিরী গোঁয়ার ?
ভুতকালের ভুতত্ব প্রেতলোকের প্রত্নতত্ব
করতে চায় আবিষ্কার।
উড়াও কালো নিশান অন্তরীক্ষে
চক্ষে যেন অন্ধকার নিরিক্ষে
নয়তো সান বন্দরের বৃক্ষে
কবন্ধ ঝুলাবো সবাকার।
তবে আমার নাম কালো সর্দ্দার॥
কয়েদ কর কায়দা কর ধড়টা তার
পেরেশান করিল আমাকে বারবার
এ আর কেউ নয় সেই বিধিবাম সর্দ্দার—
মালুম !
সকলে। মালুম মালুমজী
মশা মোষ বিজি উই চিংড়ি
মালুম মালুমজী,
হুকুমদার হুতুম ভুতুম মালুম
অপ্‌ তেজ মরুৎ বোম ক্ষিতি।

॥ সকলের হুমকী গীত ॥

অপ্‌ অপ্‌ ক্ষিত্যপ্‌ তেজ মরুৎ বোম সব
নাকে-মুখে ধুলা মল চট্‌পট্‌
উড়াও ঘোড়া পথ কর জোড়া টপাটপ
বটের সমান ফের ডালে ডালে
উকিঝুঁকি মারো আড়ালে অবডালে
কি শাম মিস্তিরীর ইটের দেয়ালে
মাঠে মাঠে আলে আলে
অপ্‌ অপ্‌ আগাও সব। (প্রস্থান)

॥ অবুর প্রবেশ ॥

অবু। না পালকী, না নালকী, না
গাড়ী, না ঘোড়া—চলেছি তো চলেইছি—
যেন কী তো কী—না সজীব না নির্জ্জীব
জীব একটা—! রাত ঘোরা ! মাঠ ঘাট
ভাঙ্গতে টেরটা পাচ্ছেন দুটা পা !
কে জানে পিশির বাড়ী কত দূর—
পথতো দেখি অফুর—বহুদূর এখনও
কুমড়োর ঝোল কাঁকড়া—পা দুখানা ভারি
ঠেকছে যেন শিল আর নোড়া। পোড়া
দেশের পথে কি নেই একটা সাইন
বোড—মাইল পোষ্ট ধরা !

॥ ত্রিসত্য বাবাজীর প্রবেশ ॥

সইত্য সইত্য সইত্য—
ভাবো মন দিবা নিশি সইত্য
পথের সেই ভাবনা,
ছংছারের বাঁকা পথে
দিনে রাতে চোর ডাকাতে
দেয় যে হানা,
এখানে নাই ছাইনবোড মিলপোষ্ট—
সবই গরমিল একটানা,
ভেখ্‌ নেনা মন সইত্য পথে সইত্য সইত্য
ত্রিসত্য বাবাজীর বাইক্য লেনা !
(প্রস্থান)
অবু। ও বাবাজী, বলি ও বাবাজী,
এ স্থানটার নাম কি ? বস্‌ চলে গেল
উত্তরই দিলেনা। সত্য ত্রিসত্য না
অসত্য কিচ্ছু বুঝতে দিলে না—রাস্তাটা
যেন সাপের মত গিলে ফেল্লে লোকটাকে।
ভুল দেখলেম না সত্যি দেখলেম কিছু
বোঝা যাচ্ছেনা—উদ্ধব যা বলেছিল
হয়তো বা—না না, এগোনো যাক্‌ আর
দাঁড়ানো নয়। এসব স্থানের কারখানা
ভালো ঠেকছে না। (প্রস্থান)
ইত কালুমঘের পালা ॥

ডেভিড্ লিভিংস্টোন: স্কটল্যাণ্ডের লোক। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম, ১৮৭৩এ মৃত্যু। অতবড় দেশ-আবিষ্কারক ইতিহাসে দুর্লভ। তোমরা যদি সত্যিকারের রোমাঞ্চকর কথা পড়তে চাও ত' তাঁর শেষে বয়সের ডায়েরিখানা পোড়ো। তাঁর মৃত্যুর পর সেটা প্রকাশ করা হয়েছে। নাম The Last Journals of David Livingstone. ইংরেজী পড়বার অভ্যাস যদি আজই না থাকে, পরে নিশ্চয়ই হবে।

আফ্রিকার অন্ধকার জঙ্গল

ছেলেটির বয়স তখন মাত্র বছর দশেক। সেই বয়সেই তাঁতকলে ঢুকতে হল মজুর হয়ে। কিন্তু, মজুর হয়ে জীবন কাটাবার জন্যে ও নিশ্চয়ই জন্মায়নি। বড় হতে হবে, অনেক অনেক বড় হতে হবে, যে-সব দেশে মানুষ কখনো পা বাড়ায়নি সেই-সব দেশের খবর আনতে হবে—আফ্রিকার অন্ধকার জঙ্গলে পথ কেটে এগিয়ে চলতে হবে, এগিয়ে চলতে হবে অজানা অচেনা নদীর সন্ধানে! ও ছেলেকে তাঁতকলের মধ্যে চিরজীবন কেমন করে আটকে রাখা সম্ভব? কিন্তু, শুধু অলস ভাবে ভাবলেই ত' চলে না! তাঁতকলের মজুর, বয়েস মাত্র বছর দশেক। জীবনে অত বড় হয়ে উঠ্তে হলে যতটা জ্ঞান থাকা দরকার তা ও পাবে কেমন করে? লিভিংস্টোন কিন্তু হাল ছাড়বার ছেলে নয়; বয়েস মাত্র বছর দশেক হলে কি হয়, তাঁতকলের মজুর হলে কি হয়, মরীয়ার মতো সে চেষ্টা করে চল্‌ল লেখাপড়া শিখতে। কম দিন নয়—পুরো তেরো বছর—দশ বছর বয়েস থেকে তেইশ বছর পর্যন্ত, একটানা রুদ্ধশ্বাস চেষ্টা। তারপর তাই কলেজে পড়বার মতো অবস্থা হল। তেইশ বছর যখন বয়স তখন তাঁতকল ছেড়ে ঢুকল কলেজে, স্বরু করল ডাক্তারী পড়া। ভাগ্যিস্ ডাক্তারীটা শিখেছিলো—নইলে আফ্রিকার ওই অন্ধকার জঙ্গলে একা-একা কেমন করে যেত সে? কত রকম বিপদ-আপদ, অসুখ-বিসুখ যে কত তারই কি শেষ আছে? রোগ হলে কে সেখানে তার চিকিৎসা করবে? নিজে ছাড়া করবার লোক ত' বাস্তবিক কেউ নেই। ডাক্তারীটা শিখে নিয়ে লিভিংস্টোন খুব ভালই করেছিলেন।

তারপর বয়স যখন সাতাশ, লিভিংস্টোন (এখন আর ছেলেমানুষ নন, তাই "তিনি" বলে বলতে হবে) যাত্রা করলেন আফ্রিকার দিকে। আফ্রিকা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান তখন খুবই সামান্য। —ওখানে গভীর জঙ্গল আছে, মানুষ-খেকো বুনো মানুষ আছে, আছে ভয়ানক সিংহ আর বিষাক্ত সাপ—এ কথাটা মোটামুটি সবাই প্রায় জানতো। কিন্তু, ওই পর্যন্ত। সেই গভীর অরণ্যের মধ্যে ঢুকে বেশী কেউ বিশেষ কোন খবর তখনো আনতে পারেনি। কোথায় কী নদী আছে? কোথায় আছে কোন্ পাহাড়? আফ্রিকা ত' আর এতটুকু জায়গা নয়: তার মধ্যে কত বিপদ, কত রোমাঞ্চ, কত আশ্চর্য অদ্ভুত জায়গা। এ-সব জায়গার খবর আজকাল হয়ত তুমি-আমি অনেক পড়েছি; আজকাল কত লোকে দেখেও এসেছে। কিন্তু, আজ আমাদের পক্ষে এত সব জানা সম্ভবই হত না লিভিংস্টোন না জন্মালে। কারণ, ওই সব অজানা আশ্চর্য জায়গায় প্রথম ঢুকেছিলেন তিনি। ওই সব গভীর জঙ্গলের খবর প্রথম তাঁরই জোগাড় করা। আর জীবন কী অদ্ভুত, আশ্চর্য! কোথায় লাগে রোমাঞ্চকর উপন্যাস? সত্যিকারের রোমাঞ্চ যদি পেতে চাও তা হলে র‍্যাজ্‌লা বাজে উপন্যাস ছেড়ে লিভিংস্টোনের

একটা ভালো জীবনী জোগাড় করে পড়ো। খাবার নেই, ওষুধ ফুরিয়েছে, একটা হাত সিংহ চিবিয়ে বরাবরের মতো জখম করে গেছে, জ্বর—আফ্রিকা জঙ্গলের জ্বর; আমাসা,—আফ্রিকা জঙ্গলের আমাসা;—তাঁর চারদিকে অসংখ্য হিংস্র জানোয়ার, অসংখ্য হিংস্র মানুষ। লিভিংস্টোন একা। অন্ধকার আফ্রিকায় পথ খুঁজে চলেছেন। সঙ্গী নেই। বন্ধু নেই। আবিষ্কারের নেশা তাঁকে প্রায় পাগল করে তুলেছে। পথ তিনি বের করছেন, বের করছেন অজানা জলপ্রপাত, অচেনা পাহাড়, নাম-না-শোনা নদী! আবিষ্কারের নেশায় বিভোর। আর কোনো খেয়াল নেই। এমন নয় যে কোথায় গুপ্তধন রয়েছে তার লোভে চলেছেন। তা হলে আর মানুষটা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস করবার কিছু থাকে না; যদি গুপ্তধনের লোভে মানুষ জীবন-মরণ পণ করে তাতে তার সাহস থাকতে পারে, বুদ্ধির পরিচয় থাকতে পারে, কিন্তু মহত্ত একটুও থাকে না। লিভিংস্টোন-কে মানুষ কোনদিনই ভুলবে না, লিভিংস্টোন-কে মানুষ শ্রদ্ধা জানাবে চিরদিন। কেন না, তিনি যে অত বিপদ তুচ্ছ করে এগিয়েছিলেন তা লোভের বশে নয়, নিছক আবিষ্কারের নেশায়। কতবার সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যু এসে দাঁড়ালো—অতি ভয়ানক, নিশ্চিত মৃত্যু—হয়ত এক চুলের জন্যে বেঁচে গেলেন; হয়ত অসুখে ভুগে বা আহত হয়ে কোনোমতে ফিরতে হল দেশে। কিন্তু, যে ছেলে দশবছর বয়স থেকে তাঁতকলের মজুর হিসেবে কাজ করতে করতে বিপদ-বাধার সঙ্গে লড়াই করতে শিখেছে, সে ছেলে অত সহজে হটবার নয়। তাই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অভিযানের আশা ছাড়েননি'; লোহার মতো মজ্‌বুত তাঁর শরীর অনাহারে, অনিয়মে, রোগে, আঘাতে ভেঙে পড়ল; তবু আবিষ্কারের নেশা কাটল না। আফ্রিকাকে জানতে হবে, দেখতে হবে। এ-কথা তিনি একদিনও ভুলতে পারেননি।

আর বাস্তবিক, কী অদ্ভুত সব আবিষ্কার! কালাহারি মরুভূমি পেরিয়ে নগামী-হ্রদ আবিষ্কার! কম কথা নয়। ল্যাডোগা-হ্রদ আর ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আবিষ্কার! কী দুঃসাহস! রাভুমা নদী ধরে এগিয়ে চলা সে-নদীর খবর যোগাড় করতে। যম যেন চলেছে পাশে পাশে; প্রত্যেক মুহূর্তে ওৎ পেতে রয়েছে সুযোগ পেলেই টুঁটি টিপে ধরবে! নয়াসা-হ্রদ খুঁজে বের করা, যে হ্রদের খবর আগে কোন সভ্য মানুষের জানা ছিলো না। এমন আরও কত কি। যেমন দুঃসাহস, তেমনি শক্তি আর বুদ্ধি। অন্য কেউ হলে কবে যে সিংহের পেটের মধ্যে মিশে যেতে হত! কেউ আর টেরও পেত না। আফ্রিকার মানচিত্র খানা একবার খুলে দেখো। আজ আমরা খুটিনাটি অনেক খবর জানি আফ্রিকা সম্বন্ধে। কিন্তু মনে রেখো, লিভিংস্টোন না-জন্মালে এর অনেকটাই আমাদের কাছে অজানা থাকত।

আবিষ্কারের অমন নেশা! তবু, মজার কথা, আফ্রিকা তিনি যান আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। সাধারণ একজন পাদরী হিসেবে তিনি প্রথম গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকার লোকদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করা। কিন্তু আফ্রিকায় পা দিয়ে তিনি দেখলেন এ কাজ করা সম্ভবই নয় যতক্ষণ না সে দেশের খবর পুরোপুরি পাওয়া যায়, যতক্ষণ না সেখানের লোকজনদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের একজন হয়ে পড়া যায়। বাইরে থেকে উপদেশ দিয়ে মানুষের মনভোলানো যায় না। তা ছাড়া আফ্রিকার যে প্রায় সবটাই অন্ধকার; সে-দেশ সম্বন্ধে কতটুকুই বা খবর মানুষ পেয়েছে? আফ্রিকাকে জানতে হবে; আফ্রিকাকে জানতে হবে; আফ্রিকাকে জানতে হবে। লিভিংস্টোনের নেশা ধরল।

কতবার কত রকম বিপদ এসে তাঁকে চোখ রাঙালো, ভয় দেখালো। কিন্তু, জীবনে অনেক কিছু তিনি শিখেছিলেন, শুধু শেখেননি ভয়কে ভয় বলে চিনতে, বিপদকে বিপদ বলে মানতে; শেখেননি তিনি দুঃখের সামনে মাথা নোয়াতে। লিভিংস্টোন মরীয়ার মতো আফ্রিকার অন্ধকার ভেদ করে চল্লেন।

আর পর্যটক হিসেবে, আবিষ্কারক হিসেবে, তাঁর ছিলো আশ্চর্য আর দুর্লভ শক্তি! একটা দেশের মধ্যে হৈ-চৈ হুড়মুড় করে এগিয়ে চল্লেই সে দেশকে আবিষ্কার করা হয় না। ধীরে সুস্থে খুঁটিয়ে দেখতে হয়, খুঁটিয়ে শিখতে হয়। লিভিংস্টোন ঠিক তাই করতেন। সেখানকার লোকদের কথা জানতে হলে তাদের সঙ্গে একেবারে এক হয়ে মিশে যেতে হয়। লিভিংস্টোন তা পারতেন। তাদের সঙ্গে মিলে তাদের খাবার-দাবারই খেতেন, তাদের দুঃখে জানাতেন সমবেদনা, তাদের সুখে আনন্দ প্রকাশ করতে ভুলতেন না। যে-সব দেশের মধ্যে দিয়ে তিনি এগিয়েছিলেন বহুদিন পর্যন্ত সে সব দেশের লোক তাঁর নাম করত, তাঁর নাম উঠ্‌লে ভক্তিতে মাথা নোয়াতো।

তাঁর চরিত্রের এ-দিকটাও মস্ত দিক। আফ্রিকায় ঘুরতে-ঘুরতে আফ্রিকার অসভ্য অসহায় মানুষদের তিনি ভালোবেসে ছিলেন। বাস্তবিক, গভীর সে ভালোবাসা। আবার এর জন্যেও বিপদ কম ঘটেনি। তখন অনেক ইয়োরোপীয় আর আরব বণিক মস্ত ব্যবসা ফেঁদেছিল: আফ্রিকা থেকে মানুষ ধরে এনে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রী করা। তিনি মরীয়ার মতো এর বিরুদ্ধে লাগলেন। আফ্রিকায় অনেক শত্রুর মধ্যে শত্রু বাড়ল আরও একদল, অনেক বিপদের মধ্যে বিপদ বাড়ল আরও। তাই সভ্য মানুষের কতরকম চক্রান্তও সুরু হল তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? বিপদকে যে ভয় করে তার নাম ত' আর লিভিংস্টোন নয়! বিপদকে যে পেরিয়ে যেতে পারে না সে অন্ধকার আফ্রিকার বুক চিরে এগুবে কেমন করে? মনে রাখতে হবে, আফ্রিকায় দাস-ব্যবস্থা যে উঠ্‌ল তার জন্যে লিভিংস্টোন অনেকখানিই দায়ী।

তাঁর শেষ বয়সের অভিযানটার কথা বলি। সেই অভিযানের শেষেই তাঁর মৃত্যু। কী অদ্ভুত জীবন খানিকটা আঁচ করতে পারবে। নয়সা হ্রদ ঘুরে টাঙ্গয়িকা হ্রদের দিকে তিনি চলেছেন। এ পথে আর কেউ পা বাড়ায়নি। দল ক্রমশ হালকা হয়ে আসছে; কেউ গেছে মারা কেউ গেছে ফিরে। তার উপর, ক্রিসমাসের দিন মরে গেল চার চারটে ছাগল। ও অবস্থায় ভয়ানক কথা; কারণ ছাগলই তখন মস্ত সহায়। তাও হয়ত চলত, কিন্তু ওষুধের বাক্স গেল চুরি। অবস্থাটা একবার ভেবে দেখো! তারপর তাঁকে ধরল জ্বরে আর আমাশয়। ওষুধ নেই, গভীর জঙ্গল সঙ্গী প্রায় নেই— দারুণ জ্বর আর আমাশয়। কিছুদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্য একেবারে ঝরঝরে হয়ে এল, তখন দেখলে মনে হয় একঝুড়ি হাড় পড়ে রয়েছে। তার উপর আবার ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা যখনই যেদিক থেকে পারে কিছু নতুন বিপদ উপহার পাঠায়। কিন্তু, ও অবস্থাতেও মুয়ের হ্রদ পর্যন্ত তিনি চল্লেন। কিছুদিন পরে চলবার শক্তিটুকুও ফুরোলো। তারপর একদিন ঘড়িতে দম দিতে গিয়ে দেখেন হাত কাঁপছে, সেটুকু শক্তিও নেই। পরদিন সকালে তাঁর অবশিষ্ট অনুচর তাঁকে ডাকতে গিয়ে দেখল বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে তিনি নিশ্চল হয়ে পড়ে রয়েছেন।

বাবীরা যে রাস্তা দিয়ে শর্টকাট্ করতে যাচ্ছিল, গিয়ে দেখ্‌লে সে পথ মেরামতের জন্যে বন্ধ। গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে অনেকটা ঘুরে যেতে হল।

ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্স এসে প্রদীপকে হস্পিট্যালে নিয়ে গেছে।

সিপাহী বল্লে, গাড়ীর আরোহীদের সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সে থামাতে বলে। সে কথা না শুনেই গাড়ী এগিয়ে যায়, তখন অগত্যা তাকে গুলি ছুঁড়তে হয়।

প্রথম গুলিতেই চিরঞ্জীলাল মারা পড়ে, তার মৃতদেহ রাস্তার গাড়ীর পাদানীতে রক্তাক্ত অবস্থায় প'ড়ে আছে।

সেই অবস্থায়ই গাড়ী অগিয়ে যায় দেখে ও বাধ্য হ'য়ে টায়ার পাংচার ক'রে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ব্রীজের রেলিংএ গিয়ে গাড়ীর বনেট্ লাগে, প্রদীপ ছিট্‌কে বাইরে পড়ে, লোহার রেলিংএ ভীষণ আহত হ'য়ে সে অচৈতন্য হয়।

সঙ্গের লোকজনগুলোকেও ধ'রে হাজতে পাঠানো হয়েছে।

এই ইতিহাসটি শুনতে যতক্ষণ গেল ততক্ষণ বাবীর মন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছে হস্পিট্যালে যাবার জন্যে। কিন্তু তার স্বামীকেও পুলিশ অফিসার হিসাবে কর্ত্তব্য করতেই হবে। ভাবপ্রবণ হ'লে তাদের কাজ চলে না।

পৃথিবীতে আরো কম ভাবপ্রবণ হচ্ছে ডাক্তাররা। বাবী যে ব্যস্ততা নিয়ে হাঁসপাতালে এলো সে ব্যস্ততা চিকিৎসকদের কাছে অভ্যস্ত। তার অজস্র প্রশ্নের উত্তরে শুধু সে জানতে পারলে প্রদীপের জ্ঞান এখনো হয়নি। বিপদের আশঙ্কা ত' আছেই, কাটবে কিনা সে কথা বলবার এখনো সময় হয়নি।

সেখানে ঘরে ঘরে মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চার। একটা বেডের পাশে আরেকটা বেডে মরণের শীতলস্পর্শ নেমে আসছে যে কোনো মুহূর্ত্তে, তার পাশে যে কম্পমান জীবন, তার কী অবস্থা হচ্ছে তা দেখ্‌বার কেউ নেই।

প্রণব প্রদীপের মাথার কাছে ছিল, ঘরে আর ভিড় বাড়ানো ডাক্তারের নিষেধ ছিল।

বাবী বাইরে থেকে অস্থির হ'তে লাগ্‌লো।

আয়ডোফর্ম আর ব্লীচিং পাউডারের উগ্র গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত।

দূর শহর থেকে মানুষের কলরোল এখানে যেন উপহাসের মতন ভেসে আসে।

তিনদিন বাদে প্রদীপ প্রলাপ্র বক্‌তে লাগ্‌লো—বাবী এসেছে? বাবীকে কি খবর দেওয়া হয়েছে?

মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বাবী বল্‌লে—আমি এসেছি প্রদীপ।

প্রদীপ চিন্‌তে পারলে না। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বল্‌লে—বাবী আর দাদু কোথায়?

দাদু পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করছিলেন।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন—আমি এসেছি দাদু!

ডাক্তার বল্‌লে—আপনারা দয়া ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আমাদের কাজ করতে দিন।

রাত আর দিন, দিন আর রাত—এতগুলি প্রাণীর ভগবানের কাছে অক্লান্ত আকুল প্রার্থনা অবশেষে মঞ্জুর হ'ল।

প্রতুল চোখ চাইলে।

কথা বল্‌লে।

সেদিন বাবীর জ্বর, সে আস্‌তে পারেনি।

যে চিকিৎসক তাঁর সমস্ত বিদ্যা আর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ ক'রে এই রুগ্ন কিশোরের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুল্‌লেন—তাঁর নাম ডাক্তার অতুল রক্ষিত।

বিশ্বেশ্বর বল্‌লেন, আপনার ঋণ কী ক'রে শোধ করব?

পারেন যদি দেশে আরো বেশী হস্পিট্যাল ক'রে—ডাক্তার স্মিতহাস্যে বল্‌লেন। আমাদের দেশে গরীবদের চিকিৎসা হয় না, আপনারা ধনীরা একথা ভুলবেন না।

প্রদীপের কাণেও একথা গেছলো।

যে কদিন সে ক্যাবিনে ছিল, চারিধারের ব্যবস্থার খোঁজ নিত।

খবর নিয়ে তার এই কথাটি মনে হ'ল—আমাদের দেশে আজো গরীবদের চিকিৎসা হয় না।

বাবী সেদিন এসেছিলো—বল্‌লে—তাহ'লে এত বড় বড় হস্পিট্যালগুলো কী করতে আছে?

প্রদীপ বল্‌লে—বড় বড় শহরের শোভা বাড়াবার জন্যে।

সেরে উঠেও নিস্তার নেই।

চিরঞ্জীলালের দলবলের বিচার সুরু হল। সাক্ষী দিতে হবে তাকে। আসামীদের মধ্যে ছিল তার নকাকা আর নতুন কাকা, আরো অনেকগুলি গুণ্ডা, খুন, রাহাজানি, লুঠতরাজ, নোট জাল, আগুন লাগানো যাদের কোনো পাপ বাদ যায়নি।

কয়েকজনের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, কয়েকজনের ফাঁসি। মৃত্যুদণ্ড পেলে তার দুই কাকা, তারা নাকি সাতটা খুন করেছে।

দুনিয়ার আবর্জ্জনা তারা, কিন্তু বিশ্বেশ্বর হাজার হোক্ বাপ, বড় কাতর হ'য়ে পড়লেন।

শিবরাত্রির শেষ শল্‌তেটিকে নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি মছলন্দপুরে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হলেন।

দুর্জ্জনের দিক্ থেকে তাঁর পৌত্রের আর ভয় রইলো না বটে, কিন্তু মরণের কাছ থেকে তিনি কোনো ভরসা পাননি। এত রুগ্ন আর দুর্ব্বল সে হ'য়ে পড়েছে ইদানীং—তাকে রেখে তিনি যেতে পারলে হয়!

এবার তিনি যেতে চান, প্রস্তুত হ'য়ে আছেন। গঙ্গার ধারে নিজের বাড়ীতে এসে তিনি প্রণবকে জমীদারী ও সম্পত্তি সংক্রান্ত সব কাগজপত্র বোঝাতে লাগ্‌লেন, উইল দেখালেন—তিন কোটি টাকার মালিক ক'রে দিয়ে যাচ্ছেন মল্লিক বংশের শেষ ছেলেটিকে। এক্‌জিকিউটর হল প্রণব।

জীবনে তিনি অনেক কষ্ট পেলেন, তবুও কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হল?

সে বুড়িটা এখন নেই যে ঝড়ের রাত্রে এসে চ্যাঁচাত—ফিরিয়ে দাও আমার ছেলেকে, ফিরিয়ে দাও আমার ছেলেকে, ফিরিয়ে দাও! কিন্তু যে কোনো ঝড়ের রাত্রে তার প্রতিধ্বনি আছে।

যেদিন তাঁর অসুখ করলো সেদিন থেকে পথ্য এবং ওষুধ দুই তিনি বন্ধ করলেন, ডাক এসেছে যদি, আর তিনি সুযোগ যেতে দেবেন না।

প্রদীপকে তিনি রেখে যাচ্ছেন যোগ্য শিক্ষকের হাতে এই তাঁর সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।

মৃত্যু যে মহান্ হয়, মৃত্যু যে সুন্দর হয়, হয় সূর্য্যাস্তের মতন মনোরম কখনো কখনো—এই বৃদ্ধের প্রসন্ন দৃষ্টি স্তব্ধ হ'য়ে যাওয়া দেখে প্রদীপ বুঝতে পারলো।

তাঁর প্রিয় লাইব্রেরী ঘরে শেষ নিঃশ্বাস তিনি ত্যাগ করলেন প্রিয়তম পৌত্রকে শেষ আশীর্ব্বাদ ক'রে।

তিন কোটি টাকার কিছু কিন্তু প্রদীপ পেলো না। তার নাবালকত্ব আগে অতিক্রম করা চাই।

সাধারণ ছেলেদের মতন সাধারণ বেশে প্রদীপ সাধারণ স্কুলে যেতে লাগ্‌লো।

ম্যাট্রিক পাশ করলো, বি-এ পাশ করলো।

তখনো তার কুড়ি বছর হয়নি।

লাইব্রেরী ঘরে প্রণব ভারী একখানা বই নিয়ে তন্ময় হ'য়েছিলো। প্রদীপ এসে বল্‌লে—টাকাটা বাড়াবার কি করছেন?

সে কথা তোমার এখন না জান্‌লেও চলে! গম্ভীরমুখে প্রণব বল্‌লে।

আমার এক বন্ধু বল্‌লে কিছু শেয়ার কিন্‌লে হয়।

নিজে কিন্‌তে গেলে ঠক্‌তে হবে, শেয়ার ডীলাররা প্রায়ই জোচ্চোর।

তাহ'লে গভর্ণমেণ্ট প্রমিসারি নোট কিম্বা ফিক্সড্ ডিপজিট?

সে তোমায় ভাবতে হবে না।

প্রদীপ একটু বিরক্ত হ'ল। তার টাকা, সে কথা কইতে পাবে না! সাবালক হ'তে আর ক'মাসই বা আছে?

প্রণব বুঝ্‌তে পেরেও কিছু বল্‌লে না।

চ'লে যাচ্ছে দেখে ডেকে বল্‌লে—এই লাইব্রেরীটা শেষ করো। বিশ্বভারতীতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের লাইব্রেরী দেখে এসো। ইউনিভারসিটির চৌকাঠ না মাড়িয়েও একজন লোক কি ক'রে মহামানব হ'য়ে উঠলেন, হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের শীর্ষমণি, বহু পশ্চাতে ফেলে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীদের, তার মূলতত্ত্বটি বুঝ্‌তে শেখো।

প্রদীপের কথাটা ভালো লাগ্‌লো না, সে বেরিয়ে গেল।

বন্ধুরা তাকে বিরক্ত ক'রে মারছে, তোর মাষ্টার সব সরিয়ে ফেল্‌লে। যে দিন]তোর হাতে বিষয় আসবে, দেখ্‌বি সব শেষ!

প্রণবের চালচলন দেখে ওর সেই সন্দেহ ক্রমশঃ দৃঢ়তর হতে লাগ্‌লো।

একুশ বছর পূর্ণ হ'তে যখন আর তিন মাস আছে, ও ঝড়ের মতন এসে প্রণবকে বল্‌লে—কেন আপনি আমায় সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন না?

এখনো সময় হয়নি।

সময় কবে হবে মাষ্টার মশাই, যেদিন আপনি সব শেষ ক'রে দেবেন?

প্রণব একটিও কথা না ব'লে বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগ্‌লো।

একুশ বছর যেদিন পূর্ণ হল, প্রদীপকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রণব তার সম্পত্তি বুঝিয়ে দিলে—তিন কোটি টাকা হ'য়ে গেছে চার কোটি, আর জমিদারী বেড়ে গেছে দ্বিগুণ।

পায়ে প'ড়ে প্রদীপ বল্‌লে—আমায় ক্ষমা করুন্‌!

প্রণব বল্‌লে—ক্ষমা নেই, গড়তে চেয়েছিলাম রত্ন, হ'ল আবর্জ্জনা।

আপনার প্রাপ্য নিয়ে যান্‌। বল্‌তে গেলে এ এক কোটি টাকার কিছুটা আপনার প্রাপ্য।

যতটা আমার প্রাপ্য, তাইতে হাসপাতাল ক'রে দিয়ো—মাতৃসদন, অনাথ আশ্রম যা পারো! সেই ডাক্তারের কথা মনে করো—বড় গরীব আমাদের দেশ।

ওদিকে বন্ধুরা মোটর নিয়ে ডাকাডাকি করছে, প্রদীপ আর দাঁড়ালো না, কথা বাড়ালো না।

ফূর্ত্তিতে বদ্‌খেয়ালে আড্ডায় খোলামকুচির মতন ঝক্‌ঝকে টাকা চক্‌চকে নোট উড়ে যেতে লাগ্‌লো—বিশ্বেশ্বরের কষ্টসঞ্চিত আর বহুজনের দীর্ঘশ্বাসে কলুয়িত অর্থ।

কলকাতা থেকে কাশ্মীর সেই টাকার ভোজবাজী দেখ্‌লো। অভিশপ্ত বংশের শেষ প্রদীপের কুকীর্ত্তি দেখে বিশ্বেশ্বরের অভিশপ্ত আত্মার কী মনে হয়েছিল সে কথা কেইবা জানে?

যখন নগদ টাকা আর জমিদারীর অল্পই অবশিষ্ট আছে, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, তখন একদিন প্রদীপের মনে পড়লো—সে কোথায় চলেছে। চলেছে ধ্বংসের পথে, চিরব্যর্থতার পথে, অমানুষের পথে।

সেদিন সে সর্ব্বস্ব ক্ষুইয়ে এক হস্পিট্যাল করলো। কটাই বা বেড হ'ল!

কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে—প্রণববাবুর জন্যে।

তাকে পাওয়া গেল না।

বাবীকে ডাক্‌লে—মেট্রন হ'তে।

সে এলো না। সে পরের ঘরের বৌ।

তাছাড়া সমস্ত খবর তার কাছে পৌঁছেছিল।

তার মতন কষ্ট কেউ পায়নি।

সমাপ্ত

অভিশপ্তবংশ শীঘ্রই পুস্তকাকারে বেরোচ্ছে।—লেখক।

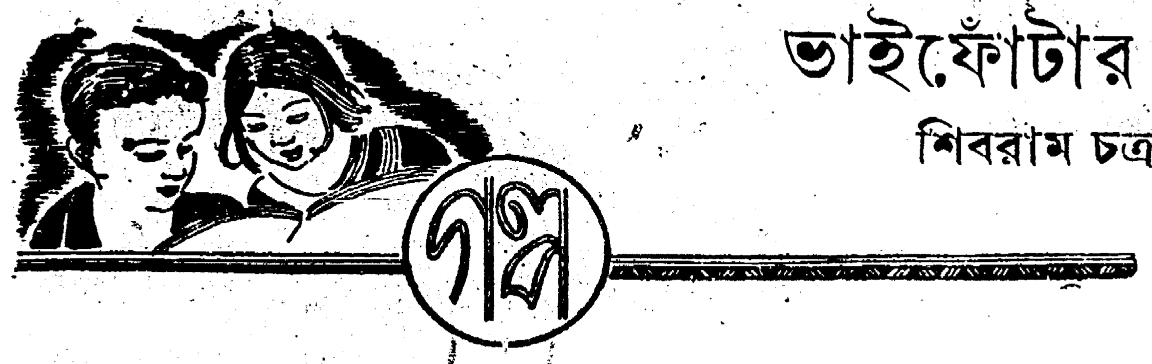

ভাইফোঁটার উপহার

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

বড় দোকানটার শো-কেস্‌ থেকে ছোট্ট পাথুরে মূর্তিটা সকাল বেলার সোনালী আলোকে যেন মুখ ভ্যাঙাচ্ছিল। বেঁটে, তোবড়ানো, বিচ্ছিরি—কোনো ভাস্করের দুঃস্বপ্ন। কলা কেবল কলার খাতিরে—নামক আর্টের একগুঁয়ে তত্ত্ব ক্ষেপে গেলে কি রকম গুঁতোতে পারে, তারই যেন সচিত্র উদাহরণ। বীভৎসতার এরূপ নমুনা প্রায় দেখা যায় না।

"দাদা, ছাখো ছাখো! কী চমৎকার! ঠিক তোমার উপযুক্ত।" বিনি উচ্ছ্বসিত উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে: "ভাইফোঁটায় তোমায় কী উপহার দেব তাই ভাবছিলুম। আর কী ভাগ্যি—"

"বিনি! ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না—"মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, স্বর রুদ্ধ হয়। বামনটা যেন অদৃশ্য বাহু বিস্তার করে' আমার গলা চেপে ধরেছে।

"এমন অপূর্ব জিনিস এর আগে আমি দেখিনি। আর্টের কী পরাকাষ্ঠা! অপরূপ! কে জানে মূর্তিটার কী মানে!" বিনি গদ্‌গদ হয়ে পড়ে।

"আমি বলে দিতে পারি—নহুঁসের প্রেতাত্মা।" আমি বলি: "এটা গড়বার সময় শিল্পীর যে কোনো হুঁস্‌ ছিল না সেবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

"তোমার লেখার টেবিলে এটা খাসা মানাবে। যখন গল্পের প্লট্‌ কিছুতেই তোমার মাথায় খেল্‌বে না, তখন এর মুখের দিকে চেয়ে, চাই কি, তোমার প্রেরণাও আসতে পারে।" বিনি রীতিমতো সিরিয়স্‌।

"শোন্‌, তোকে আমি পুনঃ পুনঃ বলে দিচ্চি এ জিনিস আমার লেখার টেবিলে কেন, আমার ঘরের ত্রিসীমানায় আমি সহ্য করব না। তার চেয়ে ত্যজ্যভ্রাতা হয়ে বনে চলে যেতে হয় সেও আমার ভালো। তবু বোনের হাত থেকে এমন উপহার প্রাণ থাকতে আমি গ্রহণ করব না।"

এই বলে' খর্‌খর্‌ করে' পা চালিয়ে মূর্তিটার ত্রিসীমানা থেকে আমি পালিয়ে আসি।

বিনি তবু কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে মূর্তিটার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে। তার নিষ্পলক মুখে ক্রমশ একটা মৃদু হাস্য ফুটে উঠচে দেখতে পাই। ওই হাসির অর্থ ভাইফোঁটার দিন কোন্‌ রূপ নেবে চিন্তা করে' আমার শরীর রোমাঞ্চিত হতে থাকে।

ঘনঘন আমার নিশ্বাস পড়ে। নিশ্বাস ফেলতেও আমার কষ্ট হয়। নগদ মূল্যে কিনতে রাজি হবেন সম্পাদক-ভোলানো এমন গল্প মাথায় আসাই তো এক মুস্কিল, তার

ওপরে ওই কদর্য চেহারা যদি আমার টেবিলে উপবিষ্ট থেকে দিনরাত আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ করতে থাকে, তাহলে তো—

তাহলে গল্প লেখায় ইস্তফা দিয়ে এই যুদ্ধের বাজারে চড়া দামে ফাউন্টেন্ পেনটা বেচে দেয়াই আমার পক্ষে ভালো।

বিনি একটা বস্ত্রালয়ে ঢুকেছে, ভাইফোঁটার অন্যান্য উপহারের মধ্যে নিজের জন্য একটা শাড়ী কেনার উদ্দেশ্যেই বোধ হয়। এই সুযোগে আমি সেই শোকেস্ওলা দোকানটার মধ্যে প্রবেশ করি।

দোকানের কর্মচারীকে ডেকে মূর্তিটা দেখাই: "ওই যে—কি বলে—চমৎকার ওই শিল্পনিদর্শনটি—ওর মর্ম কী, আমায় বাৎলাতে পারেন?"

"আপনি কি জানতে চান্ বুঝেছি। ওই মূর্তিটির নাম হচ্ছে 'প্রভাত'। একজন অতি-আধুনিক শিল্পীর শিল্পকীর্তি। মূর্তিটার খুব কাট্‌তি ছিল—কিন্তু এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। ঐ একটিই যা আছে এখন—আমাদের দোকানে। আমরাও আর পাচ্ছিনে। কিনবেন আপনি?"

"না না, কিন্ব না। আপনার ভয় নেই।" আমি অভয় দান করি: "ওই একমাত্র রত্ন থেকে আপনাকে বঞ্চিত করার আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল ওই কথাটাই আমি জানতে চাইছিলাম।"

দোকান থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে নেমে তখনো কিন্তু বিনির দেখা নেই। শাড়ীর রাজ্যে একবার গেলে সেখান থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনা ওর দুঃসাধ্য আমার জানা আছে—কিন্তু বিনি না আসুক্, তার প্রাণের বন্ধু কমলাকে আসতে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্ল্যান্ও খেলে গেল আমার মাথায়।

কমলা এগিয়ে এল হাসতে হাসতে।

আমিও যথাসাধ্য হাসিহাসি মুখ করে' হাত ধরে তাকে শোকেসের কাছে নিয়ে গেলাম।

"কী চমৎকার, দেখেচ? এমন অপূর্ব সৃষ্টি আর হয় না।" বল্‌তে বল্‌তে আমি আত্মহারা হয়ে উঠি: "ওর মুখের দিকে চেয়ে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারি। অদ্ভুত এক প্রেরণা পাওয়া যায়। আমি ওটা কিনতে যাচ্ছিলাম কিন্তু আমাদের হরেন—"

"দাদার বুঝি ওটা মনে ধরেছে?" কমলা জিজ্ঞেস করে।

"ধরা বলে' ধরা। ওল খেলে যেমন গলা ধরে প্রায় সেই রকম ধরা। তোমার দাদার সে-উৎসাহ আমার সামান্য ভাষায় আমি ব্যক্ত করতে পারব না। হরেনের ওই ঝোঁক দেখেই তো ওটা আমি কিনলাম না। হাজার হোক্, হরেন আমার চেয়ে বয়সে

ছোট, ছোট ভাইয়ের মতোই। তার ওপরে হরেন আবার তোমার ভাই। অথচ আমি কিন্ব মনে করে' হরেনও ওটা কিন্‌ল না। যাক্, ভালোই হোলো তোমার দেখা পেয়ে। তুমি নিশ্চয় আগামী ভাইফোঁটায় হরেনকে কী দেবে তাই নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছ? সেই পুণ্যতিথিতে তোমার কাছ থেকে ও যদি এটা উপহারস্বরূপ লাভ করে, ওর সেই আনন্দ কল্পনা করে' আমারও সুখ কিছু কম হবে না।"

"সত্যি, আপনি বড়ো ভালো।" বল্‌তে গিয়ে কমলা গলে পড়ল: "কী উদার আর নিঃস্বার্থপর আপনি। এমন চমৎকার উপহারের কথা আমি ভাবতেই পারিনি। কি বলে' যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব জানিনে। আপনি কতোদিক দিয়ে আমাদের কতো উপকার করেন। কিন্তু আপনার আজকের এ ঋণ কোনোদিন আমরা শুধতে পারব কিনা কে জানে।"

"না না, ঋণের কথা কেন? তোমাদের কি আমি নিজের মতো দেখি না? না, কমলা, না; উপকারের কথা তুলে' অমন করে' তুমি আমার কোমল প্রাণে ব্যথা দিয়ো না।"

এই বলে' কমলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, পথের অন্য ধারে জনতার আড়ালে আমি দাঁড়াই। গা-ঢাকা দিয়ে দেখি, কমলা আমাদের কি করে। ওই মূর্তিটা আমার জীবন-মরণের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েচে। ও-আপদ বিদায় না হওয়া পর্যন্ত আমার যেন স্বস্তি নেই। আমার অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি!

দেখি, কমলা একটু ইতস্তত করে। তারপর আর ইতস্তত করে না। সোজা দোকানের মধ্যে ঢুকে যায় সটাং। এবং একটু পরেই মূর্তিটাকে হস্তগত করে' সহাস্য মুখে বেরিয়ে আসে। ওই দৃশ্য দেখে আমার সারা দেহে আনন্দ প্রবাহ বইতে থাকে—ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায় আমার। ওই মূর্তি কেবল ওই একটিই আছে, দোকানদারটা এই কথাই তখন বল্ল না?

কেল্লা মেরে দিয়েছি! আর কি? আর আমায় পায় কে? আমার পাঁয়তারার প্যাঁচের তারিফ করে' নিজেই নিজেকে সাধুবাদ দিই। আহ্লাদে ডগমগ হয়ে মাটিতে আমার পা পড়ে না।

অবশেষে ভাইফোঁটার দিনটি আসে।

এবার কমলাও আমাকে ভাইফোঁটার উপহার পাঠিয়েচে—কী আশ্চর্য! অযাচিত ভ্রাতৃত্ব-সূত্রে প্রকাণ্ড এক প্যাকেট লাভ করেছি। সেদিনকার সেই উপকারের বিনিময়েই কিনা জানি না—কিন্তু কী থাকতে পারে এর ভেতরে?

দুরু দুরু বক্ষে প্যাকেট খুলি—যা ভয় করেছিলাম তাই।···ওর ভেতর থেকে

আধুনিক শিল্পীর সেই অমর কীর্তি শ্রীমান্ 'প্রভাত' আমার মুখের দিকে চেয়ে মুখ ভ্যাঙ্‌চাচ্ছে দেখা যায়।

উপহারের সঙ্গে জড়ানো একটা চিরকুট্।

কমলার চিঠি :

"যে বস্তুর প্রতি আপনার নিজের এতখানি পছন্দ তার থেকে আপনাকে আমরা বঞ্চিত করতে চাই না। আমার ভক্তি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ভাইফোঁটার উপহাররূপে এটি গ্রহণ করলে আমি অতিশয় পুলকিত হব। এবং আমার দাদাও খুসি হবেন খুব। ইতি,—

আপনার স্নেহের কমলা।"

আমার স্নেহের কমলার কাছ থেকে সৌহার্দের এই পরিচয় পেয়ে যে সময়ে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় সেই ভরাডুবির মুখে বিনির কড়া গলার আওয়াজ কানে এল!

"পরের বোনের কাছ থেকে এলে তখন বুঝি খুব ভালো হয়ে যায়? একই জিনিস তখন আরেক রকম হয়ে ওঠে—তাই না?" ব্যঙ্গের সুরে বিনি ফোড়ন্ কাটে।

বলুক্! বলে' নিক্! মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা বসাতে মেয়েরা ওস্তাদ্—বিশেষ করে' তারা যদি নিজের বোন হয়। বনবাসের দুঃখ কে না জানে?

টল্‌তে টল্‌তে মূর্তিটাকে নিয়ে টেবিলের ওপরে খাড়া করি। ওমা, এখানে যে ফের আরেকটা প্যাকেট্!

কম্পিত হস্তে এটারও আবরণ উন্মোচন করতে হয়।

অনুরূপ আরেকটি প্রতিমূর্তি! আকার-প্রকারে হয়ত একটু ইতর বিশেষ হলেও প্রভাতের মতোই তেমনি কদাকার। তেমনি অতুলনীয়—এ বলে আমায় দ্যাখ্, ও বলে আমায় দ্যাখ্! এটি যে বিনির ভাইফোঁটার লক্ষ্যভেদ তা বুঝতে বিলম্ব হয় না।

বিনি আবার ভালো করে' বুঝিয়ে দেয় : "এটার নাম হচ্ছে 'রাত্রি'। বুঝেচ?"

ওর চোখে কেমন একটা জিঘাংসার দীপ্তি দেখা যায়—বিনি আর মূর্তি দুজনের চোখেই।

"প্রভাত আর রাত্রি—জোড় মিলিয়ে দেয়া হোলো। কেমন, ভালো হোলো নাকি?"

আমি আর কী বল্‌ব? আমি তখন হতভম্ব।

বিনি বলে: "কম্‌লি ওটা তোমাকে উপহার দিতে যাচ্ছে যখন জানলাম তখন আমি আর কী করি? অতি কষ্টে ঠিকানা যোগাড় করে' শিল্পীর বাড়ী গিয়ে ওর জুড়ি এইটাকে নিয়ে এলাম। এই একখানাই ছিল ভদ্রলোকের স্টুডিয়োয়। এখন দুটোয় মিলে তোমার লেখার টেবিলে খাসা মানাবে—কী বলো দাদা?"

বিড্ গ্যাম্বলিঙ্

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আনন ঘোষাল

স্বপন অবাক হয়ে এদের কথোপকথন শুনছিল। কতরকম যে জীব পৃথিবীতে আছে! তাদের মন বেশ একটু কৌতূহলী হয়ে উঠল। হঠাৎ চৌধুরীমশাই চেঁচিয়ে উঠলেন, "রেখে দেন আপনার খেলা, আগে জঙ্গলটা ঠিক করেন, রেজেষ্টারীটা হয়ে যাক। শুভস্য শীঘ্রম, বুঝলেন? জোচ্চুরী জুয়োয় চলে, ব্যাবসায় চলে না।"

দেওয়ানজী চৌধুরীর কথায় একটুও ঘাবড়ালেন না। বরং অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে জানালেন, "মুস্কিল কি জানেন, তিনি সকলের সঙ্গেই খেলেন না, খেলেন শুধু আমার সঙ্গে। আসুননা খেলাটা শিখিয়ে দি।"

চৌধুরী খেলা শিখতে নারাজ কিন্তু দেওয়ানজী তাকে তা শেখাবেনই। কিছুক্ষণ বাগবিতণ্ডা চলল, শেষে চৌধুরী রাজী হলেন। খুসি হ'য়ে দেওয়ানজী জানালেন, "সব সময় মনে রাখবেন—তিন হাত গঙ্গা, তিন হাত কালী।" উত্তরে চৌধুরী বললেন, "তার মানে?" দেওয়ানজী উত্তর দিলেন, "তার মানে তিন হাত ছবি, তিন হাত সাদা।"

"অর্থাৎ সাজাবার কায়দা, হাতের কারসাজী, হে হে হে—। এই দেখ এমনি করে—। ছবি কটাই তোমার দিকে এল, এল ত? আর ওর দিকে? ওর দিকে ভোঁ ভাঁ।"

দেওয়ানজী বারবার চৌধুরিকে খেলাটা বোঝালেন, কিন্তু চৌধুরি খেলাটা বুঝতে অক্ষম হলেন। স্বপন অবাক হয়ে ভাবল, "কি আশ্চর্য, ব্যাপারটা এত সহজ অথচ তা চৌধুরির মতো লোকেরও বুঝতে দেরী হচ্ছে!"

বিরক্ত হয়ে দেওয়ানজী জানালেন, ব্যাবসাদারদের মাথাটা ব্যাবসা ছাড়া আর কোন দিকেই খেলতে চায় না, তারপর স্মিত হাস্যে তিনি স্বপনকে বললেন "দেখুন ত ফাঁকিটা কত সহজ, সহজ না!"

বুদ্ধিহীনতার অপরাধে চৌধুরি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। অনেক বাদ-প্রতিবাদ, ভুল-ত্রুটি'র পর খেলাটা তাঁর আয়ত্ত হল।

"দেওয়ানজী, দেওয়ানজী!"

স্বপনের কানে গেল একটি সুমধুর স্বর। মুখ ফেরাতেই সে দেখতে পেল একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাঙালীর মেয়ে এত সুন্দরী হতে পারে? সে বুঝতে পারল না: মেক্‌আপ না পেন্ট! তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, আপনার কেমিষ্ট কে? কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলল: না-না এ তার ভুল ধারণা। বাঙালীর ঘরে সুন্দরী মেয়ে আছে বই কি! ক'জনকেই বা সে জানে!

মুখ তুলে দেওয়ানজী বললেন, "এই যে মা লক্ষ্মী, চা এনেছ বুঝি?"

মেয়েটি ধীর পদবিক্ষেপে চায়ের পেয়ালা টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেল। স্বপনের মনে হল, জিজ্ঞেস করে, মেয়েটি কে? কিন্তু জিজ্ঞেস করতে তার সাহস হল না।

কথায়-বার্তায় অনেকক্ষণ কেটে গেছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত মনিবের এত্তালা আসেনি। বিরক্ত হয়ে দেওয়ানজী জানালেন, "নিশ্চই ভুলে মেরেছেন, খবর ত অনেকক্ষণ পাঠিয়েছি, দাঁড়ান দেখে আসি।"

আরও আধঘণ্টা কেটে গেল। চৌধুরিমশাই বিরক্ত হয়ে ওঠেন আর স্বপন হয়ে ওঠে বিব্রত। বিব্রত হবার কারণও ছিল। দূর থেকে ভেসে আসছিল, মিষ্টি গানের স্বর। ঘড়ির কাঁটাটা ক্ষেপে ক্ষেপে সরে আসছে, কিন্তু দেওয়ানজীর দেখা নেই। চৌধুরির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "আপদ।"

কিছুক্ষণ পরেই দেওয়ানজী বেরিয়ে এসে জানালেন জমিদার তলব দিয়েছেন। খাসকামরার কড়িতে ঝুলান ঝাড়-লণ্ঠন, "এত্তালা, তলব" প্রভৃতি দণ্ডোক্তি ও সেই সঙ্গে এ-যুগের চায়ের কাপ ও নীল-সাড়িতে যেন সৃষ্টি করেছিল এক অভিনব পরিবেশ। মোহমুগ্ধ স্বপনকুমার, বন্ধু মিলন ও চৌধুরির সঙ্গে, দেওয়ানজীর পিছন পিছন খাসকামরায় হাজির হল। প্রকাণ্ড হলের মতো একটা ঘর। মেঝেটা গালচে দিয়ে মোড়া। মেঝের আধখানা জুড়ে ফরাস। ফরাসের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে জমিদার গড়গড়া টানছেন। লোকটাকে দেখলে না আসে ভক্তি, না আসে ঘৃণা, আসে শুধু সহানুভূতি।

জমিদারের ঠিক সামনে বসেছিল একজন আধাবয়েসী মাড়োয়ারি। হাতে তার তাসের বাণ্ডিল। তাসগুলো গোছাতে গোছাতে মাড়োয়ারি বলল, "আউর এক দফে ত খেলেন, এবার হামি সে ঠিক জিতবে।"

উত্তরে জমিদার বললেন, "থামেন মশাই" তারপর চৌধুরির দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি মিঃ চৌধুরি? এঁকে বিদেয় করি আগে। এই পাঁচ মিনিট, কেমন?"

এবারেও মাড়োয়ারি হেরে গেল। পাঁচ শ' টাকা হেরেও মাড়োয়ারির উত্তেজনা কমেনি। আরও কতক্ষণ খেলা চলত কে জানে? হঠাৎ চৌধুরি এগিয়ে এসে বলল, "খেলেন দেখি আমার সঙ্গে!"

কায়দা মাফিক তাসগুলো ভাঁজ করে সে চোখ টিপল, চোখের ইসারায় দেওয়ানজী জানাল ঠিক আছে। সুরু হল সর্বনেশে খেলা। প্রথম দফাতেই চৌধুরি জিতে নিল আড়াই হাজার। দ্বিতীয়বারও হার হল জমিদারের। জমিদার সন্দিগ্ধ মনে চৌধুরির দিকে চেয়ে জানাল, "আপনারা যাদু জানেন। আপনার সঙ্গে খেলব না আমি।"

উত্তরে দেওয়ানজী বললেন, "আপনি তাহলে স্বপনের সঙ্গে খেলুন। সকলেই ত যাদু জানে না।"

বারবার অনুরোধেও স্বপন রাজী হয় না। তার লোভ আসে, কিন্তু বিবেক বাধা দেয়। মিলন এতক্ষণ বন্ধুর মনের গতিটুকু লক্ষ্য করছিল। এইবার সে কাছে সরে এসে কানের কাছে মুখ এনে বলল, "ক্ষতি কি? একটা স্পোর্টস্ ত বটে।"

সাতপাঁচ ভেবে স্বপন খেলতে রাজী হল। পাঁচ হাজার টাকা পকেটে ছিল। পাঁচকে ছয় করবার একটা প্রবল ইচ্ছা কখন যে তার মনে বাসা বেঁধেছে তা সে নিজেই টের পায়নি। স্বপন প্রলুব্ধ হয়ে উঠল। জেগে উঠল, তার সুপ্ত প্রলোভন ও অপরাধের স্পৃহা। বোকা জমিদারকে ঠকাবার একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছে তাকে পেয়ে বসল। ভুলে গেল সে তার শিক্ষা দীক্ষা, বংশগরিমা। কাঠের ব্যাবসা বা শালবনের কথা তার মনেই এল না। তাড়াতাড়ি টাকার বাণ্ডিলটা বার করে স্বপন খেলতে সুরু করল।

প্রথম খেলাতে জিতল সে শ'আড়াই। দ্বিতীয় খেলা থেকে সুরু হল তার হারবার পালা। সব হারিয়ে সে বুঝতে পারল, দেওয়ানজীর শিক্ষার অসারতা। আর এও বুঝল, জমিদার আসলে বোকা নয়, আসলে মহা চতুর।

হাতের আস্তিন গুটিয়ে, স্বপন দাঁড়িয়ে উঠল। চৌধুরি ও মিলনে মিলে বহুচেষ্টাতেও তাকে আটকাতে পারে না। ঘুঁসি পাকিয়ে স্বপন চীৎকার করে উঠল, "ফিরিয়ে দিন টাকা, নয় ত আমি পুলিশ ডাকব।"

জমিদার ভড়কাবার পাত্র নয়। এ কাজ তার নতুন নয়। গড়গড়াটা সরিয়ে রেখে খেঁকিয়ে উঠলো, "পুরোটাই বে-আইনি কাজ, তা আমিও জানি আপনিও জানেন। পুলিশ ডাকবেন মানে? জিজ্ঞেস করুন চৌধুরিকে, পুলিশ সন্দেশ খাওয়াবে'খন!"

টাকার শোকে স্বপন হয়ে উঠল পাগল। সবটাই যে একটা অভিনয় তার তা বুঝতে বাকি রইল না। ইতিমধ্যে চৌধুরি ও বন্ধু মিলন কখন যে সরে পড়েছে তা সে টেরও পায়নি। দেওয়ানজীকেও সে নিকটে দেখল না। আবার সে চেঁচিয়ে উঠল, "দেবেন কি না ফিরিয়ে, বলুন এক্ষুনি?"

জমিদার উত্তর না দিয়ে টেবিলের ঘণ্টাটা টিপে দিল। ঘণ্টার আওয়াজে হাজির হল সেখানে দু-দুজন মোটা হিন্দুস্থানী। জমিদার হুকুম জানালো, "বদমাইসকো আভি নিকালো।"

দৈহিক শক্তিতে স্বপনের নাম আছে। এই রকম দু-দ'টো জোয়ানকে অনায়াসেই সে ঘায়েল করতে পারে। কথাটা বোধ হয় জমিদারের জানা ছিল। গোলমালের আশঙ্কায় সে শঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াল না। হঠাৎ সেখানে হাজির হল জমিদার কন্যা নিজে।

অপরূপ লাবণ্যময়ী সুন্দরী। ক্ষিপ্র গতিতে স্বপনের কাছে এসে মেয়েটি বলে উঠল, "ছিঃ বাবা, ফের এই কাজে নেমেছ! লজ্জা করে না তোমার? দাও টাকা ফিরিয়ে। মা'কে ডেকে আনি।"

কন্যার আবির্ভাবে জমিদারের মুখ শুকিয়ে গেল। বিব্রত হয়ে সে বলল, "না, না, ডাকিস নি, টাকাটা দেওয়ানজীর কাছে। এলেই, দিয়ে দেব।"

মেয়েটি ধীরে ধীরে স্বপনের কাছে এগিয়ে এল। তারপর আঁচলের কোনটা আঙুলের উপর জড়াতে জড়াতে কোকিল কণ্ঠে বলল, "দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আসলে বাবা ভালো লোক। দেওয়ানজী আর ঐ চৌধুরিতে মিলে, বাবাকে দিয়ে এই সব করায়। সব ত আমরা জানতে পারি না। আপনি কাল একবার আসবেন। টাকাটা মা আপনাকে দিয়ে দেবেন।"

স্বপন চোখ তুলে মেয়েটিকে দেখে নিল। সরলতা মাখা তার মুখ। চোখে তার জল। মেয়েটি লজ্জায়, ক্ষোভে অভিভূত। স্বপনকে সন্দিগ্ধ ভাবে চাইতে দেখে জমিদার কন্যা হাত থেকে বিশ গাছা চুড়ি ও গলার সোনার হারটা খুলে ফেলে বলল, "বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার তা জানি। বিশ্বাস হওয়াটাই আশ্চর্য। এই কটা রেখে দিন।"

"না না, কী কর্চ্ছেন আপনি", বলে স্বপন সরে দাঁড়াল। জমিদার কন্যা কিন্তু নাছড়বান্দা। সোনার হারটা কাগজে মুড়ে, স্বপনের পকেটে ফেলে দিয়ে বলল, "শুধু হারটাই রেখে দিন। না, হাঁ-হুঁ করবেন না। আমি ভয়ানক জেদী মেয়ে, সকলে আমার কথা শোনে। কাল আসবেন কিন্তু, আসবেন ত?"

ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের ডাক শোনা গেল, "ইলা আয়।" "যাই মা", বলে, ইলা বেরিয়ে গেল।

জমিদার অনেকক্ষণ আগেই স্থান ত্যাগ করেছে। কেউ কোথাও নেই। এ অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকা অনুচিত। স্বপন ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। পিতার সঙ্গে কন্যার কত তফাৎ! স্বপন ভাবে, এও সম্ভব? নরকেও তাহলে দেবী থাকে! যখন টাকাটা ফিরিয়েই দেবে তখন আর থানায় জানিয়ে লাভ নেই। স্বপন বাড়ি ফিরল।

পরদিন সন্ধ্যা ছটায় কম্পমান হৃদয়ে স্বপন শোভাবাজার মোড়ে এসে দাঁড়াল। জমিদারের বাড়িটা খুঁজে বার করতে দেরী হল না। কিন্তু কৈ, দেউড়িতে দরোয়ান কৈ! সে এগিয়ে এল বাড়ির ভিতরে। কিন্তু কোথায় দেওয়ানজী, জমিদারই বা কোথায়? কেউ এত্তালা চাইতেও আসে না! সারা বাড়ি সে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু জমিদারের কথা ত দূরে থাক জনপ্রাণীরও সন্ধান সেখানে সে পেল না। আসবাব-পত্র জনমানব সবই যেন ম্যাজিকের মতো উধাও হয়েছে। ভীতত্রস্ত পদে বেরিয়ে এসে সে দেখল, গেটের ভিতর অপেক্ষা করছে কয়েকজন ভদ্রলোক। তাঁদের একজন ব্যস্ত হয়ে স্বপনকে জিগগেস করলেন, "হ্যাঁ মশাই, জমিদার স্যার মণীন্দ্রনাথ চৌধুরি কি এই বাড়িতে থাকেন?" ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তায় স্বপন জানল, ভদ্রলোক একটি বিরাট অভিধান রচনা করেছেন। জমিদারের নাকি জমিদারিতে আড়াই শ প্রাইমারি স্কুল আছে। স্কুলগুলির জন্য তাঁর রচিত শ আড়াই পুস্তক জমিদার সাহেব কিনবেন বলেছিলেন। কালকেও নাকি জমিদারের লোক তাঁকে ডাকতে গিয়েছিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের পাশে একজন কোটপ্যাণ্ট-পরা যুবকও দাঁড়িয়ে ছিল, যুবকটি এক নামজাদা ইংরাজ ফার্মের ম্যানেজার। নেপালের তরাইয়ে জমিদারের দশ হাজার একার জঙ্গল আছে, দালাল মারফৎ জানতে পেরে, তিনি জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ইংরাজ ফার্ম সমস্ত জঙ্গলটাই ইজারা নেবে।

স্বপন স্তম্ভিত হয়ে উভয়ের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। ছাদের আলিসায় তখন পর্যন্ত একখানা নীল রঙের সাড়ি ঝুলছিল। খুব-চেনা সাড়ি। আসবাব পত্র সাজসরঞ্জামের মধ্যে মাত্র সাড়িখানাই ঠগীরা নিয়ে যেতে পারেনি, তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছে।

আগন্তুকদের সম্বোধন করে স্বপন বলল, "চলুন, থানায় চলুন।"

থানায় এসে স্বপন জানল ইলার দেওয়া হারটা, সোনার নয় গিল্টির এবং ইলাও ঠগী দলের অন্যতম গ্যাঙ্গ-মেম্বর। গ্যাঙটা কিছুদিন যাবৎ নাগরিকদের ও সেইসঙ্গে নগর-পুলিশকে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছে। চৌধুরিবাবু এমন কি তার বন্ধু মিলন পর্যন্ত তাদের দলের লোক, ট্যাক্সিওয়ালাটা পর্যন্ত! স্বপন কড়ে আঙুলটা কামড়াতে কামড়াতে ভাবে আমি এত বোকা! লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে উঠে।

শেষ

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ রসায়নবিদ্যার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। বৈজ্ঞানিক ক্রুকস্ সেই বছর থেলিয়াম আবিষ্কার করে বিজ্ঞানজগতে তুমুল সাড়া পড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর সেই বছরেই ২রা অগস্ট বাংলা দেশের খুলনা জেলার রারুলি নামে এক নির্জন গ্রামে আবির্ভাব হয়েছিলো একটি শিশুর। তার নাম প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

প্রফুল্লচন্দ্র হরিশচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পুত্র। সেকালের জ্ঞানী, গুণী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে হরিশচন্দ্র অন্যতম। তাঁর জ্ঞান ছিলো যেমনি গভীর মতামত ছিলো তেমনি উদার। তিনি ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী রামতনু লাহিড়ীর বিশিষ্ট ছাত্র। নিতান্ত অল্প বয়সেই প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর পিতার সাহায্যে ইংরেজি সাহিত্যের অনেক বিখ্যাত বই শেষ করেছিলেন।

সে-যুগ নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি ভাষার মধ্যে দিয়ে নতুন নতুন চিন্তা ও ভাবধারা আমাদের দেশে তখন এক প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী যাচ্ছে বদলে; সুরু হচ্ছে আমাদের সমাজের ও ধর্মের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে নানা আন্দোলন। এই রকমই একটি বিরাট আন্দোলনের ফলে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হরিশচন্দ্র নিজে ছিলেন একজন স্বাধীন-চিন্তার মানুষ। এবং তখনকার অসংখ্য বুদ্ধিজীবীদের মতো তিনি নিজেও এই সব নতুন চিন্তা ও ভাবধারার স্বাদ পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন। এই আবহাওয়ায় বড় হয়ে ওঠায় প্রফুল্লচন্দ্রের বিরাট প্রতিভা বিকাশের বিশেষ সুবিধে হয়েছিলো।

ন'বছর বয়স পর্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত গ্রামের ইস্কুলে লেখাপড়া করেন। তারপর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে সপরিবারে চলে আসেন এবং তখনই প্রফুল্লচন্দ্র হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু চার বছর পরে অসুস্থতার কারণে দীর্ঘদিনের জন্যে প্রফুল্লচন্দ্রকে ইস্কুল ছাড়তে হয়। এক দিক দিয়ে ভালোই হয়েছিলো ইস্কুল ছেড়ে। ইস্কুলে তিনি ছিলেন নিতান্তই সাধারণ একটি ছাত্র। তা' ছাড়া ইস্কুলের কড়া নিয়মের মধ্যে থেকে অল্প শিক্ষা পেতে তাঁর মন তৃপ্তি পেতো না। অসুস্থ অবস্থায় তাঁর জীবনে এলো যা-খুসি ও যত-খুসি পড়বার বিরাট সুবিধে। তিনি যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। তাঁর পিতার সুন্দর লাইব্রেরি থেকে যখন যে-বই খুসি বেছে নিয়ে তিনি

পড়তেন। এই সময়েই বাংলা ও ইংরেজি অনেক বিখ্যাত লেখকের বই তিনি শেষ করেন। তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিলো মহাপুরুষদের জীবনী আর পৃথিবীর নানা দেশের খবরে ভরা বই। ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, লাতিন, ফরাসী, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি নানা বিষয়ের বই এই সময়ে তিনি পড়েছিলেন। বই পড়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন প্রধান পেটুক প্রকৃতির লোক! যখন যে-বই হাতের কাছে পেয়েছেন তখনই শেষ করেছেন সে-বই।

দু'বছর পরে, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এ্যালবার্ট স্কুলে তিনি ভর্তি হন। এই ইস্কুলটির পরিচালনার ভার ছিলো কেশবচন্দ্রের শিষ্যদের উপর। এইখানেই তিনি সমাজ ও ধর্ম সংস্কারকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং তারই ফলে ভবিষ্যতে তিনি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হন এবং আমাদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। এই ইস্কুল থেকে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পাস করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসনে ভর্তি হন। এখানে মোটামুটিভাবে আমাদের জাতীয় ভাবধারা বজায় রাখা হোতো বলেই প্রফুল্লচন্দ্র বিশেষভাবে এই বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি গদ্য পড়াতেন। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিলো।

এফ্-এ পড়ার সময় প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানের প্রতি, বিশেষ করে রসায়নবিদ্যার প্রতি, বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং বাইরের ছাত্র হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের ক্লাস করতে সুরু করেন। সার আলেক্জাণ্ডার পেড্‌লার সে-সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নবিদ্যা পড়াতেন। তিনি যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ক্লাসে করে দেখাতেন সেগুলি দেখে প্রফুল্লচন্দ্র অত্যন্ত চমৎকৃত হতেন এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে এক ছাত্রবন্ধুর বাড়িতে তিনি ছোটো একটি রসায়নাগার তৈরী করেছিলেন।

ইতিমধ্যে তাঁর পিতা নানা আর্থিক লোকসানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। ফলে প্রফুল্লচন্দ্রকে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেতে পাঠাবার আর্থিক সঙ্গতি তখন তাঁর ছিলো না। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বিলেতে না যেতে পারলে তাঁর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। তাই বি-এ পড়বার সময় লুকিয়ে গিলক্রাইস্ট স্কলারশিপের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন এবং একদিন উক্ত বৃত্তি পেয়ে সবাইকে চমৎকৃত করে দিলেন। এই বৃত্তিলাভের জন্যেই তাঁর পক্ষে বিলেত যাওয়া সম্ভব হয়েছিলো।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথমবার বিলেতে যান। জগদীশচন্দ্র বোসও তখন লণ্ডনে ছিলেন। লণ্ডনে সপ্তাহখানেক থেকে তিনি যাত্রা করেন এডিনবারায়। এডিনবারায় তিনি

ছিলেন ছ' বছর। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানের সঙ্গে বি-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তার কয়েক বছর পরে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই রসায়নবিদ্যায় মৌলিক গবেষণার জন্যে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অগস্ট মাসে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। প্রায় এক বছর তাঁকে বেকার অবস্থায় কাটাতে হয় এবং অবশেষে মাসিক ২৫০৲ বেতনে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অস্থায়ী সহকারী প্রফেসরের চাকরি পান। চাকরির উদ্বৃত্ত সমস্ত সময় তিনি নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যায় করতেন। এই সময়, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মার্কিউরিয়াস নাইট্রেট আবিষ্কার করে পৃথিবীব্যাপী যশ ও সম্মান লাভ করেন। য়ুরোপ এবং আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরা এই আবিষ্কারের জন্যে প্রফুল্লচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

বরাবরই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে আমাদের দেশবাসীর কি বিরাট শক্তি, সময় ও মেধা আইন, ডাক্তারি এবং সরকারি চাকরির খোঁজে অপব্যয় হয়। এই অপব্যয়ের চিন্তা তাঁকে বরাবরই পীড়িত করেছে এবং আমাদের দেশবাসীদের—কেরাণী এবং উকিলের জাতিকে—বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়ী করার জন্যে প্রফুল্লচন্দ্র বরাবর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞানকে ব্যবসার ক্ষেত্রে নিয়োগ করলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে তিনি অনুভব করেছিলেন। ফলে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ৯১, আপার সার্কুলার রোডে মাত্র ৮০০৲ টাকা মূলধন নিয়ে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মেসিউটিক্যাল ওয়ার্কস-এর প্রতিষ্ঠা করেন। দেশী জিনিসপত্র থেকে এবং নিজের দেশবাসীর সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠান থেকেই প্রথম বিজ্ঞান-সম্মতভাবে নানা ওষুধপত্র তৈরী হয়। প্রথমে অবশ্য তাঁকে অনেক অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের অসাধারণ একাগ্রতা ও পরিশ্রমের ফলে দেখতে দেখতে বেঙ্গল কেমিক্যালের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। দেশের আরো নানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ছাড়াও রসায়নবিদ্যার ইতিহাস সম্বন্ধেও তাঁর অসীম উৎসাহ ছিলো। তাঁর "হিন্দু রসায়নবিদ্যার ইতিহাস" নামে দু' ভল্যুমের বই দেশে এবং বিদেশে অত্যন্ত সমাদর লাভ করেছে।

প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষক হিসেবে অত্যন্ত সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং রসায়নবিদ্যাকে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্যে যে-বিরাট ব্যবস্থা করেছিলেন সেই চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে একদল তরুণ বৈজ্ঞানিককে তিনি নিজে হাতে গড়ে তুলেছিলেন, দিয়েছিলেন প্রেরণা ও উৎসাহ। রসায়নবিদ্যাশিক্ষার জন্যে তাঁরই সাহায্যে নতুন একটি

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এবং প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রথম সভাপতিরূপে ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা একটি স্মরণীয় ঘটনা।

প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রায় ত্রিশ বছর চাকরি করার পর, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং য়ুনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্সে পালিত প্রফেসর অফ কেমিস্ট্রি হিসেবে তিনি যোগদান করে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন। তারপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এমিরিটাস' অধ্যাপক নিযুক্ত হন। য়ুনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্সকে প্রথমে অত্যন্ত আর্থিক অসুবিধের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিলো। পালিত, ঘোষ এবং খয়রার প্রচুর দান না লাভ করলে এই কলেজ স্থাপন করা সম্ভবই হোতো না যেখান থেকে সি. ভি. রমন কিংবা প্রফুল্লচন্দ্রের মতো মনীষীরা স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে পারতেন। সায়েন্স কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে তিনি যে-অর্থ পেয়েছিলেন সমস্তই আবার বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন, যাতে সায়েন্স কলেজের রসায়নবিভাগের উন্নতির জন্যে সেই অর্থ ব্যয় করা হয়।

১৯০৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বার য়ুরোপ যান এবং লণ্ডনের বিখ্যাত ডেভি-ফ্যারাডে-রিসার্চ-ল্যাবরেটরিতে এবং পরে য়ুরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য বিখ্যাত রসায়নাগারে নিজে কাজ করেন। সর্বদাই তিনি আমাদের দেশে এ-ধরণের সর্বাঙ্গসুন্দর রসায়নাগারের অভাব অনুভব করেছেন। য়ুরোপ থেকে ফিরে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "হিন্দু রসায়নবিদ্যার ইতিহাস"-এর দ্বিতীয়ভাগ ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ সিলের সাহায্যে শেষ করেন। প্রথম ভাগের মতো এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগটিও পণ্ডিতমহলে অত্যন্ত সমাদর লাভ করেছিলো।

১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'কংগ্রেস অফ দি য়ুনিভার্সিটি'জে তিনি যোগদান করেছিলেন। ১৯২০ সালে চতুর্থবার এবং ১৯২৬ সালে পঞ্চমবার তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন।

লণ্ডনের 'কেমিক্যাল সোসাইটির' এবং বাংলাদেশের 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির' 'ফেলো' হিসেবে তিনি নির্বাচিত হন। বহু বছর ধরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো', সেনেটের মেম্বর, এবং ডিন-অফ-দি-ফ্যাকালটি-অফ সায়েন্স' ছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯১২ সালে তিনি সি. আই. ই. এবং ১৯১৮ সালে নাইটহুড প্রাপ্ত হন।

শিক্ষক এবং বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্বেও রসায়নাগারের শুধু টেস্ট টিউবের মধ্যেই তাঁর মন ডুবে ছিলো না। ভারতবর্ষের রাজনীতির সঙ্গেও ছিলো তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ১৯০১ সালে কলকাতায় গোখেলের বাড়িতে মহাত্মাজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা। মহাত্মাজীর কাছে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের উপর অপমান ও অত্যাচারের বিবরণ শুনে প্রফুল্লচন্দ্র গোখেলের সঙ্গে পরামর্শ করে ১৯০২ সালের ১৯শে জানুয়ারি কলকাতার

এলবার্ট হলে একটি বিরাট সভা আহ্বান করেন। ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন এই সভার সভাপতি এবং মহাত্মা গান্ধী ছিলেন প্রধান বক্তা। কলকাতায় মহাত্মাজী'র এই প্রথম বক্তৃতা এবং তার মূলে ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র।

মহাত্মা গান্ধী, গোখেল, সি. আর. দাস প্রভৃতি নেতাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে তিনি এসেছিলেন এবং কোকোনাডায় কংগ্রেসের অধিবেসনে ডেলিগেট হিসেবে গিয়ে প্রায় দশ মিনিটের জন্যে তিনি সভাপতির আসনেও বসেছিলেন।

নিজে বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্বেও চরখার উপর ছিলো তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। চরখা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন "poor man's insurance against famine," এবং ভারতবর্ষের প্রতি গ্রামে প্রতি ঘরে যাতে চরখায় সুতো কাটা হয় তার জন্যে তিনি দীর্ঘ দিন ধরে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করেছিলেন। বিজ্ঞানকে তিনি আন্তরিকভাবে ভালোবেসেছিলেন, এবং বিজ্ঞানের সাধনাতেই উৎসর্গ করেছিলেন নিজের জীবন। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকেই তিনি প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন বলে বরাবর ঘোষনা করেছেন এবং সেইজন্যেই অসহযোগ আন্দোলন যখন তীব্র গতিতে চলেছে তখন তিনি বলেছিলেন: "Science can afford to wait but Swaraj cannot."

বন্যা ও দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশের চিরদিনের সঙ্গী। তাদের আবির্ভাবের কথা শুনলে এই দুর্বল শীর্ণ মানুষটি সবকিছু ফেলে আসতেন বেরিয়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো সাহায্য করতে পারছেন ততক্ষণ অস্থির হয়ে সময় কাটাতেন। ১৯২১ সালে খুলনা জেলার দুর্ভিক্ষে সরকার বাহাদুর কোনো রকম মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেননি। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যকল্পে প্রফুল্লচন্দ্র দেশবাসীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সমস্ত দেশবাসী যথাসাধ্য দান করে তাঁর প্রার্থনাকে সম্মানিত করে। ১৯২২ সালে আত্রাই নদীর দারুণ বন্যায় বাংলাদেশের একটি অংশ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে তৎক্ষণাৎ 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সায়েন্স কলেজের বিরাট বাড়িটিকে তিনি এই কমিটির আপিস হিসেবে ব্যবহার করেন। নিস্তব্ধ সায়েন্স কলেজ দিবারাত্র ভলেন্টিয়ার ও অন্যান্য নানা লোকের আনাগোনায় হঠাৎ যেন জেগে উঠেছিল এবং প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মতৎপরতায় নিখুঁতভাবে সমস্ত কাজ ঠিক যেন ঘড়ির মতো নির্ভুল হিসেবে সম্পন্ন হতো। ১৯৩১ সালে আর একটি বিরাট বন্যায় উত্তর ও পূর্ববঙ্গের অনেকখানি বিদ্ধস্ত হয়েছিলো। খবর পাওয়া মাত্র প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে 'সঙ্কটত্রান সমিতি' তৎক্ষণাৎ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এবারেও সায়েন্স কলেজকেই উক্ত সমিতির অপিস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রতিবারের মতো এবারেও তাঁর দেশবাসী মুক্তহস্তে যথাসাধ্য দান করেছিলো।

তিনি একজন প্রধান সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন। ১৯১৭ সালে কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান ন্যাসন্যাল সোশ্যাল কনফারেন্সে'র সভাপতিরূপে নির্বাচিত হয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে

তিনি জাতিভেদ তুলে দেবার জন্যে দেশবাসীকে উপদেশ দিয়েছিলেন। জাতিভেদ দূর করা এবং মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করার জন্যে সুযোগ পেলেই নানাভাবে নানা চেষ্টা তিনি করে এসেছেন। ১৯২১ সালের পর থেকে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, জাতীয়তামূলক শিক্ষা এবং স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবার জন্যে বক্তৃতা দিয়ে ক্রমাগত তিনি ঘুরেছেন। তিনি বলতেন যে ষাট বছরের পর থেকেই তিনি সবচেয়ে বেশী কাজ করেছেন। এই সময়ে ভারতবর্ষকে তন্নতন্ন করে তিনি দেখেছিলেন। নানা জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন এবং স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করতে দেশবাসীকে উৎসাহিত করবার জন্যে এই সময়ে কম করে তিনি দু লক্ষ মাইল ভ্রমণ করেছিলেন।

বৈজ্ঞানিক হলেও সাহিত্যের প্রতি ছিলো তাঁর অসীম অনুরাগ। বহু সাহিত্য সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং সর্বদাই চেষ্টা করেছিলেন বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক পুস্তকের অভাব দূর করতে। শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। ১৯৩২ সালে "হিন্দু রাসায়নিকের জীবন ও অভিজ্ঞতা" নামে তিনি একটি আত্মজীবনী রচনা করেন। এই গ্রন্থটি সাহিত্যিক ও পণ্ডিতমহলে প্রশংসিত হয়েছিল। তাঁর লেখা শেক্সপীয়রের উপর একাধিক প্রবন্ধ 'ক্যালক্যাটা রিভিয়ুতে' প্রকাশিত হয়েছে।

গত দু' বছর ধরে তিনি ক্রমাগত ভুগছিলেন, বিশেষ করে ১৯৪২ এর সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে। সেই বছর ডিসেম্বর মাসে কলকাতার উপর যখন বিমান আক্রমণের প্রথম আশঙ্কা দেখা যায় প্রফুল্লচন্দ্রকে তখন শ্রীপুর গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় ফিরে আসবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং ট্রেনে ভিড় বলে নৌকায় যাত্রা করেন। জলপথে ভ্রমণ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। কলকাতায় ফিরে তিনি আর্যস্থান ইন্সিওরেন্সের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। তাঁর জীবনের একমাত্র সখ ছিলো প্রতি সন্ধ্যায় গড়ের মাঠে বেড়াতে আসা। তখনও প্রতি সন্ধ্যায় তাঁকে গড়ের মাঠে নিয়ে আসা হোতো। কিন্তু এই সময় তাঁর মধ্যে একটি অস্থিরতা দেখা যায়। তিনি সায়েন্স কলেজে তাঁর ঘরে ফিরে আসবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁকে সখানে আনা হয়। কিন্তু সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তিনি নিজের গ্রামে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কলকাতা থেকে আবার শ্রীপুরে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। কিন্তু দুদিন পরে তাঁকে আর কিছুতেই সামলানো গেলো না, ফলে নৌকো করে তাঁর গ্রাম রারুলিতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হোলো। ১৯৪৩ সালের ২৪-এ এপ্রিল রারুলিতে তাঁর একটি জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এইটিই তাঁর জীবনের শেষ উৎসব।

কয়েকদিন পরে রারুলিতে হঠাৎ তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক ঝড়ের রাত্রে উত্তেজিত হয়ে মাঝিদের বলেন তখুনি নৌকো ছাড়তে। শ্রীপুরে ফিরে কিছুদিন তিনি ভালো ছিলেন। কিন্তু আবার অসুস্থ হয়ে পড়ায় চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় তাঁকে আনা

হয়। তখন থেকেই তিনি সায়েন্স কলেজে ছিলেন, একেবারে উত্থানশক্তি রহিত হয়ে। একটি প্যারামবুলেটারে করে প্রতি সন্ধেয় বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে তাঁকে সায়েন্স কলেজ থেকে মোটর পর্যন্ত নিয়ে আসা হোতো। গত শীতে তাঁর সর্দিকাশি হয় এবং ক্রমশ এই অসুখ নিউমোনিয়ায় দাঁড়ালো। এই অসুখেই গত শুক্রবার, ১৬ই জুন ১৯৪৪, সন্ধে ছ' টায় সায়েন্স কলেজে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯ বছর আগে ঠিক এই দিনেই চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু হয়েছিলো।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় শুধু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, একজন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন— ডাঃ মেঘনাথ সাহা, প্রফেসর সত্যেন বোস, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি বর্তমান ভারতবর্ষের প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকরা তাঁরই ছাত্র। তিনি শুধু শিক্ষক ছিলেন না, ছিলেন সমাজ সংস্কারক ; শুধু সমাজসংস্কারক ছিলেন না, ছিলেন দেশপ্রেমিক ও রাজনীতিক ; শুধু রাজনীতিক ছিলেন না, ছিলেন সাহিত্যরসিক।—কিন্তু সবচেয়ে বড় ছিলেন তিনি মানুষ হিসেবে। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মানুষ। আজীবন তিনি যা উপার্জন করেছেন সমস্তই খরচ হয়েছে দানে। তাঁর অধিকাংশ দানই ছিলো নীরব ও নিঃস্বার্থ। বাংলাদেশের কত ছাত্র ও কত বিদ্যালয় যে তাঁর দানের উপর নির্ভর করতো তাদের সংখ্যা সহজে নির্ণয় করা যায় না।

প্রফুল্লচন্দ্রের সত্তর বছর বয়সের জয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

"উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সংহত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণ ভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে কখন সম্ভব হোতো না।"

এ-বছরের ফুটবল লিগ

এ-বছরের ফুটবল লিগ মে মাস থেকে আরম্ভ হয়েছে। লিগ আরম্ভ হবার আগে থেকেই নানা চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া যাচ্ছিলো। সে-খবরের অধিকাংশই হচ্ছে নামকরা খেলোয়াড়দের ক্লাব বদল নিয়ে! সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গত বছরের আই. এফ্. এ. শিল্ড জয়ী ইস্টবেঙ্গল। তাদের ফরয়োয়ার্ড লাইনের তু'জন নামজাদা খেলোয়াড়, সোমানা ও আপ্পারাও, ভবানীপুরে চলে গেছেন। গত বছরে ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যের মূলে ছিলো এই তু'জনের তুর্দ্ধর্ষ আক্রমণ। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই, সোমানা ও আপ্পারাও ক্লাব-বদল করলেও এ-বছরে তাঁদের খেলা কলকাতায় কোথাও এ-পর্যন্ত দেখা যায়নি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা যে কোন্ ক্লাবে খেলবেন, এমনকি এ-বছর তাঁরা খেলবেন কিনা, তা নিয়েও অনেক মজার গুজবের সৃষ্টি হয়েছে। পরেরবারের রংমশালে হয়তো এ-বিষয়ে সঠিক খবর তোমাদের জানাতে পারবো। মোহনবাগানে এসেছেন পোর্ট কমিশনারের রাইট আউট নির্মল চাটুজ্যে এবং স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিজন বোস সেণ্টারে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যে-রকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মোহনবাগান হয়েছে সেই অনুপাতে লাভবান। মহামেডান স্পোর্টিং-এ এসেছেন আমিন—গত বছরে তিনি ছিলেন এরিয়ান্সে, তার আগের বছর ইস্টবেঙ্গলে ; আর গোলে এসেছেন কোয়েটা থেকে ইসমাইল।

যুদ্ধের জন্যে এ-বছর কাস্টমস্-এর পক্ষে খেলা সম্ভব হচ্ছে না। এতোদিনকার পুরনো টিমের পক্ষে এ-বছর না খেলা তুঃখের কথা, সন্দেহ নেই।

এ্যাণ্টিলোপস্ নামে নতুন একটি টিম এবার ফার্স্ট ডিভিসনে খেলছে। এই দলে একটিও পেশাদার খেলোয়াড় নেই। গত বছর বি. আই. ব্যাটিলিয়ন নামে মোটামুটি এই টিমটিই পাওয়ার লিগে খেলে মোট ১০০টির উপর গোল দিয়ে খুব নাম কিনেছিলো। শিল্ড খেলায় অবশ্য ৩ গোলে হেরে গিয়েছিলো ইস্টবেঙ্গলের কাছে। এখনো এরা লিগ খেলায় খুব সুবিধে করতে পারেনি। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের কাছে হেরে গেছে। কিন্তু মহামেডানকে হারিয়েছে। মনে হয় লিগের সেকেণ্ড-হাফে বৃষ্টি পড়লে এই বুটপরা টিম ভালো খেলবে।

এরিয়ান্সের ভাঙা টিম দেখলে তুঃখ হয়। তাদের সেই অদ্ভুত সেণ্টার ফরোয়ার্ড ডি. ব্যানার্জি আর নেই যার ভয়ে বিপক্ষ দলের গোলকিপারের বুক সর্বদা কাঁপতো। এ-বছর মাত্র একদিন তিনি খেলতে নেমেছিলেন। কিন্তু চার বছর আগের ডি. ব্যানার্জির সঙ্গে এখন তাঁর আকাশ-পাতাল তফাৎ। তাদের ফরোয়ার্ড লাইন এখনো খুব দ্রুত ও

বেশ ভালো খেলছে এবং এই ভাঙা টিম নিয়েও মাঝেমাঝে চমক দিতে পারে। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে তারা ড্র করেছে এবং এ বছরের সবচেয়ে ভালো টিম মোহনবাগানের কাছে হেরেছে মাত্র এক গোলে। মোহনবাগানের দিনই তারা খেলেছিলো সবচেয়ে ভালো।

ডালহৌসির ফরোয়ার্ড এ-বছর যেমনি ভালো, ডিফেন্স তেমনি খারাপ। এ্যাণ্টিলোপস্ যে-রকম মিলিটরি টিম, এ-বছরের ডালহৌসি মোটামুটি সেই রকম আর. এ. এফ্-এর টিম। ডালহৌসি দলে এ-বছর আছে কয়েকটি বিলিতি পেশাদার খেলোয়াড়। সবদিন খেলোয়াড় জোগাড় হয় না বলে তারা ভালো খেলতে পারে না। মোটামুটি দেখা গেছে শনিবার দিনটায় তারা দারুণ খেলে। এ-বছর মোহনবাগানকে কোনো দলই যখন রুখতে পারছিলো না তখন ডালহৌসিই প্রথম ১-১ গোলে মোহনবাগানের সঙ্গে ড্র করে। আর ড্র কি রকম! খেলা শেষ হবার পাঁচ মিনিট আগে পর্যন্ত ডালহৌসিই জিতছিলো এক গোলে। জল পড়লে এরাও ভালো খেলবে বলে মনে হয়। শীল্ডে ডালহৌসি রীতিমতো ভালো লড়বে বলে সবাই মনে করছে।

কাগজে-কলমে কিন্তু এ-বছরের সবচেয়ে ভালো টিম বি. এণ্ড এ. আর। কোনোদিন এরা ছবির মতো খেলে, কোনোদিন আবার যেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হেরে যায়। এদের লেফ্ট আউট আলাউদ্দিন দারুণ খেলেন। বিপক্ষ দলের একের-পর-এক খেলোয়াড়দের কাটিয়ে তীরের মতো লাইন ধরে এগিয়ে গিয়ে পারেন নিখুঁত সেণ্টার করতে। সেণ্টার ফরোয়ার্ড হচ্ছেন বি. কর, গত বছরে সবচেয়ে বেশী গোল দিয়েছিলেন। এঁর শট বিত্যুতের মতো, বিশেষ করে বাঁ পায়ে বল পড়লে আর রক্ষে নেই। সেণ্টার হাফে এসেছেন মোহিনী বাঁড়ুজ্জে, গত বছর ছিলেন কালিঘাটে। নীলু মুখুজ্যেও রীতিমতো ভালো খেলোয়াড়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত তিনি মোহনবাগান দলে খেলে নাম করেন, গত বছরে ছিলেন ভবানীপুরে। গোলে আছেন জেকব, মন্দ নয়। বি. এণ্ড এ. আর বরাবরই একটা খাপছাড়া দল। গত বছরের কথাই ধর না : শিল্ডে মহামেডানকে ২-১ গোলে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে তু-এক গোলে নয়—একেবারে ৭-১ গোলে গেলো হেরে! ভাবতে পারো একবার? এ-বছরেও এই দারুণ দল ইস্টবেঙ্গলের কাছে যেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে টপাটপ চারটে গোল খেয়ে বসলো। কারুরই যেন খেলায় গা নেই। অথচ মোহনবাগানের সঙ্গে তাদের খেলা যদি দেখতে! ঠিক একেবারে ছবির মতো। যেখানে বল সেখানেই বেঙ্গল-আসাম, যেখানে বেঙ্গল-আসাম সেখানেই বল! সেদিন মোহনবাগান যে-রকম বাজে খেলেছিলো বেঙ্গল-আসাম খেলেছিলো ঠিক সেই রকম ভালো। প্রত্যেকটি খেলোয়াড় খেলেছিলো জীবন-পণ করে। ফলে এ-বছর মোহনবাগানকে হারাবার সৌভাগ্য একমত্র তাদেরই হয়েছে। অথচ মোহনবাগানের সঙ্গে খেলার ঠিক আগেই রেঞ্জার্সের কাছে তারা হেরে বসেছিলো আর এ-বছর রেঞ্জার্স

চলেছে লিগ-টেব্‌লের সবচেয়ে নীচের দিকে। সেদিন অবশ্য মোহনবাগানের গোলকিপার রাম ভটচাজ খেলেন নি, তিনি থাকলে হয়তো ওই গোলটা হতে দিতো না। তাছাড়া ছিলেন না লেফ্‌ট ইনে নিমু বোস। একটিমাত্র খেলোয়াড়ের অভাবে মোহনবাগানের আশ্চর্য ফরোয়ার্ড লাইন একেবারে যেন কানা হয়ে গিয়েছিলো।

আগেই বলেছি এ-বছর সোমানা আর আপ্পারাও না থাকায় ইস্টবেঙ্গল একেবারে কানা হয়ে গেছে। লেফ্‌ট ইনে অবশ্য পাগসলি এখনো ভালো খেলছে, যদিও আগেকার তুলনায় তাঁর ফর্ম পড়ে গেছে। তাদের দলে পাগসলিই এখন সবচেয়ে ভালো স্কোরার। কিন্তু তাকে বল দিয়ে খেলাতে কেউ নেই। ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্স লাইনও খুব দুর্বল। ব্যাকে খেলছেন পরিতোষ, রাখাল কিংবা প্রমোদ—এঁদের তিনজনের খেলাই গেছে পড়ে। একমাত্র গোলে রয়েছেন কে. দত্ত। তিনি না থাকলে এ-বছর ইস্টবেঙ্গল আরো অনেক খেলাতেই নির্ঘাৎ হারতো। এ-পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল হেরেছে দু'বার—মোহনবাগানের কাছে এক ১-০এ এবং মহামেডানের কাছে ২-০এ। ড্র করেছে একটি, এরিয়ান্সের সঙ্গে। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ডালহৌসির ম্যাচটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল জিতছিলো ৪-৩ গোলে। সে ভারি মজার খেলা। ইস্টবেঙ্গল একটি করে গোল দেয়, ডালহৌসি সেটি দেয় শোধ। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ডালহৌসি আর দাঁড়াতে পারেনি। উপরি-উপরি আরো তিনটি গোল খেয়ে ৭-৩ গোলে হেরে যায়।

মহামেডান স্পোর্টিং লিগ খেলতে আরম্ভ করে খুব দেরি করে। ফলে উপরি-উপরি তাদের অনেকগুলি ম্যাচ খেলবার অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছে। এ-বছরে তাদের প্রথম খেলায় ইস্টবেঙ্গলকে ১-০এ হারিয়ে খুব নাটকীয়ভাবে তারা লিগ আরম্ভ করেছিলো। কিন্তু তাদের প্রথম দিনকার ফর্ম সবদিন বজায় থাকছে না। এ্যান্টিলোপস্‌ এবং মোহনবাগানের কাছে হেরেছে এবং আরো দুটি ড্র করেছে। তবে ক্রমশই তাদের খেলা যেন খুলছে। শেষ খেলায় ডালহৌসিকে ৪-০এ হারিয়ে সবাইকে তারা চমকে দিয়েছে। এ-বছর এইটিই তাদের শ্রেষ্ঠ খেলা। তাদের সেণ্টার হাফ সবজান এ-দিন তার অপূর্ব খেলা দেখিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন।

সবদিক দিয়ে দেখতে গেলে মোহনবাগানের কাছে দাঁড়াতে পারে এমন কোনো টিম এবার নেই। তাদের ডিফেন্স একেবারে দুর্ভেদ্য: গোলে রাম ভটচাজ; ব্যাকে মান্না আর শরৎ; হাফে অনিল, আও আর দীপেন। মোহনবাগানের ডিফেন্স অবশ্য প্রায় প্রতিবারেই ভালো থাকে। এবারে কিন্তু ফরোয়ার্ড লাইনও চমৎকার। গুঁই-এর পর থেকে ভালো রাইট আউটের অভাবে মোহনবাগানকে বরাবর ভুগতে হয়েছে। এ-বছর পোর্ট কমিশনার থেকে নির্মল আসায় মোহনবাগানের সে অভাব ঘুচলো। এমন ক্ষিপ্রগতি, বিপক্ষদলের খেলোয়াড়দের বেবাক বোকা বানিয়ে বল নিয়ে তীরের মতো এগিয়ে যাওয়া,

ছুটতে-ছুটতে হঠাৎ বল থামিয়ে দিক্‌-পরিবর্তন করা এবং সবশেষে, যে-কোনো পায়েই হোক, নিখুঁত সেণ্টার করা—কলকাতার মাঠে আজকের দিনে তাঁর মতো বোধ হয় আর কেউ নেই। আউটের খেলোয়াড়ের এতো ভালো বল-কন্ট্রোল বাস্তবিক বিস্ময়কর। তবে নির্মল, যাকে বলে বাবু-খেলোয়াড়। আরো গা-দিয়ে খেলা তাঁর নিশ্চয়ই উচিত। ভালো সেণ্টার ফরোয়ার্ডের অভাবে মোহনবাগান চিরকাল 'ভালো খেলিয়াও পরাজিত' হয়। স্পোর্টিং ইউনিয়ন থেকে বিজন বোস আসায় মোহনবাগানের অনেক দিনকার একটি দারুণ অভাব দূর হোলো। এ-পর্যন্ত তিনিই সবচেয়ে বেশী গোল দিয়েছেন। তবে লেফ্‌ট ইনের নিমু বোসই হচ্ছেন মোহনবাগানের যাকে বলে স্টার প্লেয়ার—মোহনবাগানের নিজের হাতে গড়া। চট করে সমস্ত খেলার ধাঁচটা বুঝে নিয়ে কখন কি-ভাবে আক্রমণ করা উচিত নিমুর মতো ভালো সে-কথা খুব কম খেলোয়াড়ই বোঝেন। নিজেও যেমনি ভালো খেলেন, অন্যান্য খেলোয়াড়দেরও তেমনি পারেন ভালো খেলাতে। তবে তাঁর প্রধান দোষ হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে বল নিয়ে অনেকক্ষণ ঝুলে থাকা। ফলে খেলার টেম্পো অত্যন্ত মন্থর হয়ে আসে এবং বিপক্ষের ডিফেন্স সুবিধেজনক জায়গা দখল করার সময় পেয়ে যায়।

এই বছরে মোহনবাগানের অনেকগুলি খুব ভালো খেলা দেখা গেছে। প্রথমত হচ্ছে ক্যালকাটার সঙ্গে তাদের ৪-১ গোলে জেতা। প্রথমার্ধে ফলাফল ১-১। মোহনবাগান সেম-সাইডে গোল খায়। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় মোহনবাগান প্রাণপণে বারবার আক্রমণ করছিলো, বল গোলে মারছিলো—সবই হচ্ছিলো, কিন্তু শুধু গোল হচ্ছিল না। শেষ হবার তিন মিনিট আগে হঠাৎ খেলাটা যায় ঘুরে। দ্বিতীয় গোল দিলো বিজন। আর তারপরেই ক্যালকাটা সেণ্টার করছে আর মোহনবাগান গোল দিচ্ছে। দু মিনিটের মধ্যে মোহনবাগান তিন গোল দিয়ে দেয়। অনেক বৃদ্ধ বলেন গত পঁচিশ বছরের মধ্যে এই দু'মিনিটের মতো ভালো মোহনবাগান কখনো খেলেনি।

অবশ্য মোহনবাগানের সবচেয়ে ভালো খেলা দেখা গিয়েছিলো মহামেডানের বিরুদ্ধে। মোহনবাগান ১-০ জিতেছিলো, যদিও বিজন বোসের অন্তত আরও দুটি গোল নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত ছিলো। বিজনের খেলা দেখে নন্দর ঐতিহাসিক মিস্‌ করার কথাই বারবার মনে পড়ছিলো। মহামেডানও খেলেছিলো খুব ভালো—এবং এ-দিনের খেলার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে খেলার স্পিড। এ-ধরণের বিদ্যুৎগতির খেলা এ-বছরে আর একটিও হয়নি।

এ-বছরের প্রথম চ্যারিটি খেলা হয়েছিলো মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে। আর কী সাঙ্ঘাতিক ভিড় যে হয়েছিলো না দেখলে বোঝা যায় না। গ্রাউণ্ডে যতলোক ঢুকে খেলা দেখতে পেরেছিলো তার চেয়ে অন্তত তিনচারগুণ বেশি লোক ভিড়

করেছিলো কেল্লার মাঠে। এই ভিড় এবং দর্শকদের তুর্দশা দেখে কলকাতায় স্টেডিয়ামের অভাব সবাই হাড়ে-হাড়ে বুঝেছে।

অবশ্য এ-দিনের খেলা ঠিক তেমন জমেনি। মোহনবাগানই খেলেছিলো সবদিক দিয়ে ভালো এবং কখনোই মনে হয়নি ইস্টবেঙ্গল গোল দিতে পারবে। অনেকেই বলেন নেহাৎ যেন কপাল জোরেই ইস্টবেঙ্গল মাত্র এক গোলে হেরেছে। প্রথমার্দ্ধে মোহন-বাগানের ফরোয়ার্ড লাইন ঠিক যেন ছবির মতো খেলেছিলো। তা'ছাড়া মোহনবাগানের ডিফেন্সের খেলাও হয়েছিলো একেবারে নতুন ধরণের। ইস্টবেঙ্গল কয়েকবার যখন চাপবার চেষ্টা করেছিলো তখন মোহনবাগানের তু'জন ইনসাইড ফরোয়ার্ড চলে আসছিলো হাফ ব্যাকে এবং হাফ-ব্যাকরা পিছিয়ে এসে সব-রকম ফাঁকই দিচ্ছিলো বন্ধ করে। কিন্তু বলটা নিজেদের এলাকা থেকে বেরিয়ে গেলেই ফরোয়ার্ড লাইনের খেলোয়াড়রা চক্ষের নিমেষে এগিয়ে আসছিলো আক্রমণ করতে। এ-ধরণের খেলাকে বলা হয় আর্সেনাল-পেটেণ্ট।

এক-একটি করে খেলোয়াড় ধরে বিচার করলে হয়তো দেখা যাবে মোহনবাগান ক্লাব থেকে আগে যে-সব বিখ্যাত খেলোয়াড়রা বেরিয়েছেন সে-রকম একটি খেলোয়াড়ও মোহনবাগানে আজ নেই। কিন্তু তরুণদের নিয়ে এই দলটির মধ্যে একটি আশ্চর্য টিম-স্পিরিট আছে—এবং খেলার মাঠে এইটেই হচ্ছে আসল কথা।

অবশ্য বৃষ্টি এখনো পড়েনি। বৃষ্টি আরম্ভ হলে অনেকসব চমকপ্রদ মজার ঘটনা খেলার মাঠে ঘটবে সন্দেহ নেই। বেঙ্গল-আসামের দিন মোহনবাগান যে-রকম খেলেছিলো সে-রকম আর না খেললে লিগ এবং শিল্ডে মোহনবাগানের বেশ ভালো চান্স আছে বলে মনে হয়।

গত বছর লিগে মোহনবাগান যে-রকম বিশ্রী আরম্ভ করেছিলো ইস্টবেঙ্গল তেমনি বিশ্রী খেলে শেষ করে। এ-বছর মোহনবাগান যে-রকম ভালো সুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল শেষের দিকে যদি সেই রকম ভালো খেলে তা'হলে লিগ খেলার ফলাফল কী হবে বলা যায় না। তা'ছাড়া মহামেডানকে ভুললেও চলবে না। এই তিনটি ক্লাবই কান ঘেঁষে চলেছে। নীচে তাদের খেলার টেবল্ দিলুম :

	খেলেছে	জিতেছে	ড্র	হার	গোল দিয়েছে	গোল খেয়েছে	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	১৪	১২	১	১	২৭	৪	২৫
ইস্টবেঙ্গল	১৪	১১	১	২	৩৩	৮	২৩
মহামেডান স্পোর্টিং	১৪	১০	২	২	২২	৪	২২
বেঙ্গল-আসাম	১৪	৯	২	৩	২৪	১৫	২০

কা. চ.

আশ্বিন-মাসের প্রতিযোগিতা

১। **হাসির গল্প :** গল্পটি ৪২৫ কথার মধ্যে হওয়া দরকার। এর চেয়ে বড় হলে গ্রাহ্য হবে না। চিত্তাকর্ষক নাম, প্লট এবং চলতি ভাষায় লেখবার স্টাইল—নির্বাচনের সময় এই তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হবে।

চোদ্দ-বছর পর্যন্ত যে-সব গ্রাহক-গ্রাহিকাদের বয়স এই প্রতিযোগিতায় শুধু তারাই পারবে যোগ দিতে। শ্রেষ্ঠ গল্পটির জন্যে পাঁচ টাকা দামের বই পুরস্কার দেওয়া হবে।

২। **হাসির কবিতা :** কবিতাটি ৩০ লাইনের মধ্যে হওয়া দরকার। এর চেয়ে বড় হলে গ্রাহ্য হবে না। চিত্তাকর্ষক নাম ও ছন্দ—নির্বাচনের সময় এই তু'টি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হবে।

চোদ্দ থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত যে-সব গ্রাহক-গ্রাহিকাদের বয়স শুধু তারাই পারবে যোগ দিতে। শ্রেষ্ঠ কবিতাটির জন্যে পাঁচ টাকা দামের বই পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রতিযোগিতার নিয়ম

যারা গ্রাহক শুধু তারাই পারবে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। রচনার উপরে নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক নম্বর থাকা চাই। পরিস্কার করে কালিতে লিখে রচনা পাঠানো দরকার। পেন্সিলের লেখা গ্রাহ্য হবে না। রচনাগুলি ২০শে শ্রাবণের মধ্যে রংমশালের নতুন আপিসে পৌছনো চাই। তারপরে পৌছলে অগ্রাহ্য হবে। অমনোনীত রচনা ফেরং দেওয়া হবে না। অতএব ডাকটিকিট পাঠিও না। রচনাগুলি ঠিকমতো পৌছেছে কিনা জানতে হলে এ্যাকনলেজমেণ্টরিসিটসহ রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠিও। রচনার সঙ্গে কোনো চিঠিপত্র যেন না থাকে। চিঠি থাকলে রচনাটি অগ্রাহ্য হবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা তুটি আশ্বিনের রংমশালে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ছবিসহ ছাপা হবে।

নূতন ধাঁধা

পেরেকের বিষ

শ্যামবাজারের প্রসিদ্ধ কাপড়ে ব্যবসায়ী নীলমণি হালদারের মৃত্যুতে চতুর্দিকে সাড়া পড়ে গেছে। পুলিশ সন্দেহ করছে এ-মৃত্যু অস্বাভাবিক। আসলে নীলমণি হালদারকে কেউ খুন করেছে। কারণ মৃতদেহ পরীক্ষা করে জানা গেছে মৃত্যু ঘটেছে অক্সিলোন নামে এক মারাত্মক বিষ প্রয়োগের ফলে।

ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর অরিন্দম বোসের উপর পড়েছে তদন্তভার। অরিন্দম প্রথমে গেলো ডাক্তারের কাছে এবং তাকে জিগগেস করলো, "আপনি বলছেন অক্সিলোন প্রয়োগে মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বিষ কী করে প্রয়োগ করা হয়েছিলো?"

"সেইটেই তো সমস্যা", ঘাড় চুলকে বললেন ডাক্তার। "এই বিষ সেবন করলে কিংবা শরীরে ইনজেক্ট করলে তবেই মৃত্যু হয়। মৃতদেহের পাকস্থলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে নিহত ব্যক্তি মৃত্যুর আগে প্রায় পনেরো ঘণ্টা কিছুই খায়নি। ফলে বিষের কোনো চিহ্নই নেই। তাই মনে হচ্ছে হয়তো এই বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিলো তাঁর শরীরের কোনো অংশে।"

অরিন্দম এরপর দেখা করলো নীলমণি হালদারের অনুগত ভৃত্য বনমালীর সঙ্গে। অরিন্দমের প্রশ্নের উত্তরে বনমালী বললো, "কত্তাবাবু গতকাল সমস্ত দিন বড়বাজারে নিজে ঘুরেছিলেন। সন্ধে প্রায় সাতটার সময় ফিরে বললেন পেটের ভেতরটা কেমন যেন মোচড়াচ্ছে। তাই কিছুই খেলেন না। রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত তিনি সেই অসুস্থ শরীরেই নানা হিসেবপত্র করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন আলো নিভিয়ে। এমনিতে ঘুম থেকে উঠতে তাঁর ন'টা বেজে যেতো। শরীর ভালো ছিলো না বলে আজ সকালে উঠেছিলেন দশটায়। উঠেই আমাকে ডাকলেন। বলেছিলেন বিশ্রাম পেয়ে শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে, ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। আরো বললেন তাঁর বাইরে যাবার কাপড়-জামা-জুতো ঠিক করে দিতে, তখুনি তাঁকে কী সব কাজে ডালহৌসি স্কোয়ারে যেতে হবে। তাঁকে জুতো পরিয়ে বললুম পাশের ঘরেই সকালের চা-ডিম ইত্যাদি প্রস্তুত। তাড়াতাড়ি খাবার ঘরে ঢুকে তিনি চেয়ারে বসলেন আর খেতে আরম্ভ করার ঠিক আগেই হঠাৎ তাঁর সমস্ত শরীর চেয়ারের এক দিকে ঝুঁকে পড়লো। কাছে গিয়ে তাঁকে তুলতে গিয়ে দেখি কত্তাবাবু মারা গেছেন।"

অরিন্দম ভাবনায় পড়লো। বনমালীর কথা সত্যি হলে আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর এবং আহারে বসার আগে—এই সময়টুকুর মধ্যেই কেউ তাঁকে অক্সিলোন ইনজেক্ট করেছে।

"তুমি ছাড়া আজ সকালে আর কারুর সঙ্গে নীলমণিবাবুর দেখা হয়েছিলো?"

"না হুজুর। কত্তাবাবুর ভাইপো মধুবাবুর সঙ্গেও না।"

অরিন্দম তারপর খুব ভালো করে মৃতদেহ পরীক্ষা করলো। কিন্তু দেহের কোথাও ইনজেকসনের দাগ খুঁজে পেলো না। শুধু দেখা গেলো বাঁ পায়ের গোড়ালির তলায় একটুখানি ছড়ে যাবার চিহ্ন। তারপর সে পরীক্ষা করলো কাপড়। কিন্তু সেখানেও খুঁজে পেলো না মৃত্যুর কোনো কারন। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো নীলমণিবাবুর এ্যালবার্ট জুতোটার উপর; জুতোটা প্রায় নতুন।

"কোথা থেকে জুতোটা কেনা হয়েছে?" অরিন্দম প্রশ্ন করলো।

"হুজুর জুতোটা পুরোনো। কলেজ স্ট্রিটের কালু মিঞার দোকান থেকে জুতোটা কালকেই সারিয়ে আনা হয়েছে," উত্তর দিলো বনমালী। "কালু মিঞার দোকান থেকেই কত্তাবাবু বরাবর জুতো কেনেন কিংবা সারাতে দেন।"

"জুতোটা সারিয়ে আসবার পর এর আগে কি নীলমণিবাবু এটা পরেছিলেন?"

"না হুজুর। জুতোটা গতকাল রাত্রে এসেছে। আজ সকালেই আমি পরিস্কার করে কালি দিয়ে ঠিক করে রেখেছিলুম।"

"ভালো কথা। নীলমণিবাবুর ভাইপো মধুবাবুর সঙ্গে কি তাঁর ঝগড়া-টগড়া ছিলো?"

একটু ইতস্তত করে বনমালী উত্তর দিলো, "হালে তাঁদের প্রায়ই ঝগড়া হোতো। দাদাবাবুর বন্ধুদের কত্তাবাবু মোটেই দেখতে পারতেন না। বলতেন যত সব ছোটোলোকের সঙ্গে দাদাবাবুর আলাপ। ঐ কালু মিঞার ছেলেই ছিলো দাদাবাবুর প্রাণের বন্ধু। সারাদিন তার সঙ্গে ঘুরতো বলে কত্তাবাবু খুব রাগারাগি করতেন। কিন্তু দাদাবাবু তাঁর কথা না শোনায় কত্তাবাবু তাকে টাকা-পয়সা দেওয়া একেবারে বন্ধ করেছিলেন। সেই নিয়েও হালে প্রায়ই খুব ঝগড়া-ঝাঁটি হোতো।"

এরপর অরিন্দম জুতো জোড়াটা পরীক্ষা করতে লাগলো। হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার চোখ-মুখ। বাঁ পায়ের জুতোর ভিতরে চিকচিক করছে একটা পেরেকের ধারালো মুখ।

নানা খোঁজ-খবর নিয়ে কয়েক ঘণ্টা পরে মধুর সঙ্গে অরিন্দম দেখা করে সোজা প্রশ্ন করলো, "আট দিন আগে কী জন্যে আপনি অক্সিলোন কিনেছিলেন?"

মধুর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেলো কিন্তু জোর করে সে বারবার বলতে লাগলো, "শপথ করে বলছি অক্সিলোনটা অর একজনকে দিয়ে দিয়েছিলুম।"

তারপর অরিন্দম এলো কালু মিঞার দোকানে, কলেজ স্ট্রিটে। অরিন্দমের সঙ্গে সর্বদা থাকে তার ভাগে অজয়। তারা দোকানে খোঁজ নিয়ে জানলো কালু মিঞা আজ আসবে না। কি কাজে তার টালিগঞ্জের বাড়িতেই থাকবে।

টালিগঞ্জে কালু মিঞার বাড়ি গিয়ে তারা দেখলো মধুর বয়সী একটি ছেলে অনেকগুলো কুকুর নিয়ে মহা উৎসাহে খেলছে আর তাদের খেলা শেখাচ্ছে।

অরিন্দম কালু মিঞাকে বললো, "তোমার ছেলের বুঝি খুব কুকুরের শখ ?"

"হ্যাঁ হুজুর। কিন্তু গত পরশুই তার সবচেয়ে প্রিয় কুকুরটাকে মেরে ফেলতে হয়েছে, সেটা পাগল হয়ে গিয়েছিলো বলে।"

"হুঁ, কে মারলো কুকুরটাকে ? কী করে মারা হোলো ?"

"কে আর মারবে হুজুর। নীলমণিবাবুর ভাইপো ওকে কি যেন একটা কুকুরমারা বিষ দিয়েছিলো। মাংসর সঙ্গে মিশিয়ে ও নিজেই কুকুরটাকে খাইয়ে মারে। তারপর থেকেই ও প্রায় নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে বসে আছে। আজকেই দেখছি মনটা একটু নরম।"

অরিন্দমের হাতটা সজোরে চেপে ধরে অজয় বললো, "মামাবাবু, এক্ষুনি ছেলেটাকে গ্রেপ্তার করুন। নিশ্চয়ই ও জুতোর পেরেকে বিষ লাগিয়ে পাঠিয়েছিলো।"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে অরিন্দম বললো, "আমার মনে হয় না কিন্তু-ও অপরাধী।"

"কেন ?" উত্তেজিত হয়ে অজয় প্রশ্ন করলো।

"জুতোটা যখন নীলমণিবাবুর বাড়ি পৌঁছেছিলো তখন সেটায় বিষ ছিলো না। আমার মনে হচ্ছে মধুকেই গ্রেপ্তার করতে হবে।"

"কী করে আপনি সে কথা জানলেন ?" অরিন্দম তাকে বললো।

কী করে অরিন্দম জানলো নীলমণিবাবুর বাড়িতে পৌঁছবার পরেই জুতোটায় বিষ লাগানো হয়েছিলো ?

শ্রাবণ-সংখ্যার রংমশালে এর উত্তর পাবে।

বৈশাখ মাসের ধাঁধার উত্তর

প্রথম খদ্দের পেল ৩৷৹ আর ৷৷৹ খানা মোট ৪টা, দ্বিতীয় খদ্দের পেল ১৷৹ আর ৷৷৹ খানা মোট ২টা এবং তৃতীয় খদ্দের পেল ৷৷৹ খানা আর ৷৷৹ খানা মোট ১টা। তাহলে মোট ৭টা ডিম ছিল।

কৈফিয়ত

এই সংখ্যা (আষাঢ়, ১৩৫১) থেকে 'রংমশাল' নতুন পরিচালনা ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হোলো। 'রংমশাল' আপিসের ঠিকানাও বদলে গেছে। বর্তমান ঠিকানা : ৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা। তোমরা এটি বিশেষভাবে মনে রেখো এবং রংমশাল সম্বন্ধে চিঠিপত্র টাকাকড়ি সমস্তই এই নতুন ঠিকানায় পাঠিও।

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন আজ থেকে ন'বছর আগে 'রংমশাল' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ করেন। এই ক'বছরের মধ্যেই তাঁর যত্নে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে 'রংমশাল' আজ বাংলার কিশোর-কিশোরীদের কাছে এতো প্রিয়। এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও নানা দুর্দিন ও দুঃসময়ের মধ্যেও 'রংমশাল'কে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বাংলার কিশোর-কিশোরীরা নিঃসন্দেহেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যায় প্রভাতকিরণ বসুর উপন্যাসটি শেষ হোলো। কোনো বিশেষ কারণে এই সংখ্যায় হেমেন্দ্রকুমার রায়ের উপন্যাসটি ছাপা সম্ভব হোলো না বলে দুঃখিত। শ্রাবণ সংখ্যা থেকে বিখ্যাত সাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মশাল" নামে একটি নতুন ধরণের উপন্যাস ছাপা হবে।

তোমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে আশ্বিন থেকে প্রতি মাসেই রংমশালে একটি করে পুরস্কার প্রতিযোগিতা থাকবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাগুলি রংমশালে প্রকাশিত হবে, সেই সঙ্গে থাকবে লেখক-লেখিকাদের ফটো। যারা গ্রাহক শুধু তারাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে। অতএব আজকেই চটপট গ্রাহক হয়ে যাও।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, লীলা মজুমদার, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজ রায়চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনা নিয়মিতভাবে রংমশালে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রংমশাল যাতে তোমাদের আরো প্রিয় হয়ে উঠতে পারে তার জন্যে আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবো না।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মনে রেখো

রংমশালের নতুন ঠিকানাঃ

C/o সংকেত-ভবন

৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট

পোঃ আঃ এলগিন রোড

কলকাতা

"ঢাকেশ্বরী"র বস্ত্র দাবী করুন

কেবল বাংলার বা বাঙ্গালীর বলেই নয়, ঢাকেশ্বরী বস্ত্র সুদৃশ্য, সুস্পৃশ্য ও সুলভ বলেও।

• দি ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স্ লিঃ •

কর্ম্মাধ্যক্ষ—শ্রীসূর্য্যকুমার বসু

ফোন নং ৯ ও ২০৭ প্রধান অফিসঃ নারায়ণগঞ্জ। টেলিগ্রাফঃ "কটন্

কারখানাঃ

১নং মিল ধামগড়, নারায়ণগঞ্জ। ২নং মিল—গডেনাইল, নারায়ণগঞ্জ।

রংমশাল

[নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৫১]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

গত ১২ই জুন, ১৯৪৪এর নতুন Paper Control (Economy) Order অনুযায়ী এই সংখ্যা থেকে রংমশালের পৃষ্ঠা-সংখ্যা মারাত্মক রকম কম করতে আমরা বাধ্য হলুম। আরো বেশী পৃষ্ঠা ছাপাবার অনুমতির জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। পত্রিকার এই অঙ্গচ্ছেদ দেখে নিশ্চয়ই তোমরা ক্ষুণ্ণ হবে। আমরাও তোমাদের চেয়ে কম দুঃখিত নই। এই অল্প পরিসর স্থানে ছবি কিংবা রংমশালের সব বিভাগগুলি নিয়মিত ছাপা অসম্ভব, তোমরা বুঝতেই পারছো। যে-কটি রচনা ছাপা সম্ভব সে-কটিই যাতে খুব ভালো হয় কেবলমাত্র সেই চেষ্টা করবার উপায়ই আমাদের হাতে আছে। সে চেষ্টার ত্রুটি আমরা করবো না।—সম্পাদক

হনুমানের গান

অন্নদাশঙ্কর রায়

ওরে হনুমানের দল !
যাস্‌নে কেন লম্ফ দিয়ে
যেখানে ইম্ফল ?
যা,
লড়াই করে খা।
বলুক লোকে, সাবাস বটে
মহাবীরের ছা।
আমার বাগান ধ্বংস করে
তোদের কিম্ফল ?
ওরে হনুমানের দল !

ওরে হনুমানের দল।
অনুমান তো হয় না তোদের
আছে বাহুর বল।
যা,
বড়াই করে খা।
হল্লা শুনে হাসুক লোকে
হা হা হা হা হা !
লম্ফ দিতে জানিস্ শুধু
লাঙ্গুল সম্বল !
ওরে হনুমানের দল !

তপত্রীর যাত্রা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম মঞ্জিল

॥ চালতা তলার সাট্ ॥

গায়ন দিশা :

সিন্দুর বরণ মেঘ, বিন্দু বিন্দু বর্ষে পাণি,
বনচালতায় রঙ্ ধরায়
দুধ আলতায় একটুখানি।

ডাল বেয়ে ওঠে লাল পিঁপড়া
গাল পাড়ে উই চিংড়া
কী তার গলা খাঁকানি—

॥ উইচিংড়ার নৃত্যগীত ॥

ছি ছি ছি চি
মেজো পিসি সেজো পিসি
ডেঙে পিম্‌ড়ে দিলে চিমটে
গিচি গিচি, তেঁতুলে বিছে দিলে খিমচে

ছি ছি হাড়-জ্বালানি
রী-রী-ইরি-রি-ছিঃ।

॥ গীত—কোলা বেঙের আখর-পাখর নৃত্য ॥

এরে চালতা তলায় হাঁটু পানি
ঝিঁঝিঁর মায়ের কান ফোঁড়ানি—
জীজীমায়ের কী লাফানি!
ভন্‌ভনানি মশামাচির
গপ্‌গপানি বেঙ-বেঙাচির
খেয়ে তেলাপোকার জলপানি।
লম্বা ঠ্যাং গঙ্গাফড়িং
পোল্কা নাচে তিড়িং বিড়িং
উইচিংড়ির বাদ্যি বাজে
আদ্যিবুড়ি ফিড়িং ভাজে
বত্তিবুড়ি পাকায় সিম্।
ঝাঁজ বাজে কাঁচপোকার
—রিমি ঝিমি ঘুমপাড়ানি ॥

॥ ঝিঁঝিঁ পোকাদের জিঞ্জির নৃত্য ॥

মঞ্জির জিঞ্জির খঞ্জুরি টিং টিং
রিপিটিং রিপিটিং
ক্রিংইং ক্লিংইং
দিন্ দিন্ থ্রী সিলিং
ড্রিপ্ ড্রপ্ নিমিল্ ড্রপ্!
পার্ল্ বার্লি ডিয়ার ডার্লিং
ট্রিপিং সিপিং
পিক্‌নিকিং টী টপ্
পিন্ প্রিকিং ফুল ষ্টপ্!

* * *

গিটার ষ্ট্রিং স্প্রিং স্প্রিং
ক্লীয়ার ষ্ট্রাস্ রোলিং রোলিং
ফ্লোর সীলিং
ক্লীন্ কপ্
বস্ স্টপ্।
* * *

॥ ঝিঁঝির নৃত্য ॥

ঝিন্‌ঝার সর্দ্দার ঝন্‌ঝার ঝঙ্কার
রণজিৎসিংগির তর্জ্জোন গর্জ্জন
পঞ্জাব কাশ্মির নির্জ্জন কান্তার।
ঝিঁঝার ঝিনিক রিণিক্ রিণিক্
ঝিরঝির ঝিক্‌ঝিক্ চিক্‌মিক্ ঝিন্‌ঝার,
চিড়িক্ চিক্ চিড়িক্ চিক্—চিক্কুর
গিজি গিঞ্জি আজিপুর গাজিপুর।
হিরাঝিল মোতিঝিল
ঝল্‌মল্ ঝিল্‌মিল্
ঝিক্‌মিক্ কোহিনুর কান্নার পান্নার।

॥ ঝিন্‌ঝার ঝঙ্কার হুঙ্কার ॥

ঝাং কিড়ি কিটি ঝাং
হিজি বিজি গিজি গিজি
ঝাং ঝাং ঝাং ঝাং।
ঝাজাং ঝাং পাঁয়জার গজাং গজাং
ঝাঁই কিড়ি ঝাং
যান্ যান্ ঝাঁজা যান মিহিজাম্ ॥

॥ অবুর প্রবেশ ॥

অবু। গেছি গেছি, গেছে কান—এ যে শব্দে টরনেডো বহমান—নিশ্চয় মাসি ধরেছেন হাতি ঘুমপাড়ানি গান। সুরের কাঁচি চালাচ্ছেন পিসি কচাং কচাং। কে জানে এ কোথায় এলাম। ওকি বলে?—জীরোও জীরো —শব্দমব্দ সব অন্তর্দ্ধান।

(উপন্যাস)

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র কোটালপুত্র আর
সওদাগরপুত্র মিলে তিনে একে চার।
রাজকন্যের দেশে যাবে বন্ধু চারজন,
সঙ্গে নিল চানাচুর সাড়ে চারমণ।
—চাই, চানাচুর গরম।
দীননাথের চুরমুর কুরমুর চানাচুর গরম।
বাবু, দীননাথের চুরমুর কুরমুর চানাচুর গরম ॥

শুনে চারজন হেসেই বাঁচে না। ম্যাজিষ্ট্রেট পুত্র সুন্দর, সরকারী উকিল পুত্র মনোহর, পুলিশ সাহেব পুত্র শঙ্কর আর আড়তদার ব্যাঙ্কার পুত্র সলিল, এই চার বন্ধু।

স্কুলের টিফিনের সময় দীননাথ রোজ ছেলেদের কাছে চানাচুর বিক্রী করতে আসে। চানাচুরের চেয়ে তার মজাদার ছড়া শুনতে ছেলেরা কম ভালবাসে না। কয়েকদিন পরে পরে সে আবার ছড়া পাল্টায়—নতুন ছড়া বলে। ছেলেরা ভিড় করে ঘিরে দাঁড়িয়ে চানাচুর কেনে আর ছড়া শোনে আর ফরমাস করে, 'সেই ছড়াটা বলো দীনু, সেই বাঁদর ঝোলে গাছের ডালে—'

সুন্দর বলে, 'সাড়ে চারমণ চানাচুর খেলে আর বাঁচতে হবে না।'

মনোহর বলে, 'একদিনে খাবে নাকি? যেতে আসতে সময় লাগবে তো রাজকন্যার দেশে।'

শঙ্কর বলে, 'সঙ্গে সঙ্গে না খেলে চানাচুর গরম থাকে?' সলিল বলে, 'তোদের যেমন বুদ্ধি। খাওয়ার জন্য কেউ অত চানাচুর নেয়? যেদেশে চানাচুর নেই সেখানে বিক্রী করে অ-নে-ক টাকা লাভ করবে।'

মনোহর এক ধাঁধাঁ ভেবে নিয়ে বলে, 'ধাঁধাঁ'। তিনজনে তার মুখের দিকে তাকায়।

মনোহর বলল, 'রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র আর সদাগর-পুত্র এই হিসেব করে চানাচুর কিনল। যেতে আসতে যদ্দিন লাগবে, প্রত্যেকে রোজ সমান সমান চানাচুর পাবে কিন্তু মোট ভাগে আধমণের কম হিসেব থাকবে না। মানে, হয় আধমণ, নয় একমণ, নয় দেড়মণ, এমনি ভাগ হবে। পৌণে একমণ, সোয়া একমণ ভাগ হবে না। ওরা সাড়ে চারমণ চানাচুর কিনল কেন?'

তিনজনেই টের পায় এটা ঠকানে ধাঁধাঁ—কোথাও ফাঁকি আছে। অনেক ভেবেও ফাঁকিটা তারা ধরতে পারে না। মনোহর হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিল, তিন মিনিট পার হলেই সে বলে, 'টাইম নেই। দাও পয়সা।'

তিনজনে অনিচ্ছার সঙ্গে তিনটি আনি বার করে' বলে, 'আগে জবাব বলো।'

কৃষ্ণদাস কাছে দাঁড়িয়ে শুনছিল। এদের চারজনের সঙ্গে সে এক ক্লাসে পড়ে। সে বলে, 'আমি বলব?' মনোহর বলে, 'খবর্দ্দার ইয়ার্কি দিও না। তোমার সঙ্গে খেলছি না।'

কৃষ্ণদাস বলে, 'পয়সা দিয়ে জুয়ো খেলছ, আমি ও-খেলা খেলি নে।'

তার মন্তব্য কাণে না তুলে মনোহর ধাঁধাঁর জবাব দেয়, বলে, 'চারজনে চার মণ, রাজকন্যা আধমণ।' 'রাজকন্যা কেন?' 'রাজকন্যাকে আনতে যাচ্ছে না চারজন? রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হলে সে বুঝি রৌকে ফেলে আসবে?'

যুক্তিটা তিনজনে স্বীকার করল। কিন্তু—

'সমান ভাগ হল কই?' 'কেন? যাবার সময় তো রাজকন্যা সঙ্গে ছিল না, শুধু ফেরবার সময়।'

তিনজনের কাছে তিন আনা পয়সা নিয়ে মনোহর পকেটে রাখল। ধাঁধাঁর জুয়ায় সেই বেশী জেতে। কৃষ্ণদাস বলে, 'ছড়ায় সত্যি সত্যি সাড়ে চার মণ চানাচুর কেন আছে শুনবে? ছন্দ মেলাবার জন্য।'

'তুই জানলি কী করে?' 'আমি বানাইনি ছড়াটা বাবার জন্যে?'

চারবন্ধু স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'চানাচুরওলা তোর বাবা নাকি?' কৃষ্ণদাস সগর্ব্বে বলল, 'বাবাই তো। যত ছড়া বলে না বাবা, সব আমার তৈরী।'

সুন্দর বলল, 'আমিও কবিতা লিখতে পারি। দিদি লেখে আর আমি লিখি। এবার ম্যাগাজিনে বেরুবে দেখিস। তোর ছড়া শুনলে হাসি পায়—ছোটলোকের ছড়া।'

সলিল বলল, 'বাবা তোকে চাইলে চানাচুর দেয়?' কৃষ্ণ

বলল, 'দেয়, আমি চাইনে। খাবার নিয়ে আসে আমার জন্তে, তাই খাই।'

সলিল তোষামুদের স্বরে ভাব-জমানোর ভঙ্গিতে বলে, 'ছুটো নিয়ে আয় না ভাই চেয়ে।' 'পয়সা দাও।'

চারজনের বাড়ী থেকেই টিফিন আসে। সুন্দর আর শঙ্করের টিফিন আনে ছু'জন তকমাধারী চাপরাসী, মনোহরেরটা আনে ফর্সা সার্ট আর কাপড় পরা ভদ্র ক্লাসের চাকর, সলিলেরটা আনে আট হাতি ময়লা মোটা কাপড় পরা নোংরা এক ছোকরা। স্কুলের প্রায় সাড়ে পাঁচশো ছেলের মধ্যে টিফিন আর আসে ক'জনের, খাবার কিনে খাবার পয়সাই বা আনে ক'জন? সকলকে দেখিয়ে ভাল ভাল খাবার আর ফল ছুধ খেতে চারজনের বেশ গর্ব্ব হয়, মাঝে মাঝে ছু'একজন হাফ্ বন্ধুকে ডেকে ভাগ দিতে আনন্দ বোধ করে।

কৃষ্ণদাস বাপের কাছে গেল। দীননাথ ছড়া থামিয়ে চানাচুর বিক্রী বন্ধ করে ঝোলা থেকে ছুটি কলা আর মোয়া বার করে ছেলেকে দিল। সেগুলি ছিটের কোটের পকেটে পুরে কৃষ্ণ বলল, ছু'টো চানাচুর দেবে বাবা?'

'ওসব খেয়ে তোর কাজ কি?'

'আমি খাব না। একজনকে দেবো। কত পয়সা আনছে, কিনে কিনে খাচ্ছে, যেই শুনেছে আমি তোমার ছেলে, অমনি মাগনা খাবার লোভ হল। কেমন করে চাইল জানো বাবা? না দিলে ওর যেন মস্ত লোকসান হবে, আমার ঠকানো হবে ওকে। আমি যেন জোচ্চুরি করে দিচ্ছি না।'

টিফিনের ছুটি শেষ হয়ে এসেছে। ছেলেরা চেঁচাচ্ছে, এই চানাচুরওলা, দাও না ছু' পয়সার চানাচুর। দীননাথ শুনেও শুনছে না, ছেলের দিকে চেয়ে হাসিতে মুখখানা ভরে গেছে।

'তুই তো দিব্যি চালাক হয়ে উঠ্ছিস কেষ্ট, এত সব বুঝতে শিখেছিস।'

'এ বোঝা তো ভারি কষ্ট—ওদের ভাব দেখলেই টের পাই।'

ছু'টির বদলে চানাচুরের চারটি মোড়ক নিয়ে কৃষ্ণদাস ক্লাসে গেল। ক্লাস তখন বসি' বসি' করছে। অঙ্কের মাষ্টার কামিনীবাবু ওপাশের বারান্দায় মোড় ঘুরে এগিয়ে আসছেন। সুন্দরেরা চারজন পিছনের দিকে বসে। তাদের সামনে ডেস্কের ওপর চানাচুরের মোড়কগুলি রেখে তাড়াতাড়ি কৃষ্ণ সামনের বেঞ্চে নিজের আসনে বসতে যাচ্ছে, সুন্দর গর্জ্জন করে উঠল, 'শূয়ার, ভিক্ষে দিচ্ছিস?'

'খেতে দিইছি।'

কৃষ্ণদাস তার বসবার যায়গায় গিয়ে বসল না। কামিনী মাষ্টার ক্লাসে ঢুকতে যাচ্ছেন দেখে দাঁড়িয়েই রইল।

পিছন থেকে এসে চারটি চানাচুর ভরা কাগজের ঠোঙ্গার একটি লাগল কৃষ্ণদাসের ঘাড়ে, ছুটি লাগল কামিনী মাষ্টারের গায়ে, আর একটি লাগল ব্ল্যাকবোর্ডে। চারটি ঠোঙ্গাই ফেটে গেল।

তারপর যা হবার তাই হল। কামিনীবাবু মুখ অন্ধকার করে আগে সকলকে বসালেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কে ছুঁড়েছে চানাচুর?'

ছুঁড়েছিল সুন্দর কিন্তু উঠে দাঁড়াল মনোহর। 'আমি স্যার।'

যারা সুন্দরকে ঠোঙ্গা ছুঁড়তে দেখেছিল, তারা মনোহরের উদারতায় চমৎকৃত হয়ে গেল। শুধু কৃষ্ণদাস অনুমান করতে পারল, মনোহর সুন্দরকে খুসী করতে চায়। কিছুদিন থেকে শঙ্করের সঙ্গে সুন্দরের বেশী ভাব হয়েছে, মনোহর তেমন আমল পাচ্ছিল না। আজ এই বীরত্ব দেখিয়ে সে সুন্দরের হৃদয় জয় করতে চায়। মনোহর জানে শাস্তি তার বেশী কিছু হবে না। স্কুলে যারা কর্ত্তালি করেন, তাদের মধ্যে মনোহরের রায়বাহাদুর বাবা বিশেষ গণ্যমান্য।

কামিনীবাবু একটু নরম হয়ে বললেন, 'ক্লাসে এ সব বাঁদরামি কেন? দাঁড়িয়ে থাকো।'

মনোহর ম্লানমুখে বলল, 'স্যর, আমি ছুঁড়িনি, কেষ্টকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলাম।' 'ফিরিয়ে দিচ্ছিলে মানে!'

'ও আমাদের রোজ চানাচুর কেনবার জন্তে জ্বালাতন করে। ওর বাবা চানাচুর বিক্রী করে কিনা। আজ কিছুতেই কিনব না বললাম, তবু গছিয়ে দিল। তাই রাগ করে—মানে, ফিরিয়ে দেবার জন্তে—' মনোহর ঢোঁক গিলল। তার সুন্দর কোমল মুখখানা বড়ই করুণ দেখাতে লাগল।

কামিনীবাবুর দাঁত খারাপ। দাঁতে দাঁত ঘষতে গিয়ে তিনি দাঁতে ব্যথা পেলেন। তাতে রাগটা তাঁর আরও বেড়ে গেল। 'কেষ্ট? এটা বাজার পেয়েছো, না রাস্তা পেয়েছো?'

'না, সার। আমি ক্লাশে কখনো চানাচুর বিক্রী করিনি। সলিল চেয়েছিল, তাই চানাচুর খেতে দিয়েছি।' [ক্রমশঃ]

"ন'টেমামা"

লীলা মজুমদার

আমি জন্মাবার অনেকদিন আগে মেজমামা যখন স্কুলে পড়তেন, একবার পুজোর ছুটিতে কাঁচকলা নিয়ে দেশে গেছেন, আর তার পরের দিনই ভোরে মা'র ন'টেমামা তাঁর বিখ্যাত কালো স্যুটকেস নিয়ে উপস্থিত হ'লেন। রং-ওঠা দেড়হাত লম্বা একটা পুরোন কালো স্যুটকেস, তা'তে ডবল তালা মারা।

ঐ স্যুট্কেসই তিরিশ বছর ধরে মামাবাড়ীর ইতিহাস তৈরী করলো।

ন'টেমামাকে দেখেই দিদিমা নাকি কোল থেকে ছুম্ ক'রে ছোটমাসিকে নামিয়ে রেখে, "ওরে ন'টে এদ্দিন তুই কোথায় ছিলিরে, ওরে বাবারে!" ব'লে তাঁর গলা ধ'রে ঝুলে পড়লেন।

ন'টেমামা বল্লেন—"আঃ কি যে কর দিদি! স্যুটকেস্ পড়ে গেলেই সর্বনাশ হ'বে। মনে করেছি তোমার ছেলেপুলেদের দিয়ে যাব। আর কারু কোনও অভাব থাক্‌বে না।"

তাই শুনে দিদিমা তখুনি গলা ছেড়ে দিয়ে, চোখ মুছে এক গাল হেসে বল্লেন—"অমা! তুই চিরটাকালই পেজোমি করে কাটালি! তুই আবার ও'তে ভরে কি আন্‌লি?"

ন'টেমামা বল্লেন—"সময় হ'লে সবই জান্‌তে পারবে দিদি! তোমার ছেলেপুলেদের ছাড়া ও আর কাকে দিয়ে যাব!"

দিদিমার পেছন দিক্ থেকে দরজা দিয়ে জান্‌লা দিয়ে পিল্‌পিল ক'রে বেরিয়ে এসে মেজমামা সেজমামা বড়মাসি বড়মেসো গ্যাঁড়াদা ভজাদা রাঙ্গামাসি ট্যাঙ্গামাসি টেঁপিদিদি খেঁদিদিদি ইত্যাদি আর পাঁচসাতজন কারু ঝুঁটি বাঁধা, কারু কোমরে কালো সুতোয় পয়সা বাঁধা, কারু ন্যাড়ামাথা, যে যেমন ছিলো, সবাই অবাক্ হ'য়ে শুন্‌লো।

তারপর ন'টেমামা বারান্দার কোণে তালি দেওয়া কালো ছাতাটা রেখে মাঝের ঘরের তক্তপোষে পা ঝুলিয়ে বস্‌লে পরে, সবাই এগিয়ে এসে ওঁর ছেঁড়া নোংরা সাদা ক্যাম্বিশের জুতো পরা পায়ে টিপ্ টিপ্ ক'রে প্রণাম করলো। আর ন'টেমামা সবাইকে আশীর্বাদ ক'রে বল্লেন—"স্যুট্‌কেসে তোদের সবার ভাগ আছে। কারু কোনও ছুঃখু থাক্‌বে না।" তখন দিদিমা সবাইকে তাড়িয়ে দিলেন; বল্লেন—"আহা মানুষটা রোজগারপাতি ক'রে তেতে পুড়ে এয়েছে! তোরা যেন কি!" বলে ন'টেমামার দিকে হেসে বল্লেন—"তোকে ওদের বড্ড ভালো লেগেছেরে, রক্তের টান, ফোঁৎ ফোঁৎ!" ব'লে আবার চোখ মুছে ন'টেমামাকে স্নান করবার গরম জল, নরম তোয়ালে, সুগন্ধ সাবান, সেণ্টেড্ নারকোল তেল, দাদামশায়ের সব থেকে ভালো চটিজোড়া আর নতুন ধুতী দিলেন।

তারপর রেকাবি ক'রে সরভাজা আর ভাল সন্দেশ আর হল্‌দে পেয়ালাতে গরম চা দিলেন। শেষে রান্নাঘরে গিয়ে মহা চ্যাচামেচি লাগিয়ে দিলেন। মা'র ন'টেমামা এদিকে তক্তপোষে পা মেলে বালিশে ঠেসান দিয়ে, খবরের কাগজ নিয়ে শুয়ে পড়লেন।

দিদিমা একবার এসে বলে গেলেন—"ওরে ন'টে, আমি আর কোনও আপত্তি শুন্‌বো না। বাকী জীবনটা তোকে এখানেই কাটাতে হ'বে। অ খেঁদি, অ টেঁপি, তোদের কি কোনও আক্কেল নেই লা? ন'টেদাদামণির পা ছুটো একটু টিপেও দিতে পারিস্ না? স্যুটকেসের ভাগ নিতে তোদের লজ্জা করবে না?"

খেঁদি টেঁপি ইয়া বড় বড় সাদা সাদা জিভ কেটে তক্ষুণি পা টিপ্‌তে লেগে গেলো। আর রাঙ্গামাসিও পেছুপাও না হ'য়ে তামাক সেজে দিলো। তারপর ছুপুরে মুড়িঘণ্ট, মাছ ভাজা, নারকোল চিংড়ি, দই, রাজভোগ ইত্যাদি খেয়ে ন'টেমামা দাদামশায়ের খাটে শুয়ে পড়লেন। বড় মামিমা সারাদিন বসে বসে বুড়োকে হাওয়া করলেন। আর দাদামশাই বেচারা কিঞ্চিৎ উস্‌খুস্ ক'রে শেষে পুরোণ চটি জোড়াই পায়ে দিয়ে নকুড় দাদামশাইদের বাড়ী তাস খেল্‌তে গেলেন।

সেই প্রথমবার এসে মা'র ন'টেমামা আটমাস পরম আরামে কাটিয়ে গেলেন। এই আটমাস দাদামশাই মাছের মুড়ো কি পেটির বড় চাক্‌লা কি মাংসের চোঙার হাড়, কি বড় ফলটা মিষ্টিটার মুখ দেখ্‌লেন না। দিদিমা আগেই সে সব ন'টেমামার পাতে তুলে দেন।

ছুটির শেষে মেজমামা যেদিন রওনা হবেন সেদিনও দেখ্‌লেন ন'টেমামা মোড়ায় পা উঠিয়ে দাদামশাইয়ের ইজি-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে পান চিবোচ্ছেন আর রাঙ্গামাসি মাছি তাড়াচ্ছে, বড়মাসি পাকাচুল তুল্‌ছে।

কলকাতা গিয়েও রেহাই নেই। থেকে থেকেই দিদিমার ফরমাস্ আস্‌তে লাগ্‌লো ন'টের জন্য বালাপোষ, ন'টের জন্য ১১ ইঞ্চি গরম মোজা, ন'টের জন্য ইত্যাদি।

পরের বছর আবার পূজোর ছুটিতে বাড়ী গিয়ে মেজমামা দেখ্‌লেন ন'টেমামা ইতিমধ্যে একদিন বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে কাঁদিয়ে শ্বশুরবাড়ী গেছেন। শুন্‌লেন দিদিমা নাকি অনেক ক'রে বলেছিলেন,—"ওরে আমার বুকটাকে একেবারে খাঁ খাঁ ক'রে দিয়ে যাস্ নে রে। নিতান্তই যদি যাবি, নিদেন তোর স্যুটকেস-খানাও রেখে যা'।"

ন'টেমামা অবাক্ হয়ে গিয়ে বলেছিলেন,—"আঃ কি যে বল দিদি! ঐ স্যুটকেসই ত' আমার সব! আমি আর ক'দিন! তোমার ছেলেপুলেরাই পাবে!" ব'লে নতুন কালো জুতো, আদ্দির পাঞ্জাবী, তসরের চাদর আর সোণাবাঁধানো ছড়ি নিয়ে ছ্যাক্‌ড়া গাড়ী চেপে চলে গেলেন। ন'টেমামার চেঞ্জ ছিলো না বলে দিদিমা আবার যাবার খরচটা আর আবার ফিরে আসবার খরচটা দিয়ে দিলেন।

মেজমামা দেখ্‌লেন ন'টেমামার জন্য মাঝের ঘরটাকে রেডি ক'রে তালা দিয়ে রাখা রয়েছে। রোজ ধূলো ঝাড়া এবং ধূনো দেওয়া হচ্ছে। সকলেরই প্রায় মন খারাপ। খালি দাদামশায়ের মুখে হাসি। দিদিমা ত' থেকে থেকেই বলেন, "আহা যদি স্যুটকেসটাও রেখে যেতো তা'তে হাত বুলোতাম। কি জানি বাবা শ্বশুরবাড়ীর ওরা যদি আবার তুক্‌তাক্ ক'রে নেয়।"

সেবার পূজো দেরীতে পড়েছিলো, মেজমামা যখন ফিরে আসবেন তখন বেশ শীত পড়ে গেছে। শেষ দিনেই আবার ন'টেমামা ছেঁড়া কোট ছেঁড়া জুতো আর কালো স্যুটকেস নিয়ে এসে উপস্থিত। বল্লেন দিদিমার দেওয়া সব জিনিষ চুরী গেছে। কিন্তু দিদিমার ছেলেপুলেদের জন্য স্যুটকেসটা প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে এনেছেন।

তাই শুনে দিদিমা ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লেন। পরে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হয়েছিল?" ন'টেমামা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন, "থাক্, সে কথা আর মুখেও আন্‌তে বোলো না।" দিদিমা ভাবলেন, সব ঐ মুখপোড়া শ্বশুরবাড়ীর কাণ্ড এবং তখুনি ন'টেমামার জন্য নতুন জুতো নতুন ছড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে নতুন বালাপোষ নতুন কম্বলের ব্যবস্থা করে দিলেন। এই আয়োজনের মধ্যে মেজমামার ট্রেণের সময় হ'য়ে যাওয়াতে, মেজমামা না খেয়েই রওনা হ'য়ে গেলেন, কেউ খেয়ালও করলো না।

তারপর থেকে পঁচিশ বছর ধ'রে মা'র ন'টেমামা বছরে একবার ক'রে স্যুটকেস হাতে আসেন, আট ন'মাস থেকে আবার "শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি" বলে কোথায় জানি চলে যান। প্রতি বছর চোররাও অনলসভাবে ওঁর সর্বস্ব চুরী করে নেয় আর দিদিমাও তেমনি অনলসভাবে আবার সমস্ত কিনে দেন। দাদা-মশাইও শেষ অবধি আপত্তি করা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

পঁচিশ বছর পরে দিদিমা ও দাদামশাই চোখ বুঁজ্‌লেন। ন'টেমামা তখন শ্বশুরবাড়ীতে, সেই ঠিকানাতে তার করা হ'ল, পেলেন কিনা বোঝা গেলো না। মোট কথা এলেন না।

পূজোর সময় আবার যখন কাপড়চোপড় কেনা হচ্ছে, ন'টে-মামা কালো স্যুটকেস হাতে উপস্থিত। বল্লেন—"আর ইরে শ্বশুরবাড়ী যাব না। এখন থেকে আমিই তোদের গার্জিয়ান হ'লাম!" বলে সেদিন থেকেই সব কিছু হুকুম দেওয়ার ভার নিলেন।

বড়মামা মেজমামা তখন বিদেশে চাকরি করেন আর মাসে মাসে টাকা পাঠান। সেই টাকার বেশীর ভাগটা দিয়ে বড়মামি মেজমামি রেসারেসি ক'রে ন'টেমামার সেবা করেন।

ন'টেমামা দিব্যি আরামে আছেন। কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে দরজা জান্‌লা বন্ধ ক'রে স্যুটকেস গোছান। আর যেদিনই গোছান সেদিনই মেজাজটা যেন আরও ভালো থাকে।

সবাইকে বলেন, "দিদিরা গেছেন, আমারই বা আর ক'দিন! তোদের অনেক সেবা নিয়েছি, দেখিস্ আমাকে যেন ঝগড়া ঝাটির কারণ বানাস্ না! স্যুটকেসে যথেষ্ট আছে। সবাই সমান ভাগে ভাগ করে নেবার জন্য যথেষ্ট আছে! এতদিন রইলাম, কাউকে কিছু ইচ্ছে করেই দিই নি যাতে আমি গেলে তোদের জন্য আরও বেশী থাকে। নিজের জন্যও এক পয়সা খরচ করিনি। তোরা যখন যা' দিয়েছিস্ তা'তেই আমার চলে গেছে।"

তাই না শুনে বড়মামিমা আর মেজমামিমা ঠিক দিদিমার মতন ক'রে ফোঁৎ ফোঁৎ ক'রে কেঁদে চোখে আঁচল দিলেন, আমার নিজের চোখে দেখা।

আজকাল মা'র ন'টেমামা বুড়ো হয়ে গেছেন, শ্বশুরবাড়ী যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন। সুতির কাপড় পরলে গা কুট্‌কুট্‌ করে বলে গরদ ছাড়া কিছু পরেন না। এমনি তেল ঘী সহ্য হয় না বলে গাওয়া ঘীতে ওঁর সব রান্না হয়, রাত্রে গাওয়া ঘী দিয়ে লুচী হয়। দুর্বল হ'য়ে গেছেন ব'লে রোজই কি বলে ইয়ে মুর্গী হয়। ছাঁচি পান আসে, অম্বুরি তামাক আসে।

থেকে থেকে ন'টেমামা সবাইকে ডেকে বলেন—"ওরে আমি গেলে তোরা ঝগড়া করিস্ না রে, প্রচুর আছে, প্রচুর আছে।"

আমরা হিসেব ক'রে দেখেছি দিদিমা দাদামশাইয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যদি ন'টেমামা স্বর্গে যেতেন, একদিক দিয়ে ভালোই হ'ত। ওঁরও সব জ্বালা জুড়োত, আর স্যুটকেস্‌ও মোটে একুশ ভাগ হ'ত। এই পাঁচ বছরে আরও সবাই জন্মেটন্মে একাকার কাণ্ড করেছে। এখন বেয়াল্লিশ ভাগ হ'বে।

আমরা মনে করে রেখেছি স্যুটকেসে হীরে মণি-মুক্তো আছে। মনে করেছি বোধ হয় তোড়া তোড়া হাজার টাকার নোট ঠাসা, তাই গোপনে স্যুট্‌কেস নেড়ে দেখেছি ভেতরে কিছু নড়ে না। বেশ হাল্কাও।

যাই হোক্। গত বছরের শেষে একদিন সন্ধেবেলা ন'টেমামা সত্যি সত্যি পটোল তুল্‌লেন। বাইরে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি, ঘরে তেলের বাতীর আলোতে ন'টেমামা ম'লেন।

মামিমারা হুহু করে একবার কেঁদে নিয়েই স্যুটকেসটাকে টেনে বারাণ্ডায় আন্‌লেন। ন'টেমামার বালিশের তলা থেকে চাবি বের করলেন। দেশ্‌লাইয়ের আলোতে খুল্‌লেন।

খুলে দেখ্‌লেন শুধু খড় ঠাসা। না, শুধু খড় নয়, তার উপর একটা কাগজে লাল পেন্‌সিল দিয়ে লেখা:

"কাউকে কভু লাই দিস্ নে,
করিস্ নে কো বিশ্বাস।
বুদ্ধি তোদের দেখে দেখে
ন'টে ফেল্‌ছে নিশ্বাস!"

মিস্টার রবট

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের পাড়ার ঘোঁতন যখন ক্লাশ থ্রি'তে তৃতীয়বার ফেল করল, আমি খুব ভালোমনেই ওকে বল্লুম, "ওহে ঘোঁতন, এবার থেকে লেখাপড়ায় একটু মন দিও।" ও ভয়ানক চটে গিয়েছিল, লেখাপড়ার কথা তুলেছিলুম বলে নয়, মিস্টার বলে ওকে সম্বোধন করিনি বলে! কারণ, ওর মতে, মানুষ সম্বন্ধে কথা বল্লেই মিস্টার বলা উচিত। সেই থেকে মানুষ সম্বন্ধে কথা বলতে হলেই আমি "মিস্টার" ব্যবহার করি, তা সে যেমন মানুষই হোক! মিস্টার রবট কলের মানুষ হলেও মানুষ ত' বটে,—সে খায় শুধু ইলেক্‌ট্রিসিটি, আর কাজ যা করতে পারে তা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। ওকে জিগ্‌গেস করা হয়েছিল, কতর সঙ্গে কত গুণ করলে ৫, ২৮৩, ০৬৫, ৭৫৩, ৭০৯, ০৯ হয়?" ইস্পাত আর তাঁবায় ভরতি ওর মগজ; সেই মগজ নিয়ে ও খানিক ভাবল, তারপর বল্লে ৫৯, ৯৫৭ আর ৮৮, ১১৪, ২৪৪, ৪৩৭। যদি মনে কর মিস্টার রবট গুল মেরেছে, তা হলে নিজে-নিজে একবার হিসেব করে দেখতে পার।

মিস্টার রবট এয়ারোপ্লেন চালায় খাসা; লড়াইএর সময় বিমানে চেপে অন্য দেশে গিয়ে সে বোমাও ফেলতে পারে! এ-যুদ্ধে এ-কথার প্রমাণ হয়েছে। তুফানের মধ্যে দিয়ে সে যুদ্ধের জাহাজ দিব্বি চালিয়ে নিয়ে যায়। বাড়িতে লোক এলে তাদের করতে পারে অভ্যর্থনা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে পুলিসের মতো গাড়িঘোড়া লোকজনকে ঠিকমতো পথ চলার নির্দেশ দিতে পারে। দরকার হলে টেলিফোন ধরা, দুচারটে কথাবার্তা বলা ও অনায়াসেই পারে। এমন কি হিসেব করে বলে দিতে পারে নদীতে কখন আসবে জোয়ার, কখন ভাটা। হোক না ও' কলের মানুষ; রক্তমাংসের মানুষের চেয়ে ঢের ভালো। জ্যান্তো মানুষকে রাত জাগতে হলে সে ঢুলতে থাকে, মিস্টার রবটের চোখে ঘুম নেই। কাজ করতে করতে আসল মানুষ থকে যায়, তার হাতেপায়ে ধরে খিল। কিন্তু রবটের চোখে নেই ঘুম, শরীরে নেই ক্লান্তি, তার কাজের মধ্যে ঘটে না ভুলচুক!

মিস্টার রবট কি আজকের লোক? কলের মানুষ বহুকালের পুরোনো। গ্রীক-উপকথায় আছে ডেড্‌লাস বলে একজন কারিগর এমন এক তাঁবার মানুষ তৈরি করেছিলেন যে শত্রুদের বিরুদ্ধে সে লড়েছিল প্রবল

ভাবে। শোনা যায় মধ্যযুগে ম্যাগলাস নামে একজন এক কলের মানুষ দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে সকলের পিলে চম্‌কে দিয়েছিলেন। ও-সব কথা বাদ দিলেও, রোজার বেকন আর দেকার্থস্‌ বলে দুজন বৈজ্ঞানিক যে কয়েক শ' বছর আগে খাসা কলের মানুষ তৈরি করেছিলেন সে-কথায় ত' আর সন্দেহ থাকতে পারে না। সে মানুষ বাড়ীর দোর খুলে দিতো, বাজনাও বাজাতে জানতো। ১৮৭৫এ ম্যাস্‌কিলাইন বলে একজন একটা কলের মানুষ তৈরি করেছিলেন—এ-মানুষ দাবা আর তাস খেলতো খাসা, আর আঁক-কষায় ছিলো ধুরন্ধর। তার নাম রাখা হয়েছিল "সাইকি"। তবু আজকালকার রবটদের বুদ্ধি-শুদ্ধি ঢের বেশি! অন্ধকারে জাহাজ চালানো থেকে দু-দণ্ড গল্পগুজব করা পর্যন্ত! যে-সব আঁক কষতে তুমি আমি ঘেমে একসার হব সে-সব আঁক অনায়াসে করা ওদের পক্ষে কিচ্ছু না। ওদের বুদ্ধি দেখে হয়তো মনে-মনে ভাবছো রক্তমাংসের মানুষ না হয়ে কলের মানুষ হলেই ভালো হত! কিন্তু তা হয় না। আসল মানুষ না থাকলে মিস্টার রবটকে কে তৈরি করতো? মিস্টার রবট যে অন্ধকারে জাহাজ চালাতে পারে তার কারণ আসল মানুষ চালায় মিস্টার রবটকে। কেমন করে চালায়? সে ভারি মজার ব্যাপার। অনেক সময় রেডিওরই সাহায্যে! শোনা যাচ্ছে এবার যুদ্ধে জার্মানরা একরকম রবট-প্লেন চালাচ্ছে রেডিওর সহায্যে। সে-সম্বন্ধে আরও সব খবর বেরুলে তোমাদের ভালো করে বলবো এক সময়।

কাঠ-ঠোকরার মাথায় কেন ঝুঁটি?

নীলিমা দেবী

ব্যাবিলনের রাজা সলোমন—তাঁর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান আর বিচক্ষণ—তাঁর মতো রাজা নাকি পৃথিবীতে আর জন্মায়নি। রাজা সলোমন শুধু যে মানুষের উপরই রাজত্ব করতেন তা নয়, তাঁর কাছে ছিল এক ম্যাজিক শীলমোহর, যার গুণে মানুষ, জীবজন্তু, এমন কি দৈত্য-দানব—সবাই ছিল তাঁর প্রজা। সব জীবই তাঁর হুকুম তামিল করতো—অমান্য করতে সাহস পেত না। জীবজন্তুর ভাষা তিনি বুঝতেন, তোমাদের ভাষা আমি যেমন বুঝি। তাদের ভাষায় তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন, গল্প করতেন কত।

এ হেন রাজা যে সলোমন, তিনি যখন যেতেন কোনো দূরদেশে সফরে বা বেড়াতে, তখন তিনি নিশ্চয়ই তোমার আমার মতো সাধারণ যানবাহনে যে যেতেন না একথা না বল্‌লেও চলে। তাঁর ছিল এক ম্যাজিক কার্পেট, যেটি তাঁর দরকার মাফিক হতো ছোট বা বড়, বড় বা ছোট। দরকার হলে তাতে রাজার সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর, তাঁবু-কানাত, আসবাব-পত্র সবই চাপানো যেত, আবার যখন রাজা যেতেন শুধু হাওয়া খেতে তখন সেটা শুধু রাজার হাতির দাঁতের সাদা সিংহাসন আর মন্ত্রীদের বসবার মতো জায়গা রেখে যেত সুড়ুৎ করে ছোট হয়ে। সে কার্পেটে যেমনি বসতেন রাজা অমনি বাজ-ভাঙা বিদ্যুতের মতো আকাশ থেকে নেবে আসতো চার-চার জন নীল চামড়া দৈত্য। নেবে এসে সেটির চার কোণ ধরে রাজাকে মেঘের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেত—যেখানে রাজা যেতে চাইতেন সেখানে।

একদিন—সময় তখন সকাল—রাজা সলোমন উড়ে চলেছেন দেশবিদেশের উপর দিয়ে, সেদিন সঙ্গে ছিল না রাজছত্র। নরম থেকে ক্রমে রোদ উঠল চড়চড়িয়ে, রাজার মাথায় আর ঘাড়ে পড়তে লাগল গরম আলো। রাজার ভারি খারাপ লাগতে লাগল। এমন সময় রাজা দেখলেন আকাশে এক ঝাঁক শকুন উড়ে চলেছে। রাজা ডেকে বল্‌লেন, "ওগো সখা শকুনেরা, আমার মাথায় ডানা মেলে এমন ভাবে ওড়ো, যাতে ছায়া পড়ে—রোদে আমার মাথা আর ঘাড় ঝলসে যাচ্ছে!" শকুনদের তখন চেহারা খুবি সুঁন্দর ছিল, মস্ত বড় পাখি বলে দেমাকও ছিল খুব। মেজাজ করে তারা জবাব দিল, "আমরা চলেছি উত্তরে আর তুমি চলেছ দক্ষিণে। তোমার জন্যে আমরা উল্টো পথে চলব নাকি? আমরা তোমার মাথায় ডানা মেলে ছাতা ধরতে পারব না!"

স্বয়ং সলোমন—তাঁর হুকুম অমান্য! গলার স্বর সাত পর্দা চড়িয়ে চিৎকার করে রাজা বল্‌লেন, "তবে শোনরে শকুনের পাল! যেমন তোরা আমার আদেশ অমান্য করলি—তোদের ঘাড়ে আজ থেকে পড়ুক টাক—সব রোঁয়া যাক ঝরে। রোদের তাপে তোদের আজন্ম পুড়ুক ঘাড়। আজ থেকে শীতের কনকনে বাতাস ক্ষুরের মতো তোদের ঘাড় কাটবে, বৃষ্টির ফোঁটা তোদের ঘাড়ে ছুঁচের মতো বিঁধবে—ঘাড় বাঁচাবার কোনো উপায় আর তোদের থাকবে না। বড় অহংকার হয়েছে তোদের, কী? এ অহংকার তোদের ঘুচিয়ে দিচ্ছি! আজ থেকে তোরা খেতে পাবি শুধু মৃতদেহ আর বিষ্ঠা—তোদের নাম শুনলে ঘেন্নায় পৃথিবী নাক সিঁটকোবে!" রাজার অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। আজও যদি নজর রাখ দেখবে শকুনের ঘাড়ে রোঁয়া নেই, এই কুদর্শন পাখি কেবল মড়া খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোথাও কোনো রকম মরা জীব দেখতে পেলেই শকুনের পাল উড়ে এসে জুড়ে বসে—ঠোকরাতে আরম্ভ করে।

রাগে গজগজ করতে করতে উড়ে চলেছেন রাজা, হঠাৎ তার নজরে পড়লো কতকগুলি কাঠ-ঠোকরা পাখি। হাঁক দিয়ে রাজা তাদের বল্‌লেন মাথার উপর ছায়া ফেলে উড়তে। কাঠ-ঠোকরাদের যে সর্দার সে বল্‌লে, "মহারাজ! আপনার সেবায় লাগবো—সেতো আমাদের চরম সৌভাগ্য! কিন্তু আমরা সামান্য ছোট্ট পাখি—কতটুকুই বা আমাদের সাধ্য?" এই বলে সে সেখানে যত কাঠ-ঠোকরা ছিল সবাইকে জড়ো করে ঝাঁক শুদ্ধ রাজার মাথা মেঘের মতো ঘিরে, সূর্যকে আড়ালে রেখে, উড়তে লাগল।

বেড়ানো শেষ হলে রাজা রাজপ্রাসাদে এসে রাজসভায় গিয়ে সোনার সিংহাসনে বসে হুকুম করলেন কাঠ-ঠোকরাদের যে সর্দার তাকে রাজসভায় হাজির করতে। সে রাজার পায়ে সেলাম করে উঠে দাঁড়াতেই সলোমন বল্‌লেন, "তোমাদের সেবায় আমি বড়ই তুষ্ট। তোমরা আমার কাছে এমন কোনো পুরস্কার চেয়ে নাও যা চিরকাল সকলকে স্মরণ করিয়ে দেবে তোমাদের সেবার কথা।"

সর্দার কাঠ-ঠোকরা রাজসভায় হাজির হবার সম্মানেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল, তার উপর রাজসভার জাঁকজমক আর ঝকমকানিতে গিয়েছিল হকচকিয়ে—এমন ঘর সে জীবনেও দেখেনি, সোনার দেয়াল, চন্দনকাঠের দরজা, সেই দরজায় আবার কাচের বদলে বসান পিঁড়ির মতো হীরে। তারপর আবার যখন রাজা পুরস্কার দেবেন বল্‌লেন, তখন বেচারা সোনালিকে রূপালি আর লালকে দেখতে লাগল নীল। কি যে সে চাইবে তা ভেবেই পেল না। খানিকক্ষণ থ হয়ে চুপ করে থাকার পর সে বল্‌ল, "মহারাজ! যদি অনুমতি দেন তো আমি সর্দারণী আর দলের মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ করে আসি। তারপর আপনার কাছে পুরস্কার চেয়ে নেব।"

রাজা হেসে বল্‌লেন, "বেশ তাই হবে। কাল সকালে এসে বোলো কী চাই তোমাদের।"

সর্দার ফিরে গিয়েই দিকে দিকে উড়ন-দূত পাঠিয়ে মস্ত এক সভা ডাকল। লোহিত নদীর ধারে, নুয়ে পড়া প্রকাণ্ড এক ডালিম গাছের ডালে তাদের সভা বসল। মহা সমস্যা—কী চাইবে তারা। সবাই ডালিমের বাকলা ঠোকরাচ্ছে আর ভাবছে। একজন বল্‌লে, "চাও নীল রঙের ডানা", আর একজন বল্‌লে, "দ্যুত! নীল ডানা ভালো না—সারা গায়ে টিয়ের মতো সবুজ পালক চাই!" কেউ বলে, "না! না! ময়ূরের মতো পেখম!" কেউ বলে, "চাই বকের মতো মস্ত লম্বা ঠ্যাঙ!" কেউ বলে, "তার চেয়ে ভালো উট-পাখির মতো মস্ত বিরাট শরীর!"

ক্যাঁচম্যাচি আর থামে না—কারুর সঙ্গে মত মেলে না কারুর। দুপুর গিয়ে বিকেল হল, বিকেল গিয়ে সন্ধে হল, সন্ধে কেটে গিয়ে রাত নেমে এল, শেষে রাত কেটে ভোর প্রায় হয়—এমন সময় সর্দারণী ডানা ঝেড়ে উঠে সভা মাত্‌ করে মার-মার গলায় বলে উঠল, "যত সব হাঁদা, যত সব গাধা, যত সব মূর্খ! যেমন বুদ্ধি সর্দার তোমার, তেমনি তোমার সব মাতব্বরেরা। এত ডালিম গিলেও একটা নতুন কিছু ভাবতে পারলে না? অন্য পাখির যা আছে তা আমরা চাইব কেন? এমন একটা কিছু চাই যা আর কারো নেই। রাজাকে গিয়ে বলো—রোদ থেকে আমরা তাঁর মাথা বাঁচিয়েছি—তিনি যেন আমাদের সবার মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দেন। সোনার মুকুট আর কোন্‌ পাখির আছে শুনি? আমরা গাঁট-ঠোকরা নই, মাঠ-ঠোকরা নই—আমরা কাঠ-ঠোকরা। তার উপর মাথায় থাকে যদি সোনার মুকুট, আমরা পক্ষীজাতির মধ্যে হব শ্রেষ্ঠ। কত সবাই সম্মান করবে—ঘুঘু, টিয়া, কাকাতুয়া। সবাই মিলে আমাদের সেলাম করবে কত!"

সর্দারণীর কথা সবারই মনোমতো হল। মাথা চুলকে

সর্দার আর হোমরা চোমরারা বলতে লাগল, "তাই তো! তাই তো! আমরা একথা ভাবতে পারিনি কেন? সত্যিই তো! মাথয় যদি মুকুট থাকে, সবাই তো আমাদের পাখির রাজা বলে মেনে নেবে!"

যথাসময়ে সকালে সর্দার গিয়ে রাজসভায় হাজির। নিয়ম-মাফিক কায়দা করে রাজার কাছে আর্জি পেশ করল। রাজা বল্লেন, "তাই হবে! কিন্তু মুকুট চেয়ে ভালো করলে না সর্দার। তুমি দেখছি নিতান্তই নির্বোধ। যাহোক যদি কোনোদিন বিপদে পড়, এস আবার আমার কাছে, তোমাদের উদ্ধার করব।"

যেমনি 'তাই হবে' বেরিয়েছে রাজার মুখ দিয়ে, অমনি টুক্-টুক্ করে লাখে লাখে সোনার মুকুট সব কাঠ-ঠোকরাদের মাথায় এসে পড়ল—যেন বোশেখ মাসে শিলা বৃষ্টি! বাপ রে বাপ! তারপর আর কাঠ-ঠোকরাদের পায় কে? মুকুটের অহংকারে তাদের ডালে আর পা-ই পড়তে চায় না। অন্য পাখিদের দেখলে কথা কওয়া দূরের কথা, তাদের দিকে একবার তাকিয়েও দেখে না, অবজ্ঞায় নাক সিঁটকিয়ে উড়ে যায়। "যার তার সঙ্গে কি আর মেশা যায়?" গলা নিচু করে বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে। আর কেবল শান্ত-পুকুর পাড়ে ঘুর ঘুর করে বেড়ায় দলে দলে, মুকুট-পরা মাথাটা দেখতে হবে তো! জল-আয়নায় নিজেদের ছায়া দেখে নিজেরাই মুগ্ধ হয়ে যায়। আর সর্দারণী—সে তো দেমাকে বেলুন-ফুলতে লাগল। টান পড়েছে চামড়ায়, কাটে আর কি!

একদিন এক ব্যাধ তার ফাঁদে একটা ভাঙা আয়নার টুকরো ফেলে গিয়েছিল। সর্দারণী উড়ে যেতে যেতে নিজের ছায়া দেখতে যেমনি নিচে নাবা অমনি ফাঁদে পড়া।

সর্দারণী বেচারী প্রথমে কিছু বুঝতেই পারেনি। আয়নায় সে তখন নিজেকে দেখছে। দেখে কি আর আশ মেটে? মাথা এদিকে বাঁকায় ওদিকে ঘোরায়, ঘাড় সোজা করে, ঘাড় কাত করে—এক মনে নিজের মুকুট-পরা মূর্তি দেখতেই ব্যস্ত। এমন সময় ব্যাধ এসে উপস্থিত। ফাঁদে এমন মুকুট-পরা পাখি দেখে তাড়াতাড়ি তার ঘাড়টি দিল মটকে, মুণ্ডুটি ছিঁড়ে নিয়ে সোজা গিয়ে এক স্যাকরার দোকানে হাজির। স্যাকরাকে সে বল্লে, "দেখ তো। কিসের তৈরি এ মুকুট পাখির মাথায়?"

স্যাকরা ছিল চালাক ড্যাকরা লোক। সে বল্লে, "পেতলের! এমনি আজব পাখি আবার যদি পাও এনো! এই নাও দাম—ছুটো টাকা!"

ব্যাধ সেই থেকে রোজই আয়না রেখে দেয় ফাঁদে, একটা ছুটো কাঠ-ঠোকরা রোজ ফাঁদে পড়ে আর তার মুণ্ডুটি গিয়ে পৌঁছায় স্যাকরা-বাড়ি। একদিন ব্যাধের সঙ্গে রাস্তায় আর এক স্যাকরার দেখা। তাকে সে বল্লে, "ও মা! এ যে সোনার মুকুট!" তিনশো টাকা দিয়ে সে মুণ্ডুটি কিনে নিলে।

খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সোনার মুকুট-পরা কাঠ-ঠোকরার কথা ছড়িয়ে পড়ল সব দেশে। সোনার ওপর মানুষের লোভ সব চেয়ে বড়। দেশশুদ্ধ লোক দিকে বিদিকে, বনে বাদাড়ে, জঙ্গলে মাঠে—সব জায়গায় কাঠ-ঠোকরা শিকার করতে লাগল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে কাঠ-ঠোকরারা আর লুকোবার জায়গা পর্যন্ত খুঁজে পায় না। তাদের বংশই লোপ পাবার যোগাড়।

সর্দার এতদিন সর্দারণী-মৃত্যুর দুঃখে ডুবে ছিল। সবার অনুরোধে এবার এর একটা বিহিত করার চেষ্টায় মন দিলে। মনে পড়ল রাজার কথা, তাঁর কাছে লুকিয়ে চুরিয়ে গিয়ে সে কেঁদে পড়ল, "মহারাজ! মুকুট পরার ফলে আজ আমাদের বংশ ধ্বংস হবার জোগাড়। মহারাজ, দোহাই আপনার, আমাদের রক্ষা করুন!"

রাজা সলোমন বল্লেন, "তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম সর্দার—তুমি বড় মূর্খ! ও হে, মুকুট শুধু পরলেই হয় না মুকুট রক্ষা করার শক্তি থাকা চাই। শক্তিহীনের কাছে সোনার মুকুট যে একটা মরবার কারণ হয়ে দাঁড়াবে—তা আর বিচিত্র কি? শিক্ষা হয়েছে তো? যাও! আজ থেকে আর তোমাদের মাথায় সোনার মুকুট থাকবে না, তার বদলে গজাবে সেখানে সুন্দর একটা ঝুঁটি।"

ভোঁ-ভোঁ-হেই—কারো মাথায় আর সোনার মুকুট নেই চট্-পট্-ফুটি—সবার মাথায় সুন্দর সুন্দর ঝুঁটি। কাট-ঠোকরা শিকারও বন্ধ হয়ে গেল। ঝুঁটি তো আর সোনার তৈরি নয় যে লোকে তার বদলে রূপোর চাক্তি পাবে! ভারি মন খারাপ হয়ে গেল সকলের। সলোমনের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে, দশ-সে নিঃশ্বাস ফেলে, চোখ আকাশের দিকে তুলে তারা বল্লে,

"অবাক করলি দাদা,
অম্বলে দিলি আদা।"

সেকাল আর একালের ফুটবল

গোষ্ঠ পাল

এককালে মাঠে যেতুম খেলতে, এখন যাই খেলা দেখতে। শুনলুম রংমশালের ছোটছোট বন্ধুদের জন্যে কিছু লিখে দিতে হবে; লিখতে হবে সেকাল আর একালের খেলার তফাৎ কি রকম হয়েছে। অর্থাৎ, আমি যখন খেলোয়াড় ছিলুম তখন খেলা কি রকম ছিল, আর আমি যখন দর্শক হয়েছি তখন খেলা কি রকম হয়েছে। সত্যি বলতে কি আমার ত' মনে হয় আজকালকার খেলায় অনেক অবনতি হয়েছে। তোমরা হয়ত ভাবছো নিজের দিকে টেনে কথা বলছি। কিন্তু আসলে তা নয়। বাস্তবিক যদি দেশে ফুটবলের উন্নতি দেখতুম তাহলে আমার চেয়ে সুখী খুব কম লোকই হত। কিন্তু উন্নতি কোথায়? আজকালকার খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য কী হল? যোঝবার শক্তিই বা তাদের কতটুকু? একটু ধাক্কাধাক্কি হলেই দেখি ওরা চিৎপাত হয়ে পড়ে যায়; আজকাল যেন ফুলের ঘায়ে ফাউল হয়। অনেকে বলেন আজকাল খেলা অনেক পরিস্কার হয়েছে, একটুতেই রেফারি ফাউল ধরে, গুণ্ডামির দিন গিয়েছে। কিন্তু, খেলার ব্যাপারেও মানুষ ফুরফুরে বাবুগিরি করবে? শরীরের শক্তিই যদি খোয়া গেল তা হলে আর খেলাধুলো কেন? কোঁচান কাপড় পরে কাদা বাঁচিয়ে ঘুরে বেড়ানোই তাহলে ভালো। তবু তো আগেকার মতো সব দুঁদে পলটন্ টিম আর খেলতে আসে না—তাদের সঙ্গে খেলতে হলে আজকালকার বাবুদের যে কী দশা হত! শরীরে শক্তি, আর যাকে বলে স্ট্যামিনা;—আজকাল দেখি তা বড় কমে গিয়েছে। মনে পড়ে রোভার্স সেমি-ফাইন্যালে খেলবার সময় বিপক্ষ দল 'আর-জি-এ'র সব খেলোয়াড়দের চেহারা। কী লম্বা, আর কী জোয়ান্! ওরা নাকি বলেছিলো মেরেই আমাদের পাট বানিয়ে দেবে! সেবার মুখে ফেনা উঠ্তে উঠ্তেও খেলেছি—কী অসম্ভব পরিশ্রম। জিতেছিলুম নেহাৎ স্ট্যামিনার জোরে। আজকালকার খেলোয়াড়রা কি সে খেলা খেলতে পারত? আর একবারের কথা বলি। তখন আমার ১৬ বছর বয়েস, স্বাস্থ্য কানায় কানায় ভর্তি। সেই সবে মোহনবাগান দলের হয়ে আসল খেলা খেলতে স্থুরু করেছি। একটা ট্রায়েল ম্যাচ্ ছিল ব্লাক্-ওয়াচের সঙ্গে। খেলতে খেলতে ওদের এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগল: যন্ত্রণায় মনে হল কাঁধটা ফেটে যাচ্ছে; তবু যন্ত্রণার চেয়ে বেশী হল লজ্জা। আমি কাঁধে হাত পর্যন্ত বুলোতে পারলুম না; শুধু লজ্জায় পারলুম না! আজকাল-কার খেলোয়াড় হলে হয়ত আসত এম্বুলেন্স, আসত ষ্ট্রেচার, আসত হরেক রকম দাওয়াই!

স্ট্যামিনা কম্‌ল কেন? শক্তি কমল কেন? এ আর কিছুই নয়, জাতীয় অবনতির একটা লক্ষণ মাত্র। খেলোয়াড়-দের সংযম কমেছে, তারা দেখি ফুর্তি করতে শিখেছে। ওতে খেলাধূলো হয় না। আমি মনে করি বড় খেলোয়াড় হওয়াও মস্ত বড় সাধনার কথা! এতেও দরকার মনের দৃঢ়তা, চরিত্রের তেজ! মাঠে যখন নামব তখন পৃথিবীর আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, মাঠ থেকে যখন ফিরব তখন একমাত্র চিন্তা হবে খেলার উন্নতি নিয়ে। তা নয়, আজকাল দেখি মাঠ থেকে ফিরে অনেকে মিলে তাসের আড্ডা জমালো; সস্তা ইয়ার্কি-তামাসা স্থুরু করল। খেলার প্রতি সে দরদ গেল কোথায়? অনেকেই ত' শুনি পাকে-চক্রে নিজের খেলা বিক্রী করতে ব্যস্ত—কোন টিম কত টাকা দেবে তাই চিন্তা! এর চেয়ে খোলাখুলি পেশাদার হওয়া অনেক ভালো। তারপর, আজকাল নাকি খেলা নিয়ে ধনী লোকেরা খুব জুয়া খেলে--মস্ত বড়-বড় সব বাজি ফেলে। আর বাজির ব্যাপার থাকলেই ঘুষ দেওয়া এসে যায়। ফলে হয় নানান্ রকম নোংরামি। এ-সব আমাদের সময় ছিল না।

খেলাটা সব সময় আজকাল বড় নয়, বড় হয়ে দাঁড়ায় ক্যারদানি দেখানো, সস্তা হাততালি কুড়োনো। ফরোয়ার্ড খেলতে খেলতে তাই অনেক সময় দেখি কেউ কেউ এমন লোক-দেখানি ড্রিব্‌লিং করছে যে রাগ ধরে! তাই গোল আর শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে না, খেলা হয় পণ্ড! বেশী ড্রিব্‌ল করার কায়দা জানার দরকার যে নেই তা নয়। মনে

পড়ে, আমরা যখন খেলতে-খেলতে একেবারে থকে যেতুম তখন বিজয় ভাদুড়ীকে—১৯১১র শিল্ড-বিজয়ী বিজয় ভাদুড়ীকে—বলতুম খানিক বেশী ড্রিব্‌ল্ করেও বলটা আটকে রাখতে যাতে আমরা দম নিতে পারি। আর বাস্তবিক সে কি ড্রিব্‌ল্, অনেকটা যেন যাদুকরের কায়দা, কে কাড়ে বল তাঁর পা থেকে! কিন্তু লোকদেখানি ড্রিব্‌ল্? —তার কোনো মানে হয় না।

সে-সব দিন চলে যাচ্ছে। জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে-সঙ্গে জাতীয় ফুটবলও ভোঁতা হচ্ছে। তোমরা যখন বড় হবে তখন নিশ্চই কেউ-কেউ নামজাদা খেলোয়াড় হবে। তখন শুধু একটি কথা মনে রেখো—গোষ্ঠ পাল মনে করত খেলার জন্যে দরকার শরীরের শক্তি আর স্ট্যামিনা, চাই চরিত্রের সংযম। খেলা একটা সাধনারই মতো জিনিস, খেলতে হলে খেলার প্রতি অখণ্ড দরদ চাই! এ-কথা মনে রাখলে ফুটবলের পুরোণো গৌরব বাংলা দেশে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

কোন টিম এ-বছর লিগ পাবে?

প্রশ্নটি সবাইকার মনেই ঘুরেফিরে আসছে: কোন টিম? কারণ খেলার মাঠের হাওয়া একেবারে ঘুরে গেছে। অনেক সব ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটেছে। অত্যন্ত খারাপ খেলে, পুলিশ মহামের্ডান, বেঙ্গল-আসাম ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে ড্র এবং কালিঘাট ও মোহনবাগানের কাছে হেরে ইস্টবেঙ্গল চলে গেছে একেবারে প্রতিযোগিতার বাইরে। এদিকে এ-বছরের শ্রেষ্ঠ দল মোহনবাগান উপরি-উপরি ভবানীপুর, ডালহৌসি ও স্পোর্টিং-এর সঙ্গে ড্র এবং শেষ খেলা এরিয়ান্সের কাছে সেমসাইডে এক গোল খেয়ে হেরে (এরিয়ান্সকে অন্তত সেদিন আটটি গোল দেওয়া উচিত ছিলো) লিগ টেবিলের চূড়ো থেকে নেমে এসেছে দ্বিতীয় জায়গায়। অন্য দিকে গত ২২শে মে থেকে মহামেডান স্পোর্টিং দল আর হারেনি, কিংবা ড্রও করেনি; প্রত্যেকটি ম্যাচে এসেছে জিতে। এবং শেষ ম্যাচে বেঙ্গল-আসামকে দু গোলে হারিয়ে লিগ টেবিলের চূড়োয় এসে পৌঁছেছে। তাদের এই অবিশ্বাস্য সাফল্যের জন্যে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। খেলার মাঠে সবচেয়ে বেশি দরকার যে দুটি জিনিস—কখনোই নিরুৎসাহ হব না এবং নিজের দলকে যেমন-করে-পারি জেতাবো—মহামেডান দলের মতো সে-রকমটি আর কোনো দলের মধ্যেই নেই। তাছাড়া, যত খেলছে ততই যেন তাদের খেলা খুলছে। আগামী ২২শে জুলাই এ-বছরের শেষ লিগ ম্যাচ হবে মোহনবাগান আর মহামেডানের সঙ্গে। দু দলই খেলবে মরীয়া হয়ে। মোহনবাগানের দরকার এই ম্যাচে জেতা (ফার্স্ট হাফে তারা মহামেডানকে ১-০ গোলে হারিয়ে ছিল), এদিকে মহামেডান যদি ড্র-ও করতে পারে তা হলেই লিগ তাদের হবে। লিগ খেলায় এ-রকম উত্তেজনা বহুদিন দেখা যায়নি। সমস্ত কলকাতা দুরুদুরু বুক নিয়ে সেদিনের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

	খেলেছে	জিত	ড্র	হার	পয়েন্ট
মহামেডান	২৩	১৮	৩	২	৩৯
মোহনবাগান	২৩	১৭	৪	২	৩৮
ইস্টবেঙ্গল	২৩	১৪	৫	৪	৩৩

কা. চ.

স্বর্গীয়

হরপ্রসাদ মিত্র

ডাক নাম ছিলো দু'টি ভায়ের
'মুড়ি' ও 'মুড়কি' বুড়ি মায়ের।
মুড়ি চ'লে গেল যুদ্ধে,—মাইনে পঁইতিরিশ
খাকি কোটে-শার্টে কি-বা বাহার,
গোঁফে প্রজাপতি, জাতে কাহার,
বন্ধু ও জোটে ছটু, মিঠ্ঠু, কান্নু, গিরিশ।
তাই দেখে শুনে মুড়কি ভাই
বিছানায় শুয়ে তুল্‌লো হাই
ব'ল্‌লো: 'এ সব মিথ্যে,—এসব ছুটোছুটি,
আরাকানে আর লামডিং-এ যতো হুটোপুটি।
তা'র চেয়ে এই বাংলাতে
শেখো আপনাকে সাম্‌লাতে,
চাল চুলো সব কেড়ে নেয় যতো হ্যাংলাতে।
সুতরাং,—আর জাগ্‌তে না পেরে নাক ডাকায়
ঘুমের মধ্যে বলে যা'রা শোয় পাশ ফিরে,
তারা স্বর্গে যায়।

কার আদর্শে আমরা অনুপ্রাণিত হব, গড়তে চেষ্টা করবো নিজেদের জীবন?—এ-কথা তোমরা অনেকেই হয়তো ভাবো। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন সেই আদর্শ পুরুষ। গত ১৬ই জুন, ১৯৪৪, শুক্রবার সন্ধে ৬-২৭ মিনিটের সময় কলকাতার সায়েন্স কলেজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হয়। শনিবার দিন নিমতলা ঘাটে রবীন্দ্রনাথের চিতাভূমির পাশেই সম্পন্ন হয় তাঁর শেষ কাজ। আষাঢ়-সংখ্যা রংমশালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনী আমরা প্রকাশ করেছি। তাঁর মহৎ জীবন আমাদের অনুপ্রাণিত করুক, তাঁর বিয়োগব্যথা সমস্ত ভারতবাসীকে পরস্পরের কাছে আনুক—এই আমাদের প্রার্থনা।

* * * *

ত জুন মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জার্মনরা দক্ষিণ ংলণ্ডের উপর এক নতুন ধরণের অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ ালিয়েছে। সাধারণত সেই অস্ত্রকে বলা হচ্ছে পাইলটলেস া রবট প্লেন, কিংবা ফ্লাইং বম্ব। এই প্লেনগুলিতে কোনো াইলট থাকে না। সম্ভবত রেডিও কিংবা রকেটের সাহায্যে কে চালানো হয়। এদের দেহ কোনো রকম অত্যন্ত ক্ত ধাতুর তৈরি, সরু ও ছোটো এবং পিছনে একটি বাক্সর তো জিনিস আছে। অত্যন্ত তীব্র গতিতে, একেবারে রল রেখায়, এরা উড়ে আসে। ইঞ্জিনের একটা শব্দ হয় ও পিছনে আগুণের হল্কা দেখা যায়। ইঞ্জিন বন্ধ হলে এবং আগুণ নিভে গেলে এগুলো সোজা এসে আছড়ে পড়ে াটিতে। ভিতরে থাকে দারুণ বিস্ফোরক। বিস্ফোরণের ঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের ঘর-বাড়ি-মানুষ-পশু সবকিছু ংস হয়। মানুষ নেই অথচ এয়ারোপ্লেন উড়ে আসছে—্যাপারটা কি রকম ভুতুড়ে নয়? তবে যন্ত্রকে দিয়ে ানুষের কাজ করাবার নানারকম পরীক্ষা ইতিপূর্বে বহুবার য়ে গেছে। সে-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ এ-সংখ্যায় দেওয়া হলো। ভবিষ্যতে হয়তো যুদ্ধ হবে রবট প্লেনের সঙ্গে রবট প্লেনের, রবট যুদ্ধ জাহাজের সঙ্গে রবট যুদ্ধ জাহাজের, রবট ট্যাঙ্কের সঙ্গে রবট ট্যাঙ্কের। মানুষরা হয়তো অনেক রে বসে এদের চালাবে। তা হলে কেমন হবে তাই ভাবছি!

গত ২৪শে আষাঢ়, কলকাতায় 'রংমশাল কার্যালয়ে' মৌচাক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাংলার বিভিন্ন শিশুসাময়িকপত্রের সম্পাদকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পর বাংলার শিশুপত্রিকাগুলিকে এই আদেশ থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি সম্মিলিত দরখাস্ত প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলার সমস্ত শিশু-সাময়িক-পত্রিকা ও শিশুসাহিত্য প্রকাশকেরা যাতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে "শিশু সাহিত্য পরিষদ" নামে একটি স্থায়ী পরিষদ গঠিত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে 'কৈশোরক'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে পরিষদের সভাপতি এবং 'রামধনু'—সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও 'রংমশাল' সম্পাদক শ্রীযুক্ত কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। বাংলার বিভিন্ন শিশু-সাময়িক-পত্র ও শিশু-সাহিত্য-প্রকাশকদের এই পরিষদে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। পরিষদের কার্যালয় 'রংমশাল' আপিস। সম্পাদকের নামে পত্রালাপ করতে হয়।

বার্ষিক চাঁদা ৩৷০, যাণ্মাষিক ১৸০, প্রত্যেক সংখ্যা ।৵০। ১৩৫১'র আষাঢ় মাস থেকে কিংবা তারপরের যে-কোনো মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায়। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি সমস্তই **রংমশালের নতুন ঠিকানায়** লিখো: C/o সংকেত-ভবন, ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা।

রংমশাল বৈঠক

কার্তিক মাসের প্রতিযোগিতা

১। হাসির গল্প : ২০০ কথার মধ্যে। চোদ্দ বছর পর্যন্ত গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্যে। প্রথম পুরস্কার : পাঁচ টাকা দামের বই।

২। হাসির গল্প : ২০০ কথার মধ্যে। চোদ্দ থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্যে। প্রথম পুরস্কার : পাঁচ টাকা দামের বই।

চিত্তাকর্ষক নাম, প্লট এবং চলতি ভাষায় লেখবার স্টাইল—নির্বাচনের সময় এই তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হবে। যারা গ্রাহক শুধু তারাই পারবে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। গল্পগুলি ২০শে ভাদ্রের মধ্যে রংমশালের নতুন আপিসে পৌঁছনো দরকার। রচনার সঙ্গে যেন চিঠি না থাকে। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হবে না। রচনাগুলির উপর স্পষ্ট করে নাম, ঠিকানা, গ্রাহক নং এবং বয়স লেখা থাকা দরকার। পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা দুটি কার্তিকের রংমশালে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ছবিসহ ছাপা হবে। খামের উপর 'কার্তিক মাসের প্রতিযোগিতার জন্য'—এই কথা কটি লিখতে ভুলো না।

নতুন কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশের জন্যে আশ্বিন মাসের প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত দুটি লেখাই হয়তো ছাপা সম্ভব হবে না। তবে পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ছবি নিশ্চয়ই ছাপা হবে এবং পুরস্কার দুটিই দেওয়া হবে।

আষাঢ় মাসের ধাঁধাঁর উত্তর

পেরেকের বিষ

অরিন্দম অজয়কে বললো, "তোমার মনে-পড়ছে অজয়, কালু মিঞার বাড়ি থেকে সারিয়ে আসবার পর নীলমণি-বাবুর জুতোজোড়া পরিষ্কার করেছিলো বনমালী ? ভালো করে পরিষ্কার করতে হলে জুতোর ভিতরেও হাত ঢোকানো দরকার। সে-ভাবে পরিষ্কার করবার সময়, বিষ আগে থেকে লাগানো থাকলে, বনমালীরই মৃত্যু হোতো। অতএব সকালে বনমালী জুতোটা পরিষ্কার করবার পর এবং নীলমণিবাবু সেটা পরবার আগেই পেরেকের মাথায় বিষ লাগানো হয়েছিলো।"

নতুন ধাঁধাঁ

১। একটি পদ্মফুল প্রত্যহ আয়তনে দ্বিগুণ হয়। আটি দিনের দিন দেখা গেলো পদ্মটি পুকুরের অর্দ্ধেক জায়গা জুড়ে বসেছে। কত দিনের দিন সমস্ত পুকুরটি সে ছেয়ে ফেলবে ?

২। একটি ঘোড়া পুবমুখো হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। খানিক পরে সে পশ্চিমমুখো হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। তার লেজ তখন কোন দিকে থাকবে ?

৩। আধ ডজন ডজন টাকা নাকি ছ' ডজন ডজন টাকা—কোনটি নেবে ? (অবশ্য যদি তোমাকে দেওয়া হয়!)

দ্রষ্টব্য : কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশের জন্যে ধাঁধাঁর উত্তরদাতাদের নাম বর্তমানে ছাপা সম্ভব নয়। ধাঁধাঁর উত্তরগুলি তোমরা নিজেরা করে রেখে পরের মাসের সঠিক উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো।

সম্পাদকের দপ্তর

আষাঢ় সংখ্যা পেতে দেরি হয়েছিলো বলে তোমাদের অনেকের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। আপিস বদলানো'র হাঙ্গামায় শুধু এ-বারেই এতো দেরি হোলো। ভবিষ্যতে যাতে তোমরা সময়মতো পত্রিকা পাও সে-চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

চিঠিপত্র দেবার সময় সর্বদা **নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর** পরিষ্কার করে লিখবে এবং উত্তর পেতে হলে **রিপ্লাই কার্ড** নিশ্চয়ই দেবে। চিঠির উত্তর না পেলে রাগ করবার আগে একবার ভালো করে ভেবে দেখো এই নিয়ম মেনে চলেছিলে কিনা! এই নিয়ম না মানলে চিঠির উত্তর দেওয়া কিংবা তোমাদের অভিযোগের প্রতিকার করা সম্ভব নয় বলে দুঃখিত।

রংমশাল

[নবম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ভাদ্র, ১৩৫১]
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত
অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ময়নার মা ময়নামতী

অন্নদাশঙ্কর রায়

ময়নার মা ময়নামতী
　　ময়না তোমার কই ?
ময়না গেছে কুটুম বাড়ী
　　গাছের ডালে ওই।
কুটুম কুটুম কুটুম
নামটি তার ভুতুম
আঁধার রাতের চৌকিদার
　　দিনে বলে, শুতুম।
ময়না গেছে কুটুম বাড়ী
　　আনতে গেছে কী ?
চোখগুলো তার ছানাবড়া
　　চৌকিদারের ঝি।

ভুতুম কিন্তু লোক ভালো
মা লক্ষ্মীর বাহন কিনা
　　লক্ষ টাকায় ঘর আলো।

গয়না দেবে শাড়ী দেবে
সাত মহলা বাড়ী দেবে
মস্ত মোটর গাড়ী দেবে
　　সোনা কাহন কাহন।
ভুতুম মলে ময়না হবে
　　মা লক্ষ্মীর বাহন।

ভূতপত্রীর যাত্রা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ মূল গায়ন ও জুড়ি দোহার গীত ॥
আচম্বিতে থামিল ঝিল্লির রব
নিস্পন্দ হইল বায়ু যেন কি করিয়া অনুভব।
তমোময় দ্রুম　　নিস্পন্দ নিঝুম
হেলা দোলা ক্ষান্ত দিয়া স্থির রয় সব।
জুড়ি। হঠাৎ কুহুরাত নামিল বনে
থমথমে চারিদিক ভয় জাগায়
　　পথিকের মনে।
নিবীড় অটবীতে　　প্রদীপ জ্বালি দিতে
জোনাকিরা ব্যস্ত হয় তরুশিরে পুষ্প বনে।

দোহার। নিঃসাড়ায় ডানা মেলায় কাল পেচক
কোকিল ভাবিছে দিবে কিনা দিবে কুহুরব।
কেতকী বনটিতে　　ময়ূর আচম্বিতে
—'কেও ?'—বলি হইল নীরব ॥

অবু। কেও বল্লে কে ? বোঝা গেছে উপদ্রব বেড়েছে। পেটটা কেমন টেনে ধরলো যে !—একটা চালতা গাছ দেখি যে !—
চালতার রস বড় তেজস্কার
মহৌষধ পেইন কিলার
যদি হাপোরে চলে নিঃশ্বেস
জোর করে পিয়েস্
বলেছে কব্‌রেজ্ চালতা দেয় বিশেষ উপকার
কাঁচা পাকা পেড়ে নেওয়া যাক্—গণ্ডা দুচ্চার !

॥ গীত নৃত্য অবুর ॥

পাকা চালতা তুটা খেয়ে নেওয়া চাই
কাঁচা পাকা তুটা বা হাতে রাখা চাই
কি জানি পিসির বাড়ি গুড় অম্বল দই দম্বল
পাই কিনা পাই।
এ-সব তুর্গম পথে ক্রোশেক তুক্রোশ যেতে
পেটেও তো দেওয়া চাই।
শুভস্য শীঘ্রং বিলম্বে কাজ নাই
চালতার অম্বল চাই-ই চাই
অকালের চালতা চাই বলতে পেতে নাই।

॥ অবুর লম্ফ ঝম্ফ ॥

এই এক লাফ্—গুড় অম্বল
তুই লাফ্—দই দম্বল
তিন লাফ্—দিনের খোরাক হল সম্বল
চার লাফ্ পাঁচ-লাফ্ ভূমে মেরে লাং
ডাল ভেঙে চালতা পাং—মাথা টলমল্;
চিৎপাং পপাং ভুপাং
খালি হাত অবুনাথ—ঘুরচে ভূমণ্ডল।

॥ রালতা পাখিদের নৃত্যগীত ॥
(পার্ল্যমেণ্টাল ব্যাঙ)

কিপ্লোলো ? কিপ্লেলো ?
গ্যাছে চেপে কেপ্লোলো—দ্রুম দদ্দড়
ধ্রুম ধদ্ধড় শব্দ হলো।
শব্দকল্পদ্রুম প'লো
দ্রুম্পোলো দ্রাম্পোলো
ওয়েবষ্টার প'লো—কি চেপে ?

অবু। আরে বাবা চালতা চেপে অবুনাথ পলো।
অবুনাথকে চেপে চালতা গাছ পলো
ধড় ধড় ধড়াস্ ধপাৎ প'লো
—হে দরদী এখন ধরে তোলো।

॥ জুড়ি দোহার গীত ॥

ধরে তোলো হে দরদী ! পড়েছি বিপাকেতে
হাঁটু পানিতে বুঝি হয় ভরা ডুবি।
সোজা নয় এ দেহের বোঝা
তলিয়ে যেতে চাইছে সোজা
নড়িতে চড়িতে কেবলি পড়ি যে
এখন কোথা রইলো মাসি পিসি এ বিপদে।

॥ ব্যাঙ বাক্য ॥

বিপদি ধৈর্য্যং
ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং
আপদং কথিতং
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ানাং ন সংযম
তজ্জয়ং কুরু
তেনেষ্টং গমত্যাং কুরু ॥

অবু। এ যে সশব্দে গুড়ুনি গুড়ুনি বিষ্টি হল সুরু।

॥ চালতা বুড়ি আলতা বুড়ির প্রবেশ ॥

১। টিপির টিপির বৃষ্টি পড়ে, চালতা তলায় কে ?

অবু। আর কে ? অবুনাথ আচার খেয়েছে, পড়ে পড়ে পটল তুলতেছে।

২। এই মেরেছে—চালতা পেড়েছে।

অবু। পেড়েচে তো পেড়েচে, যত পেরেচে পেড়েচে, যত পেরেচে খেয়েচে—তোরা বলবার কে ?

১। ওমা এযে বিড়ির বিড়ির বকতে নেগেচে—মিটির চাইতে নেগেচে।

২। ওলো ঘোমটা তুলেচে—এই মরেচে দেখে ফেলেচে।

১। হাতে চালতা, ব্যাতে চালতা—

২। যত না পেড়েচে ততোধিক খেয়েচে।

১। চল চল পেড়ে নিতে দে খেয়ে নিতে দে পিচ্ ফেলে দে পিচ্ ফেলে দে।

অবু। এই মরেচে, গায়ে ফেলেচে—এঃ, পপাং থেকে পচাং একেবারে বনচালতার ট্রিপ্‌ল্ এক্স্ট্রাক্ট,—ডালপালা ঝেড়ে আমিও খালাস—মাজাটা মচকেছে। যাক্ চালতা কটা তো ডাল ভেঙে হয়েছে হাত। চলি, সকলি তোমার কৃপা হে নামটা ভুলে গেছি যাক্ উদ্দিসে প্রণিপাৎ।

[ক্রমশ]

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কামিনীবাবু সলিলের দিকে তাকালেন। সলিল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি চাই নি সার। ওর কাছে কেন চাইতে যাব ?'

কামিনীবাবু ভাবলেন, সে কথা ঠিক। তুজনের জামা কাপড়ে কত তফাৎ! কৃষ্ণদাসকে জিজ্ঞেস্ করলেন,

'তোমার বাবা চানাচুর বেচে ?' 'হ্যাঁ, সার।'

কৃষ্ণদাসের ভয়ের অভাব দেখে কামিনীবাবুর রাগ আরও বেড়ে গেল। চানাচুরওলার ছেলে! তিনি আচ্ছা করে কৃষ্ণদাসের কাণ মলে তু'গালে তুটো চড় মারলেন। ওয়ার্ণিং দিলেন যে ফের ক্লাসের কোনো ছেলের কাছে চানাচুর বিক্রী করতে গেলে তিনি দেখে নেবেন। তারপর এলজাব্রার একস্ ওয়াইকে তিনি ক্লাশে টেনে এনে চরে বেড়াবার জন্য ছেলেদের মাথায় ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ক্লাসের মণিটর নাজির। পিরিয়ড শেষ হলে কামিনীবাবু বেরিয়ে যাওয়া মাত্র সে কৃষ্ণদাসের কাছে এল। 'ক্লাসে চানাচুর বেচেছিস ? 'কখ্খনো না।' 'ওদের কাছে ?' কৃষ্ণদাস মাথা নাড়ল। 'আয়।' কৃষ্ণদাসের হাত ধরে নাজির তাকে কামিনীবাবুর কাছে নিয়ে গেল। টিচার্স রুমে কামিনীবাবু আরেকটি ক্লাসে পড়াতে যাবার দম নিচ্ছিলেন। সব শুনে বললেন, 'তুমি কখনো ওকে চানাচুর বেচতে ত্যাখোনি ?' 'না, সার। কোন ছেলে ত্যাখে নি। ডেকে জিজ্ঞেস করুণ।' 'তাই নাকি!' একটু, সামান্য একটু বিব্রত হয়ে কামিনীবাবু কয়েক সেকেণ্ড চোখ বুজে রইলেন। মাষ্টারি করার মতো ঝকমারি কাজ আর নেই। চোখ খুলে বললেন, 'অ্যাঁ, কি বলে, তুমি তুঃখ করো না কষ্ট। বিক্রী কর না কর, ক্লাসে ওসব চানাচুর ফানাচুর আনো কেন ? ওদের দিতেই বা গেলে কেন তুমি ?' 'সলিল চাইল, তাই।' চানাচুরওলার ছেলে! পথে ঘাটে খেলার মাঠে চানাচুর ফেরি করে বেড়ায়, তার ছেলে! চটপট জবাব দেয়। তর্ক করে! 'যাকগে। সামান্য ব্যাপার ছেড়ে দাও। ওদের ধমকে দেব'খন।' 'ভালরকম শাস্তি দেওয়া উচিত সার', নাজির বলল। 'কি রকম শাস্তি হওয়া উচিত, সেটা কি তুমি ঠিক করবে ?' নাজির ভড়কে গিয়ে বলল, 'না, সার।' 'যাও। আমার ক্লাশ আছে।'

বারান্দায় এসে নাজির বলল, 'চল, হেডমাষ্টারের কাছে যাই।' কৃষ্ণদাস বলল, 'কিচ্ছু হবে না। একটা জিনিষ বুঝতে পারছি ভাই। খুঁটির জোর না থাকলে নালিশ করে কিছু হয় না।' 'সমস্ত ক্লাশের সামনে অপমান হলি, চুপচাপ সয়ে যাবি ?' 'তা সইব কেন। নিজেই যা হোক করব।' 'কি করবি ?' 'দেখি কি করা যায়।' শেষ পর্যন্ত নাজির কিন্তু ছাড়ল না, একরকম জোর করেই তাকে হেডমাষ্টারের কাছে নিয়ে গেল। নাজিরের অন্যায় সয় না। হেডমাষ্টার হৃদয়বাবুর একজোড়া কাঁচা পাকা গোঁফ আর মাথায় মস্ত টাক আছে, খুব জমকালো চেহারা। সব শুনে তিনি বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা ক্লাশে যাও।' কামিনীবাবুকে ডেকে পাঠিয়ে তার কাছেও সব শুনলেন। ধমক আর আপশোষের সুরে বললেন, 'দেখুন দিকি কি করেন আপনারা! মেরে ধরে শাসন করবার কি হয়েছিল ? আপনি চলে গেলে আপনার মতো মাষ্টার ঢের পাওয়া যাবে, কৃষ্ণদাসের মতো ছেলে সহজে মেলে না। সত্যবতী ইনষ্টিটিউশন থেকে ওকে ভাঙ্গিয়ে নেবার কত চেষ্টা করছে জানেন ?' কৃষ্ণদাসের পরীক্ষার খাতায় নম্বর কাটা মুস্কিল হয়। তুটি পরীক্ষায় সে স্কুলে রেকর্ড নম্বর পেয়েছে। ম্যাট্রিকে সে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হলে স্কুলের গৌরব, স্কুলের গৌরবে হেডমাষ্টারের গৌরব, কর্ত্তাদের কাছে খাতির। স্কুলের ছেলে ভালো রেজাল্ট করলে কামিনীবাবুর কোন লাভ নেই, স্কুলের তরফ থেকে দামটা তার খেয়াল ছিল না। চানাচুরওয়ালার ছেলে! কামিনীবাবু ধমক খেয়ে ক্লাশে ফিরে গেলেন, হৃদয়বাবু বসে বসে ভাবতে লাগলেন কি করা যায়। কৃষ্ণদাসকে ডাকিয়ে এনে পিঠ চাপড়ে দেবেন ? ক্লাশে গিয়ে অন্য ছেলে কটাকে ধমক দিয়ে কৃষ্ণদাসের কাছে ক্ষমা চাওয়াবেন ? ছেলে কটা আবার যার তার ছেলে নয়! একটা ক্লাশ করে এসে আবার ভাবতে ভাবতে তিনি যখন একটা উপায় প্রায় স্থির করে ফেলেছেন, তখন ঢং ঢং করে স্কুলের ঘণ্টা বেজে গেল। হৃদয়বাবু ভাবলেন, আজ থাক। কাল কৃষ্ণদাসকে নিজের ঘরে ডেকে এনে ভালো করে পিঠ চাপড়ে দেবেন আর বলবেন যে যারা তার নামে মিথ্যে করে লাগিয়েছে তাদের গার্জ্জেনের কাছ কড়া চিঠি তিনি লিখে দেবেন। যদিও ওরকম চিঠি তিনি লিখবেন না, তবু সুবিচার হল জেনে কৃষ্ণদাস খুসী হয়ে যাবে। হৃদয়বাবু নিজের বুদ্ধির দৌড় দেখে নিজের মনেই একটু হাসলেন।

চারজনে চারটি গাড়ীতে স্কুলে আসে যায়। তু'টি মোটর

গাড়ী, একটি ঘোড়ার গাড়ী একটি টমটম। গাড়ীতে উঠবার আগে চারজন আজকের ব্যাপার নিয়ে কথা বলছিল আর হাসাহাসি করছিল রাস্তার ধারে কৃষ্ণচুড়া গাছটার নীচে। কৃষ্ণদাস সামনে এসে দাঁড়াল। 'তোমরা আমার নামে মিথ্যে করে লাগালে কেন?' সুন্দর হেসে বলল, 'কানমলায় খুব লেগেছিল, না?' শঙ্কর হেসে বলল, 'গালে চড় খেয়ে?' 'এই রকম লেগেছিল' বলে কেউ কিছু বুঝবার আগেই কৃষ্ণদাস ছিঁড়ে নেবার মতো করে সুন্দরের কান মলে শঙ্করের দু'গালে দুই চড় বসিয়ে দিল। মনোহরের থুতনিতে মারল এক ঘুঁষি। সলিল মোটা শরীর নিয়ে পালাচ্ছিল, কৃষ্ণদাস পা বাড়িয়ে ল্যাং মারতেই সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আকস্মিক আক্রমণে প্রথমে এই জয়টুকু লাভ করলেও চারজনে একসঙ্গে মিলে মারামারি করলে কৃষ্ণদাস জব্দ হয়ে যেত। কিন্তু বিপদের সময় চার বন্ধু ভুলে গেল তারা চারজন। সে রকম মারামারি তাই একেবারেই হল না। ছেলেরা হৈ চৈ করে ছুটে এসে তাদের ঘিরে দাঁড়াল আর তাদের সঙ্গে এল চার গাড়ীর ড্রাইভার সহিস ও কোচম্যান মিলে পাঁচজন। এই পাঁচজনের মার খেয়ে আধমরা হয়ে কৃষ্ণদাস পড়ে গেল! তখন সুন্দর এসে জুতো পায়ে তার মাথায় একটা লাথি মারল, মনোহর মারল জুতোর ডগা দিয়ে গায়ে ঠোক্কর। শঙ্কর গাড়ী থেকে চাবুকটা এনে সপাং সপাং মারতে লাগল। কৃষ্ণদাসের গা কেটে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল, কোট ছিঁড়ে গা তার উদলা হয়ে গিয়েছিল। মাথা কেটে আগেই রক্ত পড়ছিল! এটুকু ঘটল অল্প সময়ের মধ্যেই। তারপর সকলে মিলে মারধোর বন্ধ করে দিল।

বেশী রকম আহত হলেও কৃষ্ণদাস অজ্ঞান হয়নি। কিন্তু সেদিন রাত্রে তার এত জ্বর হল যে জ্বরের ঘোরেই তার আর জ্ঞান রইল না। জ্বর কমল সাতদিন পরে। ব্যাপারটাও চাপা পড়ে গেল তার এই জ্বরের জন্য। চার বন্ধুর বাপেরা কিছু করলেন না। হৃদয়বাবুকে শুধু কড়া ভাষায় বলে দেওয়া হল, ছেলেটাকে যেন রীতিমতো শাসনে রাখা হয়। নাজির রোজ দু'একবার কৃষ্ণদাসের বাড়ী যেত। তাকে একদিন কৃষ্ণদাস বলল, 'আরেকটা জিনিষ বুঝতে পেরেছি। একা কিছু করা যায় না, করা উচিত নয়। তোদের কয়েকজন সঙ্গে থাকলে—' 'সব কটাকে তাড়িয়ে দিত স্কুল থেকে।' 'কিন্তু ওদের সকলকে মেরে তো লাশ বানিয়ে দিতে পারতাম!'

[ক্রমশ]

পদীপিসির বর্মী বাক্স (উপন্যাস)

লীলা মজুমদার

এক

পাঁচুমামার প্যাঁকাটির মতন হাত ধ'রে টেনে ওকে ট্রেনে তুল্‌লাম। শূন্যে খানিক হাতপা ছুঁড়ে, ওবাবাগোমাগো ব'লে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শেষে পাঁচুমামা খচমচ্ ক'রে বেঞ্চিতে উঠে বস্‌লো। তারপর পকেট থেকে লাল রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে ফেলে, খুব ভালো করে নিজের হাত পা পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লো কোথাও ছ'ড়ে গেছে কি না ও আয়োডিন দেওয়া দরকার কি না। তারপর কিছু না পেয়ে দু'বার নাক টেনে, পকেটে হাত পুরে, খুদে খুদে পা দুটো সাম্‌নের বেঞ্চিতে তুলে দিয়ে, আমার দিকে চেয়ে চিঁচিঁ ক'রে বল্লো, "ছোটো বেলায় একবার ভুলে বাদ্‌সাহী জোলাপ খেয়ে অবধি শরীরটা আমার একদম গেছে, কিন্তু বুকে আমার সিংহের মতন সাহস! তা নইলে পদীপিসির বর্মী বাক্স খোঁজার ব্যাপারে হাত দেবো কেন!" বলে ভুরু দুটো কপালে তুলে চোখ দুটো জিজ্ঞাসার চিহ্ন বানিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি ত' অবাক্!!

কোণার বেঞ্চিতে যে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক ছেলেপুলে বাক্স প্যাঁটরা ও মোটা গিন্নী নিয়ে বসে বসে আমাদের কথা শুন্‌ছিলেন তিনিও অবাক্!! পাঁচু মামা বল্লো, "এক শ' বছর পরে পদীপিসির বর্মী বাক্স আমি আবিস্কার করবো! জানিস্ তাতে এক একটা পান্না আছে এক একটা মোরগের ডিমের মতন, চুনী আছে এক একটা পায়রার ডিমের মতন, মুক্তো আছে হাঁসের ডিমের মতন। মুঠো মুঠো হীরে আছে, গোছাগোছা মোহর আছে। তা'র জন্য শত শত লোক মরে গেছে, রক্তের সাল্‌ওয়েন নদী বয়ে গেছে, পাপের উপর পাপ চেপে পর্বত তৈরী হয়েছে—সব আমি একা উদ্ধার করবো!"

তখন আমার ভারী রাগ হ'ল। বল্লাম, "তুমি ইঁদুর ভয় পাও, গোরু দেখ্‌লে তোমার হাঁটু বেঁকে যায়, তুমি কি ক'রে উদ্ধার করবে?" পাঁচুমামা বল্লো, "আমার মনের ভিতর যে সিংহ গর্জন করছে।" ব'লে একদম চুপ্ মেরে গেলো। আমি পাঁচুমামাকে একটা ছাঁচি পান দিলাম, এক বোতল লেমোনেড

খাওয়ালাম, খাবারওয়ালাকে ডেকে মস্ত শাল পাতার ঠোঙা ক'রে লুচী আলুর দম, কপির সিঙ্গাড়া, খাজা আর রসগোল্লা কিনে ওর হাতে গুঁজে দিলাম। বল্লাম, "ও পাঁচুমামা, পদীপিসির বর্মী বাক্সটা কোথায় আছে?" পাঁচুমামা আমার এত কাছে ঘেঁষে এলো যে তার কনুইটা আমার কোঁকে ফুট্‌তে লাগ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচুমামার ভুরুর প্রত্যেকটা লোম খাড়া হয়ে দু'টো শুঁয়োপোকার মতন দেখাতে লাগ্‌লো। ওর মাথাটা ঝুলে আমার এত কাছে এসে গেলো যে ঐ শুঁয়োপোকার সুড়সুড়ি আমার কপালে লাগ্‌লো। পাঁচুমামা নীচু গলায় কথা বল্‌তে লাগ্‌লো, আর আমি তাই শুন্‌তে শুন্‌তে টের পেলাম চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক কখন জানি ওঁর নিজেব বেঞ্চি ছেড়ে পাঁচুমামার ওপাশে ঘেঁষে বসে হাঁ করে কথা শুনছেন, আর তাঁর চোখদুটো গোলগোল হ'য়ে গেছে আর গলার মধ্যিখানে একটা গুট্‌লিমতন ওঠানামা করছে। তাই দেখে আর পাঁচুমামার কথা শুনে আমার সারা গা শিরশির করতে লাগ্‌লো।

পাঁচুমামা বল্‌তে লাগ্‌লো, "দেখ্, মামাবাড়ী ত' যাচ্ছিস্। সেখানকার গোপন সব লোমহর্ষণ কাহিনীগুলো তোর জানা দরকার একথা কখনও ভেবে দেখেছিস্? পদীপিসির নাম ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লেখা থাক্‌তে পারতো তা' জানিস্? ঠাকুর্দার পদীপিসি, অদ্ভুত রাঁধ্‌তে পারতেন। একবার ঘাস দিয়ে এইসা চচ্চড়ি রেঁধেছিলেন যে বড়লাট সাহেব একেবারে থ'! বলেছিলেন এই খেয়েই তোমলোক্‌কো দেশকো এইসা দশা! থাক্‌গে সে কথা! অদ্ভুত রাঁধুনী ছিলেন পদীপিসি, বেঁটেখাটো বিধবা মানুষ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, আর মনে জিলিপির প্যাঁচ্! সিংহের মতন তেজও ছিলো তাঁর, হাজার হোক্, এক দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে আমি ত' তাঁরই বংশধর! বুঝ্‌লি, ঐ পদীপিসি গোরুরগাড়ী চ'ড়ে, মাঘীপূর্ণিমার রাতে, বালাপোষ গায়ে, নিমাইখুড়োর বাড়ী চলেছেন বত্রিশবিঘার ঘন শালবনের মধ্যে দিয়ে। যাচ্ছেন আর মনে মনে ভাবছেন নিমাইখুড়োর ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত, জঙ্গলে একা থাকেন, মেলা সাঙ্গোপাঙ্গ চেলা নিয়ে, কপালে চন্দন-সিঁদূর দিয়ে চিত্তির করা, কথায় কথায় ভগবানের নাম। অথচ এদিকে মনে হয় দেদার টাকা, দানটানও করেন, জিজ্ঞাসা করলে বলেন—সবই ভগবানের দয়া! এত লোক থাক্‌তে ভগবান যে কেন ওঁকেই দয়া করতে যাবেন সেও একটা কথা। এই সব ভাবছেন হঠাৎ হৈহৈরৈরৈ ক'রে একদল লাল লুঙ্গিপরা লাল পাগ্‌ড়িবাঁধা, লাল চোখওয়ালা ডাকাতপানা লোক একেবারে গোরুর গাড়ী ঘেরাও করে ফেল্লে! নিমেষের মধ্যে গোরু দুটো গাড়ী থেকে খুলে নিলো, আর পদীপিসির সঙ্গে রমাকান্ত ছিলো, তা'কে ত' টেনে হিঁচড়ে গোরুর গাড়ী থেকে বের করে তা'র ট্যাঁক্ থেকে সাড়ে সাত আনা পয়সা আর নস্যির কৌটো কেড়ে নিলে। পদীপিসি থান পরা। রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, কোমরে কাপড় জড়িয়ে আর তার উপর দুই হাত দিয়ে রাস্তার মাঝখানে এমন ক'রে দাঁড়ালেন যে ভয়ে কেউ তাঁর কাছে এগুলো না। শেষটা তিনি হাঁক্ দিয়ে বল্লেন, "ওরে বাট্‌পাড়েরা, গাড়েয়ান রমাকান্ত সবাইকেই ত আধমরা ক'রে ফেল্লি, গোরুগুলোরও কিছু বাকী রেখেছিস্ কিনা জানিনা। এবার তোরাই আমাকে নিমাইখুড়োর বাড়ী কাঁধে করে পৌছে দে!" তাই না শুনে ডাকাতরা জিভটিভ কেটে, পদীপিসির পায়ে একেবারে কেঁদে পড়ে বল্লো নিমাইসর্দার যদি জান্‌তে পারে তা'র কুটুমকে এরা ধরেছিলো নিমাইসর্দার এদের প্রত্যেকের ছাল ছাড়িয়ে নেবে হাউমাউ! তখন তারা ফের গোরু জুতে, পয়সা ফিরিয়ে, রমাকান্তর গায়ে হাত বুলিয়ে, গাড়োয়ানকে নগদ্ চারটে পয়সা ঘুষ দিয়ে, নিজেরাই নিমাই-খুড়োর বাড়ীর পথ দেখিয়ে দিয়েছিলো।

পদীপিসিও নিমাইখুড়োর গোপন কথা জান্‌তে পেরে মহাখুসি!

[ক্রমশ]

দিগ্বিজয়ীর দিদিমা

বুদ্ধদেব বসু

ঠিক বাইরের দরজাতেই দিদিমার সঙ্গে মুখোমুখি।

'কোথায় যাচ্ছিস?' 'খেলতে।'

'কী-খেলা? ডাংগুলি বুঝি? পাড়ার যত বদ ছেলেদের সঙ্গে জুটে—' 'না, দিদিমা, ডাংগুলি না। ক্রিকেট।'

'কিরকেট? সে আবার কী খেলা?' 'একটা বল থাকে, তাকে ব্যাট দিয়ে পেটায়—' 'ও, ব্যাটবল-খেলা! তবু ভালো! আমি ভাবলুম কেরকিট আবার কী জিনিশ!' 'তাহ'লে যাই, দিদিমা?' 'আচ্ছা, যাও। কিন্তু ঐ যে সব ফিলিম না কী বলে—যাতে মেমসায়েবদের নাচ দেখায়—সেখানে কিন্তু কক্ষনো—' 'না, দিদিমা, কক্‌খনো না! এই একটুখানি খেলেই বাড়ি চ'লে আসবো।' 'সন্ধের আগেই আসা চাই—মনে থাকে

যেন। আর শোন—চুলটাকে মোষের শিঙের মত বাঁকিয়েছিস কেন? আয় এদিকে।' সন্তর মাথাটি দু'হাতের মধ্যে ধ'রে দিদিমা তার চুলগুলিকে খুব খানিক নেড়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'যা।'

রাস্তায় বেরিয়ে সন্ত দেখলো, মন্ত তার পিছন-পিছন আসছে। 'তুই আসছিস যে?' 'বাঃ আমি বুঝি খেলবো না?' 'তুই কিন্তু ফ্যাগ খাটবি। খবরদার—ব্যাট ধরতে যাসনে।' মন্ত খুকখুক ক'রে হেসে উঠলো। 'হাসবার কী হলো?' 'না—বলছিলুম কী—তুমি আজ তেল-জল দিয়ে কত কষ্টে একটুখানি টেড়ি কাটলে—' 'ফাজলেমি, না?'

'না, না, আমি তো সে-কথাই বলছি—টেড়ি কাটা তো কিছু দোষের নয়—কিন্তু দিদিমা যে কেমন—খুক-খুক-খুক—' 'তুই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিলি বুঝি?' 'সত্যি, দিদিমার এ ভারি অন্যায়! তোমার মাথাটা ধ'রে ও-রকম ক'রে—খুক-খুক, খুক-খুক-খুক—'

সন্ত হঠাৎ দাঁড়িয়ে হাফ-প্যান্টের বেল্টটা একটু আঁটো ক'রে নিলে। তারপর বললে, 'ছাখ ইষ্টুপিট, ফের ও-রকম ইডিয়টের মতো হাসবি তো তোর মুণ্ডু গুঁড়ো ক'রে দেবো।'

'আমি তো কিছু বলিনি—ঐ দিদিমা—' 'চুপ!' বাকিটা রাস্তা সন্ত মন্তর দিকে একবারও তাকালো না। খেলার মাঠে এসে ছাখে, দলের সবাই পৌঁছে গেছে। চটপট ইষ্ট্যাম্পো পোঁতা হ'লো, পকেট থেকে তামার পয়সা বের করে টস্ করা হ'লো, তারপর খেলা আরম্ভ হ'লো। এক-এক দিকে চারজন ক'রে দুটো টীম। সন্তর দল টস্-এ হেরেছিলো, সে বোলিং করতে নামলো। এমন বোলিংই করলে যে পটাপট চারজনই আউট হয়ে গেলো, ভুলু বেচারা তো ব্যাট নিয়ে দাঁড়ালো আর মরলো। আর এই ভুলু কাল ছত্রিশ রান ক'রে অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিলো! এর পর সন্তর দল পেটাবে। সন্ত এমনভাবে ব্যাট হাতে নিয়ে মাঠে নামলো যেন সে ব্র্যাডম্যানের বাচ্ছা সংস্করণ। ভুলু বোলিং করবে—বোলিং-এ ও একেবারে হাঁদাকাণ্ড, আজ সন্ত এমন পেটানোই পেটাবে যে কাউকে আর কথাটি বলতে হবে না! প্রথম বলটা ট্রায়াল,—সন্ত সেটা আস্তে ঠুকে ফিরিয়ে দিলে। দ্বিতীয় বলটি ভুলু যে কেমন ক'রে ছুঁড়লো—ধাঁ ক'রে এসে ঠাস ক'রে লাগলো ঠিক সন্তর বাঁ পায়ের হাঁটুতে। ব্যাট ফেলে দিয়ে দু'হাতের হাঁটু আঁকড়ে ধ'রে সন্ত ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়লো।

অন্য সাতজন ছেলে তক্ষুনি তাকে ঘিরে ফেললো—কেউ তার হাঁটু ধ'রে টানে, কেউ তার মাথা টিপে দেয়, কেউ ছুটে গিয়ে বরফ নিয়ে আসে। দাঁতে দাঁত চেপে চুপ ক'রে রইলো সে, তবু তার চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। খানিক পরে ব্যথাটা একটু যেন ক'মে এলো, আস্তে-আস্তে পা-টা নেড়ে-নেড়ে সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো।

কেষ্টা বললে—'রোসো, আর একটু বরফ ঘ'ষে দিই।' সন্ত জিগেস করলে, 'কী হয়েছে? হাড়-টাড় ভাঙেনি তো?' সে শুনেছিলো হাড় ভাঙলে তিন মাস শুয়ে থাকতে হয়, তাই ওতে তার বড্ড ভয়! বেণু বললে—'কে জানে, বাড়ি গিয়ে ডাক্তার দেখাস।' 'ডাক্তার না হাতি! ও কিছু হয়নি।' জোর ক'রে সে উঠে দাঁড়ালো। হাঁটুর কাছটা লাল হ'য়ে ফুলে উঠেছে—বিশ্রী হয়েছে দেখতে। সে একটুখানি হেঁটে দেখলো—বেশ তো হাঁটতে পারে। তাহ'লে আর ভাবনা কী।

একটু দূরে একলা দাঁড়িয়ে ছিলো ভুলু। তার কাছে গিয়ে সন্ত বললে, 'তুই আমাকে ইচ্ছে ক'রে মেরেছিলি?' 'না, ভাই, সত্যি না—বিশ্বাস কর, আমি—'কথাটা শেষ না ক'রে ভুলু হঠাৎ সন্তর হাত চেপে ধরলো। 'ইচ্ছে ক'রে মারিসনি তো? তাহ'লে ঠিক আছে। নয়তো তোর হাতটা এক্ষুনি মুচড়িয়ে-মুচড়িয়ে ভেঙে দিতে হ'তো—সে আবার এক হাঙ্গামা!' ভুলু ঢোঁক গিলে বললে, 'চল তোকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।' 'কেন? আমি কি খোঁড়া হ'য়ে গিয়েছি? ভাগ্!' পকেট থেকে লম্বা এক টুকরো রবার বের ক'রে সন্ত বাঁ হাঁটুর উপরে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে বাঁধলে, তারপর খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে আস্তে-আস্তে চললো বাড়ির দিকে। সে যে বড়ো হ'য়ে মস্ত একজন প্লেয়ার হবে, তার এই ভবিষ্যৎই যেন সন্ধ্যাবেলার আলোয় উজ্জ্বল হ'য়ে তার চোখের সামনে দেখা দিলো।

সন্ধেবেলায় বাড়িটা খুব ফাঁকা, খুব চুপচাপ থাকে। বাবা তাস খেলতে বেরোন, মা থাকেন রান্নাঘরে, শুধু দিদিমা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরঘুর ক'রে বেড়ান—সমস্ত বাড়ির তিনিই পাহারাওলা। সন্ত চুপে-চুপে তার নিজের ঘরটিতে এসে জানলা ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলো। আকাশে আলো মিলিয়ে গেলো, ঘর অন্ধকার হ'য়ে এলো, সে তার চোখের সামনে দেখতে পেলো কলকাতার ইডেন গার্ডেন লোকে লোকারণ্য, ফ্ল্যানেলের প্যাণ্ট আর শাদা শার্ট প'রে ব্যাট হাতে নিয়ে সে প্যাভিলিয়ন থেকে বেরুচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে কানে-তালা-লাগানো হাত-তালি, আর চারদিক থেকে ক্লিক-ক্লিক

ক'রে ক্যামেরায় তার ছবি উঠে যাচ্ছে। কলকাতা সে কখনো চোখে ছাখেনি, কিন্তু খবর-কাগজে খেলার যে-সব ছবি বেরোয় আর বর্ণনা লেখা থাকে, সেইগুলিকে অবলম্বন ক'রে সে মনে-মনে এক প্রকাণ্ড উপন্যাস বানাতে লাগলো। ব্যাট হাতে নিয়ে সে প্রথমেই একটা বাউণ্ডারি করেছে, আবার সেই হাত-তালি, এমন সময় একটি হারিকেন লণ্ঠন হাতে ক'রে দিদিমা ঘরে এসে ঢুকলেন। 'কী রে? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস যে?' 'এমনি।'

দিদিমা একটু কাছে এসে বললেন, 'কী হয়েছে?' 'কিছু হয়নি, দিদিমা।' 'হাত পা ধুয়েছিস?' 'এই—এই যাচ্ছি, দিদিমা।' 'যাচ্ছি আবার কেন? এখুনি যা।'

দিদিমার সামনে খুঁড়িয়ে হাঁটলেই তার সব জারিজুরি বেরিয়ে যাবে, তাই সে চুপ ক'রে রইলো। লণ্ঠনটা টেবিলের উপর রেখে দিদিমা সলতেটা একটু উশকে দিলেন। হঠাৎ সন্তর পায়ের দিকে তাঁর নজর গেলো। —'ও কী? পায়ে আবার ওটা কী বেঁধেছিস? ফ্যাশন বুঝি? খুলে ফ্যাল শিগগির।'

মন্ত কোত্থেকে ঘরে এসে বললে, 'দাদার হাঁটুতে বল লেগেছে, দিদিমা।' ব'লেই দৌড়ে পালিয়ে গেলো।

দিদিমা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বললেন, 'ও, তাই! আমার কাছে আবার লুকোনো হচ্ছিলো! খোল ওটা!' দিদিমার বিরাট ব্যক্তিত্বের কাছে সন্ত কুঁকড়ে এইটুকু হয়ে গেলো। নিচু হ'য়ে হাঁটুতে জড়ানো রবারটা খুলে ফেললো। দিদিমা মোটা মানুষ, নিচু হ'তে কষ্ট হয়, তাই তিনি আদেশ করলেন, 'পা-টা তোল চেয়ারের উপর।'

পা-টা তুলতে বেশ কষ্ট হলো সন্তর, দু' একবার চেষ্টার পরে পা ঠিক উঠে এলো চেয়ারে। দিদিমা একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখলেন, তারপর আঙুল দিয়ে ফোলা জায়গাটা টিপে বললেন, 'লাগছে?' 'না।' দিদিমা আরো জোরে টিপলেন,—'এখন?' সন্তর প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিলো, নিশ্বাস বন্ধ ক'রে বললে, 'না।' 'হুঁ। যত সব—'

চেয়ার থেকে পা নামিয়ে সন্ত বাঁচলো। দিদিমা তার বিছানাটা ঠিকঠাক ক'রে দিয়ে বললেন, 'শুয়ে পড়্।' সন্ত লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লো। তারপর একজন চাকর এলো গরম রেড়ির তেল নিয়ে, আর সেই দুর্গন্ধি তেল মালিশ করা হ'লো তার পায়ে। দিদিমা এলেন মস্ত একটা কাঁসার বাটি হাতে ক'রে। —'আজ আর ভারি কিছু খেয়ে কাজ নেই—এই দুধ-সাবুটুকু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।' একে রেড়ির তেলের দুর্গন্ধ, তার উপর দুধ-সাবু! তবু সে দুধ-সাবু খেলো, সবটাই খেলো, কেননা সবটুকু না-খাওয়া পর্যন্ত দিদিমা পাশে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

দিদিমা তার গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে বললেন, 'এখন ঘুম। আবার ঐ ছাইপাঁশ গল্পের বইগুলো যেন পড়তে বোসো না।'

ভবিষ্যতের দিগ্বিজয়ী খেলোয়াড় চুপ ক'রে সব সহ্য করলো। দিদিমা সব পারেন, কিন্তু সে না-ঘুমুলে কিছুই করতে পারেন না। আজ সে ঘুমুবে না—সারা রাত ঘুমুবে না—ঐখেনে তার জিৎ। তার চোখের সামনে আবার ইডেন গার্ডেনের ছবি ফুটে উঠলো। সে দু' দুটো সেঞ্চুরি করেছে, পরের দিনের খবর-কাগজগুলোয়—

মন্ত পা টিপে-টিপে তার কাছে এসে দাঁড়ালো।—'দাদা, এখন কেমন লাগছে?' সন্ত ঠাশ ক'রে তার গালে এক চড় বসিয়ে দিলে।

জয়ন্তের পুনরাগমন (উপন্যাস)

হেমেন্দ্রকুমার রায়

তৃতীয় : জয়ন্তের গল্প

পরদিন হন্তদন্তের মতন সুন্দরবাবু এসে হাজির জয়ন্তের বাড়ীতে। জয়ন্ত ও মাণিক ব'সে ব'সে কথাবার্ত্তা কইছিল। সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত, তুমি ভৈরবের ঘর খানাতল্লাস করবার জন্যে পরোয়ানা আনতে বলেছ কেন?" "আমি নিজের একটা সন্দেহ দূর করতে চাই।" "সন্দেহ আবার কিসের?"

জয়ন্ত সোজাসুজি জবাব না দিয়ে বললে, "সুন্দরবাবু, আমি সেই কুকুর আর বিড়ালের মৃতদেহ পরীক্ষা করেছি।" "ক'রে কি লাভ হ'ল?"

"জানতে পারলুম যে সেই বিড়াল আর কুকুরের মৃত্যু হয়েছে গোখরো সাপের বিষে।" "হুম্, কি আশ্চর্য্য!"

"আরো আশ্চর্য্য এই যে, তাদের কারুকেই সাপে কামড়ায় নি।" সুন্দরবাবু চমকে বললেন, "অ্যাঁঃ! তা'হলে তারাও রামবাবুর মত সাপের কামড় না খেয়েও সাপের বিষে মারা পড়েছে?"

—"হ্যাঁ।" "এ কী রহস্য!" "বিড়ালের থাবাগুলোও আমি পরীক্ষা করেছি।" "থাবা?" "হ্যাঁ, থাবা। তার থাবাগুলোর প্রত্যেক নখেই মাখানো ছিল গোখ্‌রো সাপের বিষ।"

—"এ আবার কি ব্যাপার বাবা?" "কোন লোক বিড়ালটাকে ধ'রে তার নখে বিষ মাখিয়ে দিয়েছে।" "মানে?" "একটা মানেও আবিষ্কার করেছি।" "শুনি, শুনি।" "এই বিড়ালটাই হচ্ছে রামবাবুর হত্যাকারী।" "ধেৎ!" "এই নিয়ে আমি একটা গল্পও রচনা করেছি। শুনবেন?" "আরে না, না! আমার এখন বাজে গল্প শোনবার সময় নেই।" "তবু শুনুন।" সুন্দরবাবু নাচারের মতন মুখভঙ্গি করলেন।

জয়ন্ত বললে, "মনে আছে, রামবাবুর বাড়ীর একতালার ভাড়াটিয়া কি কি বলেছে? প্রথমত, রামবাবু থিয়েটার থেকে ফিরে খুব জোরে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময়ে ভৈরবের অধিকৃত দোতালায় একটা বিষম খেঁকী বিড়ালের আর্ত্তনাদ শোনা গিয়েছিল। তৃতীয়ত, রাত প্রায় দুটোর সময়ে বাড়ীর পাশের খানায় একটা বিড়াল আর একটা কুকুর ঝগড়া করেছিল। চতুর্থত, রামবাবুর মৃতদেহের পায়ে বিড়ালের আঁচড়ের দাগ ছিল। প্রত্যেক ব্যাপারটাই তুচ্ছ। কিন্তু এরই উপরে দাঁড় করিয়েছি আমার গল্পের কাঠামো"। —"যত সব বাজে কথা!"

—"আচ্ছা, এখন আমার গল্প শুনুন। ভৈরব হচ্ছে একটি ঝানু লোক। সে কোনগতিকে টের পেয়েছিল, রামবাবুর লোহার সিন্ধুকে আছে পাঁচ লক্ষ টাকা। এই টাকার উপরে তার লোভ হয়। তাই সে এক অদ্ভুত উপায়ে রামবাবুকে হত্যা করবার সংকল্প করে। ঘটনার দিন বৈকালে সে একটা প্রায়-বন্য বিড়ালকে বন্দী করে। তার কাছে আগে থাকতেই গোখ্‌রো সাপের বিষ সংগ্রহ করা ছিল। সেই বিষ সে বিড়ালটার চার থাবার নখে মাখিয়ে দেয়। এই কারণেই দোতালায় বিড়ালের আর্ত্তনাদ শোনা গিয়েছিল। তেতালার ঘর বন্ধ ক'রে রামবাবু থিয়েটার দেখতে বেরিয়ে যান। ভৈরব লুকিয়ে বিড়ালটাকে নিয়ে তেতালায় ওঠে। খড়খড়ির পাখির ফাঁকে হাত গলিয়ে জানালা খোলে। বিড়ালটাকে ঘরের ভিতরে পুরে দিয়ে আবার জানালা বন্ধ করে। তারপর "নিমন্ত্রণ-বাড়ী যাচ্ছি" বলে বাড়ী থেকে সরে পড়ে—সকলের সন্দেহের বাইরে থাকবে ব'লে। তারপর থিয়েটার দেখে রামবাবু ফিরে আসেন। নিজের ঘরের দরজা খোলেন। সঙ্গে সঙ্গে পালাবার পথ পেয়ে বিড়ালটা ছুটে আসে আর তাঁর পায়ে আঁচড়ে দিয়ে বাইরে পালিয়ে যায়। রামবাবু ভয় পেয়ে সজোরে দরজা বন্ধ ক'রে দেন। তার খানিকক্ষণ পরে বিড়ালের বিষাক্ত নখের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। রামবাবুর মৃত্যু হয়। তারপর শেষ-রাতে ঘটনাস্থলে ভৈরবের আবির্ভাব। রামবাবু নিশ্চয়ই ঘরের দরজায় খিল দেন নি। ভৈরব ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। মৃতের পকেট থেকে চাবি নিয়ে লোহার সিন্ধুক খোলে।"

সুন্দরবাবু দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে বললেন, "হুম্! এমন খুনের কথা কে কবে শুনেছে? কিন্তু ভৈরবের অপরাধ তুমি প্রমাণ করবে কেমন ক'রে?" জয়ন্ত বললে, "হয়তো তার ঘর খানাতল্লাস করলে কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। হয়তো সে ভেবেছে পুলিস এই আশ্চর্য্য খুনের রহস্য বুঝতে পারবে না, তাই এখনো সাবধান হয় নি।"

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না জয়ন্ত, এখনো সব রহস্য পরিষ্কার হ'ল না। ঐ একই গোখ্‌রো সাপের বিষে কুকুর আর বিড়ালেরও মৃত্যু হ'ল কেন?" জয়ন্ত বললে, "এ-কথাও আমি ভেবে দেখেছি। ভুলবেন না, ঘটনার রাত্রে বাড়ীর পাশের খানায় কুকুর আর বিড়ালের ঝগড়ার শব্দ শোনা গিয়েছিল। কুকুরটা নিশ্চয়ই বিড়ালটাকে তাড়া ক'রে তার পিছনে পিছনে খানায় গিয়ে ঢোকে। সেখানে তাদের ভিতরে মারামারি হয়। বিড়ালের নখের বিষে কুকুর মারা পড়ে।" —"আর বিড়ালটা?" —"সেও নাকে-মুখে কুকুরের কামড় খেয়েছিল। তারপর ক্ষতস্থানে যখন নিজের থাবা বুলোচ্ছিল, তখন নখের বিষ গিয়ে মিশেছিল তারও রক্তে।" সুন্দরবাবু বললেন, "তোমার অনুমান হয়তো মিথ্যা নয়, কিন্তু আদালতে এ-সব কথা প্রমাণ করা সহজ হবে না। এ-সব যেন ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের মতন শোনাচ্ছে!" জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আদালতের কথা পরে হবে। আপাতত এখানে ব'সে সময় নষ্ট না ক'রে ঘটনাস্থলে যাত্রা করাই উচিত।" সুন্দরবাবু বললেন, "ঠিক! তাই চল।"

কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে শোনা গেল, ভৈরব গত রাত্রেই কোথায় বেরিয়ে গিয়েছে, এখনো ফিরে আসে নি। জয়ন্ত বললে, "সে বোধহয় আর ফিরবেও না। ভৈরব আমাদের সন্দেহ করেছে। আমি যে বিড়ালের মৃতদেহ আবিষ্কার করব এতটা সে ভাবতে পারে নি।"

[ক্রমশ]

ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পার্কে বিকেল বেলায় ডাং গুলি খেলতে খেলতে ঘোঁতোন, জগু আর পান্নালাল দেখলো একজায়গায় বেজায় ভীড় জমেছে। "মারপিট না কি? চল্ দেখে আসি"—ওরা চটপট্ এলো সেখানে। মারপিট নয়। একটা চেয়ারের ওপোর দাঁড়িয়ে একজন কালো কুৎকুতে ধরণের ভদ্দরলোক হাত পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছে! চোখগুলো লাল লাল, গোল গোল; কানগুলো বড় বড়; গলাটা হেঁড়ে। বেড়ে দেখতে লোকটাকে। ওরা ভীড় ঠেলে এগুলো। কি বলছে শুনতে হবে তো। শুনলো, লোকটা বলে চলেছে—

"চারপাশে দিনরাত অসংখ্য জীবন্ত জিনিস, ঠিক পোকা-মাকড়ের মতো জিনিস, কিলবিল করছে। পা ফেলতে গেলেই একগাদাকে মাড়িয়ে দিতে হয়। নিশ্বেস নিতে গেলেই একদল হুড়মুড় করে নাকেমুখে ঢুকে পড়ে। জল না খেলে গলা চাঁ চাঁ করে, খাবার না খেলে মেজাজ বিগড়ে যায়। কিন্তু জল খেতে গেলে সেই সঙ্গে একগাদা পোকাকে গিলতে হবে, খাবারের মধ্যে বিজবিজ করছে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে পোকা।"......

ঘোঁতন বল্লে, "দেখেছিস লোকটা কি রকম গুল মারছে!" জগু বল্লে, "লোকটার চেহারাটা দেখ না কি রকম গুলিখোরের মতো।" পান্না বল্ল, "চ, চ, তার চেয়ে ডাংগুলি খেলা যাক।"

ওরা যেমন হুড়মুড় করে ভীড় ঠেলে ঢুকেছিলো, তেমনি গোঁতাগুঁতি করে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে গেলো। এমন সময় পেছন থেকে সেই বক্তা ভদ্দরলোকটি ডাকলেন: "ও খোকারা, শোনো, শোনো, চলে যাচ্ছ কেন?"

পান্না ভয়ে ভয়ে বল্লে, "সেরেছে! মারবে না কি!" জগু ডাং গুলির ডাণ্ডাটা শক্ত করে নিয়ে ধরে বল্লে, "মারা পড়ে রয়েছে কিনা! চ' না দেখি কি বলে!"—ওরা এগিয়ে গেলো ভদ্দরলোকের দিকে। কাছে আসতে ভদ্দরলোক বল্লেন, "চলে যাচ্ছিলে যে? ভাবছো বাজে বকছি আমি, না?"

জগু বল্লে, "বাজেই ত'! পোকামাকড় চারদিকে দিন রাত বীজবীজ করছে না হাতি হচ্ছে। তাহলে ত' মশাই চোখেই দেখতে পেতুম।"

"চোখেই ত' দেখতে পাওয়া যায়। তবে কি জানো—শুধু চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। পোকাগুলো ভয়ানোক ছোটছোট কিনা। তাই অনুবিক্ষণ লাগিয়ে দেখতে হয়। এগুলো এতো ছোট যে পোকামাকড় বলাই বোধ হয় উচিত নয়, পোকামাকড় বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি তার চেয়ে ঢের ঢের ছোট; পণ্ডিতেরা তাই এদের নতুন নাম দিয়েছেন জীবাণু। অনুবিক্ষণ চোখে দিলেই এদের দেখতে পাওয়া যায়।"

ঘোঁতোন চাপা গলায় পান্নাকে বল্লে, "কী ক্ষণ্, ক্ষণ্ বলছে রে?" —"অনুবিক্ষণ! জানিস না বুঝি! সেই যে ডান চোখ বুঁজে বাঁ চোখ দিয়ে নলের মতো একটা জিনিসের ফোঁকোরে"......

"হাঁ, হাঁ, ঠিক বলেছো।" ভদ্দরলোক ওদের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। "সেই নলের মতোটার দু'দিকে দুটো পুরু কাঁচ লাগানো। চোখের সামনে সেই কাঁচ ধরলে সামনের ছোট জিনিস মস্ত বড় বড় করে দেখা যায়। ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস দেখেছ ত'—সেই রকমের কাঁচ। নলটার সামনেকার ছোটছোট জিনিস মস্ত বড় বড় লাগে। যা শুধু চোখে দেখা যায় না, এই নলের মধ্যে দিয়ে তা দেখা যায়।"

"আপনি দেখেছেন না কি?" জগু সটান্ জিগ্‌গেস করে বসল।

"ঢের দেখেছি। আজকাল লোকে ত' হামেসাই দেখছে! আজকাল ওতে আর বাহাদুরি কি? তোমার অসুখ করলে যে ডাক্তারবাবু দেখতে আসেন তাঁকে জিগ্‌গেস কোরো, তিনি অমন কতো দেখেছেন। আজকের দিনে ওতে বাহাদুরি নেই। যে ভদ্দরলোক প্রথম দেখতে পান তাঁরই আসল বাহাদুরি।"

"সে লোকটা আবার কে?"

"ওঃ, সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। বলছি শোনো—" সেই কালো কুৎকুতে ভদ্দরলোক উৎসাহভরে চেয়ার থেকে

নেমে পড়লেন। তাই দেখে মিটিংএর মধ্যে মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল।—"কি মশাই! কুঁচো ছেলে ছোকরা নিয়েই দেখছি মেতে উঠ্‌লেন। বক্তৃতার কী হল?"—চারদিক থেকে এই রকম চীৎকার। ভদ্দরলোক আবার চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়িয়ে রীতিমতো চীৎকার স্বরু করলেন: "ছোটদের বোঝানোই আসল। বক্তৃতা ত' মশাই আমি অনেক বছর থেকে দিয়ে যাচ্ছি। বুড়োরা সময় কাটাবার জন্যে শোনেন, কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হয় না। আজ যদি আমি মাত্র কয়েকটি ছোটছেলেকেও শেখাবার জন্যে পাই তা হলে কত আশ্চর্য তার ফল হতে পারে! এদের বয়েস কচি; এদের সামনে সমস্ত জীবনটা বাকি পড়ে রয়েছে; এদের সামনে একটা পুরো পৃথিবী। কত আশ্চর্য, অদ্ভুত সম্ভাবনা, কী বিরাট ভবিষ্যৎ এই ছোটদেরই মধ্যে। আজকের যে কিশোর কাল সে বড়ো হয়ে উঠবে। কত বড় হবে কে বলতে পারে? সে আনতে পারে পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী; সে বদলে দিতে পারে সমস্ত দুনিয়ার চেহারা।"

এ-ধরণের কথাবার্তা শুনে বুড়োর দল বেজায় চটে উঠল। কটা কচি, ফোচ্‌কে ছেলেই আজ বড় হল? বুড়োরা কেউ নয়? "লোকটার মাথায় ছিট্ আছে।" "কী রকম গুলিখোরের মতো চেহারা দেখুন না"—এই সব বলতে বলতে বড়োরা সদলবলে সভা থেকে বেরিয়ে গেলো।

এতোক্ষণে কিন্তু ঘোঁতোন, পান্না, জগু সকলেই মনে মনে ভারি খুসি হয়ে উঠেছে। হোক্‌গে ও রকম বিধ্-ঘুটে চেহারা! চেহারা নিয়ে ত' আর মানুষ ধুয়ে খাবে না। কিন্তু কী রকম বল্ল! কী রকম খাতির করে ছোটদের! পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনা!—ওরা ঠিকমতো বুঝতে অবশ্য পারেনি ব্যাপারটা কি। কিন্তু, একটা ভয়ানক আশ্চর্য, ভয়ানক রোমাঞ্চকর কিছু হবে নিশ্চই। ভাবতেই কি রকম ভালো লাগে। আর এমন একটা অতি-অপূর্ব কীর্তি এ শুধু পারে ছোটরাই! ভাবতেই ওদের গায়ের মধ্যে আনন্দে কাঁটা দিয়ে ওঠে। চলে যাক বুড়োরা! চটে যাক বুড়োরা! কীই বা তাতে আসে যায়। ওরা শুনবে, ওরা খুব মন দিয়ে শুনবে! কারণ ওদেরি ওপোর এক অতি-রোমাঞ্চকর, অতি উত্তেজনা-মূলক কাজ নির্ভর করছে।

সভা হালকা হয়ে এলো। ওরা এগিয়ে গেলো সেই ভদ্রলোকের কাছে। বল্ল "বলুন।"

"কী যেন বল্‌ছিলুম?" ভদ্রলোক একটু ভেবে নেন। "তোমাদের অনেক কথা বলব। অনেক সব আশ্চর্য কথা। "জীবাণু আবিষ্কারের কথা বলছিলুম। সে অনেকদিন আগেকার কথা। প্রায় তিনশো বছর হতে চলল। ১৬৬৫ সাল। এক ভদ্দরলোক ছিলেন, তাঁর নাম রবার্ট হুকি। কী অদ্ভুত নাম। আর তেমনি অদ্ভুত তাঁর সব খেয়াল! কী যে তাঁর মাথায় ঢুকেছিলো কে জানে। নিজের মনেই একটা অদ্ভুত যন্ত্র তিনি তৈরী করেন। এই যন্ত্রটাই আজকালকার অনুবিক্ষণের পূর্বপুরুষ। পূর্বপুরুষ বলছি কেন না আজকালকার অনুবিক্ষণএর চেহারা অনেক বদলে গিয়েছে; আজকালকার অনুবিক্ষণ দেখতেও হয়েছে অনেক ফিট্‌ফাট্, আর কাজেরও হয়েছে অনেক বেশি। তা হোক। কিন্তু, হুকির অনুবিক্ষণটা যত অসম্পূর্ণই হোক না কেন, তার মধ্যে দিয়েই মানুষ ক্ষুদে রাজত্বের প্রথম সন্ধান পায়! সেই যন্তর চোখে দিয়ে হুকি দেখলেন একটা শক্ত ছিপির টুকরোর মধ্যেও অসংখ্য ফুটো রয়েছে। দেখলেন অসংখ্য ক্ষুদে পোকা। এ-সব পোকাগুলোর তিনি ছবি আঁকতে স্বরু করলেন। ভারি মজার মজার সে-সব ছবি। কিন্তু যাই হোক্, তাঁর অনুবিক্ষণটা তত ভালো ছিলো না। রীতিমতো ভালো অনুবিক্ষণ যিনি প্রথম তৈরি করেন তাঁর নাম লিউএন্‌হক্। বাড়ি তাঁর ডেনমার্কে। কী করে যে অতদিন আগে তিনি অমন খাসা একটা অনুবিক্ষণ তৈরি করেছিলেন তা ভাবতেও আজ অবাক লাগে! সেই যন্ত্র চোখে দিয়ে তিনি দেখলেন এক ফোঁটা সাদা জলের মধ্যেও অসংখ্য জীবন্ত জিনিস ঘুরে বেড়াচ্ছে। এগুলোর নাম তিনি দেন "ক্ষুদে জীব"। তিনি দেখলেন এক টুকরো মাংস বা একটা মরা জানোয়ার জলের মধ্যে ফেলে রাখলে পর তার মধ্যে অসংখ্য এক রকম প্রাণী দেখা দেয়। এই ভাবে চলল দিনের পর দিন ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণী আবিষ্কার। কত সব সব মহা মহা পণ্ডিত দিনের পর দিন নাওয়া-খাওয়া

ছেড়ে এই ক্ষুদে প্রাণী নিয়ে হিসেব-নিকেশ করতে লেগেছেন তা ভাবতেই পার না। দেখা যাচ্ছে জীবাণু শুধু এক রকমের নয়; দিনের পর দিন মানুষ সন্ধান হচ্ছে নতুন নতুন সব জীবাণুর। এত সব বই লেখা হয়েছে এ-সব জীবাণু নিয়ে যে ঘরের পর ঘর বোঝাই করে ফেল্লেও শেষ করা কঠিন।"

[ক্রমশ]

চলন্তিকা

আমেরিকানরা ডি. ডি. টি নামে এক অশ্চর্য ওষুধ আবিষ্কার করেছে। এই ওষুধ কোনো দেয়ালে ছিটিয়ে দেবার তিন মাস পর পর্যন্ত সেই দেয়াল স্পর্শ করলেই মশা মাছির মৃত্যু হবে, বিছানায় ছিটিয়ে দিলে দশ মাস পর্যন্ত ছারপোকা কাছে আসতে পারবে না, জামাকাপড়ে ছিটিয়ে দিলে আটবার ধোবার পারও সেখানে আসতে পারবে না উকুন কিংবা অন্য কোনো জাতের পোকা এবং ডোবায় কয়েক ফোঁটা ফেলে দিলেই মশার বংশ ধ্বংস হবে। যুদ্ধের পর সবাইকার জন্যেই ডি. ডি টি পাওয়া যাবে। হয়তো যুদ্ধে যত লোকের মৃত্যু হয়েছে এই ওষুধ একদিন তার চেয়েও বেশি জীবন বাঁচাতে পারবে।

*　　*　　*　　*

আরো একটি নতুন ওষুধ ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হয়েছে। তার নাম ভিভিসিলিন। প্রন্টসিল, এম্-বি ও পেনিসিলিন এই তিনটি যুগান্তকারী ওষুধের কথা তোমরা হয়তো অনেকেই শুনেছ। ভিভিসিলিন অনেকটা সেই জাতেরই ওষুধ। ভিভিসিলিন সম্বন্ধে নানা রকম গবেষণা ও পরীক্ষা চলেছে। এ-সম্বন্ধে নতুন খবর বেরুলেই তোমাদের জানাবো।

*　　*　　*　　*

কলকাতা থেকে দিল্লি যদি মিনিট কুড়িতে, কিংবা কলকাতা থেকে বোম্বাই যদি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যাওয়া যায় তা হলে মজা মন্দ হয় না! কী বলো? ব্যাপারটা নেহাৎ অসম্ভব বলে আজ আর মনে হচ্ছে না। কারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্যে নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত ডাঃ আরভিং ল্যাঙ্গমুইর একটি অভূতপূর্ব বৈদ্যুতিক ট্রেনের পরিকল্পনা করেছেন। এই এক্সপ্রেস ট্রেনের গাড়িগুলি হবে এয়ার-টাইট্ এবং বাতাসহীন বিরাট চোঙের মধ্যে চুম্বকের সাহায্যে থাকবে ভেসে। এ-ধরণের রেলগাড়ি তৈরি করা সম্ভব হলে তার গতি হবে ঘণ্টায় দু হাজার থেকে তিন হাজার মাইল পর্যন্ত। এখন বাসে-ট্রামে শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জ আসতেই লাগে ঘণ্টাখানেক। তাই এই বৈদ্যুতিক ট্রেনের কথা ভাবতেই মাথা কি-রকম-যেন ঝিমঝিম করছে!

এ-বছরের লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

গত ২২শে জুলাই এ-বছরের শ্রেষ্ঠ ম্যাচ হয়ে গেলো মোহনবাগান আর মহামেডানের সঙ্গে লিগের শেষ খেলা। সমস্ত কলকাতা ভেঙে পড়েছিলো ফুটবল মাঠের ভিতরে-বাইরে। সবাইকার মুখেচোখেই ফুটে উঠেছিলো 'কি-হয় কি-হয় একটা ভাব। সত্যি কথা বলতে কি ফুটবল লিগের ইতিহাসে এ-রকম উত্তেজনাপূর্ণ খেলা আর কখনো হয়নি। লিগ পেতে হলে একদলকে হবে জিততে, অপরপক্ষ শুধু ড্র করতে পারলেও লিগ পেয়ে যাবে। বিকেল চারটে থেকেই পাড়াটা যেন চুপচাপ্ হয়ে গেলো। লোক নেই : খাঁ-খাঁ করছে। যারা অধ্যবসায়ী তারা সকাল দশটা থেকে মাঠে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়েছিলো, যারা সৌভাগ্যবান তারা টিকিট কিনে ঢুকতে পেরেছিলো, যারা বলবান তারা কেল্লার দিকের তারের বেড়ার কাছে বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে ছিলো দাঁড়িয়ে, যারা আবিষ্কারক প্রকৃতির তারা উঠেছিলো ইডেন গার্ডেনের বড় বড় গাছে, যারা নার্ভাস তারা খেলার মাঠের কাছাকাছি বসেছিলো নির্বাক হয়ে—আর যারা কিছুই পারেনি তারা ঘরে-ঘরে রেডিও খুলে দুরুদুরু বুকে শুনেছিলো রিলে।

সেদিন কিন্তু ফুলবল খেলা খুব উঁচু স্ট্যাণ্ডার্ডের হয়নি। বরাবরই লক্ষ্য করেছি এ ধরণের ম্যাচ, যাতে হারজিতের উপর একটা দারুণ কিছু নির্ভর করছে, খুব ভালো হয় না। খেলোয়াড়দের মনেও উত্তেজনার ছোঁয়াচ লাগে, একটা পাথরের ভার যেন থাকে চেপে—ফলে আসল খেলাটাই মাটি হয়। বিদেশে এ ধরণের প্রত্যেক বড় বড় খেলার আগের দিন খেলোয়াড়দের সহরের বাইরে, সমুদ্রের তীরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে। হালকা হাসি-গান-বাজনা ও ফুর্তির মধ্যে তাদের রাখা হয়, দেওয়া হয় শারীরিক ও মানসিক সম্পূর্ণ বিশ্রাম, যাতে আগামী ম্যাচের উত্তেজনা তাদের মনের মধ্যে ভারের মতো চেপে থাকতে না পারে। তারপর খেলার ঠিক আগেই গাড়ি করে সোজা তাদের আনা হয় ফুটবল মাঠে। ফলে খেলাটা নষ্ট হয় না। আমাদের দেশে সে-রকম ব্যবস্থার কোনো বালাই নেই—বলাই বাহুল্য। শোনা যায় অনেক খেলোয়াড় সমস্ত দিন আপিস করে খেলা আরম্ভ হবার মাত্র কয়েক মিনিট আগে মাঠে আসতে পারে।—সে যাই হোক। সে-দিন কিন্তু অধিকাংশ লোকেই গিয়েছিলো গোল দেখতে, খেলা দেখতে নয়। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে তারা হতাশ হয়নি।

গোড়ার দিকে কিছুক্ষণ মহামেডান স্পোর্টিং চেপেছিলো। কিন্তু ক্রমশ মোহনবাগানের স্বপক্ষেই খেলার হাওয়া বয়। আসলে নির্মল ছাড়া সেদিন কোনো দলের ফরোয়ার্ডই বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি এবং দু'দলের রক্ষণভাগের খেলাই হয়েছিলো প্রশংসনীয়, বিশেষ করে মোহনবাগানের ব্যাক মান্নার: সেই ছিপছিপে, নিতান্ত সাধারণ দেখতে তরুণ খেলোয়াড়ের। ব্যাক বলতে যে-রকম ভারিক্কি চেহারা মনে আসে মান্নার চেহারা ঠিক তার উল্টো ধরণের। সে একাই করেছিলো অবাক কাণ্ড। ওই উত্তেজনার মধ্যে অমন শান্ত ভাবে হিসেব করে খেলা বহুদিন দেখা যায়নি। আর তার সট্, সেটাও দেখবার মতো। তার পায়ে বল পড়লে মুহূর্তের মধ্যেই খেলার চেহারা যাচ্ছিলো বদলে।

প্রথমার্দ্ধে কোনো গোলই হোলো না। কিন্তু হাফ টাইমের পর থেকেই খেলার গল্প একেবারে গেলো ঘুরে। মোহনবাগান বারবার আক্রমণ চালাতে লাগলো। একবার তো ভৌমিকের একটি সট গোল হব-হব করেও উড়ে গেলো বারের ঠিক উপর দিয়ে। কিন্তু মিনিটের পর মিনিট যেন আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরে যেতে লাগলো। দর্শকরা কেউ উল্লসিত, কেউ বা উৎকণ্ঠিত, ড্র হবার সম্ভাবনায়। মাত্র আর মিনিট পাঁচেক বাকী। এমন সময় ঠিক পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে মাসুমের হ্যাণ্ডবল হোলো এবং মোহনবাগান পেলো একটি ফ্রি-কিক। মহামেডান স্পোর্টিং নিজেদের গোলের ঠিক সামনেই তুললো মানুষের পাঁচিল। মান্নার পায়ে বল। প্রথমবার সট্ মারবার আগেই মহামেডান স্পোর্টিং-এর খেলোয়াড়রা এগিয়ে এসেছিলো বলে রেফারি ক্যাপ্টেন হলোয়ে দ্বিতীয়বার সট করতে আদেশ দিলেন। এবারে মান্না সট করলো নীচু করে, কোনো জোর তাতে নেই। খেলোয়াড়দের পাঁচিল কাটিয়া খুব ধীরে ধীরে বল ঢুকলো মহামেডান স্পোর্টিং-এর গোলে, ছুঁলো নেট। ইসমাইল, এতোক্ষণ যে লম্ফঝম্ফ করে গেলারি শো করছিলো—সে শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কী হোলো, কী হোলো? সমস্ত মাঠের স্পন্দন স্তব্ধ, উত্তেজিত জনসমুদ্র হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেছে! তারপরেই বেজে উঠলো রেফারির তীব্র বাঁশি। গোল হবার সংকেত। আর তারপর? সে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। হঠাৎ যেন জোয়ার এলো, জোয়ার নয় টর্ণেডো, চীৎকার আর চাঞ্চল্যের। লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হোলো: জয় মান্নার, জয় মোহনবাগানের, জয় তরুণ টিমের।

রংমশাল বৈঠক

অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিযোগিতা

সুকুমার রায়ের 'সৎপাত্র' ('শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে' ইত্যাদি) কবিতাটি তোমরা সবাই নিশ্চয়ই পড়েছো। সেই কবিতাটি পড়ে কার্টুন আঁকতে হবে—এই হচ্ছে অগ্রহায়ণের প্রতিযোগিতা। দুটি পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রথমটি চোদ্দ বছর পর্যন্ত গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্যে। দ্বিতীয়টি দেওয়া হবে যে-সব গ্রাহক-গ্রাহিকাদের বয়েস চোদ্দর উপরে।

যারা রংমশালের গ্রাহক কিংবা গ্রাহিকা শুধু তারাই পারবে এই প্রতিয়োগিতায় যোগ দিতে। কার্টুনগুলি ২০শে আশ্বিনের মধ্যে রংমশাল আপিসে পৌছনো দরকার। চিঠি দিও না। অমনোনীত কার্টুন ফেরৎ দেওয়া হবে না। কার্টুনগুলির পিছনে স্পষ্টাক্ষরে গ্রাহক নং, নাম এবং ঠিকানা যেন লেখা থাকে এবং কার্টুনগুলি যেন পরিষ্কার কাগজের উপর কালিতে আঁকা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রত্যেককে পাঁচটাকা দামের বই দেওয়া হবে এবং কার্টুনগুলি শিল্পীদের ছবিসহ অগ্রহায়ণের রংমশালে ছাপা হবে।

সম্পাদকের দপ্তর

অগ্রহায়ণের প্রতিযোগিতাটি একটু নতুন রকমের করা হোলো। কাগজ কলম নিয়ে এখুনি তোমরা বসে যাও। কারণ ভালো কার্টুন আঁকা মোটেই সহজ নয়। ঠিক কোন্ ভঙ্গীটি দর্শকের মনকে সবচেয়ে খুসি করবে সেটি আবিষ্কার করতে হলে অনেক সময় খরচ এবং মস্তিষ্কচালনা করা দরকার।

কিন্তু তার আগে দরকার সুকুমার রায়ের "সৎপাত্র" কবিতাটি আবার নতুন করে ও ভালো করে পড়া। আমরা আশাকরি রংমশালের সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকাই সুকুমার রায়ের লেখার সঙ্গে পরিচিত। না-হওয়াটা অত্যন্তই দুঃখের ও লজ্জার ব্যাপার সন্দেহ নেই। অবশ্য সকলেই তোমরা বলতে পারো বাজারে আজকাল সুকুমার রায়ের বই পাওয়া যায় না। এ অসুবিধের কথা আমরাও মানি। কিন্তু শীঘ্রই এই অভাব দূর হবে। "সিগনেট প্রেস" সুকুমার রায়ের সমস্ত রচনাই অত্যন্ত চমৎকার করে ছাপাচ্ছেন। "আবোল-তাবোল" কিছুদিনের মধ্যেই আবার নতুন চেহারা নিয়ে প্রকাশিত হবে। যাদের কাছে "আবোল-তাবোল" নেই এবং সৎপাত্র কবিতাটিও যারা ভুলে গেছো তারা যদি ঠিকানা-লেখা ডাকটিকিটসহ খাম পাঠাও তা' হলে উক্ত কবিতাটির একটি করে ছাপা কপি তোমাদের পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিগনেট প্রেস কবিতাটি ছেপে দিয়ে তোমাদের ও আমাদের ধন্যবাদ অর্জন করেছেন।

নতুন ধাঁধা

তারা তিন বন্ধু। সঙ্গে নিজেদের ছোটোবোনদের নিয়ে এক রবিবারে গিয়েছিলো নিউ মার্কেটে। বন্ধু তিনটির নাম জীবনানন্দ, অরবিন্দ আর জয়ন্ত। বোন তিনটির নাম মীরা, জয়ন্তী আর এষা। কিন্তু কে কার বোন জানা নেই। মার্কেটে এসে জীবনানন্দের বোন যত চকোলেট কিনেছিলো অরবিন্দ কিনেছিলো তার দ্বিগুণ লজেন্স এবং জীবনানন্দের বোন যত চকোলেট কিনেছিলো জয়ন্তীর ভাই লজেন্স কিনেছিলো তার অর্দ্ধেক। জয়ন্তী কিন্তু চকোলেট ভালোবাসে না। (খুবি আশ্চর্য, কারণ সব মেয়েরাই চকোলেট বলতে পাগল!) তাই সে চকোলেট কেনেনি। সে কেক ভালোবাসে। এষা যতগুলো কেক কিনেছিলো তার ডবল কেক কিনেছিলো জয়ন্তী। এদিকে আবার অরবিন্দ যতগুলো লজেন্স কিনেছিলো তার ডবল কেক কিনেছিলো এষা। কিন্তু অরবিন্দের বোন যতগুলো কেক কিনেছিলো জীবনানন্দের বোন কিনেছিলো তার দ্বিগুণ চকোলেট। এখন হিসেব করে বলতে পারো কি কে কার বোন?

শ্রাবণ মাসের ধাঁধাঁর উত্তর

১। পদ্মফুলটি ন' দিনের দিন সমস্ত পুকুর ছেয়ে ফেলবে।

২। ঘোড়ার লেজ তো সর্বদাই মাটির দিকে থাকে। পশ্চিমমুখো হয়ে ঘুরে দাঁড়াবার পরেও তাই থাকবে!

৩। আধ ডজন ডজন = ৬ × ১২ = ৭২

ছ' ডজন ডজন = ৬ × ১২ × ১২ = ৮৬৪

অতএব পাওয়া গেলে ছ' ডজন ডজন টাকা নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে!

বার্ষিক চাঁদা ৩৲, যন্মাসিক ১৸৹, প্রতি সংখ্যা ।৴৹। ১৩৫১'র আষাঢ় কিংবা তারপরের যে-কোনো মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায়। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি সমস্তই রংমশালের নতুন ঠিকানায় পাঠানো দরকার: c/o সংকেত-ভবন, ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা। গ্রাহক নং ও রিপ্লাই-কার্ড না পেলে চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় বলে দুঃখিত।

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ।

ডিরেক্টার-বর্গ।

মি. জে. সি. মুখার্জ্জি	বার-অ্যাট্-ল—ভূতপূর্ব্ব চীফ প্রধান একজিকিউটিভ অফিসার কলিকাতা কর্পোরেশন। ডিরেক্টার—আসাম-বেঙ্গল সিমেন্ট কোং।
খান বাহাদুর এম. এ. মোমিন সি. আই. ই.	ডিরেক্টার—নিউ এসিয়াটিক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ, আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ।
মিঃ জি. ভি. সোয়াইকা	প্রোঃ—সোয়াইকা অয়েল মিলস্, ম্যানিজিং ডাইরেক্টার—সোয়াইকা কেমিক্যাল এণ্ড মিনারেল কোং লিঃ। সোয়াইকা ফার্টিলাইসর লিঃ, সোয়াইকা ষ্টীও অয়েল এণ্ড বার্ণিশিং কোং।
মিঃ এন্. সি. চন্দ্র	ডিরেক্টার—ন্যাশনাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ, বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ, মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ।
মিঃ বি. সি. ঘোষ	কণ্ট্রোলার—হিন্দুস্থান কোঃ অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ।
মিঃ এস দত্ত—(ম্যানেজিং ডাইরেক্টর)	ডিরেক্টার—এইচ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ, রামচন্দ্রভপুর টি কোং লিঃ, ব্রিটিশ ডিষ্ট্রিবিউটারস্ লিঃ।

আদায়ী মূলধন	৯,২৫,০০০ টাকার উর্দ্ধে
গচ্ছিত আমানত	১,১০,০০০ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন	১,৫০,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে

জেনারেল ম্যানেজার—**জে. এন্. সেন,** বি. এ. এফ. আর. এস. (লণ্ডন)

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.

রংমশাল

[নবম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : আশ্বিন, ১৩৫১]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

বাজার গরম

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ঘাট হয়েছে হাটে এসে
ছাঁট হয়েছে ফর্দ,
পোড়াদা-তে বসে ভাবি
মাকড়দা না খড়দ' !
আড়াই টাকা পোনার ছানা,
ট্যাঁরস, সেও চোদ্দ আনা,
ছাগল-ভেড়া বলি গেছেন
আছেন বলীবর্দ।
মাছ নিয়েছে হুলো বেরাল
মিনি নেচে কণ্ট,
ভেবেছিলাম বাঁচব খেয়ে
কচু-ঘেঁচুর ঘণ্ট।
কচুও দেখি মিলিটারি,
কুমড়োরও আজ পায়া ভারী,
পটিয়াতে স্বপ্ন দেখি
কাটোয়ারি ভণ্ট।

ভুতপত্রীর যাত্রা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ অবুর চলন বলন গীত ॥

আক্কু বাক্কু থেক্কু থেক্কু চালতা গাছ তুমি খাও ঝড় ঝাপটা
আমি চিবাই চালতা পাৎ
পাণ্টা আর চালতা তলায় আসতেন না অবুনাথ
চালতা বুড়ি আলতা বুড়ি প্রণিপাৎ।

॥ মোর পন্থ মারাঠির প্রবেশ ॥

অবু। কেও ? তুমি আবার কে পাত হাত ?'—'মুখে চিত্রি বিচিত্রি লেখা মাথাতে ময়ূরের পাখা ?' বাঁহাতে কেয়াপাতার করাতে···?

মোর। মোর পন্থ মারাঠি—দাও মুণ্ডু কাটি !

অবু। আমি তো শিশুবোধের বৃষকেতু নয় যে বল্লেই দেবে মুণ্ড কাটি !

মোর। তবে দাও চৌখ্।

অবু। আরে মশয় চৌখই দেবোতো মুণ্ডুই বা অপরাধ করলে কি ?

মোর। দাও মুণ্ডু কাটি !

অবু। আবার বলে মুণ্ডু কাটি—এর কথার মাথাতো কিছু বুঝচিনে ! কার মুণ্ড কাটি দিতে হবে কও বাপু তাই দি !

মোর। গৌড়ের

অবু। গৌড়ের আমার সম্পর্ক কি ?

মোর। তুমি তো গৌড়ের লোক।

অবু। আমি গৌড়েরও নয় উড়েরও নয়; আমি যে-সে লোক নয়—হাঁ ! আবার যে করাত বেরোয়—হে বাসুদেব,—আমি বৃষকেতু নয়, দেখ বাপু কৃশ শরীর, হাতে লাঠি, এই লণ্ঠনটি আর কানে গোজা খড়কি কাটিটি ! মুণ্ডু

কাটাকাটিতে কাজ কি এই খড়কি কাটিটি আছে নিয়ে সরে যাও ; নয়তো দেখচো তো হাতের লাঠি—হাঁ ! যাক্ ভেগেছে মুণ্ডু কাটি—উদ্ধব যা বলেছিল—গৌরে ওঝার মুণ্ডু চাইতে এসেছিল ! যাক্ না তার কাছে—সে হচ্ছে আর কেউ না—গোমশা মুখো গৌরে ওঝা, ঘোমটা খোলা তার বৌ—এ হাটের ভূত ও হাটে বেচে, আগাক্ দিকি তার কাছে কেউ ! উদ্ধব যা বলেছিল—কিছু কিছু লাগছে উপদ্রবের ঢেউ ! যাক এখনকার মত চুকলো ঝন্‌ঝাট্—সরে পড়ি সেরে চালতাতলার হাট।

॥ ঝিঁঝির বাদ্য গীত—অবুর উত্তর ॥

চল্লে বাঁচি চল্লে বাঁচি
—আরে বাবু চলতেই তো আছি।
চল্লে বাঁচি চল্লে বাঁচি
—কেন কাটো আর কানে খামচি,
চল্লে পরে আমিও বাঁচি
চালতা খাও চলতে চলতে।
—সে কথা আর হবে না বলতে
চলতে চলতে খেতে আছি
পাল্কি পেলে এখন বাঁচি।

॥ পাল্কির প্রবেশ অবু ও বেহারাদের গীত ॥

জুড়ি ও বেহারা। হেই বাবুজী চৈলে চল
চালতাতলায় ঝামেলা বড়
গাছের গোড়ায় বেঙের হাঁচি
পাতায় বসে উড়লো মাছি
মশক বলে চল্লে বাঁচি।
দোহার ও অবু। চোলবো কেন ? চোলবো কেন ?
পাল্কি আন ঘরটি যেন,
চলতে কি আর পারি বাপু
কানের জ্বালায় শর্ম্মা কাবু।
এত তাড়া কিসের ? পিছলে পড়ে পা ভেঙেছি
চলতে পারলে আমিও বাঁচি।
পাল্কি নিয়ে সরলো যে—রও হাত মুখ ধুয়ে আসি।
জুড়ি ও বেহারা। হেই বাবুজী তাকায়ে দেহ
ভুঁইফোঁড় ওটা কেও
তাকায়ে আছে কট্‌মট্ ?

অবু। ওরে পাল্কিতে ধরে ওঠা চট্‌পট্—কই নাই কেউ, কোথায় বা কি—যেথানকার সেথানেই আছি—খালি শব্দই পাচ্ছি, হুম্পাহুমা চলেছে পাল্কি।

॥ অবুর গীত ॥

ও অবুনাথ আলোটা জ্বালো
মাঠ ঘাটের গতিক ঠেকছেনা ভালো।
এক ফোঁটা তেল নেইকো ভাঁড়ে, আলো জ্বলে কি প্রকারে ?
অন্ধের নড়ি ভুতপতরী আট ঘাট দেখিয়ে চল
চটাল ধর নামাল ধর
নামি চল উঠি চল
খৈ-মোয়াটা মামি পাকালো ভালো
পাল্কিটা দিলেই করতো ভালো।
মন, ভালো সঙ্গ ছেড়ে এলে এখন যাবে কোথায়
সম্মুখে অদৃষ্ট যোগ, আক্ষেপ কর বৃথায়
যে দিকে তুচক্ষু যায় চলে চল, চলে চল,
জগবন্ধুর নাম কর, জগবন্ধুর নাম কর।

॥ ঝিঁঝিদের ঝিম্ বাদ্য ॥

মন্‌জিল মন্‌জিল চলে চল ভাই
ভেবোনা আগেতে মন্‌জিল নাই,
যত মন্‌জিল যাবে তত মন্‌জিল পাবে
তুঃখ বিগত হবে কবে যে তার স্থির নাই।
মন্‌জিল মন্‌জিল চলে চল ভাই ॥

। ইতি চালতাতলার সাট।

প্র থ ম ম ন্ জি ল্ খ ত ম্

[ক্রমশ]

মশাল (উপন্যাস)—২

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণদাসেরও বন্ধু ছিল। সে বিনে মাইনেয় পড়তে পায়, তাকে বই কিনতে হয় না, তার ওপর তাকে স্কুল থেকে টাকা দেওয়া হয় মাসে মাসে। পরীক্ষা পাশের কেরামতির জন্য যে ছেলেকে স্কুল এভাবে ঘুষ দিয়ে থাকে তার প্রতি সাধারণ ছেলেদের হিংসা

ও ভয় মেশানো একটা আকর্ষণ থাকে। ম্যাজিকওলাদের সম্পর্কে যেমন থাকে অনেকটা তারি মত। পরীক্ষা পাশের মত কঠিন কাজ যে সহজে পারে সে কি কম বাহাদুর !

কৃষ্ণদাস যে চানাচুরওলা দীননাথের ছেলে এটা জেনেও অনেকে জানত না। মনের তলায় পড়ে থাকত কথাটা। সুন্দরাদি চার বন্ধু আর তাদের ধামাধরা সহরের হাকিম মুন্সেফ উকীল মোক্তারের কয়েকটা ছেলে প্রচারের খন্তা দিয়ে ঘুঁটে কথাটা সকলের মনে বড় করে তুলবার চেষ্টা আরম্ভ করল। শ্লোগান হল,—চানাচুর গরম !

চারিদিক থেকে যখন তখন কৃষ্ণদাসের কাণে আসে—চানাচুর গরম ! বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকে—চানাচুর গরম। পথ চলবার সময়ও কাছে বা দূর থেকে তার কাণে ভেসে আসে—চানাচুর গরম।

নাজির বলে, 'ছি ছি !'

অশোক বলে, 'ওরা দল বেঁধেছে।'

কৃষ্ণদাস হেসে বলে, 'দল বাঁধে নি, ভাড়া করেছে। শচীন রোজ আমার সঙ্গে স্কুল আসত যেত, আটদশ দিন চেষ্টা করে তবে ওকে বাগিয়েছে। চা খাওয়ায়, সুন্দরের সাইকেলে চড়তে দেয়, তবু শচীন ভোলে নি। আমাকে এসে সব বলত আর হাসত। তারপর সুন্দর ওকে তু'দিন বাড়ী নিয়ে গেল। বাড়ী গেলে সুন্দরের মা আর বোনেরা আদর করে চা খেতে দেয়। একদিন গেলে রোজ যেতে ইচ্ছে করে।'

'কী করে জানলি ?' হীরেন জিজ্ঞেস করল।

'আমায় একদিন নিয়ে গিয়েছিল, হাফ্ ইয়ার্লির আগে। এগজামিনের সময় আমার কাছে বললে তু'চারটে অ্যানসার জানিয়ে দেব কিবা জানতে।'

'চানাচুর গরম !'-এর অস্ত্রবর্ষণে কৃষ্ণদাসকে মোটেই কাবু করতে পারছে না দেখে সুন্দরদের মাথাই গরম হয়ে উঠতে লাগল। মনের মধ্যে যাই হোক, কৃষ্ণদাস মুখের হাসি বজায় রাখে। মাঝে-মাঝে আক্রমণকারিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে সস্মিত-মুখে মাথা নেড়ে সায় পর্যন্ত দেয় ! তার ভাব দেখে মনে হয় সে যেন তাকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য 'হাইল হিট্‌লার'কে বাংলা ছাঁদে ঢেলে সকলকে শিখিয়ে দিয়েছে—ওদের কাছে যথারীতি সম্মান পেয়ে সে ভারি খুসি।

সেদিন সত্যবতী ইনষ্টিটিউসনের সঙ্গে এ স্কুলের ম্যাচ। দীননাথ মহোৎসাহে মাঠের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে চানাচুর বিক্রী করছে। কৃষ্ণদাস খেলাধূলায় পটু নয়—লেখাপড়ায় যে ভালো হবে সে কস্মিনকালে খেলায় ভালো হতে পারে না, স্কুলের লেখাপড়াই তেমন নয়। খেলা দেখবার জন্য সে এসে সবে দাঁড়িয়েছে সুন্দরেরা দল বেঁধে তাকে প্রায় ঘিরে দাঁড়িয়ে সমস্বরে চীৎকার করল : 'চানাচুর গরম !'

তখন যা ঘটল, তারা তা কল্পনাও করে নি !

একবার চেঁচিয়ে আরেকবার চেঁচাবার জন্য তারা দম নিচ্ছে, সেই অবসরে কৃষ্ণদাস নিজেই আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল : 'চানাচুর গরম !'

সুন্দরেরা একটু থ' বনে গেল বৈ কি ! কিন্তু লড়ায়ের যে কৌশল অনেক পরামর্শ করে স্থির করে এসেছিল, হঠাৎ সেটা তারা বদলাতে পারল না। আরেকবার চেঁচাল।

চেঁচিয়ে যখন আবার দম নিচ্ছে তখন কৃষ্ণদাস এবং আরও অনেকগুলি গলা একসঙ্গে তাদের অনুকরণ করল। অনুকরণ—কিন্তু আওয়াজে তিনগুণ বেশী। সুন্দরেরা দলে ছিল জন পনের—কৃষ্ণদাসের দল হবে প্রায় পঞ্চাশ জনের।

তারপর আর মাঠে চানাচুর গরমের জয়ধ্বনি শোনা গেল না—অবশ্য দীননাথের ছড়ায় জয়গান ছাড়া। দীননাথের ছড়াও অল্পক্ষণ শোনা গেল। সুন্দরেরা সরতে সরতে মাঠের অপর দিকে চলে গিয়েছিল। সেখানে দীননাথকে অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে ছড়া বলতে শুনে ওদের গায়ে কেন জ্বালা ধরে গেল বলা কঠিন নয়।

তু'টি স্কুলের ছেলে আর সহরের লোক মিলে মাঠে বেশ ভিড় জমিয়েছিল। তখন খেলা সুরু হয়ে গেছে এবং থেকে থেকে এক এক স্কুলের ছেলেরা হৈ হৈ করে চেঁচিয়ে উঠছে। তবু কৃষ্ণদাস টের পেয়েছিল মাঠের অপরদিকে একটা কিসের গোলমাল বেঁধে থেমে গেল। ব্যাপারটা তখন সে কিছুই বুঝতে পারে নি।

খেলার শেষে ফিরবার সময় সে দেখতে পেল মাঠের শেষে রাস্তার ধারে বাঁধানো বটগাছটার নীচে হারাধনের অস্থায়ী পান বিড়ি সিগারেট ও লেমোনেড শরবতের দোকানের পাশে দীননাথ বসে আছে। তার গায়ের ছোট হাফ সার্টটি ছেঁড়া, চানাচুরের থলি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, তাতে রক্ত মাখা। বরফ ধোয়া বালতির জলে ন্যাকড়াটা ভিজিয়ে সে বাঁ চোখে লাগাচ্ছে।

'চোখ কাণা করে দিয়েছে কেষ্ট 'ইস্কুলের কটা ছেলে। চানাচুরগুলো সব ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছে, আঁচড়ে কামড়ে একদম

শষ করেছে আমায়। একটা ছেলে চোখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে। কটা ছেলেকে আমি চিনি কেষ্ট।'

'খেলা সুরু হবার সময় তো? আমিও চিনি।'

'থানায় যাই চ'। নয় তো হেডমাষ্টারের কাছে।'

'না। বাড়ী চল।'

'না, আমি নালিশ করব। ছোঁড়াদের জেল খাটাব, বেত খাওয়াব—'

রাগে গর্জাতে গর্জাতে দীননাথ জানায় আর মনের দুঃখে ও চোখের ব্যথায় কেঁদে ফেলে। চোখ থেকে এখনও অল্প অল্প রক্ত চুঁইয়ে আসছে—ফুলে বাইরে ঠেলে উঠেছে চোখটা। বরফ জল দেওয়া হয় তো ভাল হয়েছে কিন্তু ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ দেওয়াও দরকার। বাপের চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কৃষ্ণদাসের চোখে যেন শান্ দেওয়া ছুরির আলো ঝলসাতে থাকে। তবু সে ধৈর্য ধরে বাপকে বোঝায়। বোঝায় যে নালিশ করে কিছু হবে না। থানাই যার, সে কি তার ছেলের নামে নালিশ শোনে? স্কুল যাদের, তাদের ছেলেদের নামে দালিশ কি হেডমাষ্টার কাণে তোলে? অনেক বুঝিয়ে বাপকে সে বাজারের কাছে ঘোষাল ডাক্তারের ডিসপেন্সারীতে নিয়ে গেল। সঙ্গে গেল জগৎ, মুরারি আর চাঁদা নামে তিনটি ছেলে। ঘোষাল ডাক্তার কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য অনেক রোগের স্পেশালিষ্ট—'চক্ষু পরীক্ষাপূর্বক ছানি কাটা হইতে চশমা প্রদান করা হয়' পর্যন্ত সহরে তার তুলনা নেই।

তিনি চক্ষু পরীক্ষা করেন সকালে।

'কাল সকালে এসো। রাতে আমি চোখ দেখি না।'

কথাটা শোনালো এইরকম, 'রাতে আমি চোখে দেখি না।'

অনেক অনুনয় বিনয়ের পর দীননাথের চোখের বিপদ খানিকটা অনুভব করে তিনি যেভাবে চশমার মোটা কাঁচের ভেতর দিয়ে চোখ মিটমিট করে তাকাতে লাগলেন আর যেরকম এলোমেলো খাপছাড়া ভাবে ওষুধ লাগিয়ে দীননাথের চোখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন তাতে মনে হল সত্যিই তিনি সন্ধ্যার সময় চোখে দেখেন না।

বাড়ি যেতে যেতে কৃষ্ণদাস বলল, 'চোখটা ভাল হলে তুমি শুধু আমায় একবার দেখিয়ে দিও বাবা—শুধু দেখিয়ে দিও কোন ছেলেটা তোমার চোখে খোঁচা দিয়েছে।'

দীননাথ মনে মনে বলল, 'সেরেছে। তবেই তোমায় আমি চিনিয়ে দিয়েছি ছোঁড়াটাকে!'

[ক্রমশ]

পদীপিসির বর্মি বাক্স (উপন্যাস)—২

লীলা মজুমদার

পাঁচুমামা ঢোক গিলে চোখ গোল ক'রে আরও কত কী বল্লো। "পদীপিসির ভীষণ বুদ্ধি, ধাঁ করে টের পেয়ে গেলেন খুড়োই ডাকাতদলের সর্দার। পদীপিসি খুড়োর বাড়ী দুপুর রাতে পৌঁছেই খুড়োর চোখের উপর চোখ রেখে, দাঁতে দাঁত ঘষে বল্লেন—'শালবনে আমাকে ডাকাতে ধরেছিলো, তাড়াতাড়ি গোরুর গাড়ী থেকে নাম্‌তে গিয়ে আমার তসরের চাদর খানিকটা ছিঁড়ে গেছে, পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে হোঁচট লেগেছে, আর তা ছাড়া মনেও খুব একটা ধাক্কা লেগেছে। এর কী প্রতিশোধ নেব এখনও স্থির করি নি। এখন রান্না করব, খাব, পান মুখে নিয়ে শুয়ে শুয়ে ভেবে দেখ্‌ব।'

"খুড়োর মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো, হাত থেকে রূপো বাঁধানো গড়গড়ার নলটা মাটিতে পড়ে গেলো; খুড়োমশাই বিদ্যাসাগরী চটি পায়ে তারই উপর একটু কাৎ হ'য়ে দাঁড়িয়ে গোঁফ নাড়তে লাগ্‌লেন, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না! পদীপিসি তাই দেখে প্রসন্ন হ'য়ে বল্লেন—'আমার মনের মধ্যে যে সব সন্দেহরা ঝাঁক বেঁধে অন্ধকার বানিয়ে রেখেছে, তা'রা যাতে মনের মধ্যেই থেকে যায়, বাইরে প্রকাশ পেয়ে তোমার অনিষ্ট না ঘটায়, তার ব্যবস্থা অবশ্যি তোমার হাতে।' ব'লে চাদরটা চৌকীর উপর রেখে কুঁজো থেকে খাবার জল নিয়ে পা ধুলেন। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে খুড়িকে ঠেলে বের ক'রে দিয়ে মনের সুখে গাওয়া ঘী দিয়ে নিজের মতন চারটি ঘী-ভাত রাঁধতে বসে গেলেন। খুড়োও আস্তে আস্তে সেইখানে উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন—'তোমায় পঞ্চাশ টাকা দেব যদি ডাকাতের কথা কাউকে না ব'ল—।'

"পদীপিসি একমনে রাঁধতে লাগ্‌লেন।

"খুড়ো বল্লেন—'একশ' টাকা দেব।' পদীপিসি একটু হাসলেন। খুড়ো বল্লেন—'পাঁচশ' টাকা দেব।' পদীপিসি একটু কাশলেন। খুড়ো মরীয়া হ'য়ে বল্লেন—'হাজার টাকা দেব, পাঁচ হাজার টাকা দেব, আমার লোহার সিন্দুক খুলে দেব, যা খুশি নিও।' পদীপিসি খুন্তিকড়া নামিয়ে রেখে সোজা সিন্দুকের সাম্নে উপস্থিত হ'লেন। খুড়ো সিন্দুক খুল্‌তেই হীরে-জহরতের আলোয় পদীপিসির চোখ ঝল্‌সে গেলো। খুড়ো ভেবেছিলেন সেই সঙ্গে পদীপিসির মাথাও ঘুরে যাবে, কি নেবে না নেবে কিছু ঠাহর করতে পারবে না। কিন্তু পদীপিসি সে মেয়েই নয়। তিনি অবাক্ হ'য়ে গালে আঙ্গুল দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বল্লেন—'ওমা, এযে আলাদীনের ভাঁড়ার ঘর! ব্যাটা ঠ্যাঙাড়ে বাট্‌পাড়, কি দাঁওটাই মেরেছিস্!' ব'লে দু'হাতে জড়ো করে একটিপি ধনরত্ন মাটিতে নামালেন। আর একটা হাঙ্গরের নক্সা আঁকা লাল বর্মি বাক্সও টেনে নামালেন। বুড়ো হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এসে বল্লেন—'আহা ওটা থাক্, ওটাতে যে আমার সব প্রাইভেট্ পেপার আছে।'

"পদীপিসি থপ্ করে মাটিতে ধেবড়ে বসে বল্লেন—'চোপ্‌রাও শালা। নয় ত' সব প্রাইভেট্ ব্যাপার খবরের কাগজে ছেপে দেবো!' ব'লে কাগজপত্র বের ক'রে ফেলে দিয়ে, ঐ সব ধনরত্ন বর্মি বাক্সে ভ'রে নিয়ে, আবার রান্নাঘরে গিয়ে জলচৌকীতে বসে কড়াটা উনুনে চাপালেন। সারারাত ঘুমোলেন না, বাক্স আগ্‌লে জেগে রইলেন, ভোর না হ'তেই আবার গোরুর গাড়ী চেপে শাল-বনের মধ্যে দিয়ে লাল আলোয়ান গায়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন।"

পাঁচুমামা এবার থাম্‌লো—। আর আমি মাথা বাগিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"তারপর?" এবং সেই মোটাসোটা ভদ্রলোকও নিশ্বাস বন্ধ ক'রে বল্লেন—"তারপর? তারপর?" পাঁচুমামা বিরক্ত হ'য়ে বল্লো—"আপনার কি মশাই?" ভদ্রলোক অপ্রস্তুত-পানা মুখ করে বল্লেন—"না, না—গল্পটা বড় লোমহর্ষণ কি না—"

পাঁচুমামা আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিলো, আমি হঠাৎ ভদ্র-লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে ইংরিজিতে বল্লাম—"চুপ্, চোখ ইজ্ জ্বল্‌জ্বলিং!" পাঁচুমামা আর কিছু না ব'লে আবার বল্‌তে লাগ্‌লো—"এত কষ্ট ক'রে পাওয়া বর্মি বাক্স নিয়ে পদীপিসি সারাদিন গোরুর গাড়ি চেপে বাড়ীমুখো চল্‌তে লাগ্‌লেন। দুপুরে সজ্‌নে গাছ তলায় গাড়ি থামিয়ে খিচুড়ী আর সজ্‌নে ফুল ভাজা খাওয়া হ'ল, তারপর আবার চল্‌তে লাগ্‌লেন। এম্‌নি ক'রে রাত দশটা নাগাৎ বাড়ী পোঁছুলেন। কেউ মনেই করে নি পদীপিসি এত শীগ্‌গির ফিরবেন, সবাই অবাক্! সবাই বেরিয়ে এসে পদীপিসিকে আর জিনিসপত্র পোঁট্‌লা-পাঁটলি টেনে নামালো। তারপর গোলমাল, চ্যাঁচামেচি, ডাকাতের গল্প, অবিশ্যি ডাকাতের সঙ্গে খুড়োর জোগের কথা পদীপিসি ছাড়া কেউ সন্দেহও করেনি, পদীপিসিও চেপে গেলেন। হঠাৎ বাক্সটার কথা মনে পড়াতে বগল থেকে সেটা টেনে বের করে দেখেন, যেটাকে বর্মি বাক্স মনে করে সযত্নে গাড়ি থেকে নামিয়েছিলেন সেটা আসলে পানের ডিবে। বর্মি বাক্স পাওয়া যাচ্ছে না।"

[ক্রমশ]

জয়ন্তের পুনরাগমন (উপন্যাস)

হেমেন্দ্রকুমার রায়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : 'স্যারং' ও 'প্যারং' প্রভৃতি

সুন্দরবাবু বললেন, "একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না জয়ন্ত! ভৈরব কেমন ক'রে আন্দাজ করলে যে আমরা তাকে সন্দেহ করেছি?" জয়ন্ত বললে, "খুব সহজেই। তার চোখের সামনেই আমরা যে মরা বিড়ালটাকে আবিষ্কার করেছি! যে লোক এমন অদ্ভুত উপায়ে নরহত্যা করতে পারে সে তো নির্ব্বোধ নয় সুন্দরবাবু!"—"হুম্, তাহ'লে তোমার বিশ্বাস ভৈরব আর ফিরবে না?"—"হ্যাঁ, এ-বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই। তার পক্ষে এখন ফিরে আসা মানে আত্মহত্যা করা। তাকে খুঁজে বার করতে হবে আমাদেরই।"—"কিন্তু কোথায় তাকে খুঁজব?"—"সে কথা একটু পরে ভাবলেও চলবে। আপাতত তার ঘর খানাতল্লাস করা দরকার, চলুন।"

দোতালায় ছিল তিনখানা কামরা ও একখানা রান্নাঘর। তার মধ্যে একটি ঘর বাহির থেকে তালাবন্ধ। জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল, সেখানা হচ্ছে ভৈরবের শোবার ঘর। তালা ভেঙে ঘরের দরজা খুলে ফেলা হ'ল। সুন্দরবাবু একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "ভৈরব দেখছি আসবাব-পত্তর কিছুই নিয়ে যায়নি। হয়তো সে ফিরে আসবে।" জয়ন্ত বললে, "আসবাব রেখে গেছে সে আমাদের চোখে ধূলো দেবার জন্যে। যাতে আমরা ভাবি সে পালায় নি। তার সঙ্গে আছে পাঁচলক্ষ টাকা, তার কাছে এই আসবাবগুলো তো তুচ্ছ!" মাণিক বিস্মিত স্বরে বললে, "জয়ন্ত, আন্‌লায় কি ঝুলছে, দেখছ?"—"হুঁ, 'স্যারং'!"—"আরে, টেবিলের উপরে যে একখানা 'ক্রিশ'

রয়েছে !"—"আর এই দেখ, একখানা 'প্যারাং' !"—"এদিকে রয়েছে 'রাত্যানে'র তৈরি একটা 'বাস্কেট', ঘরের কোনেও দেখছি 'রাত্যানে'র লাঠি !" সুন্দরবাবু ইতভম্বের মতন বললেন, "স্যারং, ক্রিশ্, প্যারাং, রাত্যান্! এ-সব কি কথা বাবা ?" জয়ন্ত বললে, "স্যারং মানে হচ্ছে একরকম কাপড়। প্যারাং একরকম বড় ছুরি। ক্রিশও আর একরকম ছুরির নাম। রাত্যান একজাতের গাছ, তা দিয়ে দড়ী, লাঠি আর ঝুড়ী প্রভৃতি তৈরি করা হয়।"—"ও-সব কোন্ দেশের কথা ?"—"মালয় উপদ্বীপের। সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপেও ঐ জিনিসগুলির চলন আছে।"—"থাক্-গে, ও-নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে রাজি নই।"

টেবিলের 'ড্রয়ার' টেনে খান-কয়েক খাম বার ক'রে নিয়ে জয়ন্ত বললে, "খামগুলোর ওপরেও দেখছি সুমাত্রার ডাকঘরের ছাপ। বোধ হচ্ছে ভৈরব ও-অঞ্চলে অনেকদিন বাস করেছিল। এখনো তার বন্ধুরা সেখান থেকে তাকে চিঠিপত্র লেখে। বটে, বটে, বটে !" জয়ন্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, তার মুখে চিন্তার ছায়া। সুন্দরবাবু এটা-ওটা-সেটা নাড়তে নাড়তে বললেন, "যত-সব বাজে জিনিস। এখানে ভৈরবের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণই নেই। চল জয়ন্ত, আর মিছে সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি ?" জয়ন্ত হঠাৎ বললে, "রামবাবুর ঘরে টেলিফোন দেখেছিলুম না ?" —"হ্যাঁ। কিন্তু কেন ?"

জয়ন্ত কোন উত্তর না দিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুন্দরবাবু বললেন, "তোমার বন্ধুর মৎলোব কি বল তো ? ও কখন যে কি বলে আর কি করে, কিছু বোঝা যায় না ! হুম্ !" মাণিক সহাস্যে বললে, "অতএব জয়ন্তকে বোঝবার চেষ্টা ছেড়ে দিন। কি জানি, যদি শেষটা আপনার মূল্যবান মস্তিষ্ক গুলিয়ে যায় ?" সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "ঠাট্টা ভালো লাগে না। আমি কি তোমার ঠাট্টার পাত্র ?"

খানিক পরেই জয়ন্ত ফিরে এসে বললে, "টেলিফোনে খবর নিয়ে জানলুম, আজ বেলা সাড়ে-বারোটার সময় ডায়মণ্ড হারবার থেকে একখানা জাহাজ ছাড়বে—রেঙ্গুন হয়ে সে যাবে সিঙ্গাপুরের দিকে।" সুন্দরবাবু বললেন, "তাতে তোমারই বা কি, আমারই বা কি ?"—"ইচ্ছা করলে এখনো আপনি সেই জাহাজখানা ধরতে পারেন।"—"কেন শুনি ?—"ভৈরব হয়তো সেই জাহাজে আছে।"—"হয়তো ?"—"হ্যাঁ, এটা আমার আন্দাজ।"—"আন্দাজের একটা কারণ আছে তো ?"—"ভৈরবের কথা মনে আছে ? সে ভবঘুরে। ভারতের বাইরেও তার গতিবিধি আছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ভৈরব মালয়, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দেশে বহুকাল বাস করেছে। এই ঘরে তার ব্যবহার-করা জিনিসগুলো এবিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে। এখনো ও-অঞ্চল থেকে তার নামে চিঠিপত্র আসে। আমার মনে হয়, যে-উপায়েই হোক্ অর্থাভাব দূর করবার জন্যেই সে কলকাতায় এসেছিল। আর সেই উদ্দেশ্যেই সে নরহত্যা করেছে। এখন সে জানতে পেরেছে যে, আমরা তার গুপ্ত কথা ধ'রে ফেলেছি। এমন অবস্থায় ফাঁশিকাঠকে ফাঁকি দিতে হ'লে প্রথম সুযোগেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু তার পক্ষে কোন দেশে যাওয়া স্বাভাবিক ? নিশ্চয় মালয় বা সুমাত্রার দিকে ! সে এখান থেকে অদৃশ্য হবার পর এই প্রথম জাহাজ যাচ্ছে ঐ অঞ্চলে। এমন সুযোগ সে ছাড়বে ব'লে মনে হয় না।"

সুন্দরবাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, "তোমার আন্দাজটা সত্য হ'লেও হ'তে পারে। তুমিও আমার সঙ্গে চলনা কেন ?" জয়ন্ত বললে, "আমার অন্য কাজ আছে।"—"তোমার আবার কাজ কি ?"—"দেশে এসে পর্য্যন্ত বাঁশী বাজাই নি। আজ বাঁশী বাজাব। চল মাণিক !"—জয়ন্ত ও মাণিক চ'লে গেল। সুন্দরবাবু নিজের মনেই বললেন, "এমন পাগল কি তুনিয়ায় তুটি আছে ?"

সন্ধ্যার সময়ে জয়ন্ত নিজের ঘরে চুপ ক'রে ব'সে আছে, হঠাৎ টেলিফোন-যন্ত্র বেজে উঠল। 'রিসিভার'টা তুলে নিয়ে জয়ন্ত বললে, "হ্যালো !—"—"কে, জয়ন্ত ?"—"হ্যাঁ।"—"আমি সুন্দরবাবু, কেল্লা ফতে ! বাহাতুর ভায়া ! তোমার আন্দাজই সত্য। ভৈরবকে গ্রেপ্তার করেছি।"—"সাধু, সাধু !"—"কিন্তু বেটা ভারি বেগ দিয়েছে। দেখা হ'লে সব বলব। পাঁচলক্ষ টাকার নোট সে গঙ্গায় ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু পারেনি। তবে সে আর একটা কি জিনিস জলে ফেলে দিয়েছে সেটাকে দেখতে ছোট শিশির মতো।" জয়ন্ত বললে, "তার ভিতরে কি ছিল, আমি বলতে পারি।"—"বল দেখি ?"—"গোখ্রো সাপের বিষ।"—"হুম্, হুম্, হুম্ !"*

---

* এইখানেই ভৈরবের কাহিনী সমাপ্ত হ'ল। এবার থেকে মাঝে মাঝে জয়ন্তের নূতন নূতন কীর্ত্তির কথা প্রকাশিত হবে। ইতি—লেখক

…দে শয়তানের রাজত্ব

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

…াতনের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিলো।—"বলেন কি ? ওই …র ক্ষুদে ক্ষুদে জীব,—শুধু চোখে দেখাই যায় না এমন …টকে,—আর তাদের নিয়ে মোটা মোটা বই লিখে ঘর …ঝাই করা ! পণ্ডিতদের ভিমরতি ধরেছে না কি ?"

"ভিমরতি নয় ভাই। সমস্ত কথা শুনলেই বুঝতে …রবে ওই পুঁটকে পুঁটকে প্রাণীদের কী অসম্ভব দৌরাত্ম্য ! …ঝতে পারবে ওদের সম্বন্ধে কেন এত খবর নেওয়া দরকার।"

…কী রকমের চেহারা এই জীবগুলোর ?"—পান্না জিজ্ঞেস …রল। "ওঃ, সে নানান রকমের চেহারা। কাউকে দেখতে …রু সুতোর মতো ; কেউ ঠিক ফুলের মতো গোল, …ঝখানে যেন পাপ্ড়ির দাগ ! কারুর গা লোমে ভরতি, …রুর মাথায় শুধু একটা ঝুঁটি, কারুর মাথায় এক ঝাঁকড়া …ল। কেউ কেউ বেয়াড়া রকম তেকোনা, কারুর বা তুদিকে …টো ল্যাজ ! কেউ কেউ থাকে দঙ্গল পাকিয়ে একজোট …য়ে, কেউ কেউ পরস্পরের ল্যাজ আঁকড়ে ধরে সরু লম্বা …নের মতো হয়ে থাকে। এমনি আরও কত কি ? কত …কম যে আজগুবি চেহারার জীব অষ্টপ্রহর আমাদের …রপাশে কিলবিল করছে তা ভাবতেই গা ঘিন-ঘিন করে। …ক এই যে শুধু চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, তা না …লে ত' মানুষ পাগল হয়ে যেত।"

পান্না এতক্ষণ গালে হাত দিয়ে চুপ করে শুনছিলো। …কটু আমতা আমতা করে এবার বল্ল—"আমি ঠিক …ঝতে পারছি না। আপনি বলছেন ওগুলো একরকমের …াণী, আবার বলছেন এত ছোট যে চোখে দেখা যায় না। আবার কোন্ ধরণের কথা ? গরু, ছাগল, মানুষ—সমস্ত …াণীকেই ত' চোখে দেখতে পাই।"

ভদ্রলোক একটু মিষ্টি হাসলেন। "আসলে কি জানো ? …থিবীর বড় বড় পণ্ডিতেরা সহজে সন্তুষ্ট হতে চান না। …কে আমরা সাধারণত প্রাণী বলি সে জিনিস আসলে কী …া ঠিক করতে হবে—এই হ'ল পণ্ডিতদের পণ। অনেক …বে মাথা খাটিয়ে, অনেক রকম পরীক্ষা করে, অনেক দেখে অনেক শিখে তাঁরা একটা কিম্ভূতকিমাকার শব্দ আবিষ্কার করলেন। প্রোটোপ্লাসম্। শব্দটা বিদ্ঘুটে লাগছে ? কিন্তু কী করা যায় বলো ! পণ্ডিতরা যখন এ রকম দাঁতভাঙ্গা শব্দ আবিষ্কার করেই ফেলেছেন তখন আর উপায় কি ? শব্দটা মনে রাখতে হবে। কেন না, পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করেছেন যে, যে-কোনো রকম প্রাণী,—তা সে মানুষই হোক, জীবজন্তুই হোক, গাছপালাই হোক, —শেষ পর্যন্ত সবই একটা মূল জিনিস দিয়ে তৈরি। যেমন সমস্ত মাটির পুতুলই মাটি দিয়ে তৈরি তেমনি সমস্ত প্রাণীই তৈরি প্রোটোপ্লাসম্ দিয়ে। সবচেয়ে ছোটো প্রাণী যা আবিষ্কার হয়েছে তা মাত্র একবিন্দু প্রোটোপ্লাসম্ দিয়ে তৈরি —নাম তার ব্যাকটিরিয়া। কিন্তু অতখানি নাম হলে কি হয়, চেহারাটা নিতান্তই ক্ষুদে। অনুবীক্ষণ দিয়ে অন্তত হাজার গুণ বড় করে না দেখলে তাকে চোখে দেখবার আর কোনো উপায়ই নেই। ওদের মধ্যে যে একটু বড়সড় তার মাপ এক ইঞ্চির পাঁচহাজার ভাগের একভাগ মাত্র। অনেকেই অবশ্য এর চেয়েও ছোট। এখন মনে করে দেখো দিকিনি —ব্যাকটিরিয়ার দল যদি দর্জির দোকানে গিয়ে জামা করবার ফরমাস দিতো তা হলে দর্জি বেচারার কী মুস্কিলটাই বাধত ! যে গজফিতে দিয়ে সে তোমার আমার জামার মাপ নেয়, সেই গজফিতের একটা দাগের মধ্যেই অমন হাজার হাজার ব্যাকটিরিয়া হাত পা ছড়িয়ে বসে হাই তুলতে পারে ! দর্জির অবশ্য এ ভয় নেই, কেন না, জামাকাপড় ওরা পরে না। কিন্তু ওদের মেপে দেখতে না পারলে পণ্ডিতদের স্বস্তি নেই। তাঁরা তাই এক নতুন গজফিতে তৈরি করেছেন—তার প্রত্যেকটা ঘর এক ইঞ্চির ২৫০০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই এক একটা ঘরের নাম দেওয়া হয়েছে মাইক্রণ। সবচেয়ে ছোট যে বীজাণুকে দেখা গিয়াছে লম্বায় সে এক মাইক্রোণের একের ছ' ভাগ মাত্র।

"কিন্তু যত ক্ষুদেই হোক না, এদিকে ওদের বাবুগিরির শেষ নেই ! কোথাও একটু পানের থেকে চুণ খসতে দেবে না। বেশ শুকনো জায়গায় পড়লে দিব্যি আরামে ঘুম দেবে। জাগায় কার সাধ্যি ! ঘুম ভাঙে আবহাওয়া স্যাঁৎ-সেঁতে হয়ে এলে। গরম একটু কম পড়লে কী বেশী পড়লে

বাবুদের মহামুশকিল! ঠিক মাঝারি ধরণের গরম, যে রকম আমাদের শরীরের মধ্যেটায় আছে, ওদের খাসা লাগে। অবশ্য সবাই সমান বাবু নয়—ওদের মধ্যেও কেউ কেউ আছে খুব কষ্ট সইতে পারে। যে গরমে আমাদের প্রাণ বেরোয় বা যে শীতে আমাদের হাত-পা হিম হয়ে যায়—সেখানেও ওরা কেউ কেউ দিব্বি থাকতে পারে। আর খাবার দাবার ব্যাপারে ওদের খুঁতখুঁতে পনা যদি দেখো!—যার যেটি রোচে ঠিক সেটি ছাড়া আর কোনো খাবারের দিকে ফিরেও তাকাবে না।

"কিন্তু অতো সুখ কি আর সয়? বেছারাদের পরমায়ু বড় কম। কাজের সময় বাঁচে মাত্র মিনিট কুড়ি করে। তারপর প্রত্যেকে নিজে নিজে দু' ভাগে ভাগ হয়ে যায়। তখন একটা জীবাণুর বদল হয় দুটো। আবার মিনিট কুড়ি পরে প্রত্যেকে দুভাগ হয়ে দুটো করে জীবাণু হয়ে পড়ে। এই ভাবে সাঁ-সাঁ করে ওরা বেড়ে চলে, অঙ্কের গুণফলের মতো তাড়াতাড়ি। একটু হিসেব করে দেখো একদিনে একটা জীবাণু থেকে মোট কটা জীবাণু হয়ে দাঁড়ায়!

"অবশ্য সব জীবাণুই যে সব সময় প্রতি কুড়ি মিনিটে দু ভাগে ভাগ হয়ে যায় তার কোনো মানে নেই। তাই আগে বলছিলাম "কাজের সময়" ওদের পরমায়ু ওইটুকুই। কিন্তু মাঝে মাঝে ওরা দেখে যে ব্যাপার বড় বেগতিক। ঠাণ্ডা বা গরম পড়ছে বড্ড বেশি। তখন আর ওরা নিজেদের কাজকর্ম করে না—নিজেরাই একরকম খোলস বানিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। তখন আর ওদের মারে কে? যে জীবাণু কাজ করছে তাকে মেরে ফেলা কঠিন নয়—ফুটন্ত জলে ফেলে দিলেই তার ভবলীলা খতম। কিন্তু যে একবার খোলসে ঢুকেছে বছরের পর বছর সে দিব্বি টিঁকে থাকতে পারে! বরফেই রাখো আর ফুটন্ত জলেই ফেলো মরবার নামটি নেই!…আবার যখন সময় ভালো পড়বে তখন সে হয়তো বেরুবে খোলস ছেড়ে, করবে নিজের কাজ আর প্রতি বিশ মিনিটে দুভাগে ভাগ হয়ে যাবে।"

ওরা সব তন্ময় হয়ে শুনছিলো। এই পৃথিবীর মধ্যেই যে এমন মজাদার জীব আছে তা ত' আগে কেউ বলে নি!

ভদ্রলোক চুপ করতে ওদের খেয়াল হ'ল কখন সন্ধে হ[য়ে] গিয়েছে। শূন্য পার্কে জ্বলছে গ্যাসের আলো। এবার ত[াদের] বাড়ি ফিরতে হয়!

"কাল তোমরা একটু তাড়াতাড়ি মাঠে এসো। এই খানেই আমার দেখা পাবে। তোমাদের আরও অনে[ক] কথা বলব।"

"দাসীর মেয়ে আর রাজার মেয়ে"

হৈমন্তী চক্রবর্ত্তী

সমুদ্রের উপর এলো দক্ষিণ থেকে হাওয়া; উঠল ঢেউ, উড় ফেনা। হাওয়া বল্লে ঢেউএর কাণেকাণে, "শুনেছ, খবর[টা] শুনেছ?" "শুনেছ, খবরটা শুনেছ?"—ঢেউ বল্লে তার পাশে[র] ঢেউকে, পাশের ঢেউ তার পাশের ঢেউকে। "আমাদের রাজা[র] হবে বিয়ে।" উৎসাহে লাফিয়ে উঠল ঢেউএর দল, পাড়েপা[ড়ে] কানাকানি পড়ে গেল, পাখীর বাসায় পৌঁছলো খবর: সাগর-রাজের বিয়ে হবে ভারতের রাজকন্যের সঙ্গে।

সমুদ্রের তলায় সমুদ্রের রাজা গোছায় ঘর। চকচকে বালি[র] মেঝে ধুয়ে দেয় ঢেউএর দল। রঙীন মাছ মুখে লণ্ঠন লাগি[য়ে] ঘুরে বেড়ায়, মৎসকন্যা দেয় নাচের মহড়া। রাণী আসবে—কাঁকড়ার দল মুক্তো বিছিয়ে সমুদ্রের তলায় পথ তৈরি করে—রাণী আসবে—ঝকঝকে ঝিনুক সাজায় পথের দু' পাশ। পূর্ণিমা[র] গভীর রাতে আসবে রাণী, সমুদ্রে স্ফটিকের রাজপ্রাসাদ চাঁদে[র] আলোয় জ্বলজ্বল করবে, ঝিনুকের গায়ে ঠিকরোবে রঙীন ছটা।

রাজপ্রাসাদে সবাই কনে সাজায়। হাতের চেটোয় ও পা[য়ে] টুকটুকে লাল আলতা; মেঘের মতো কালো চুলে হীরের তার, কত রকম সুন্দর ফুল! কী তার চোখ, কী তার ঠোঁট! রাজ-কন্যে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে—এক ঝড়ের দিনে ওই সমু[দ্রে] সে দেখেছিলো সাগররাজের চেহারা! এবার যেতে হবে তার কাছে, সেখানে তার ভবিষ্যতের সংসার। রাজকন্যের মনে কি[ন্তু সু]খ নেই—ছাড়তে হবে প্রিয়জনকে, ছাড়তে হবে আলো হাওয়া [গ]াছের ফুল আর পাখীর গান। যেতে হবে সমুদ্রের নীচে,—নিঃঝুম আর কনকনে ঠাণ্ডা। মন ওঠে না। তবু বাবার কথা ঠেলা যায় না, বিয়ে ত' করতেই হবে! কতোবার কতো উপায় ও ভাবে, কিন্তু কিছুতেই পার নেই। মনের দুঃখ ও [ক]ারুর কাছে বলে না, কেবল তারই বয়সী এক দাসীকন্যেকে ছাড়া। দাসীর মেয়ে তার পরম বন্ধু, তার মতোই বয়েস, তার [ম]তোই ফুটফুটে। দাসীর মেয়ে বোঝে না এতে দুঃখের কী আছে। "আমি হলে ত' ভাই আহ্লাদে আটখানা হতাম।" তার কথা শুনে রাজকন্যের মাথায় একটা ফন্দি আসে।

বিয়ের দিন সন্ধেবেলায় রাজকন্যেকে বেরুতে হবে প্রাসাদ ছেড়ে। একা-একা যেতে হবে সমুদ্রের পাড়ে। সেখানে সাগর-[র]াজ করবে বরণ, তারপর নিয়ে যাবে সাগরের গভীরে। পূর্ণিমার [র]াতে চাঁদ ওঠে, রাজকন্যে বাবাকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ে প্রাসাদ থেকে। তারপর আস্তে-আস্তে অনেক দূরে চলে যায়, [ব]াবার নজর আর যায় না। সমুদ্রের কাছে একটা পাহাড়, তার [ম]ধ্যে একটা গুহা, গুহার মুখে দাসীর মেয়ে তার অপেক্ষায় [দ]াঁড়িয়ে। জামার মধ্যে থেকে একটা ভারি মোড়ক বের করে [র]াজকন্যে দেয় দাসীকন্যেকে। তারপর চুপচাপ। খানিক পরে দুটি [ম]েয়েই একসঙ্গে বেরিয়ে আসে গুহার ভিতর থেকে,—দু'জনের [প]রণেই রাজকন্যের সাজ—যেন রাজার দুটি মেয়ে। শুধু একজনের [চ]োখে হাসি আর একজনের চোখে জল। সমুদ্রের পাড়ে দুজন [দ]াঁড়ায়। আসল রাজকন্যে কে?—কে চিনবে বলো? ঢেউএর [দ]ল পথে ছেড়ে দেয়, বিরাট ঝিনুকের ভেলায় সাগররাজ আসে। [প]াড়ে দু'জন মেয়ে দেখে সে ত' অবাক! রাজা কিছু বলবার [আ]গেই একটি মেয়ে বলে, "ভারত রাজার প্রাসাদে ছিলো দুই [ক]ন্যে। তাদের একজনের সঙ্গে বিয়ে হবে সাগররাজের। একজন [এ]ই সবুজ পৃথিবী, এই পাখীর গান, বনের ফুল ছেড়ে যেতে [ব্য]াকুল হ'ল; আর একজন সাগরের রাণী হতে পেলে খুসিতে [ভ]রে ওঠে। দুজনই রয়েছে, তুমি ঠিক করো কাকে বিয়ে করবে। [কে]বল একটি কথা কোনোদিন জানতে পারবে না'—আসল [র]াজকন্যে কে।"

সাগররাজ খুসি হোলো মেয়েটির গলা শুনে, খুসি হোলো [ত]ার চোখের হাসি দেখে। তাই তারই আঙুলে পরিয়ে দিলো [আ]ংটি। তারপর তাকে ঝিনুকের মস্ত ভেলায় তুলে দু'জনে চলে [গ]েলো। বালির ওপর দাঁড়িয়ে এ-মেয়েটি খানিক দেখলো চাঁদের আলোয় সমুদ্র শুধু চকচক করছে। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে গুহায় সে ফিরে এলো। আর দাসীকন্যের সাজ পরে ফিরলো দাসীর বাড়ি।

কিছুদিন পরে সেই রাজ্যে আর একটি বিয়ের খবর শোনা গেলো। দাসীকন্যের সঙ্গে বিয়ে হোলো এক কাঠুরের ছেলের, তার চেহারা বীরের মতো দীর্ঘ আর সবল। কনে নিয়ে সে ফিরল গভীর বনে; সবুজে ঝলমল করছে বন। কত রকম ফুল, কত পাখীর ডাক! খুসিতে সবুজ অরণ্যের মতোই বনে কাঠুরের বৌ ঝলমল করে উঠলো।

[গল্পটি ইংরিজিতে লেখা। স্থানাভাবে তর্জমার সময় কিছু সংক্ষিপ্ত করায় মূল রচনার সমস্ত সৌন্দর্য বজায় রাখা সম্ভব হয়নি বলে আমরা দুঃখিত।—সঃ]

মোহনবাগান

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আজকে দাদা, কালকে শালা,
বল তো দেখি কাহার বেলা?
আজ লাফিয়ে উঠছে ঘাড়ে,
কালকে তুলে আছাড় মারে?
আজকে তিড়িং-তুবড়ি ছোটায়,
কালকে লাজে লেজুড় গোটায়?
পারে এনে ডোবায় তরী,
কেরদানি আর মাতব্বরি?
থামুন, থামুন, কেন রাগান?
মোহনবাগান মোহনবাগান!
খত্তা নাকে বারে-বারে
আর যাব না মাঠের ধারে।
গোখখুরি না গাঁজাখুরি,
হেই দেয়ালে মাথা খুঁড়ি।
আর হব না বে-আক্কেল,
কাকের কী হয় পাকলে বেল?

তার পরে ফের সময় হলে
গুটি-গুটি আসিস চলে ?
বুকে কেন লোহা দাগান ?
মোহনবাগান, মোহনবাগান !
সকাল হতেই খালি মাঠে,
কত মানত কালীঘাটে ;
লোপাট জুতো ছাতার বাঁট
জামার তলায় পকেট-কাট ।
রোদে মুখে উঠছে গেজা,
বৃষ্টিতে ঠায় দাঁড়িয়ে ভেজা ।
গোলের 'গরু'ই হলি মার
খাওয়ালিনা 'ওল'টি আর ।
ঘায়ে কেন লবণ লাগান ?
তবু মোদের মোহনবাগান ।

এবছরের শিল্ড হোল্ডার বি-এণ্ড-এ-আর

এ-বছরের আই-এফ্-এ শিল্ড খেলার অর্দ্ধেক উৎসাহ নষ্ট হয়েছিলো প্রথম দিকেই রয়েল এঞ্জিনিয়ার্সের কাছে মহামেডান স্পোর্টিং ৩—১ গোলে হেরে যাওয়ায় । সেদিন মহামেডান স্পোর্টিং-এর খেলা মোটেই ভালো হয়নি এবং আমার মনে হয় এই দলটির লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আনতে হলে নতুন ও তরুণ খেলোয়াড় আনানো দরকার । রয়েল এঞ্জিনিয়ার্স পরপর ক্যালকাটা ও জর্জ টেলিগ্রাফকে হারিয়া ওঠে সেমি-ফাইনালে । এবং তার সঙ্গে খেলা পড়ে বি-এণ্ড-এ-আর-তারাও মাইসোর রোভার্স নামে এক শক্তিশালী টিমকে ৩—২ গোলে হারিয়ে ওঠে সেমি-ফাইনালে । অন্যদিকে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল হিরোজকে তিন গোলে, ফিল্ড রেজিমেণ্ট নামে সত্যিকারের ভালো মিলিটারি টিমকে চার গোলে এবং কালিঘাটকে ৫—১ গোলে হারিয়ে উঠে আসে সেমি ফাইনালে । শেষের দুটি খেলায় মোহনবাগানের আশ্চর্য ফর্ম দেখে অনেকেই ভেবেছিলো এ-বছরে শিল্ড পাওয়াও তাদের পক্ষে খুব একটা অসম্ভব কিছু নয় । রবার্ট হাডসন নামে সেকেণ্ড ডিভিসন চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলকে দু' দিন খেলতে হয়েছিলো । এ-রকম জঘন্য টিম কলকাতার মাঠে দুটি দেখা যায়নি । বল মারার চেয়ে মানুষ মারার দিকেই তাজের নজর বেশি । ইস্টবেঙ্গলকে তারা তো মেরেই প্রায় শেষ করে দিয়েছিলো । এই দলটিকে লিগ এবং শিল্ড থেকে স্ক্র্যাচ করে দিলে কেউই বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হবে না এবং দেয়াই উচিত । খেলার মাঠের আবহাওয়াকে সবচেয়ে বিষাক্ত করেছিলো এঁরা । যাই হোক এ-দলকে হারিয়া ইস্টবেঙ্গলও সেমি-ফাইনালে উঠলো । পাঁচই আগস্ট মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা হোলো । এবং খেলা শেষ হবার মিনিট আষ্টেক আগে মোহনবাগান এক গোল খেয়ে গেলো হেরে । সেদিনকার মতো বাজে মোহনবাগান একদিনও খেলেনি, যেন মোহনবাগানের ভূত নেমেছিলো মাঠে । এবং যদিও ইস্ট-বেঙ্গল জিতলো তবু এ-কথা সবাই বলবে মোহনবাগানের চেয়ে ভালো তারা খেলেনি । গত সাতই আগস্ট বেঙ্গল-আসাম (তারা রয়েল এঞ্জিনিয়ার্সকে ৩—১ গোলে সেমি-ফাইনালে হারিয়েছিলো) আর ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে হয়ে গেলো ফাইনাল খেলা এবং তাতে দু গোলে জিতে বি-এণ্ড-এ-আর এই প্রথম পোলা আই-এফ-এ শিল্ড । বেঙ্গল আসামের এই আশ্চর্য সাফল্যের জন্যে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি ।

রংমশাল বৈঠক

আশ্বিন মাসের প্রতিযোগিতার ফল :

১ । গরুর চাষ (গল্প)—শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত
বয়স ১২ বছর ; গ্রাহক নং ১৮৫০

২ । "শুধু অকারণ পুলকে—" (কবিতা)—
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু ; গ্রাহক নং ১৭৭৪

"শুধু অকারণ পুলকে"

প্রবোধচন্দ্র বসু

বাড়ী মোর ভ'রে গেছে কত লোক জনেতে ;
কোলাহল বেড়ে ওঠে ;—বাজনার সনেতে ।
গ্রামের মহেশমুদী,
গয়লা, ময়রাক্ষুদী
আসিয়া জট্‌লা ক'রে, কত কথা ব'ল্‌ছে ।
ও ধারেতে মেয়েদের টিপ্পনী চল্‌ছে ।
এ গ্রামের জমিদার—এসেছেন তিনিও !
ট্যাঁক্ ভ'রে আছে নোট্, কাঁচাটাকা, গিনিও !
জানাশোনা আরও কত,
ঘিরে মোরে শত শত ;
কত সব উপদেশ, কত রকমের ভাষ্,
আমাকেই দিতেছেন, সদা থেকে মোর পাশ ।
ও ধারেতে জড় করা, কল্‌সী, ঘটি ও বাটি
সোনার গহনা হেথা : মেকী নয়, সব খাঁটি !
ট্রাঙ্ক ও বিছানা হোথা
(এমনটি পাবো কোথা ?)
কাছে যায় ছেলেগুলো, আরো যায় অনেকে,
বাড়ীতে ঢুকেছে কেউ, খুঁজ্‌ছে কি কনেকে ?
মাঝে মাঝে গুম্ গুম্ বেজে' ওঠে বাজ্‌না :
শুনে' ভাবি, মায়াময় সংসারে কাজ্ না,
ভাবি মিথ্যাই সব :
যেন প্রাণহীন শব ।
তবুও শুনিতে হয়, কালা নই, আছে কাণ
মনে হয়, বাড়ীটার ধড়ে আসিয়াছে প্রাণ ।
ও পাড়ার ছোটবাবু, এ গ্রামের জমিদার,
ময়রা, গয়লা, মুদী : দেখি সব গুল্‌জার !
—ভাবো সবে হোল কী ?
কারণ কি শোননি ?
জনতা যে মহাজন : আর,—বাকী খাজ্‌না,
—বিয়ের বাজ্‌না নয়, নীলামের বাজ্‌না !!......

পৌষ মাসের প্রতিযোগিতা

"আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা"—এই বিষয়ে ৪৫০টি কথার মধ্যে লেখা শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য পাঁচ টাকা দামের বই পুরস্কার দেওয়া হবে । কেবলমাত্র রংমশালের গ্রাহক-গ্রাহিকারাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে । ২০শে কার্তিকের মধ্যে প্রবন্ধগুলি রংমশাল আপিসে পৌছনো দরকার । চিঠি দিও না । পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধটি পৌষের রংমশালে ছাপা হবে ।

চলন্তিকা

গত ১৯শে আগস্ট ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব সার আজিজুল হকের সঙ্গে শিশু-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযোগেন্দ্র গুপ্ত ও যুগ্মসম্পাদক শ্রীক্ষিতিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দেখা করেন । নতুন কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশের জন্য বাংলার শিশু-সাহিত্য যে কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে-সম্বন্ধে আলোচনা হয় । সার অজিজুল হক এ-সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন এবং সেপ্টেশিশু-সাহিত্য-পরিষদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দিয়াছেন ।

* * * *

জার্মনদের যুদ্ধের নতুন অস্ত্র ফ্লাইং বম্বের কথা তোমরা শুনেছ । এখন তারা বলছে এমন একটা ও শুধু তারা আবিষ্কার করেছে যেটা জলের উপর ছড়িয়ে দিলে আশেপাশের পাঁচশ' গজ জায়গার জল জমে কঠিন বরফ হয়ে যাবে !

* * * *

যুদ্ধের জন্যে পেট্রোলের খরচ অবিশ্বাস্য রকম বেড়ে গেছে। কেবলমাত্র মার্কিন ও ব্রিটিশ উড়োজাহাজের জন্যেই লাগছে চব্বিশ ঘণ্টায় পঞ্চাশ লক্ষ গ্যালন!

* * * *

তোমরা কতই বা হাঁচতে পারো? একজন আমেরিকান মহিলা মিনিটে পনেরো বার করে ক্রমাগত পাঁচ দিন হেঁচেছিলেন। Chippewa Fallsএর ডেজি জস্ট নামে এক মহিলা হেঁচেছিলেন ক্রমাগত আট দিন ধরে। Salt Ste Marie Ontarioতে এতো লোক হে-ফিভারে ভোগে যে সেখানে রীতিমতো একটি হাঁচি-ক্লাব আছে। এই ক্লাবের প্রথম যিনি চেয়ারম্যান হয়েছিলেন প্রত্যেকবার হাঁচবার সময় তাঁর চশমাজোড়া সাত হাত দূরে ছিটকে পড়তো। কিন্তু তাঁরও হার হোলো আর এক ভদ্রলোকের কাছে, তাঁর নাম মিঃ জর্জ পিলাণ্ট। পিলাণ্ট সাহেব একবার সামলাতে না পেরে তাঁর ড্রাইভারের গলার উপর হেঁচে ফেলেছিলেন। ফলে বেচারা ড্রাইভারের ঘাড়টা মটকে যায়!

* * * *

কেমব্রিজের প্রফেসর সার লরেন্স ব্র্যাগ বলছেন রেডিওর ক্ষেত্রে নানা ধরণের অদ্ভুত আবিষ্কার হয়েছে। 'রেডিও আই'-এর (বেতার চোখ) আলোর সাহায্যে কয়েক শ' মাইল দূরের জিনিস অনায়াসেই দেখতে পারা যাবে!

সম্পাদকের দপ্তর

আশ্বিনের প্রতিযোগিতার ফলাফল এই সংখ্যায় প্রকাশিত হোলো। দুঃখের বিষয় প্রতিযোগিতার জন্যে খুব কম লেখা আমরা পেয়েছিলুম। ভালো লেখা তো ছিলোই না বলতে গেলে। শ্রীমান অশোক দাশগুপ্ত (গ্রাহক নং ১৮৫০) হাসির গল্পের জন্যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু নতুন কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশের জন্যে তার লেখাটি ছাপা গেলো না বলে দুঃখিত। পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ফটো ছাপাবার কথা ছিলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীমান অশোক যে ছবিটি পাঠিয়েছিলো সেটি থেকে ব্লক করা সম্ভব হোলো না এবং শ্রীমান প্রবোধচন্দ্রকে অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও এ-পর্যন্ত চিঠির উত্তর কিংবা ফোটো—কিছুই এসে পৌছয় নি। ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতায় তোমাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

নতুন ধাঁধাঁ

এক রাজার একবার খেয়াল চেপেছিলো তাঁর রাজ্যের প্রত্যেককে জুতো পরাবেন। কিন্তু তাঁর রাজ্যের শতকরা পাঁচজন লোকের একটি করে পা কাটা এবং যারা বাকী রইলো তাদের মধ্যে অর্দ্ধেক প্রজা জুতো পরতে চাইলো না। এখন বলতে পারো কি রাজাকে কতগুলো জুতোর যোগাড় করতে হয়েছিলো?

ভাদ্র মাসের ধাঁধাঁর উত্তর

জীবনানন্দ'র বোন যতগুলো চকোলেট কিনেছিলো ঠিক তার ডবল লজেন্স কিনেছিলো অরবিন্দ আর জয়ন্তীর দাদা লজেন্স কিনেছিলো ঠিক তার অর্দ্ধেক। অতএব অরবিন্দ'র বোন জয়ন্তী নয়। তাহলে জয়ন্তীর দাদা হয় জয়ন্ত নয় জীবনানন্দ।

এদিকে জীবনানন্দ'র বোন চকোলেট কিনেছিলো কিন্তু জয়ন্তী চকোলেট কেনেনি। অতএব জয়ন্তী হচ্ছে জয়ন্ত'র বোন।

তাহলে অরবিন্দ'র বোন হয় মীরা কিংবা এষা।

অরবিন্দ'র বোন যতগুলো কেক কিনেছিলো ঠিক তার দ্বিগুণ চকোলেট কিনেছিলো জীবনানন্দ'র বোন, তা হলে অরবিন্দ যতগুলো লজেন্স কিনেছিলো তার সিকি সংখ্যা কেক কিনেছিলো অরবিন্দ'র বোন। কিন্তু অরবিন্দ যতগুলো লজেন্স কিনেছিলো ঠিক তার দ্বিগুণ কেক কিনেছিলো এষা।

অতএব এষা অরবিন্দ'র বোন নয়।

তা হলে মীরা হচ্ছে অরবিন্দ'র বোন আর জীবনানন্দ'র বোন হচ্ছে এষা।

জীবনানন্দ-এষা, অরবিন্দ-মীরা এবং জয়ন্ত-জয়ন্তী—এরাই ভাই বোন।

আশ্বিন মাসে তোমাদের অনেকের গ্রাহকের চাঁদা শেষ হবে। কার্তিক-সংখ্যা বেরুবে খুব শিগ্‌গীরই। তোমরা, যারা গ্রাহক থাকতে চাও না, আশ্বিন মাসের রংমশাল পেয়েই একটি করে পোস্ট-কার্ড লিখে জানিয়ে দিও। তোমাদের কাছ থেকে চিঠিপত্র না পেলে যথাসময়ে ভি-পি-তে কার্তিক-সংখ্যার রংমশাল পাঠানো হবে। ভি. পি. ফেরৎ দিয়ে আশাকরি আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲, ষান্মাসিক ১৸০। আষাঢ় কিংবা তারপরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হতে হয়। গ্রাহক নং ও রিপ্লাই-কার্ড না-পেলে চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় বলে দুঃখিত। অমনোনীত রচনার সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট না থাকলে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করে ফেলা হয়। সে-কারণে ভবিষ্যতে লেখা সেই সম্বন্ধে কোনো খবর জানানো সম্ভব নয়। রংমশালের নতুন ঠিকানা: C/o সংকেত-ভবন, ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা।

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র
ছোটোদের জন্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

আম আঁটির ভেঁপু

'পথের পাঁচালী' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ, সে সম্বন্ধে কারুরই আজ সন্দেহ নেই। বাংলার গ্রাম্যজীবনের এমন গূঢ় ও অন্তরঙ্গ প্রতিলিপি আজ পর্যন্ত আর বেরোয় নি। 'পথের পাঁচালী'র রস ছোটোরাও অনায়াসে পেতে পারে। কিন্তু মূল বইয়ের আয়তন এবং আবেদন কোনোটাই ছোটোদের ধৈর্য এবং অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ উপযুক্ত নয়। এজন্যই তাদের উপযোগী করে বইটিকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু মূল-রস কোথাও ব্যহত হয়নি। উপরন্তু অসংখ্য ছবির সাহায্যে এই রসকে আরো ঘন করা হয়েছে। বাংলা দেশকে জানতে হলে বাংলার গ্রামকে ঘনিষ্ঠভাবে জানা দরকার এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা অপরিহার্য। 'আম আঁটির ভেঁপু' পড়লে বাংলার ছেলেমেয়েরা বাংলা গ্রামের প্রকৃত পরিচয় পাবে। অপূর্ব প্রচ্ছদসজ্জা, পাইকায় ঝরঝরে ছাপা। দাম ২৷০

প্রকাশক—সিগ্‌নেট প্রেস, ১০৷২, এল্‌গিন রোড, কলিকাতা

"এই বাজারে তাক লাগাইতেছেন সিগ্‌নেট প্রেস; রং ছবি ভাল ছাপা ও ভাল বাঁধাইয়ের মজুব লাগাইয়া দিয়াছেন—বইগুলির মহিমা স্বতন্ত্র তো আছেই। অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী' (সম্পূর্ণ), সুকুমার রায়ের 'ঝালাপালা', 'বহুরূপী'—যে অপূর্ব রূপসজ্জায় এ যুগের ছেলেমেয়েরা পাইতেছে তাহাতে তাহাদিগকে হিংসা হয়" শনিবারের চিঠি।

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ।

ডিরেক্টার-বর্গ।

মি. জে. সি. মুখার্জ্জি — বার-অ্যাট্-ল—ভূতপূর্ব্ব চীফ প্রধান একজিকিউটিভ অফিসার কলিকাতা কর্পোরেশন। ডিরেক্টার—আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট কোং।

খান বাহাদুর এম. এ. মোমিন সি. আই. ই. — ডিরেক্টার—নিউ এসিয়াটিক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ, আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ।

মিঃ জি. ভি. সোয়াইকা — প্রোঃ—সোয়াইকা অয়েল মিলস্, ম্যানিজিং ডাইরেক্টর—সোয়াইকা কেমিক্যাল এণ্ড মিনারেল কোং লিঃ। সোয়াইকা ফার্টিলাইসর লিঃ, সোয়াইকা ষ্টাণ্ড অয়েল এণ্ড বার্ণিশিং কোং।

মিঃ এন্. সি. চন্দ্র — ডিরেক্টার—ন্যাশনাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ, বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ, মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ।

মিঃ বি. সি ঘোষ — কন্ট্রোলার—হিন্দুস্থান কোঃ অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ।

মিঃ এস দত্ত—(ম্যানেজিং ডাইরেক্টর) — ডিরেক্টার—এইচ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ, রামদুর্ল্লভপুর টি কোং লিঃ, ব্রিটিশ ডিষ্ট্রিবিউটারস্ লিঃ।

আদায়ী মূলধন	৯,২৫,০০০ টাকার উর্দ্ধে
গচ্ছিত আমানত	১,১০,০০০ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন	১,৫০,০০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে

জেনারেল ম্যানেজার—**জে. এন্. সেন,** বি. এ. এফ. আর. এস. (লণ্ডন)

রংমশাল

[নবম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : কার্তিক, ১৩৫১]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

হিংসুটে : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

হিংসুটে হিংসুক
কারু মনে নেই সুখ।
এর যদি নাম হয়
ওর তবে ঘাম হয় ;
ও যদি বা টাকা পায়
জ্বলবে এ কাটা ঘায়।
এর কোনো হলে জ্বর,
সুশীতল কলেবর ;
ওর হলে বেগতিক,
করবে এ মানসিক।
চুরি গেলে শাড়ি-জামা
ধরবে ও সারিগামা ;
ওর যদি চুরি যায়,
হাই মেলে তুড়ি খায়।
এর গরু দড়ি-ছুট,
দিচ্ছে ও হরি-লুট ;
ওর পাখি খাঁচা-খোলা,
খুসিতে এ কাছা-ভোলা।
দু' জনেই অবিশেষ
এক বুলি, 'হবি শেষ'।
দু' জনেরি কলিজায়
দাবানল জ্বলি যায়।
আসলেতে ভায়রা,
ঘুঘু আর পায়রা।
মুখে হাসি মনে শাণ
দু' জনেই পরেশান।
এর যদি মরে বউ,
খাবে ও যে চৌ-চৌ ;
ওরো যদি বউ মরে,
তবে দুয়ে ভাব করে।

ভুতপত্রীর যাত্রা : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—দ্বিতীয় মঞ্জিল—

॥ কেয়াতলার সাট ॥

কেয়াতলার মাঠ ঘেরা কেয়াগাছের কাঁটা বেড়া
তার মধ্যে হার্স টন সাহেবের আড়গড়া।
ঘোড়ার গোড় তারই কাছে
উয়ে খাওয়া তেকাটা একটা খাড়া আছে।
তাতে প্রেক্ গাঁথা মরা ঘোড়ার মুণ্ডু একটা দেখা যাচ্ছে
যেন দাঁত ছিরকুটে হাসছে—বিদঘুটে চেহারা!

॥ জুড়ি দোহার গীত ॥

আহে, ঘোড়ারোগে ধরা বড় দায়   টান ধরায় পুঁজিপাটায়
ডানে চালাইতে নন বাঘে ভিড়ে যায়!
হাঁ হে কপালে যার ঢেঁকি চড়া, তার কি কখনো হয় ঘোড়া?
পোড়া ঘোড়ারোগে সে কথা ভোলায়।
তুর্কি তাজি কাজির পিছে   তন্‌মন্‌কে মিছে ছোটায়
শেষ বয়সে ভেট্ সাহেবের আড়গড়াতে হাঁসা ঘোড়া চাপায়ে
লোক হাঁসায়ে নিয়া পৌছায়।

॥ ঘোড়ার দালাল ॥

মশায়, লাভ আছে ঘোড়ার ব্যবসায়
এই মরেছে, সায়েব এসতেছে,—ছেলাম ছাহেব
আপনার মঙ্গল হায়?

(হাস্‌টন্‌ সাহেবের প্রবেশ)

সাহেব। হামি আপনাকে ফাঁসি কাষ্ঠে লটকাইতে চাই।

দালাল। ওকি কথা সাহেব? এই রথের দিনে অমন কথা বলতে নাই।

সাহেব। হামি শোয়াতে চাই আপনাকে আমার প্রিয় ঘোড়ার সাতে এক কবরে। ওপারে ময়রা বুড়া রথ টানালো তেরো চুড়া—ঘোড়ার ওয়াস্তে হামার আড়গড়ায় আকাউণ্ট খুল্লো নাই।

(ময়রা বুড়োর প্রবেশ)

ময়রা। তাতে হয়েছে কি সাহেব? উল্টো রথ এখনো তো হয়ে যায় নাই। ও ভণ্ডুলালের রাস্তাবোলের ঘোড়া ভালো নয় আমি এবারে তোমার ঘোড়া নিতে চাই। গয়লারা দু'ঘোড়া দিয়েছে, আমি দেবো চার ঘোড়া—আচ্ছা মোটা সোটা চাই।

দালাল। গয়লা পাড়ার রথ আবার রথ, আপনার রথের কাছে গো-শকট!

সাহেব। বুড়ো তোমার রথ আমি দেখিয়াছি—বানরে ধরেছে ধ্বজা তেরা চূড়া দেখিতে মজা—খুব সাস্তায় ভালো ভালো ঘোড়া পাবে হামার নিকট!

ময়রা। দু' একটা ঘোড়া দেখাও!

সাহেব। প্যালারাম হর্স কেতাব দেখলাও।

দালাল। এই যে।

॥ গীত দালালের ॥

দেখেন দেখেন চিত্র দেখেন
এক নম্বর রথের ঘোড়া
দুই নম্বর কাঠের ঘোড়া
দমকলে জোড়বার জল-পী-পী ঘোড়া
বাজি খেলাবার তাজি ঘোড়া।

সাহেব। দেখো তালপাত্‌ড়াই সিফাইকি ঘোড়া।

ময়রা। ল্যাজ দেখছি বারো আনা ওড়া।

সাহেব। কুছ নেহি তবু ভি থোড়া।

দালাল। হরিহর ছত্তরের জল ছত্তর ঘোড়া।

কাজ দেয় বিস্তর
বাঁচে ষাট বচ্ছর
খেয়ে শুধু কাঁকড় নুড়ি নোড়া;
চিন্‌ তাতারে ঘোড়া, বিন্দে নেপালে ঘোড়া
বিন্দাবনে ঘোড়া।—
যা চান, জোড়া জোড়া জুড়ে আছে আগাগোড়া।

ময়রা। আট চাকার জন্যে আমি চাই সাহেব রকম বেরকম আট জোড়া।

সাহেব। থান্ডার অ্যাণ্ড লাইট্‌নিং—পেলারাম চক্কর ফিরাও ঘোড়া।

দালাল। কামান্‌ সাহেব।

সাহেব। সহিস্‌ খোলো ফটক—ময়দান পর ছোড়ে ঘোড়া। (প্রস্থান)

[ক্রমশ

পদীপিসির বর্মি বাক্স (উপন্যাস)—৩:

লীলা মজুমদার

পাঁচুমামা চোখ গোল ক'রে চুল খাড়া ক'রে চিঁচিঁ ক' বল্‌তে লাগ্‌লো আর আমি আর সেই চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক নিশ্‌ বন্ধ করে শুন্‌তে লাগলাম। "সে বাক্স একেবারে হাওয়া হ' গেলো। সেই রাত দুপুরে পদীপিসি এম্‌নি চ্যাঁচামেচি শু করলেন যে বাড়ী শুদ্ধ সবাই যে যেখানে থেকে পারে মশা মোমবাতি, লণ্ঠন, তেলের পিদ্দিম জ্বেলে নিয়ে এসে এ ওর মাড়িয়ে দিয়ে মহা খোঁজাখুঁজি সুরু ক'রে দিলো। তার ম খানে দাঁড়িয়ে পদীপিসি নিজে হাত পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে মে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিলেন। বল্লেন, 'নেই বল্লেই হ'ল! আমার বগলদাবা করা ছিলো, আর এই তার হদিস্‌ পাওরা য না। একটা আধ হাত লম্বা শক্ত কাঠের বাক্স একের কর্পূরের মতন উড়ে গেলো! একি মগের মল্লুক!'

"ব'লে গোরু খুলিয়ে, গোরুর গাড়ীর ছাউনী তুলিয়ে, বাঁ বাঁধন আল্লা করিয়ে, গাড়োয়ানের দু' হাতী ধুতি ঝাড়িয়ে রমাকান্তকে দস্তুর মতন সার্চ করিয়ে এমন এক কাণ্ড বাধা যে তার আর বর্ণনা দেওয়া যায় না। শেষে যখন গোরু ল্যাজের খাঁজে খুঁজতে গেছেন তখন গোরু দুটো ধৈর্য্য হা

পদীপিসির হাঁটুতে এইসা গুঁতিয়ে দিলো যে পদীপিসি তখুনি বাবা গো মাগো ব'সে পড়লেন। কিন্তু বসে পড়লে কি হ'বে, বলেছিই ত' সিংহের মতন তেজ ছিলো তাঁর, বসে বসেই সারা রাত বাড়ী শুদ্ধ সবাইকে জাগিয়ে রাখলেন। কিন্তু সে বাক্স আর পাওয়াই গেলো না। এতক্ষণ যারা খুঁজেছিলো তারা কেউ বাক্সে কি আছে না জেনেই খুঁজেছিলো। এবার পদীপিসি কেঁদে ফেলে সব ফাঁস ক'রে দিলেন। বল্লেন, 'নিমাই খুড়ো আমাকে দেখে খুসি হ'য়ে ঐ বাক্স ভরে কত হীরে মতি দিয়েছিলো, আর সে তোরা কোথায় হারিয়ে ফেল্লি!' তাই না শুনে যা'রা খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হ'য়ে বসে পড়েছিলো, তারা আবার উঠে খুঁজতে সুরু ক'রে দিলো। শুনেছি তিন দিন তিন রাত ধ'রে মামা বাড়ী শুদ্ধ কেউ খায়ও নি, ঘুমোয়ও নি। বাগান পর্য্যন্ত খুঁড়ে ফেলেছিলো। যাদের মধ্যে বিষম ভালোবাসা ছিলো তারাও পরস্পরকে সন্দেহ করতে লেগেছিলো।"

আমি আর সেই চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক বল্লাম, "তারপর? তারপর?" পাঁচুমামা বল্ল, "তারপর আর কি হবে? এক সপ্তাহ সব ওলট্‌ পালট্‌ হ'য়ে রইলো, খাওয়া নেই শোয়া নেই, কারু মুখে কথাটি নেই। সারা বাড়ী সবাই মিলে তোলপাড় ক'রে ফেল্ল। কত যে রাশী রাশী ধূলো, মাকড়ষার জাল, ভাঙা শিশি বোতল, তামাকের কৌটো বেরোল তার ঠিক নেই। কত পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া চিঠি বেরুলো; কত গোপন কথা জানাজানি হ'য়ে গেলো; কত হারানো জিনিষ খুঁজে পাওয়া গেলো। কিন্তু পদীপিসির বর্মী বাক্স বাতাস হ'য়ে উড়ে গেলো। এমন ভাবে হাওয়া হয়ে গেলো যে শেষ অবধি অনেকে এ কথাও বল্‌তে ছাড়লো না যে বাক্সটাক্স সব পদীপিসির কল্পনাতে ছাড়া আর কোথাও ছিলো না। কেমল মাত্র রমাকান্ত বার বার বল্‌তে লাগ্‌লো—নিমাই খুড়োর বাড়ী থেকে পদীপিসি যে খালি হাতে ফেরেন নি একথা ঠিক। গোরুর গাড়ীতে আসবার সময়ে বাক্সটা চোখে না দেখ্‌লেও পদীপিসির আঁচল চাপা শক্ত চৌকো জিনিযের খোঁচা তার পেটে লাগ্‌ছিলো, এবং সেটা পানের বাটা নয় এও নিশ্চিত, কারণ পানের বাটার খোঁচা তার পিঠে লাগ্‌ছিলো।

"বাক্সের শোকে পদীপিসি আধখানা হয়ে গেলেন। অত হীরে মতি লোকে সারাজীবনে কল্পনার চোখেও দেখে না আর সে কি না অমন করে কোলছাড়া হয়ে গেলো। শোকটা একটু সাম্‌লে নিয়ে পদীপিসি আবার রমাকান্তকে নিয়ে নিমাই খুড়োর খোঁজে গেছিলেন যদি কিছু পাওয়া যায়। গিয়ে দেখেন বত্রিশ বিঘার শালবনের মাঝখানে নিমাই খুড়োর আড্ডা ভেঙে গেছে, জনমানুষের সাড়া নেই, বুনো বেড়াল আর হুতুম প্যাচার আস্তানা।

"তারপর কত বছর কেটে গেলো। বাক্সের কথা কেউ ভুলে গেলো, আব্‌ছায়া মনে রাখ্‌লো। একমাত্র পদীপিসিই মাঝে মাঝে বাক্সের কথা তুল্‌তেন। আরও বহু বছর বাদে পদীপিসি স্বর্গে গেলেন। যাবার আগে হঠাৎ ফিক্‌ করে হেসে বল্লেন, 'এই রে! বাক্সটা কি করেছিলাম এদ্দিন পরে মনে পড়েছে!' বলেই চোখ বুঁজলেন। তাই শুনে পদীপিসির শ্রাদ্ধের পর আর এক চেটে খোঁজাখুঁজি হয়েছিলো কিন্তু কোনও ফল হয় নি।"

চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক বল্লেন, "তারপর?"

পাঁচুমামা বল্লো, "সেই বাক্স আমি বের করবো। কিন্তু আপনার তা'তে কি মশাই?" [ক্রমশ]

মশাল (উপন্যাস): মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ী গিয়ে চোখের যাতনায় দীননাথ কাৎরাতে লাগল। ঘোষাল ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়ার পর থেকে যন্ত্রণা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে আরম্ভ করেছে। রাত দশটার সময় তার কষ্ট দেখে কৃষ্ণদাস থাকতে পারল না, ব্যাকুল হয়ে পাগলা-ডাক্তারের কাছে ছুটে গেল। বাড়ী তার কাছেই।

পাগলা-ডাক্তার ডাক্তার না হয়েও ডাক্তারি করেন, নিজের খেয়ালে। আগে ছিলেন উকীল—প্রথম বয়সে। শোনা যায় উকীল তিনি নাকি ভালই ছিলেন। আসামীর পক্ষ হয়ে কোর্টে এমন কাঁদুনি গাইতেন যে কড়া হাকিমের চোখে পর্য্যন্ত জল আসত আর সেই লজ্জায় তিনি যাকে ক'টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেবেন ভেবেছিলেন তাকে ঠুকে দিতেন তিন বচ্ছর। একটা গরুচোর নাকি একবার পাগলা-ডাক্তারের ওকালতিতে ফাঁসি যেতে বসেছিল।

বেশী পয়সা আয় না করেও উকীলবাবু সুখে ঘর সংসার

করেছিলেন, একদিন বিবেচনা করে দেখলেন যে এবার দেশটাকে স্বাধীন করা কর্তব্য, বড় বেশীদিন পরাধীন হয়ে আছে। কিছুদিন জেল খাটলেন। কিছুদিন আটক রইলেন। কিছুদিন হাসপাতালে কাটালেন। এই অবসরে তার মা, বৌ আর ছেলেটা একে একে অসুখে ভুগে মরে গেল। ফিরে এসে তিনি দেখলেন যে তার ঘর আছে কিন্তু সংসার নেই।

জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসে মরল?'

একজন কলেরা, একজন বসন্ত আর একজন ম্যালেরিয়ায় মরেছে শুনে থ' বনে গেলেন।

'চিকিৎসা করলে কে?'

তা চিকিৎসা একরকম কেউ করেনি। একজন না করালে তো আর চিকিৎসা হয় না। ছেলেটা সবার শেষে ম্যালেরিয়ায় মর মর হওয়ায় প্রতিবেশীরাই তাকে ওষুধপথ্য দিয়ে ক'দিন যথাসাধ্য করেছিল। আহা, পাঁচ বছরের শিশু, না করলে চলবে কেন।

সেই থেকে উকীলবাবু ডাক্তার বনে গেছেন। ডাক্তারি বই কিনে পড়েছেন অনেকগুলি, এখনো পড়েন। মুখে কিন্তু বলেন, সেই যে ছ'মাস হাসপাতালে ছিলেন, ডাক্তারি বিদ্যাটা তিনি আগাগোড়া আয়ত্ত করেন সেই সময়।

'ছ'মাস লাগে নাকি? বড় হাসপাতালে দু'হপ্তাই ঢের। তাততো আর দেশে নেই। তাইতে ছ'মাস লেগে গেল।'

'ডিগ্রী পান নি?'

'বাপ্ রে! ডিগ্রী? হার্টের বদলিতে ডিগ্রী কিনতে হয় তা জানো? অপারেশন করে হার্টটা বার করে নেয়। সেখানে একটা লোহার কল বসিয়ে হার্টলেস ডাক্তার করে ছেড়ে দেয়।'

হাসিমুখে পাগলা-ডাক্তার আরো ফলাও করে হাসেন। তার মুখ দেখতে হলে হাসিটুকু না দেখে উপায় নেই। এ তার নিজস্ব পেটেন্ট হাসি—ভীষণ ছোঁয়াচে। নিজের দাঁতের কামড়ানিতে যার মুখ ভেংচি কেটে গেছে পাগলা-ডাক্তারের হাসি চোখে পড়লে তার মুখখানাও সস্মিত হয়ে ওঠে। প্রতিদিন সকালে তার টিনের বাড়ীর বারান্দা আর উঠানে রোগীর ভিড় জমে। সব চাষাভুষো কুলিমজুর হাড়িবাগদী গরীব মেয়েপুরুষ। পাগলা-ডাক্তার পরীক্ষা করে ওষুধ দেন। ফি আর ওষুধের দাম কেউ দেয় দু'পয়সা কেউ চার আনা, কেউ আধ সের ধান, কেউ দুটো বেগুন। পাগলা-ডাক্তার হাসেন আর বলেন, 'ঠকাচ্ছো আমাকে? সবাই তোমাদের ঠকায় বলে আমার একার ঘাড়ে শোধ নিচ্ছ?' রোগী দেখে ওষুধ দিতে দিতে হঠাৎ একটা রোগীর বেলা থমকে যান। বিবরণ শুনে বলেন, 'আমার কাছে মরতে এসেছো কেন বেটাচ্ছেলে? এমন রোগ বাগিয়ে এসেছো আমার চোদ্দপুরুষ যার চিকিচ্ছের মাথামুণ্ডু জানে না। এত কষ্টের পশার মাটি করতে চাও? যা ব্যাটা হাসপাতালে।' রোগী কাঁদে, 'বাবুগো! ও ডাকৃতর-বাবু!'

পাগলা ডাক্তার হাসিমুখে বলেন, 'আমি চিকিচ্ছে করব? আজ তবে তুই বাড়ী যা বাপু। আমি গিয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হই; পাশ করে আসি। ছ'বছর পরে আসিস, সারিয়ে দেব।'

পাড়ার কয়েকটি ছেলে পাগলা-ডাক্তারের কম্পাউণ্ডারি করতে আসে; তাদের একজনকে দিয়ে রোগীটিকে তিনি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন, বছিরুদ্দিনের গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে।

ভদ্রলোকের চিকিৎসা তিনি সহজে করেন না। কেবল টাকাওলা ভদ্রলোক নয়, শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা পর্যন্ত কেউ কেউ পাশকরা ডাক্তারের বদলে তাকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে চান। তাদের কেমন একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে যে পাগলা-ডাক্তারের নিশ্চয় বিশেষ একটা ভৌতিক ক্ষমতা আছে—মন্ত্রতন্ত্র জানে, গাছগাছড়া শিকড়বাকড় পেয়েছে সাধুটাধু ফকিরটকিরের কাছে। এতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, হতভম্ব হওয়া চলে। আমি নিজে (মানে তোমরা যে কাহিনী পড়ছ তার লেখক) দু'চারজন নামকরা বিজ্ঞানের অধ্যাপককে জানি, যাঁরা কব্জি আর কোমরের ঘুন্‌সীতে মাদুলি ধারণ করেন, জাত যাবার ভয়ে

যার-তার সঙ্গে মস্ত বড় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন টেবিলে বসে চা পর্যন্ত খান না এবং মাঝে মাঝে পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন পড়ে নানা মন্ত্র শিখবার আশায় পোষ্ট বক্সের ঠিকানায় অগ্রিম পয়সা মনিঅর্ডার করে পাঠান। মস্ত একজন ডাক্তার কি করেন জানো? বাড়ীতে অসুখ হলে মানত করে পূজা পাঠিয়ে দেন। ভাবো দিকি ব্যাপারখানা একবার। নিজের চিকিৎসায় যার এইটুকু মোটে বিশ্বাস যে আপনজনের রোগ সারাবার ভারটা ঠাকুরদেবতার ঘাড়ে চাপিয়ে দেন, তিনিই মোটা ভিজিট নিয়ে চিকিৎসা করেন শত শত রোগীর!

ভদ্রলোক ডাকতে এলে পাগলা-ডাক্তার বলেন, 'আরে মশায়, ফাঁসিকাঠে লটকাতে চান নাকি আমাকে? আমার এক ডোজ ওষুধ খেলেই রোগী আপনার পটল তুলবে!'

মুখে হাসি আছে দেখে আগন্তুক ভাবেন পাগলা-ডাক্তারের এটা পাগলামি। সেই সঙ্গে একথাও ভাবেন, যে ডাক্তার ডাকতে এলে যেতে চায় না সে না জানি কতবড় ডাক্তার, একে নিতেই হবে! বেশী ধরাধরি করলে পাগলা-ডাক্তার লোক বুঝে ফি হাকেন। কারো কাছে চারটাকা, কারো কাছে চল্লিশ! হৃদয় নন্দী নামে একজনের কাছে তিনি চার-শো টাকা চেয়েছিলেন। হৃদয় মহাজনী কারবার করে অনেক টাকা করেছে।

রোগী দেখে পাগলা-ডাক্তার যদি বুঝতে পারেন যে নিজের বিদ্যাতেই চলবে, তা হলে ওষুধ দেন, নতুবা গম্ভীর মুখে সরকারী ডাক্তার কিংবা অক্ষয় ডাক্তারকে ডাকতে বলে ভিজিটের টাকা পকেটস্থ করে ফিরে আসেন।

পরাণ চৌধুরী পাট কিনে বেচে বড়লোক। তার ছেলের একবার হল ডবল নিমুনিয়া। একশ টাকা চুক্তি করে তার বাড়ীতে গিয়ে রোগীর অবস্থা দেখে পাগলা-ডাক্তারের মুখ থেকে চিরস্থায়ী হাসিটুকু মিলিয়ে যায় আর কি! খাঁটি কড়া কথা কেউ তাঁর মুখে কোনোদিন শোনে নি, সেদিন আরেকটু হলে গালাগালি করে বসতেন।

'আমার দ্বারা হবে না পরাণ। অক্ষয়বাবুকে আনাও শিগ্গীর—এখুনি।' বলে তিনি ভিজিটের টাকার জন্য হাত বাড়ালেন। পরাণ বলল, 'সে কি কথা ডাক্তারবাবু! রোগী দেখলেন না, ওষুধ দিলেন না—'

'দেখলাম না? আমার চোখ নেই?

'আজ্ঞে চিকিচ্ছের ব্যবস্থা কিছু করলেন না—'

'করলাম না? অক্ষয় ডাক্তারকে ডাকবার ব্যবস্থাটা কে দিল পরাণ?'

পাগলা-ডাক্তারের সঙ্গে কেউ পারে না। পরাণকে একশোটি টাকা গুণে গুণে দিতে হল। তা, টাকা না নিলে পাগলা-ডাক্তারেরও বা চলবে কেন। যারা দুটো বেগুন বা দুটো পয়সা ফি দেয় তাদেরও তো ওষুধ দেওয়া চাই!

ঘোষাল ডাক্তারের ইস্তাহারে তিনি চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ এই ঘোষণা আছে বলেই কৃষ্ণদাস বাপের চোখ দেখাতে সেখানে গিয়েছিল। অন্য কিছু হলে পাগলা-ডাক্তারকেই দেখাত সন্দেহ নেই। পাগলা-ডাক্তার তার বাড়ী গিয়ে দীননাথের চোখের ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেললেন। দেখে শুনে বললেন, 'ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে কেরে কেষ্ট?'

'ঘোষাল ডাক্তার।'

'ওর কাছে যাওয়া হয়েছিল কি জন্য? ও কি ডাক্তার না কি? ও ব্যাটা হল রোগ ব্যারামদের মাইনে করা লোক, যমরাজার পঞ্চম বাহিনী, হাতুড়ে নম্বর ওয়ান। খোঁচা লেগে চোখ ফুলেছে, ব্যাটা এঁটে বেঁধেছে ব্যাণ্ডেজ—ঘসড়ানিতে চোখের পর্দা উঠে যাচ্ছে সাত পরল। সারা রাত ঠাণ্ডা জল ঢাল চোখে, সকালে হাসপাতাল নিয়ে যাবি। শুধু জল? বোরিক পাউডার খানিকটা মিশিয়ে নিতে বললাম না?'

বিদায় নেওয়ার আগে পাগলা-ডাক্তার শুধোলেন, 'খোঁচাটা লাগল কিসে?'

[ক্রমশ]

পরের দিন বড়দিন (উপন্যাস):

এডালবার্ট স্টিফ্‌টর

আমাদের দেশের উঁচু পাহাড়ের মধ্যে এক গ্রাম আছে। সেখানকার লাল গির্জেটি ছোটো। তার চূড়ো উঁচু আর ছুঁচলো।

পিছনে অসংখ্য সবুজ ফলের গাছ। এই লাল রঙের জন্য পাহাড়ের নীল আর গোলাপী গোধূলিতেও অনেক দূর থেকে গির্জেটি চোখে পড়ে। প্রায় ডিমের মতো গড়নের এক চওড়া উপত্যকার ঠিক মাঝখানে এই গ্রামটি। গির্জে ছাড়াও গ্রামে একটি ইস্কুল, গ্রামবাসীদের জন্য বড় একটি হলঘর আর অনেকগুলি বড়বড় বাড়ি আছে। এই বাড়িগুলিতে সেই পাহাড়ি লোকদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস তৈরি হয়। উপত্যকায় ও পাহাড়ের গায়ে ছড়ানো আছে অসংখ্য কুঁড়ে ঘর। তাদের মধ্যে অনেকগুলি এতোই দূরে যে উপত্যকা থেকে নজরেই পড়ে না। সেখানকার লোকদের এই গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক খুবি কম। শীতকালে তাদের কারুর মৃত্যু হলে তুষার না-গলা পর্যন্ত প্রায়ই তারা অপেক্ষা করে, তারপর তুষার গলে পথ পরিষ্কার হবার পর তাদের মৃত আত্মীয়দের কবর দেবার জন্যে গ্রামে নিয়ে আসে। গ্রামের প্রধান মাতব্বর হচ্ছেন গির্জের পুরোহিত। সবাই তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে।

উপত্যকার মধ্যে দিয়ে কোনো পথ চলে যায়নি। ফলে বাইরের পৃথিবী থেকে খুব কম লোকই আসে: কখনো বা কেনো নিঃসঙ্গ পর্যটক, কখনো বা কোনো শিল্পী। গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যেই একটি পৃথিবী গড়ে তুলছে। প্রত্যেকের নামই প্রত্যেকে জানে, একের বংশপরিচয় অন্যের কণ্ঠস্থ। একজনের মৃত্যু হলে বাকী সবাই শোকে অভিভূত হয়, নতুন শিশু জন্মালে সবাই জানে তার নাম। সমতলবাসীদের সঙ্গে তাদের ভাষার পার্থক্য আছে। নিজেদের ঝগড়া তারা নিজেরাই মেটায়, একের বিপদে অন্যেও এগিয়ে আসে আর অসাধারণ কিছু ঘটলে দল বেঁধে ছোটে। ভারি প্রাচীনপন্থী এখানকার লোকেরা। দেয়াল থেকে একটি পাথর খসলে আবার সেটিকে যথাস্থানে তুলে রাখে। পুরনো বাড়ির গড়নে নতুন বাড়ি তৈরি করে, ভাঙা ছাত সারায় হুবহু পুরনো ছাতের নকলে। এমন কি সেখানকার চিত্রবিচিত্র রঙের গরুর বাচ্চা হলে বাছুরের রঙও হয় ঠিক একই ধরণের চিত্রবিচিত্র—আর সেই রঙ দেখলে কোন্ বাড়ির গাই সহজে চেনা যায়।

গ্রামের দক্ষিণে একটি তুষার-পাহাড় নজরে পড়ে। তার ঝকঝকে চূড়োগুলো দেখলে মনে হয় বুঝি বা ছাতের ঠিক পাশেই রয়েছে। আসলে কিন্তু অত কাছে নয়। কি গ্রীষ্ম, কি শীত—সমস্ত বছর ধরেই তার তুষারের মাঠ আর বড়বড় পাথর নিয়ে উপত্যকার উপর ঝুঁকে পড়ে সে যেন দেখে। এই পাহাড়টিকেই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে, তাই তার সম্বন্ধে গল্পের অন্ত নেই। সবস্ত গ্রামবাসীর প্রধান গর্ব হচ্ছে এই পাহাড়, যেন তারাই একে সৃষ্টি করেছে! সত্যি কথা বলতে কি পাহাড়টিও নানা ভাবে গ্রামবাসীদের সাহায্য করে। তার তুষার-ক্ষেত থেকে অনবরত জল সরবরাহ করে একটি হ্রদকে ভরে তোলে এই পাহাড় আর সেই হ্রদের উপছে-পড়া জল ঝর্ণার আকার নিয়ে নীচে নেমে উপত্যকার বুকের উপর সুন্দর স্রোত হয়ে বয়ে যায়। সেই স্রোত গ্রামের কাঠের কারখানার বড় করাত চালায়, মিলের এবং অন্যান্য ছোটোছোটো যন্ত্রের চাকা ঘোরায়, গ্রামকে পরিষ্কার করে ধুয়ে দেয় আর সমস্ত গৃহপালিত পশুর পানীয় জল সরবরাহ করে। পাহাড়ের অরণ্য থেকে অনেক কাঠ পাওয়া যায়। এই অরণ্যই আবার আভালাঁশগুলোকে (তুষারের বড়বড় চাঁই) আটকে রেখে উপত্যকাবাসীদের বাঁচায়।

দুটো বড়বড় শিঙের মতো এই পাহাড়ের চূড়ো আছে। শীতকালে সে-দুটো ঝকঝকে শাদা দেখায়। পরিষ্কার দিনের গভীর নীল বাতাসের মধ্যে তারা চোখ ধাঁধিঁয়ে দেয়। এই চূড়োর চারিদিকের পাহাড়ি মাঠগুলো তখন একেবারে শাদা, প্রত্যেকটি ঢালু একই রকম দেখতে, এমন কি খাড়া পাথরগুলো—যে-গুলোকে গ্রামবাসীরা দেয়াল বলে—তুষারের শাদা আবরণে ঢাকা। তার পায়েয় কাছের ধূসর কুয়াশাচ্ছন্ন অরণ্যের পর সেই শাদা দেয়াল হঠাৎ যেন একটি রূপকথার প্রাসাদের মতো আকাশের দিকে উঠেছে। গ্রীষ্মের সূর্য আর গরম হাওয়া পাহাড়ের খাড়াই অংশ থেকে তুষার মুছে দেয় আর সেই শিঙ দুটোয় শাদা সরু শিরা আর মাঝেমাঝে শাদা ছোপ চোখে পড়ে। আকাশের বুকে সেই চূড়োগুলি তখন কালো শিঙের মতো। কিন্তু আসলে তাদের রঙ কোমল ফিকে-নীল আর সেই শিরা ও শাদা ছোপের রঙ ঠিক শাদা নয়—দূর থেকে ঘন-পাথরের উপর তুষারকে যে-রকম দুধে-নীল দেখায়—সেই রঙ। গ্রীষ্মের উত্তাপ যখন সবচেয়ে বেশি সেই চূড়োর চারিদিকের পাহাড়ি-মাঠের উপরের অংশে গত বছরের তুষার তখনো গলে না—উপত্যকার সবুজ গাছগুলির উপর নিজেদের শাদা চোখ মেলে তারা যেন চেয়ে থাকে। কিন্তু তলার অংশ থেকে শীতের তুষার গলে যায় আর সেখানকার নানা রঙ চোখে পড়ে—যে-গুলো ঠিক নীল নয়, ঠিক সবুজও নয়। গ্রীষ্মের উত্তাপ যখন খুব বাড়ে আর অনেক

দিন স্থায়ী হয় অনেক উপকার তুষার-ক্ষেতের আবরণ তখন খসে পড়ে আর অনেকখানি নীল আর সবুজ রঙ উপত্যকাটিকে যেন দেখতে থাকে। অনেক গুহা আর অনেক চূড়ো, এতোদিন তুষারের জন্যে যাদের দেখা যায়নি, আবরণমুক্ত হয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর পাথর আর মাটি আর কাদার সঙ্গে তুষার যেখানে মিশছে সেই অপরিষ্কার জায়গাটাও নজরে পড়ে। বছরের অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে বেশি জল তখন উপত্যকার উপর দিয়ে বয়ে যায়।

শরৎকাল পর্যন্ত এইভাবে চলে। তারপর স্রোত ক্ষীণ হয়ে আসে আর একদিন ধূসর বর্ষায় সমস্ত উপত্যকা ঢাকা পড়ে। আর কিছুদিন পরে কুয়াশা কেটে গেলে দেখা যায় সেই পাহাড় আবার তার নরম পরিচ্ছদ পরেছে, উঁচু পাথর আর তীক্ষ্ণ চূড়োগুলো আবার শাদা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এখন, পাহাড়ে ওঠার কথা ধরা যাক। এই উপত্যকা থেকেই উঠতে হয়। দক্ষিণ থেকে চমৎকার একটি পথ উঠেছে। সেই পথ "নেক্"-এর উপর দিয়ে অন্য একটি উপত্যকায় পৌঁচেছে। পাহাড়ের দুটি বড় চূড়োকে যে উঁচু অংশ যোগ করে তারই স্থানীয় নাম "নেক্"। তুষারের পাহাড়কে অন্য একটি দীর্ঘ পাহাড়ের তরঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা নেক্-এর উপর দেবদারুর অরণ্য আছে। সেখানকার সবচেয়ে উঁচু জায়গায়, যেখান থেকে পথটি ধীরেধীরে ওপাশের উপত্যকায় নেমেছে ঠিক সেই-খানেই, একটি স্তম্ভ খাড়া আছে। তার নাম স্মৃতিস্তম্ভ। অনেকদিন আগে এক রুটিওলা বাক্স ভরে রুটি নিয়ে নেক্ পার হবার সময় এই জায়গায় মারা যায়। কে যেন সেই মৃত-রুটিওলা, তার বাক্স আর চারিদিকের ঝাউ গাছকে এঁকে তলায় অল্প-কথায় ঘটনাটা বুঝিয়ে এবং সেই মৃত-আত্মার মঙ্গল কামনায় সবাইকে প্রার্থনা করার অনুরোধ জানিয়ে, একটি লাল কাঠের স্তম্ভের উপর ছবিটি এঁটে যেখানে লোকটির মৃত্যু হয়েছিলো সেখানে খাড়া করে রেখেছে। নেক্-পেরিয়ে ওপাশের উপত্যকায় না পৌঁছে তুমি অবশ্য সোজা নেক্ এর উপর দিয়েই যেতে পারো। দেবদারু অরণ্যের মধ্যে যেন একটি পথ চলে গেছে! এই পথ ক্রমশ উপরে উঠেছে। সেখান দিয়ে এগিয়ে গেলে এক সময় তুমি খোলা জায়গায় পৌঁছবে। একটিও গাছ সেখানে নেই। জায়গাটা শুকনো, মাটিতে ঘাসের শুকনো চাবড়া, আগাছাও নেই। শুকনো শ্যাওলা আর যে-সব গাছ ক্ষুধিত জমিতে বাঁচে তাদের দিয়ে যেন একটি বন্ধুর গালচে-মোড়া সেই জায়গা। এখান থেকে জমিটা ক্রমশ বেশি খাড়া হয়ে উঠেছে, তোমার সামনের পথ তখন দীর্ঘ ও দুর্গম। কিন্তু আসলে তোমাকে একটি খালের মধ্যে দিয়ে এগুতে হবে, যেন একটি ফাঁপা পরিখা-পথে চলেছো—তার ভিতর থেকে তুমি সেই চাওড়া আর ফাঁকা আর সর্বত্রই এক-রকম-দেখতে জলা-ভূমিতে পথ হারাতে পারবে না। কিছু পরে পাথর দেখা যাবে। ছোটোছোটো ঝোপের মধ্যে হঠাৎ সেগুলো দেখলে মনে হয় যেন এক-একটি গির্জে। তাদের দেয়ালের ভিতর দিয়ে বেশ কিছুটা পথ তুমি উঠতে পারবে। আবার তারপর টাকপড়া পাহাড় দেখা যায়, তার পিঠে একটিও লতাগুল্ম নেই। উপরকার স্বচ্ছ বাতাসের মধ্যে সেই পাহাড় সোজা তুষারের রাজ্যে উঠে গেছে। পথের দু-পাশের জমি তখন ঢালু হয়ে খাদে নেমেছে। এই আরোহণের ফলেই তুষারের পাহাড় নেক্-এর সঙ্গে এক হয়ে আছে। বরফ এড়িয়ে যাবার জন্য এখানকার পাথরের কোণের উপর পা রেখে তুমি খানিক চলতে পারো যতক্ষণ না গত বছরের তুষারের কাছে পৌঁছও। পাহাড়ের ফাটলে-ফাটলে সেই তুষার এতো কঠিন হয়ে জমে থাকে যে বছরের প্রায় যে-কেনো সময়েই মানুষের ভার সইতে পারে। এর প্রান্তে, তুষারের ভিতর থেকে উঠেছে সেই শিঙের মতো চূড়ো দুটি—একটি অন্যটির চেয়ে উন্নত। ফলে সুন্দর দেখায়। চূড়ো দুটিতে ওঠা অত্যন্ত কঠিন। তুষার জমে কঠিন হয়ে তাদের ঘিরে আছে। কোনো রকমে পা রাখবার জায়গা হতে পারে। ফলে অধিকাংশ পর্যটককেই এখান থেকে, সেই শিঙের মতো চূড়ো পেরিয়ে যতটা দৃশ্য দেখা যায় দেখে, খুসি হয়ে ফিরতে হয়। যারা অবশ্য চূড়োয় উঠবে বলে ঠিক করেছে তাদের দরকার দড়ি আর পাহাড়ে ওঠবার লোহার সরঞ্জাম।

দক্ষিণেও পাহাড় আছে। কিন্তু কোনোটাই এতো উঁচু নয়, যদিও শরতের সুরুতেই তারা তুষারে আচ্ছন্ন হয় আর বসন্তের অনেক পরে হয় আবরণমুক্ত। কিন্তু প্রতি গ্রীষ্মেই তাদের তুষার গলে যায় আর রৌদ্রে পাথরগুলি চমৎকার চকচক করে। তাদের গভীর অরণ্যের কোমল-সবুজ রঙ নানা চাওড়া নীল ছায়ায় চিহ্নিত হয়ে ওঠে আর এত সুন্দর দেখায় যে সমস্ত জীবন ভোর দেখলেও কারুর আশ মিটবে না।

উপত্যকার অন্য পাশের, উত্তর-পূব ও পশ্চিমের, পাহাড়গুলি

যেন চক্রবালের কাছে আর অনেক নীচু। অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত মাঠ আর ক্ষেত। তাদের উপর দেখা যায় নানা অরণ্যের চূড়ো, আল্পস্ পাহাড়ের কুঁড়ে, এই ধরণের সব জিনিস। পাহাড়ের চূড়োর সঙ্গে আকাশ যেখানে মিশেছে সেখানে যেন অরণ্যের সূক্ষ্ম জাল বোনা। এই সুন্দর ঝালর দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় গাছগুলো খুব লম্বা নয়। দক্ষিণের পাহাড়ের গাছগুলো অনেকটা বড়। কিন্তু পাহাড়টা উজ্জ্বল আকাশের সঙ্গে যেখানে মিশেছে সেখানে একটিও গাছ নেই।

উপত্যকার মাঝ-পথে দাঁড়িয়ে তোমার মনে হবে সমতল-ভূমিতে যাবার কিংবা সেখান থেকে বেরুবার বুঝি একটি পথও নেই। যারা পাহাড়ে একাধিকবার এসেছে তারা অবশ্য এই ভুলের কথা জানে। আসলে শুধু যে উত্তর দিক দিয়ে সমতল-ভূমিতে যাবার একাধিক পথ আছে এবং পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে সে-রকম অনেকগুলি পথ যে প্রায়-সমতল মাটির উপর দিয়েই গেছে তা-ই নয়, দক্ষিণেও—যেখানে মনে হয় উপত্যকার চারিদিকে খাড়া পাথরের দেয়াল—একটি পথ আছে এবং সেই পথ এই নেক্-এর মাঝখান দিয়েই গেছে।

এই ছোট্ট গ্রামটির নাম জিশ্‌চেড আর সেই তুষার-পাহাড়ের নাম গারস্।

নেক্-এর ওপাশে আছে জিশ্‌চেডের চেয়েও অনেক সুন্দর আর একটি উপত্যকা। কাঠের স্তম্ভ থেকে পায়ে-চলা পথটি সেই উপত্যকাতেই গেছে। তার সামনেই মিলস্‌ডর্ফ নামে একটি সহর। সেখানে হাট বসে। নানা ধরণের কারখানাও আছে। লোক-সংখ্যা খুব কম নয়। সাধারণ সহরের লোকেরা যে-ধরণের ব্যবসা করে জীবিকা উপার্জন করে তারাও সে-ই উপায়ে সংসার চালায়। জিশ্‌চেডবাসীদের চেয়ে তাদের অবস্থা কিছুটা ভালো। এ-গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে লাগে মাত্র তিন ঘণ্টা। যারা পাহাড়ে থাকে তাদের কাছে এই পথ বিশেষ কিছুই নয়। অনেক দূর হাঁটা আর নানা কষ্ট স্বীকার করা তাদের অভ্যেস হয়ে যায়। তবু এই দুই উপত্যকাবাসীদের আচার-ব্যবহার এতোই বিপরীত, এমন কি চেহারাতেও এতো গরমিল যে দেখলে মনে হয় তাদের মধ্যে বুঝি অনেক মাইলের ব্যবধান। পাহাড়ে অবশ্য এ-ধরণের ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু এই দুই উপত্যকাবাসীদের মধ্যেও অন্তত একটি মিল আছে: দু-জায়গার লোকেরাই প্রাচীনপন্থী, একের সঙ্গে অন্যে মেলামেশা না করলেও তাদের দিব্বি চলে; নিজেদের উপত্যকাকে তারা অসম্ভব ভালোবাসে এবং সে-জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও বাঁচতে পারে না।

[ক্রমশ]

ভ্যাবাচাকা : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গনি মিঞা আছেন বসে মুখটি করে বিশুষ্ক,
বাড়ি তাঁহার কেউ বলে না তুরুষ্ক।
ভড়কা খেয়ে ছিদাম দাদা আছেন রাগে ঠাসিয়া,
বাড়ি তাঁহার কেউ বলে না রাশিয়া॥

ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পান্না বাড়ী ফিরল বীরদর্পে: বাড়ীর আর কেউ নিশ্চয়ই ওই আশ্চর্য্য রাজত্বের খবর জানে না। ছোট বোন মিনি বসে পিসিমার কাছে গল্প শুনছিলো; ওদের দেখে পান্নার রীতিমতো মায়া লাগল। ভাবল সবটুকু ভালো করে বোঝানো দরকার। ক্ষুদে শয়তানের কথা সুরু করতেই মিনির চোখ হয়ে গেল গোলগোল, মুখ হাঁ। কিন্তু পিসিমা মুখ ব্যাজার করে বল্লেন, "কোথা থেকে ছেলে যতসব আষ্টেলা কথা শুনে এসেছে! না হয় আজকালই চোখে কম দেখি, কিন্তু দিষ্টি ত' এককালে ছিলো। তখন যে দিন-রাত চারপাশে পোকামাকড় দেখেছি তা ত' মনে হয় না।" পান্না বোঝাতে গেল, "আসলে অনুবীক্ষণ দিয়ে···।" কিন্তু পিসিমার এক ধমক, "যত সব মেলেচ্ছ কথাবাত্তা শিখে···।" পান্না দেখলে সেকালের লোকদের নিয়ে বড় মুস্কিল, এদের কী করে সব বোঝানো যায়? ভাব্‌লে: কাল বিকেলে আবার সে ভদ্দরলোকের সঙ্গে দেখা হবে, তখন এ কথা জিগ্‌গেস করে নেওয়া যাবে! পরের দিন সময় যেন আর কাটতে চায় না, কখন বিকেল হয়! স্কুল থেকে নাকেমুখে জলখাবার গুঁজে ছুটলো মাঠে। দেখল ইতিমধ্যেই ভদ্দরলোক এসে বসে আছেন, জগু আর ঘোঁতনও জুটেছে। পিসিমাকে নিয়ে মুস্কিলের কথা পান্না বল্লে; ভদ্রলোক শুনে একটু হাসলেন। বল্লেন, "সেকালের লোকের কথা ছেড়ে দাও। ভুত, প্রেত, মাম্‌দ, ব্রহ্মদত্তি, ডাইনি, পেতনি, কত

রকমের জিনিস ওরা মানত। যতদিন যাচ্ছে ততই বোঝা যাচ্ছে ও সব কথা নেহাত আজগুবি। এই ধরো না জীবাণুর কথাই বলি। এর কথা জানত না বলেই ওরা মনে করত যে ধুলো বালি কাদা থেকে মাঝে মাঝে জীবন্ত জিনিসের জন্ম হয়। গোবর পচে বিছে হয়, বর্ষার জল পড়লে কাদা থেকে পোকা গজায়, জিনিসপত্তর পচতে পচতে তার মধ্যে পোকা কিলবিল করে ওঠে! এই সব দেখে দেখে সেকালের লোক মনে করত যে যে-সব জিনিসের মধ্যে প্রাণ নেই সে সব জিনিস থেকেও জীবন্ত পোকা মাকড়ের জন্ম হয়। কিন্তু আসলে অনুবীক্ষণ ছিলো না বলে এবং জীবাণুর খবর রাখত না বলে এই সব ধারণা ওদের মাথায় ঢুকেছিলো।

জীবাণু বাদ দিয়ে যে জীবের জন্ম হয় না সে কথা পণ্ডিতেরা প্রমান করেছেন। কেমন করে করেছেন বলছি, শোনো।—প্রায় শ' খানেক বছর আগে পণ্ডিতেরা একটা মজার পরীক্ষা সুরু করলেন। খানিকটা জলে এক টুক্‌রো মাংস বা পচা পাতা ফেলে সেটা একটু গরম জায়গায় রেখে দিলেন। কিছুদিন পরে সেই জল এক ফোঁটা তুলে অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখা গেল তার মধ্যে অসংখ্য জীবাণু খলবল করছে। কোথা থেকে এল এরা? ১৮৩৭এ সিওয়ান্ বলে এক পণ্ডিত বল্লেন: আর কিছু নয়, এগুলো হাওয়ায় ভেসে এসেছে, জলের মধ্যে মুখরোচক খাবার পেয়ে সেখানেই গেড়েছে আড্ডা! তখন অনেকে মনে করত শুধু হাওয়া থেকে নতুন জীবাণুর জন্ম হয়, হাওয়ার ভেতকার জীবাণু থেকে নয়। সেই সব লোকের মত যে ভুল তা প্রমাণ করবার জন্যে সিওয়ান একটা অদ্ভুত কাঁচের পাত্র তৈরী করলেন; সেটা দেখতে একটা বোতলের মতই, কেবল বোতলের মুখটা যেমন সোজা ওপোর দিকে ওঠে সে রকম নয়। সিওয়ানের বোতলের মুখটা অনেক লম্বা আর পাশের দিকে বাঁকা। সেই বোতলে পরিষ্কার জীবাণুহীন জল ঢেলে বাঁকা মুখটার সামনে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। তাহলে, হাওয়া যখন নলের মধ্যে দিয়ে যাবে তখন নিশ্চয়ই সেই হাওয়ায় যে সব জীবাণু আছে সেগুলো যাবে পুড়ে, অথচ বোতলের মধ্যে ঢুকবে হাওয়া। দেখা গেল, এই ভাবে হাওয়া ঢুকতে জলে আর জীবাণু জন্মাবে না। তা হলে ত' প্রমাণ হল জীবাণু হাওয়া থেকে জন্মায় না, হাওয়াতেই ভাসে। প্রাণহীন জিনিস থেকে প্রাণীর জন্ম হতে পারে না।"

জগু মন দিয়ে সব শুনছিলো। হঠাৎ জোর গলায় আপত্তি করে উঠল, "তা কী করে প্রমাণ হয় মশায়? পোড়া হাওয়া আর তাজা হাওয়া কি এক জিনিস হল? এমন ত' হতেই পারে যে হাওয়াকে পুড়িয়ে নিলে তার এমন ক্ষতি হতে পারে যে ঠিক যে-যে গুণের দরুণ তা থেকে জীবাণু জন্মাতে পারতো সেই-সেই গুণগুলোই নষ্ট হয়ে যায়?"

"ঠিক বলেছো, ভারি বুদ্ধিমানের মতো বলেছো", ভদ্রলোক আনন্দে প্রায় আটখানা হয়ে পড়লেন! "আসলে সিওয়ানের প্রমাণটা সত্যিই নির্ভুল নয়। কথাটার আসল প্রমাণ করলেন লুই পাস্তর। লুই পাস্তরের নাম শুনেছ? নিশ্চয়ই শুনেছ। অমন আশ্চর্য্য মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই জন্মেছেন। তাঁর সমস্ত জীবন যেন একটা রোমাঞ্চকর গল্পের মতো। কত অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনা! কত সব বিপজ্জনক পরীক্ষা! সে সব শুনতে-শুনতে শিউরে উঠতে হয়। পরে একদিন পাস্তরের কথা তোমাদের অনেক বলব। আপাতত শুধু দু-একটা পরীক্ষার কথা বলি।"

[ক্রমশ]

ফিঙেবাবুর অসুখ : শ্রীশামুক

এলাহাবাদের কথা মনে হলেই সবচেয়ে আগে মনে পড়ে অবনীবাবু ডাক্তারকে। মোটাসোটা হাসিখুসি সুন্দর চেহারা। ঘন ঝুরি গোঁফের আগাছা প্রায় সমস্ত মুখ ঢেকেছে, ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় শুধু কামানো চিবুকের সবুজ অংশটুকু ও গালের দু'পাশ। গায়ে গলাবন্ধ লম্বা কোট ও তার সে কী বড় বড় পকেট, যেন ছেলেধরার ঝুলি এক একটি। পকেট সব সময় ঝোলার মতন ফোলা—যেন কোন হ্যাংলা ছেলের পেট—টাই টম্বুর।

ওতে থাকে হরেক রকমের জিনিষ। বুকদেখার যন্ত্র; থারমোমিটার, পকেট বই, প্রেস্‌ক্রিপসন্‌, টাকা, খুদে রোগীদের জন্য টফি লজেঞ্জ, আর মাঝে মাঝে দু'একটি গিনিপিগ বা বিলিতি ইঁদুরও!

এখানে বলা যেতে পারে যে ডাক্তারবাবুর ভারি শখ জন্তুজানোয়ার পোষা। বাড়ি একটি চিড়িয়াখানা বিশেষ। বেতো ঘোড়ার গাড়িতে যখন রোগী দেখতে বার হ'ন তখনও সঙ্গে থাকে—কুকুর, মেনি বিড়াল, ময়না পাখী; গোটাকতক খরগোস; গিনিপিগ বা ইঁদুর। রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে চলতি গাড়িতে ডাক্তারবাবু ওদের কোলে করে আদর করেন, কত কথা বলেন, আর টিনের বাক্স খুলে জানোয়ারদের সব মুখরোচক খাবার খাওয়ান। সুতরাং পকেটের ভিতর দু'এক বন্ধুর সব সময়ে থেকে যাওয়া আশ্চর্য্য নয় কিছু।

আমাদের বাড়িতে কিছু হলেই ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া হ'ত! কোনদিন অন্য কারুর ওষুধ খেয়েছি বলে ত' মনে হয় না। একবার চিকিৎসা করতে এসে কি কাণ্ডটি ঘটলো আসলে সে কথা বলবার জন্যই এতক্ষণ ওঁর পরিচয় কিছু দিলাম।

বাবার এক বড়লোক বন্ধুর ছেলে কলকাতা থেকে চাকরি করতে এল। ছেলেটি কোন কাজকর্ম করতে চায় না, এবং আড্ডার বহর এমন ভয়ানক ভাবে বাড়িয়ে চলেছিল যে ভবিষ্যতের আশা ছেড়ে দিয়েছিল আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব অনেকেই। সেজন্য বাবার কাছে অনেক অনুনয়-বিনয় করে চিঠি এল,—ভাই এ তোমারই ছেলে, তোমার আপিসে একটা হিল্লে করে দিতেই হবে।

কলকাতার বাবু এলেন। সুটকেশ খুলে তার প্রসাধনের জিনিষপত্র টেবিলে সাজাবার কায়দা দেখে চোখ কপালে উঠে যায়। বুঝতে পারা যায় কেন এত পিন্‌পিনে ফিন্‌ফিনে রোঁয়া-ওঠা-দাঁড়কাকের মতন চেহারা। বাবা আপিস চলে যেতেই ডেকে বলে,—ওহে খোকা শুনে যাও, তুমিও ত' দেখছি একটি আস্ত ছাতু! বলি এ ছাতুর দেশে ভাল সেলুন আছে? আসবার সময় চুলটা ছাঁটা হয়নি। ভাল সেলুন চাই। দেখছ ত' এই ঢেউ খেলানো চুল, এর একটি ঢেউ ছোটবড় হয়ে গেলে তার জান্‌ খেয়ে ফেলবো!—চোখ রাঙিয়ে এক গোছা চুল দু'টি আঙুলে টিপে নিজের দাড়ি পর্যন্ত টেনে এনে ছেড়ে দিল, স্প্রিং-এর মত লাফিয়ে চুল ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

এমন রাগ হ'ল এই অসভ্য কথা শুনে আর চালমারা ঢঙ দেখে—বিশেষ ঐ খোকা বলে ডাকা, যেন আমার নাম নেই কোন—কিন্তু বাবার ভয়ে কিছু না বলে সেখান থেকে চলে গেলাম।

আরো দু'চারদিনে অন্য গুণেরও পরিচয় পাওয়া গেল। বাবু ত বাবু যাকে বলে কলকাতার আসল ফিঙেবাবু। রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে জ্বর আসে, বৃষ্টিতে ঘরে বসে লাগে সর্দি, বাড়িতে উনুন ধরালেই মাথা ধরে যায়, তরি-তরকারি রাঁধতে ফোড়ন দিয়েছো কি—হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো—একশ' আটটি। এর উপর আরো আছে। অন্ধকারে চলতে গা ছম্‌ছম্‌, নতুন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে তোতোতো, আর কোন পোকামাকড় গায়ে বা মাথায় পড়েছে ত' হিহিহি—সে কী কাঁপুনি, যেন ধরেছে খাস মুন্সীগঞ্জের ম্যালেরিয়া!

চাকরি হ'ল। ভাল চাকরী। ওর বিদ্যের তুলনায় অনেক ভাল। কিন্তু করবে কে? আজ মাথা ধরা, কাল দাঁত কন্‌কন্‌, পরশু পেটের গোলমাল—এ আর থামতে চায় না। কোনদিন বা যায় আপিসে, কিন্তু পালিয়ে আসতে তর সয় না। অশ্চর্য্য হতাম যে কী করে একটা মানুষ আপিসের ভয়ে সারাদিন বসে-শুয়ে কাটাতে পারে। আমাকে ত' ওর বদলে নর্দমা সাফ করতে বললে দৌড়ে যেতাম।

বাবার সামনে ভিজে বেড়াল কিন্তু আমাদের ভাই-বোনেদের উপর যত ফাইফরমাসের জুলুম।

—হেঁ, এই ছাতুর দেশে চাকরি করতে—জামা-কাপড় পরতে জানে না, চুল আঁচড়াতে জানে না, হেঁ—এই রোদ্দুরে খেয়ে দৌড়ও আর সারাদিন পিঠ ব্যাথা করে কাজ কর—যাও এক মিনিটে এক গেলাস জল আর দুটো পান নিয়ে এস, যাও।

বাবা বড় রাশভারী মানুষ। খুব ধমকে দিলেন একদিন, আপিস যেতেই হবে। বাবার সামনে সেজেগুজে আপিস গেল তারপর দেখা যায় নিজের ঘরে অঘোরে ঘুমাচ্ছে, বুকের উপর এক ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস চাপা দেওয়া। এ ছাড়া নিত্য অসুখের কামাই ত' আছেই। রাগে বাবার যেন জ্ঞান হারিয়ে যায়, অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রাখেন। এদিকে বন্ধু হরদম চিঠি লিখছেন,—ছেলের একটি হিল্লে করে দিতেই হবে, ওকে মানুষ করার ভার তোমার উপর ছেড়ে দিলাম ভাই! কত বিপদে পড়ে যে তিনি ভারটুকু ছেড়ে দিয়েছেন সে আর কারুকে বলে দিতে হয় না। বাবা ঠিক করলেন আপিসে যাবে-আসবে তাঁর সঙ্গে এবং তাঁরই ঘরের এক পাশে বসে ও কাজ করবে। যেদিন থেকে এই ব্যবস্থা ঠিক সেদিন সকালে হ'ল বাবুর ভয়ানক অসুখ। সে কী ভয়ানক অসুখ! কী অসম্ভব ছটফট'নি। বিছানার উপর গড়াগড়ি এধার থেকে ওধার! বুকে অসহ্য যন্ত্রণা যেন পাঁজরার হাড়গুলো পটাপট ছিঁড়ে ফেলবে এখুনি। চোখ শক্ত করে বন্ধ করে থাকে, দাঁতে দাঁত চেপে মুখ খিঁচোয়, আর কপাল এত জোরে কুঁচকোয় যে রেখায় রেখায় তৈরি হয়ে যায় রাশিয়ার এক হিজিবিজি ম্যাপ!

ভয়ে সকলের মুখ গেল শুকিয়ে। মা বলে, পরের ছেলে নিয়ে একি বিপদে পড়া দেখ ত'! বাবা বিষন্ন মুখে মাথা নেড়ে বলেন, নিশ্চয় কোন কলিক-টুলিক হবে কারণ থারমোমিটারে জ্বর উঠলো না। এর আগে কলিকের নাম শুনিনি কোন দিন। সেদিন দেখলাম যে কলিক মানে শরীরের ভিতর চীন-জাপানের যুদ্ধ। এদিকে অবনীবাবু বাড়ি নেই। ভোরে উঠে কোথায় রোগী দেখতে গেছেন দূরে, ফিরতে দেরি হবে। মা বাবা মিলে যতদূর সম্ভব ডাক্তারি করতে থাকেন। কিন্তু রোগী বা রোগ বাগ মানে না কিছুতেই। বাবার আপিস যাবার পর অনেক বেলায় অবনীবাবু ব্যস্ত ভাবে এসে হাজির। তাড়াতাড়ি নিয়ে যাই রোগীর ঘরে। দেখি মা বসে হাওয়া করছে, রোগী বেশ অনেকটা শান্ত। অবনীবাবু মন দিয়ে বুক-পিঠ পরীক্ষা করেন, খুঁজে পাননা কিছু। কিছু জিজ্ঞাসা করলে ফিঙেবাবু শুধু উঃ-আঃ যন্ত্রণার আওয়াজ করে, কথা বলে না। ওর বদলে মা এক নিশ্বাসে সকালের হঠাৎ বাড়াবাড়ির খবর বিস্তারিত ভাবে ডাক্তারবাবুকে জানিয়ে দেয়। ডাক্তারবাবুর কপাল কুঁচকে গেল চিন্তায়। ব্যাপার কি? রোগ যে বড় ভীষণ, ধরা পড়তে চাইছে না। মিষ্টি করে রোগীকে বলেন, একটু সরে শোও ত' ভাই আরেকবার দেখি! রোগী অনেক কষ্টে অনেক যন্ত্রণার শব্দ করে একটু সরে গেল। বিছানাতেই তার গা ঘেঁষে বসে ডাক্তারবাবু বুক দেখার যন্ত্রটি আবার কাণে লাগালেন। আমি একটু দূরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখি ডাক্তারবাবুর পকেট থেকে একটি সাদা বিলিতি ইঁদুর উঁকি মারছে। হাসি পেলেও হাসলাম না। ইঁদুর ভায়া আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে কোলের উপর, গোঁফ নেড়ে চারিদিকে পিটির পিটির দেখে। শেষে রোগীর গায়ে ঢাকা চাদরের উপর নামে! ঐ যাঃ, ভিতরে ঢুকে গেল!

একটা উক্‌ করে শব্দ মুখ থেকে আপনি বেরিয়ে গেল। কি করি ভেবে না পেয়ে দু'পা এগিয়ে যাই সামনে। অজান্তে এক দুই তিন গুনছিলাম মনে মনে, ঠিক পাঁচে পৌচেছি আর বোমা ফাটলো যেন।

রোগীর শরীরে ভূমিকম্প হয়ে গেল, মুখ দিয়ে শব্দ যা বেরুল অবিকল তারই। তারপর হালুম করে এক লাফ মেঝের উপর—লম্ফ দুই সামনের রোয়াকে—তিন নম্বর বাগানে—চার সোজা দৌড়—দৌড় দে দৌড়। খেয়াল নেই জ্ঞান নেই যে নিজের আপিসের দিকেই ছুটে চলেছে!

রংমশাল বৈঠক

কার্তিক মাসের প্রতিযোগিতার ফল :

১। গল্প নয়—শ্রীঅলকা দত্ত (গ্রাহক নং ১৬৯৯)
২। চাঁটির জালায়—শ্রীযশোধন ভট্টাচার্য্য (গ্রাহক নং ১২০৯)

শ্রীমান যশোধন ভট্টাচার্য যে ফটো পাঠিয়েছিলো সেটি থেকে ব্লক করা সম্ভব হোলো না।

শ্রীঅলকা দত্ত, গ্রাহক নং ১৬৯৯

চাঁটির জ্বালায় : যশোধন ভট্টাচার্য

[কার্তিকের ২নং প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার]

ডাকাত-সর্দার বললে, "দেখি, পকেটে কী আছে ?"

কাঁপতে কাঁপতে টেকো-জীতেন উত্তর দিল, "কিছু নেই।"

অমনি পাঁচজন ডাকাত পালা করে মারলে টেকো-চাঁদিতে তিনটে করে চাঁটি। টেকো-চাঁদি পনেরো চাঁটির জ্বালায় লাগল জ্বলতে। জীতেন প্রতিবাদ করতে গিয়ে কি ভেবে করলে চুপ। আবার হল প্রশ্ন। কিন্তু এবারেও সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে আবার পনেরো চাঁটি টেকো-চাঁদি দিল জ্বলিয়ে। এবারও জীতেন রইল ধৈর্য্য ধরে! শেষকালে আবার পনেরো চাঁটি খেয়ে ধৈর্য্যের বাঁধ গেল ভেঙে। চীৎকার করে বলল জীতেন, "তিন পনেরোং পঁয়তাল্লিশ চাঁটি খেয়ে বোধ হয় আমার টাক গেছে ফেটে। আর আমি চাঁটি খেতে পারব না।" অমনি ডাকাতের দল এল ছুটে, "হল কি? অন্য কথা বললে কেন? বেশী লেগেছে বুঝি? কিন্তু-কিন্তু.........."

কিন্তু কি হল বুঝতে পারলে না? একটা ফিল্মের দৃশ্য হচ্ছিল তোলা। জীতেন সেজেছে নিরীহ ভদ্রলোক, আর তার বন্ধুরা ডাকাতের দল। যাহোক ম্যানেজার এলেন ছুটে হন্তদন্ত হয়ে, "এঃ, 'ব্রিলিয়াণ্ট' হচ্ছিল, কিন্তু শেষটা দিলেন একেবারে 'মার্ডার' করে। আর একটু ধৈর্য্য ধরলেই পারতেন। আমাকে এখন অনেকটা 'ফিল্ম' হবে ছাঁটতে।"

এবার জীতেন হয়ে উঠল আরো খাপ্পা, "আমি আজন্মকাল চাঁটি খাবার জন্যে জন্মগ্রহণ করিনি। ছেলেবেলায় মার চাঁটি, প্রথমভাগ পড়বার সময় মেজমামার চাঁটি, স্কুলে থার্ডমাস্টারের চাঁটি—আর এই বুড়ো-বয়সে বন্ধুর চাঁটি। উঃ, আমার জীবনটা হয়ে গেছে চাঁটিময়। আমি বিদায় নিচ্ছি। খালি চাঁটি! চাঁটি!! চাঁটি!!! দূর ছাই"—বলে টেকো-জীতেন গটমট করে বেরিয়ে গেল স্টুডিও থেকে।

চলন্তিকা

গত ২রা অক্টোবর, সোমবার, মহাত্মা গান্ধীর ৭৬ বছর পূর্ণ হোলো। তাঁর জন্মদিন উৎসব পৃথিবীর নানা দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সবচেয়ে সুন্দর হয়েছিলো ওয়ার্ধায়। কস্তুরবা'র স্মৃতি রক্ষার্থে দেশবাসীর কাছে চাঁদা চাওয়া হয়েছিলো এবং ঠিক ছিলো মহাত্মাজীর জন্মদিনে ৭০ লক্ষ টাকা দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে। সুখের বিষয় সমস্ত ভারতবর্ষ মুক্ত হস্তে দান করেছে এবং ইতিমধ্যেই চাঁদার অঙ্ক এক কোটির উপর উঠেছে। মহাত্মাজী বলেছেন ভারতবর্ষের নারী ও শিশুদের শিক্ষার জন্যে এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

* * * * *

গত যুদ্ধ	বর্তমান যুদ্ধ
১৯১৩ = ১৪	১৯৪০ = ১৪
১৯১৪ = ১৫	১৯৪১ = ১৫
১৯১৫ = ১৬	১৯৪২ = ১৬
১৯১৬ = ১৭	১৯৪৩ = ১৭
১৯১৭ = ১৮	১৯৪৪ = ১৮
১৯১৮ = ১৯ (শান্তি)	১৯৪৫ = ১৯ (থামবে?)

উপরের অঙ্ক কী করে পাওয়া গেলো বুঝেছো? গতবার যুদ্ধ লেগেছিলো ১৯১৩ সালে। ১+৯+১+৩ = ১৪ হয়। এবারে ঠিকমতো যুদ্ধ লেগেছে বলতে গেলে ১৯৪০ সালে। ১+৯+৪+০ = ১৪। এইভাবে যো করে দেখো ১৯১৮'র সঙ্গে ১৯৪৫ মিলে যাচ্ছে। গত যু

থেমেছিলো ১৯১৮-তে। এই যুদ্ধ তা হলে কি থামবে ১৯৪৫-এ?

* * * *

খবর পাওয়া গেছে যে রুষ বৈজ্ঞানিক প্রফেসর ভ্লাডিমির নেগরভ্‌স্কি গত আট বছর ধরে ক্রমাগত চেষ্টা করার পর মৃত মানুষকে জীবন ফিরিয়ে দিতে পারছেন! হালে তিনি বারজন সৈনিকের মৃত্যুর ছ'-মিনিট পরে আবার বাঁচিয়ে তুলেছেন। মৃতদেহের মধ্যে নতুন রক্ত চালান করা এবং গলার মধ্যে পাম্পের সাহায্যে টাটকা বাতাস পাঠিয়ে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস চালানো—মোটামুটি এইভাবে তিনি এই অবিশ্বাস্য ও আশ্চর্য ঘটনা সম্ভব করছেন।

সম্পাদকের দপ্তর

বিজয়ার ভালোবাসা জেনো। তোমাদের অনেকের কাছ থেকে বিজয়ার চিঠি পেয়ে খুব খুসি হয়েছি।

প্রেসের গোলমালে আশ্বিন-সংখ্যা রংমশাল ছাপা হতে অসম্ভব দেরি হয়ে গেলো। এ জন্যে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। পত্রিকা নিয়মিত বার করবার জন্যে আমরা খুব চেষ্টা করছি। কিন্তু মাঝেমাঝে এমন কতকগুলি বাধা এসে পড়ে যার উপর আমাদের কোনো হাত নেই। যাই হোক, ভবিষ্যতে আশাকরি এ-রকম দেরি হবে না।

কার্তিক মাসের হাসির গল্প প্রতিযোগিতার ফলাফল ছাপানো হোলো। সবচেয়ে দুঃখের কথা কোনো প্রতিযোগিতাতেই তেমন সাড়া পাচ্ছি না। কার্তিকের প্রতিযোগিতার জন্যে তো মাত্র আটটি গল্প পেয়েছিলুম। ভালো গল্প একটিও নেই বলতে গেলে। পুরস্কারপ্রাপ্ত একটি গল্প ছাপা হোলো। অন্যটি ছাপা সম্ভব হোলো না।

যদি তোমরা যোগ না দাও তা হলে প্রতিযোগিতার সার্থকতা কী? পুরস্কার পাওয়ার মধ্যেও কোনো মজা নেই। দুজনের মধ্যে একজন প্রথম আর একজন দ্বিতীয় হলে তোমাদেরই কি ভালো লাগবে?

অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'সুকুমার রায়'-সংখ্যা করার চেষ্টা হচ্ছে। সময়মতো প্রতিশ্রুত লেখাগুলি পেলে অনেক পড়বার জিনিস থাকবে, দেখো।

নতুন ধাঁধাঁ

একটি পুলির (লোহার গোল চাকার উপর) একটি দড়ি ঝোলানো। দড়ির একদিকে একটা বাঁদর বাঁধা আর অন্য দিকে একতাল লোহা। বাঁদর আর লোহার তালের ওজন সমান। দড়িটার প্রতি ফুটের ওজন চার আউন্স। বাঁদর আর তার মা-র বয়েসের ওজোন যোগ করলে হয় চার বছর। বাঁদরটার ওজন যত পাউণ্ড তার মা-র বয়েস ঠিক তত বছর। বাঁদরের মা-র উপস্থিত বয়েস হল বাঁদরের একটা বিশেষ বয়েসের দ্বিগুণ। কোন্ বয়েসটা বলছি: বাঁদরের মা-র বয়েস যখন বাঁদরের বয়েসের তিনগুণ ছিলো তখন তার মার যা বয়েস ছিলো বাঁদরটার বয়েস যখন তার তিনগুণ হবে, তখন সেই বয়েসটার অর্দ্ধেক বয়েস হবে। দড়ির ওজন আর লোহার তালের ওজন মিলে হল বাঁদর ও লোহার ওজন যোগ করলে যা হয় তার থেকে লোহার ওজন বাদ দিলে যা থাকে তার তিনভাগের দু-ভাগ। দড়িটা তা হলে কতখানি লম্বা বলতে পারো?

আশ্বিন মাসের ধাঁধাঁর উত্তর

রাজ্যের যতগুলি অধিবাসী ঠিক ততগুলি জুতো।

যাদের একটা করে পা নেই তাদের জন্যে লাগলো একটি করে জুতো। আর বাকী লোকের অর্দ্ধেক সংখ্যা জুতো পরতে না-চাইলে যতগুলি জুতোর দরকার, রাজ্যের প্রত্যেকটি লোক যদি একপাটি করে জুতো পরে তা হলেও লাগবে ঠিক সেই একই সংখ্যা জুতো।

সেই রাজ্যের এক-পা-ওলা লোকের সংখ্যা শতকরা পাঁচ না-হয়ে শতকরা যে-কোনো সংখ্যাই হোক-না কেন, হিসেব করে দেখ, উত্তর এই একই হবে!

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.
Established by Prof. K. N. Sen.

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ।

ডিরেক্টার-বর্গ।

মিঃ জে. সি. মুখার্জ্জি	বার-অ্যাট্-ল—ভূতপূর্ব্ব চীফ প্রধান একজিকিউটিভ অফিসার কলিকাতা কর্পোরেশন। ডিরেক্টার—আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট কোং।
খান বাহাদুর এম. এ. মোমিন সি. আই. ই.	ডিরেক্টার—নিউ এসিয়াটিক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ, আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ।
মিঃ জি. ভি. সোয়াইকা	প্রোঃ—সোয়াইকা অয়েল মিলস্, ম্যানিজিং ডাইরেক্টর—সোয়াইকা কেমিক্যাল এণ্ড মিনারেল কোং লিঃ। সোয়াইকা ফার্টিলাইসর লিঃ, সোয়াইকা ষ্টাণ্ড অয়েল এণ্ড বার্ণিশিং কোং।
মিঃ এন্. সি. চন্দ্র	ডিরেক্টার—ন্যাশনাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ, বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ, মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ।
মিঃ বি. সি. ঘোষ	কন্ট্রোলার—হিন্দুস্থান কোঃ অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ।
মিঃ এস. দত্ত—(ম্যানেজিং ডাইরেক্টর)	ডিরেক্টার—এইচ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ, রামচুর্ল্লভপুর টি কোং লিঃ, ব্রিটিশ ডিষ্ট্রিবিউটারস্ লিঃ।

আদায়ী মূলধন	৯,২৫,০০০ টাকার উর্দ্ধে
গচ্ছিত আমানত	১,১০,০০০ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন	১,৫০,০০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে

জেনারেল ম্যানেজার—**জে. এন্. সেন,** বি. এ. এফ. আর. এস. (লণ্ডন)

রংমশাল

সু কু মা র রা য় সং খ্যা

[নবম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ, ১৩৫১]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে—
নাইবা তাহার অর্থ হোক্
নাইবা বুঝুক বেবাক লোক।
আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে,
ছুট্‌লে কথা থামায় কে?
আজকে ঠেকায় আমায় কে?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ্ তব্‌লা বাজে—
রাম-খটাখট্ ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ্
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ্।
আলোয় ঢাকা অন্ধকার,
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।
গোপন প্রাণে স্বপন দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চ ভূত!
হ্যাংলা হাতী চ্যাং-দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরাণী পক্ষিরাজ—
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর—
গানের পালা সাঙ্গ মোর।
আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।

স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের হাতের লেখার প্রতিলিপি। কবিতাটি মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে লেখা। কবিতাটি পড়তে হয়তো তোমাদের খুব মজা লাগবে, কিন্তু যখন বড় হবে তখন বুঝতে পারবে এর ভাব কত সুন্দর আর গভীর!

 উল্টোপাল্টা ছড়া : প্রেমেন্দ্র মিত্র

কত অসাধারণ মানুষের কথাই তো আমরা মনে করে রাখি। তাঁদের কেউ সেকালের মস্ত বড় যোদ্ধা, কেউ একালের মস্ত বড় পণ্ডিত, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ দুঃসাহসী [illegible]টিক।

আজ যাঁর কথা বিশেষভাবে তোমাদের স্মরণ করতে লছি, সেই সুকুমার রায় মস্ত বড় পণ্ডিতও ছিলেন না, দ্ধও করেননি কখন। তিনি শুধু লিখতেন—আর লিখতেন এমন কিছু ভারি-ভারি কেতাবও নয়। এমন কি সাধারণ গল্প-উপন্যাসও তিনি লেখেননি। তিনি শুধু বলতে গেলে বেশির ভাগ ছড়াই লিখে গেছেন, কিন্তু সেই ছড়ায় এমন রঙের ছটা, এমন রসের তরিবৎ, যে, বাংলা দেশ তাতে মশগুল হয়ে থাকবে চিরকাল।

সামান্য ছড়াকাটার এত কদর কেন? কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, তাহলে নিশ্চয় বুঝবে সুকুমার রায়ের সঙ্গে তার চেনাশুনো হয়নি; যদিও বাংলা যার ভাষা এমন কারুর

সঙ্গে সুকুমার রায়ের লেখা না-পড়া, বিশ্বাস করবার ব্যাপার নয় বলেই মনে হয়।

সুকুমার রায়ের লেখার আসল মজা এই যে তাঁর সব কথাই সোজার বদলে উল্টো। সিধের জায়গায় বেয়াড়া। আয়নায় যেমন ডান দিকটা বাঁ হয়ে যায়, তেমনি তাঁর মনের আয়না থেকে ঠিকরে সব কথা ঝিকমিকিয়ে ওঠে উল্টোভাবে। আর সেকি যেমন-তেমন উল্টো—মামুলি ন্যায়-শাস্ত্র আর ব্যাকরণ সে ছড়ার তোড়ে নাকানি-চোবানি খেয়ে একেবারে নাজেহাল। বাংলা দেশে উল্টো ছড়ার রেওয়াজ তিনিই প্রথম আনেন, আর হিসেব-করা-কথার গদাইলস্করী-কুচকাওয়াজ দেখে দেখে হাঁপিয়ে-ওঠা আমাদের মন হঠাৎ এই বেফাঁস বুলির হুল্লোড়ে এসে নিশ্বেস ফেলে বাঁচে।

তা বলে একথাও ভুললে চলবে না যে সুকুমার রায়ের লেখা শুধুই যদি এলোমেলো উল্টোপাল্টা হত তাহলে এত দাম তার কেউ দিত না। ভেতর দিকে একেবারে সরল সোজা বলেই তাঁর লেখা বাইরে অমন উল্টো। চারিদিকে যা কিছু তাঁর বাঁকা বা বেয়াড়া ঠেকছে, তা সিধে করে দেবার জন্যই তিনি যেন ইচ্ছে করে নিজের কথা বাঁকিয়ে উল্‌টিয়ে বলেছেন। আমরা যখন তাঁর শব্দের ফুলঝুরি আর ভাষার ডিগবাজি দেখে হেসে খুন সেই ফাঁকে নিজের আসল মতলব তিনি হাসিল করে নেন। যেকথা সোজা করে বল্লে গালাগাল বুঝে আমরা উঠি চটে, হাসিয়ে দিয়ে সেকথা তিনি বেকসুর দেন শুনিয়ে। আবোল-তাবোলের ছলে এমন চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি নইলে কে সইত?

সুকুমার রায়ের উল্টোপাল্টা ছড়ার ভেতরের মর্ম কোথায় গিয়ে পৌঁছোয়, তারই একটা আজকালকার লাগসই উদাহরণ দিয়ে এলেখা শেষ করেদি :

খিলখিল্লির মুল্লুকেতে থাকত নাকি দুই বেড়াল
একটা শুধায় আরেকটাকে 'তুই বেড়াল না মুই বেড়াল?'
তারই থেকে হয় তর্ক শুরু, চিৎকারে তার ভূত পালায়,
আঁচড় কামড় চর্কিবাজি ধাঁই চটাপট চড় চালায়।
খামচা খাবল ডাইনে বাঁয়ে, হুড়মুড়িয়ে হুলোর মতো
উড়ল রোঁয়া চারদিকেতে রাম-ধনুরীর তুলোর মতো।
তর্ক যখন শান্ত হয়, ক্ষান্ত হল আঁচড়দাগা,
থাকতে দুটো আস্ত বেড়াল, রইল দুটো ল্যাজের ডগা।

নিরুপায় : সুকুমার রায়

বসি বছরের পয়লা তারিখে
মনের খাতায় রাখিলাম লিখে—
"সহজে উদরে ধরিবে যেটুক,
সেইটুকু খাব হব না পেটুক।"
মাস দুই যেতে খাতা খুলে দেখি
এরই মাঝে মন লিখিয়াছে একি!
লিখিয়াছে "যদি নেমন্তন্নে
কেঁদে উঠে প্রাণ লুচির জন্যে,
উচিত হবে কি কাঁদান তাহারে?
কিংবা যখন বিপুল আহারে,
তেড়ে দেয় পাতে পোলাও কালিয়া
পায়েস অথবা রাবড়ী ঢালিয়া—
তখন কি করি, আমি নিরুপায়!
তাড়াতে না পারি, বলি আয় আয়,
ঢুকে আয় মুখে দুয়ার ঠেলিয়া
উদার রয়েছি উদর মেলিয়া!"

আড়ি : সুকুমার রায়

কিসে কিসে ভাব নেই ভক্ষক ও ভক্ষ্যে—
বাঘে-ছাগে মিশ হলে আর নেই রক্ষে।
শেয়ালের সাড়া পেলে কুকুরেরা তৈরী
সাপ আর নেউলে তো চিরকাল বৈরী।
আদা আর কাঁচকলা মেশে কোন দিন সে?
কোকিলের ডাক শুনে কাক মরে হিংসে।
তেল দেওয়া বেগুনের ঝগড়াটি দেখনি?
ছ্যাঁক ছ্যাঁক রাগ যেন খেতে আসে এখনি।
তার চেয়ে বেশী আড়ি আমি পারি কহিতে—
তোমাদের কারো কারো কেতাবের সহিতে।

সুকুমার রায়ের আঁকা একটি ছবি

কবি সুকুমার রায় : বুদ্ধদেব বসু

[প্রায় আঠার বছর আগে প্রবন্ধটি প্রথম 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখানে সেটি সংক্ষিপ্ত করে উদ্ধৃত করা হোলো—স:]

"সন্দেশে"র পৃষ্ঠায় সুকুমার রায়ের কত ধরণের কত লেখা ও ছবি যে পড়ে আছে, তার কে ইয়ত্তা করবে। তা থেকে বেছে বেছে দুখানি বই তৈরি করা হয়েছে—"আবোল-তাবোল" ও "হ-য-ব-র-ল"। এই বই দুখানি ভালো করে পড়লেই বোঝা যায়, সুকুমার রায় কবি ও রসলেখক হিসেবে কত বড় ছিলেন। যাঁর হৃদয় পুষ্পের হাসির মতো শুচি ও সুন্দর নয়, তাঁর পক্ষে এসব কবিতা ও গল্প রচনা করা অসম্ভব বলেই মনে হয়। তাঁর হাসির বিশেষত্বই হচ্ছে অত্যন্ত সহজ ও সরল—তার পেছনে কোনো নিরস প্রচেষ্টা নেই। তিনি তাঁর অন্তরের নিজস্ব মাধুর্য দিয়ে এই সমস্ত হাসির টুকরো তিল তিল গড়ে গেছেন; তাই মনে হয়, তিনি হাসাবার জন্যে এসব লিখে যাননি, খুবই সাধারণ কথা খুবই সাধারণ ভাবে বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কি করে জানি সে সমস্ত তরল খুসিতে রসিয়ে উঠলো। এছাড়া তাঁর আরো অনেক লেখা আছে যা এদের চাইতে কোনো অংশেই হীন নয়। যেমন "খাই খাই", "দাড়ি" ইত্যাদি কবিতা ও "অবাক জলপান" "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" ইত্যাদি নাটিক।

"আবোল তাবোল"-এর নামটিই তার অনেকখানি পরিচয় বলে দেয়। কিন্তু এ অপূর্ব কবিতাগুলিকে কেবল nonsense rhyme বললে অনেকখানি কম করে বলা হয়। ইংরেজি ভাষায় nonsense rhyme বলে যে ধরণের ছড়া পরিচিত হয়ে আসচে তার মূল্য কেবল এইটুকু যে, সেগুলি গানের সুরে আবৃত্তি 'করে মা'রা ছোটো ছেলেমেয়েদের সহজে ঘুম পাড়াতে পারেন, কিম্বা ছেলে-মেয়েরা নিজেরা সেগুলির ছন্দের মিষ্টত্ব থেকে খানিকটা আনন্দ পেতে পারে। এইটুকু ছাড়া তাদের বাস্তবিক কোনো মূল্য নেই—এবং তাদের মানে সত্যি-সত্যি কিছু থাকে না—থাকলেও তা অতি সাধারণ ও বিশেষত্ববর্জিত। যথা—"Jack and Jill, went up the hill", ইত্যাদি। "আবোল-তাবোল" মোটেই সে-ধরণের কিন্তু নয়। যদি বা nonsense হয়, তবু এ অতি উঁচু ধরণের nonsense। বইখানি মুখ্যত ছেলেমেয়েদের জন্যে লেখা, কিন্তু অনেক বুড়ো বয়েসের লোকও এর আনন্দরসটি উপভোগ করতে পারেন। সাধারণ বাঙালীর জীবন

অত্যন্ত নীরস ও একঘেয়ে, বৈচিত্র্যের অভাব তার প্রধান অভিশাপ। আমরা আগামী রবিবার কি-ভাবে কাটাবো তা এ রবিবারে অনায়াসে বলে দিতে পারি।' এই নির্জীব নিরানন্দের মাঝখানে "আবোল-তাবোল"-এর আজগুবি কাণ্ড-কারখানা ও অদ্ভুত কথাবার্তা বড়ই উপাদেয় ও প্রীতিকর। কবি তাঁর কল্পনা ও আনন্দের সুষমা দিয়ে একটি স্বপ্নপুরী তৈরি করেছেন, যেখানে আকাশের গায়ে টকটক গন্ধ পাওয়া যায়, শূয়োরের মাথায় টুপি না দেখে মানুষ অবাক হয়ে যায়, যেখানে ছায়া-ধরার ব্যবসা দিব্যি চলে, গানের গুঁতোয় দালান চৌচির হয়ে ফেটে পড়ে, রামধনুর রঙ পাকা নয় বলে খুঁত-ধরা বুড়ো মুখ ভার করে —আরো কত ধরণের উদ্ভট ব্যাপার ঘটে।

মানুষের মনের একটি দিক আছে যা গতানুগতিক নিয়ে তৃপ্ত নয়, যা এই দৃশ্যমান জগতের সমস্ত শোভা ও সৌন্দর্য চয়ন করেও তুষ্ট হয় না—যেখানে এক চিরশিশু দুর্দম কৌতূহলের বশে নিরন্তর চিররহস্য অন্ধকারে উঁকি মারতে চায়—এই ইন্দ্রিয়গোচর জগতের বাইরের খবর জানবার জন্যে যার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। সেইজন্যেই আদিমকাল থেকে মানুষ, পরী-দৈত্য-দানব-ভূত-প্রেত প্রভৃতি কাল্পনিক জীব সৃষ্টি করে আসছে! এরা মিথ্যে হতে পারে কিন্তু এক হিসেবে সংসারে এদের মতো সত্যি আর কিছু নেই। মানুষ তার কল্পনার সুধা দিয়ে যাদের গড়ছে, অনাদি কাল থেকে অসীম পর্যন্ত তাদের সেই একই রূপ, একই প্রকাশ। তাদের বার্দ্ধক্য নেই, জরা নেই, পরিবর্তন নেই—জগতে বাস্তবিক চিরন্তন কিছু থাকে তো তারাই।

এই অতীন্দ্রিয় জগতের আভাস আমরা "আবোল-তাবোলে" পাই বলেই এর স্থান এত উপরে। অথচ লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, কবিতাগুলিতে (দু-একটি ছাড়া) ভূত-পেত্নী ইত্যাদির উল্লেখ বড় একটা নেই। সেইজন্যেই বইটিকে ঠিক রূপকথার শ্রেণীতেও ফেলা যায় না। অধিকাংশ কবিতারই পাত্র আমাদের মতোই একজন রক্তমাংসের মানুষ (দু-একটি পশু-পাখীরও আছে)। আমরা প্রতিদিনকার কাজকর্মের ভিতর দিয়ে যে-সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি সেগুলিকেই খুব বাড়িয়ে অদ্ভুত করে বলা হয়েছে। কিন্তু সেরূপ আচরণ সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব বলেই সেগুলি রূপকথার মতো অদ্ভুত ও সুন্দর মনে হয়। এ-সম্বন্ধে চার্লি চ্যাপলিনের ফিল্মগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। বাস্তবজগতে বেহালার ছড়িটা বারবার কারো গোঁফের উপর এসে সুড়সুড় করে না লাগতে পারে, কিন্তু একটা মাছি বারবার এসে ঠিক নাকের তলায় বসে ভোঁ-ভোঁ করে তাকে আধপাগলা করে দিয়ে যেতে পারে। এই রকম কত ছোটোখাটো দুর্ঘটনা আমাদের তো হামেশাই ঘটছে। সেগুলির উপরই একটু বেশি করে রঙ ফলিয়ে চার্লি তাঁর ফিল্মগুলো তৈরি করেন বলেই তাঁকে আমাদের এত ভালো লাগে—এত আপন ও অন্তরঙ্গ মনে হয়। সেইজন্যেই সর্বদা দুর্বল ও অক্ষম হয়েও তিনি আমাদের সবাইকার সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। সুকুমার রায়ের কবিতাতেও অনেকটা এইজন্যেই আমাদের মন এত সহজ ও এমন প্রবলভাবে সাড়া দিয়ে ওঠে।

স্মৃতি তর্পণ : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

"ফেল" করে মুখ খেয়ে কেঁদেছিলে সেবারে;
আদা নুন খেয়ে লাগ, পাশ কর এবারে।
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ো নাকো, যেয়ো নাক ভড়কে,
খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে, বসে খাও খড়কে।
এত খেয়ে তবু যদি নাহি ওঠে মনটা—
খাও তবে কচুপোড়া; খাও তবে ঘণ্টা।

খ্যাঁটের একটা লম্বা ফিরিস্তি থেকে খানিকটা তুলে দিলাম; মনে পড়ছে ব্যবস্থাটা কার? যদি বলো পড়ছে না তো আশ্চর্য হব না: কথাতেই বলে গলার নিচে গেলে আর মনে থাকে না।

যাক্, কথা বাড়িয়ে ফল নেই, কবিকে এনেই ফেলি। লাইন ক'টি তুলে দিয়েছি সুকুমার রায়ের 'খাই-খাই' নামে একটি হাসির কবিতা থেকে, তাঁর লেখার নমুনা হিসেবে। তোমাদের মধ্যে যারা পড়েছ পড়েছ; যারা পড়নি তারা কবিতাটি সংগ্রহ করে পোড়ো একবার, হাসতে হাসতে পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যাবে।

হাসির কথা বলতে গিয়ে কিন্তু কান্না এসে পড়ে

আগে—এই কথা মনে পড়ে গিয়ে যে এই হাসির উৎস গেছে অকালেই শুকিয়ে। বাংলা দেশের, বিশেষ করে তোমাদের মতো কিশোর-কিশোরীদের দুর্ভাগ্য। বইয়ের ঘরে ঢুকলেই হিস্ট্রি, জিয়োগ্রাফি, অঙ্ক, সায়েন্সের বই; স্কুলে স্রেফ ঐ চর্চা; বাপ, কাকা, মেসো, জ্যাঠা—যে-কোনও অভিভাবকের সঙ্গে দেখা হোক, আগেই ঐ কথা—এত হেনস্তার মধ্যে যদি বা একজন তোমাদের মনকে চিনে তার সঙ্গে মিতালি করতে এলেন তো বিধাতা তাঁকে টুপ করে দিলেন সরিয়ে। সুকুমার রায় মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে, সাহিত্যের যে-দিকটি আলোকিত করে তুলে-ছিলেন সে-দিকটি অন্ধকার করে চলে যান। তবে কি জানো?—এ-সব লোকের আসাটা সম্পূর্ণরূপে কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। অকালে চলে গেলেও সুকুমার শিশু-সাহিত্যে একটা বিশেষ ধারা সৃষ্টি করে গেছেন। সেই ধারার গোড়ার কথা হচ্ছে যে শিশু আর কিশোরদের মন বড় অদ্ভুতলোকে বিচরণ করে। বড়দের নজরে সেখানে নানান রকম গোলমাল, গরমিল, বেহিসেব; ছোটরা কিন্তু তার মধ্যেই বেশ কেমন একটা শৃঙ্খলা পায়, অদ্ভুত আর অসম্ভবের মধ্যে পায় একটা রসের খোরাক। হিস্ট্রি-জিয়োগ্রাফি-হিসেবের কচকচানিতে যখন বেচারারা ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ওঠে বিশেষ করে তখন তাদের ঐ গোপন জগৎটির জন্যে মন আতালি-পাতালি করে।...আমরা অনেকেই হয়তো এই তত্ত্বটি জানি, কিন্তু একে আমল দিতে চাই না। সুকুমার রায়ে আর অন্যে তফাৎ এই ছিল যে তিনি এই তত্ত্বটি—অর্থাৎ ছোটদের মনের এই অদ্ভুত ক্ষমতাটির কথা মেনে নিয়েছিলেন, আর তাঁর অদ্ভুত প্রতিভার বলে এই জগৎটি তাদের সামনে স্পষ্ট করে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। সফল যে হয়েছিলেন তা, তাঁর লেখা যারা পড়েছো, সকলেই অন্তর দিয়ে বুঝতে পার। তাঁর লেখা মাত্র হাসির-কবিতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না—শিশুদের জন্যে অন্যভাবে হাসির কবিতা ছিল আমাদের দেশে, নেহাৎ যে ছিল না এমন নয়, জানোই তো, বাঙালী জাতটা বড় আমুদে—তবে এই যে যতো সব আজগুবি আর গরমিলের মধ্যে অনাবিল রসের ধারা, এটার প্রবর্তন এক রকম সুকুমার রায়ই করেছেন। সাক্ষী তাঁর "পাগলা দাশু", "হ-য-ব-র-ল", "আবোল-তাবোল"। নামগুলোই দেখ না কি রকম বেখাপ্পা, শুনেই পেট যেন হাসিতে গুরগুরিয়ে ওঠে। অবশ্য একথা বলে দেওয়া দরকার যে ইংরিজিতে ও-জিনিসটা অনেকদিন থেকেই ছিল। যদি বোঝবার ক্ষমতা হয়ে থাকে তো Alice in Wonderland বইটা পড়ে দেখো। Nonsense Rhyme বলেও ওদের শিশুসাহিত্যে আজগুবি কবিতা বিস্তর আছে—খেয়াল-খুসির মাথামুণ্ডু কবিতা, তার ভাব, বাঁধুনি সবই মনে সুড়সুড়ি দেয়। বলতে পারো, ইংরিজি থেকে এত জিনিস এল আমাদের সাহিত্যে—এরই আসতে এত দেরি হোল কেন? তার উত্তর আগেই কতকটা দিয়েছি—অর্থাৎ ঠিক দরদী লোকের অভাব ছিল। তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে আজব-জগতে প্রবেশ করবে এমন লোক একজন চাইতো?—সে লোক সুকুমার রায়ের আগে হয়তো জন্মাননি। আমি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিচ্ছি। তিনি তো এত দরদ দিয়ে তোমাদের মনের কথা বলে গেছেন যে মনে হয় বুঝি কোন্ অলক্ষিতে শিশু তাঁর কলমের ডগায় বসে বলেছে নিজের কথা। কিন্তু বিশ্বকবিও প্রথম দিকটায় তোমাদের এই 'হ-য-ব-র-ল'-এর জগৎটাকে বাদ দিয়ে গিয়েছিলেন।

শুধু কবিতা বা নাটকই নয়, কবিদের মনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ছবি আঁকতেও সুকুমার রায়ের হাত ছিল পাকা। অনেকে দেখে থাকবে তাঁর ছবি—সেসব-ছবির অদ্ভুত পরিকল্পনা আর ভঙ্গি দেখলে ডুকরে হেসে উঠতে হয় না কি? পদ্যই বল, গদ্যই বল, নাটকই বল, ছবিই বল—সবেরই মধ্যে দিয়ে আমাদের একটা অদ্ভুত জগতের সামনে এনে ফেলেন সুকুমার রায়। "আমাদের" কথাটা আমার কলম থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েনি, জেনেশুনেই লিখলাম। অর্থাৎ এমন বলার ভঙ্গি, আঁকবার গুণ যে তোমাদের মতো আমাদেরও কবি-শিল্পী ঐ আজগুবি দুনিয়ায় টেনে নেন, ভুলিয়ে দেন আমাদের গাম্ভীর্য, আমাদের বয়সের হিসেব।

এই তো শক্তিমান কবি বা শিল্পীর লক্ষণ কিনা—যা

ইচ্ছে তাই করবেন—বড়দের করবেন ছোট, ছোটদের করবেন বড়। যে পাষাণ কান্না ভুলেছে, তাকে চোখের জলে দেবেন ভাসিয়ে; যে গম্ভীর—বয়সের মস্ত পাগড়ি মাথায় বেঁধে মুখ গোমড়া করে বসে আছে—তার মুখে ফোটাবেন হাসির ফুলঝুরি।

সুকুমার ছিলেন এই ধরণের প্রতিভাবান কবি-শিল্পী, তাই বলছিলাম এমন একজন রসিক পুরুষের হঠাৎ তিরোধান একটা জাতীয় দুর্ভাগ্য। কিন্তু বিধাতার এই ইচ্ছে, তাতে তো আমাদের হাত নেই? আমরা শুধু তাঁর বিধান মেনে নিতে পারি, আর পারি কবি-শিল্পীর স্মৃতি-বার্ষিকীতে তাঁর অমর-আত্মাকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

তেজিয়ান! : সুকুমার রায়

চলে খচ্‌খচ্‌ রাগে গজ্‌গজ্‌ জুতা মচ্‌মচ্‌ তানে,
ভুরু খট্‌মট্‌ ছড়ি ফট্‌ফট্‌ লাথি চট্‌পট্‌ হানে।
দেখে বাঘ-রাগ লোকে "ভাগ্‌ ভাগ্‌" করে আগভাগ থেকে
ভয়ে লাফঝাঁপ বলে "বাপ্‌ বাপ্‌" সবে হাবভাব দেখে।
লাথি চার চার খেয়ে মার্জার ছোটে যার যার ঘরে,
মহা উৎপাৎ করে হুট্‌পাট্‌ চলে ফুটপাত পরে।
ঝাড়ু বর্দার হারুসর্দার ফেরে ঘরদার ঝেড়ে,
তারি বাল্‌তি এ-দেখে ফাল দিয়ে আসে পাল্‌টিয়ে তেড়ে।
রেখে লালমুখে হেঁকে গাল রুখে মারে তাল ঠুকে দাপে,
মারে ঠন্‌ঠন্‌ হাড়ে টন্‌টন্‌ মাথা কন্‌কন্‌ কাঁপে!
পায়ে কালসিটে! কেন বাল্‌তিতে মেরে চাল দিতে গেলে
বুঝি ঠ্যাং যায় খোঁড়া ল্যাংচায় দেখে ভ্যাংচায় ছেলে।

সুকুমার রায়ের ছবি : নিলীমা দেবী

ছবি দেখতে নিশ্চয়ই তোমরা ভালবাস? কারণ, ছোটবেলায় ছবির চাইতে বেশী ভাল আর কিছুই লাগে না; অন্ততঃ আমি তো ছোটবেলায় একটা ছবির বই হাতে পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম ঐ ছবির বিচিত্রলোকেই। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন 'সন্দেশ' নামে ছোটদের জন্য একখানা মাসিকপত্র বার হ'ত; সেটি আমরা এতই ভালবাসতাম যে, একটা সংখ্যা শেষ হতে না হ'তেই পরেরটার জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকতাম। তাতে কৌতূহল মেটাবার খোরাক থাকত অনেক, কিন্তু তার সব চেয়ে কৌতুকপ্রদ খোরাক ছিল সুকুমার রায়ের ছড়া, গল্প, নাটক ইত্যাদি। আর এসব রচনা মনের মধ্যে গেঁথে দিত সুকুমারবাবুর হাতের আঁকা মজার মাজার ছবি। কি সব অদ্ভুত জীবজন্তু, মানুষ, তিনি আঁকতেন, তার প্রতীক তোমরা জীবলোকে হয়তো খুঁজে

হ্যাংলা থেরিয়াম

পাবে না, কিন্তু ছোটবেলার কল্পলোকে তাদের সঙ্গী-সাথী খুঁজে পেতে দেরী লাগে না। দুঃখের কথা এই যে আমরা বড় হয়ে উঠতে না উঠতেই সুকুমারবাবু মৃত্যুলোকে যাত্রা করলেন। সে আজ একুশ বছরের কথা, কাজেই তোমাদের যুগের ছেলেমেয়েদের কপালে তাঁর নতুন নতুন সৃষ্টি দেখার সৌভাগ্য ঘটল না। কিন্তু তোমরা অনেকে নিশ্চয়ই তাঁর 'আবোল-তাবোল' পড়েছ, তাতে তাঁর আঁ[কা] সব ছবিও দেখেছ, চিনেছ যে, তাঁর চিত্রে আছে অনাবি[ল] কৌতুকের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ, রেখার অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা। জায়গা[র] অভাবে এইসঙ্গে তাঁর মাত্র একখানি ছবির নমুনা তোমাদের দিচ্ছি।

দেখ ত', এই 'হ্যাংলা থেরিয়াম' জীবটিকে চিনতে পার নাকি? তুমি আমি, সবাই, এই 'হ্যাংলা থেরিয়ামের' মতো গপ্‌গপ্‌ করে এক গ্রাসে একটা আস্ত পাঁউরুটি, আধ সের গুড় আর পাঁচ-সাতটা খোসাশুদ্ধ সিদ্ধ ডিম খেতে না পারলেও, মার নিষেধ সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মেঠাই-মণ্ডা সিঙাড়া-কচুরী পেলে 'হ্যাংলা থেরিয়ামের' মতোই হ্যাংলামি করি নাকি? সুকুমারবাবুর মজার ছবির মাধুর্য্য ঐখানেই—তাঁর জীবজন্তু, মানুষ, সবকটাই কল্পনার অদ্ভুত সৃষ্টি হলেও সেগুলো মানুষের প্রবৃত্তির এক একটা বিকৃতির বিরাট ঠাট্টার প্রতীক। কিন্তু, এসব জীবের সঙ্গে মানুষ নিজের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য দেখলেও কেউ রাগ করতে পারে না, কারণ তাঁর ঠাট্টা শুধুই ঠাট্টা, তাতে মানুষের প্রতি একবিন্দু বিদ্বেষ বা হতশ্রদ্ধা নেই। সুকুমারবাবুর ছবিগুলি যদিও রসজ্ঞ সমঝদার শিল্পীর নিপুণ হাতে আঁকা, কিন্তু তার প্রেরণা এসেছে শিশু-জগতের নির্ম্মল হাস্যকৌতুক থেকে; কাজেই সেগুলি দেখে তোমাদের কখনই মনে হবে না যে, তিনি ছিলেন বড়দের রাজত্বের বাসিন্দে, শুধু অবুঝ শিশুর মন ভোলাবার জন্য শিশুর ভূমিকায় অভিনয় করতে চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর ছবি, তাঁর ছড়া, তাঁর গল্প, তাঁর নাটক এমন সার্থক সৃষ্টি। [আনন্দবাজারের সৌজন্যে]

সুকুমার রায় : লীলা মজুমদার

যাঁরা জন্মকালে হাতে ক'রে অমরতার বীজ নিয়ে আসেন, সুকুমার রায় তাঁদের একজন। বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য যখন সবেমাত্র কলেবর ধারণ করেছে, তখনই তাকে টেনে নিয়ে একেবারে ক্ল্যাসিকের কোঠায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। সাহিত্যের মধ্যে যা'কিছু স্থায়ী আদরের সামগ্রী হয় আমরা তাকেই ক্ল্যাসিক বলি। সুকুমার শিশুসাহিত্যের এমন আদর্শ গড়ে দিয়ে গেছেন যা' কোনও দিন ম্লান হবে না। কেবলমাত্র সেরা জিনিসই কখনও পুরোন হয় না, কখনও সেকেলে হয় না; বরং যুগেযুগে তার মূল্য বেড়েই যায়। সুকুমারের রচনাও এই শ্রেণীর।

১২৯৪ সনের ১৩ই কার্তিক সুকুমার এই কলকাতা সহরেই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের বংশের আদি নিবাস ময়মনসিংহ জেলায়, সেখানে জ্ঞানানুরাগী বলে তাঁদের পুরাতন খ্যাতি ছিলো। সুকুমারের কথা বল্‌তে গেলে তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোরের কথাও বল্‌তে হয়। উপেন্দ্রকিশোর সাহিত্যে শিল্পে ও সঙ্গীতে অদ্ভুত প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। সুকুমারের মাতা ছিলেন সেকালের বিখ্যাত তেজস্বী পুরুষ দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর কন্যা।

সুকুমার বাল্যকালে কলকাতায় বিদ্যাশিক্ষা ক'রে, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পাশ করেন। তারপর গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি নিয়ে বিলেত যান। ম্যাঞ্চেস্টারে স্কুল অব টেক্‌নলজিতে ফোটোগ্রাফি ও ব্লক তৈরী শিখে ১৯১৩ সালে দেশে ফেরেন।

এদিকে ৯।১০ বছর বয়স থেকেই সুকুমারের রস-রচনা খ্যাতি লাভ করেছিলো। বস্তুত ময়মনসিংহের এই রায় পরিবার শিশুসাহিত্যের যেরকম সেবা করেছেন, কোনও দেশে একটি বিশেষ পরিবার তেমন করেছেন কিনা সন্দেহ। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে শিশুসাহিত্য বলে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে কিছু ছিল না বল্লেই হয়। তখন উপেন্দ্রকিশোর তাঁর সুবিখ্যাত "সন্দেশ" পত্রিকা প্রকাশিত করেন। সেই ত্রিশ বছর আগেকার সন্দেশ দেখ্‌লে বিস্মিত হ'তে হয়, কারণ আজ পর্যন্ত এদেশে শিশুদের কোনও মাসিক পত্রিকা সেই আদর্শকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। সেই প্রাচীন "সন্দেশে" বৈজ্ঞানিক তথ্য, পৌরাণিক কাহিনী, ছোট গল্প, কবিতা, ধাঁধা ও শিশু-পাঠ্য কোনও জিনিসেরই অভাব ছিলো না। একটু অভাব ছিলো শুধু সুকুমারের অনাবিল অপূর্ব হাস্যরসের। সে অভাবও সময়ে পূর্ণ হ'ল।

এই একই রায় পরিবারে বহু শিশুসাহিত্যসেবী জন্মেছেন। কুলদারঞ্জন ও প্রমদারঞ্জন উপেন্দ্রকিশোরের সহোদর, সুবিনয় ও সুবিমল তাঁর পুত্র, সুখলতা রাও ও পুণ্যলতা চক্রবর্তী তাঁর কন্যা। এঁরা সকলেই আমাদের পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে অবজ্ঞার অন্তরাল থেকে বাইরে এনে পৃথিবীর চোখের সাম্‌নে গৌরবমণ্ডিত করেছেন। তাই তিনি প্রাতঃস্মরণীয়। সুকুমারের কীর্তিও কম নয়। তিনি ঐ বাঙালী যে ছিলো হুঁকোমুখোর আদি সংস্করণ, তার মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। যে মরে গিয়েছিলো তাকে জাগন্ত করে দিয়েছেন। তিনিও প্রাতঃস্মরণীয়।

শ্লেষবিহীন কৌতুক এক অপূর্ব জিনিস। এই কৌতুক হ'বে নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু হ'বে জনসাধারণের প্রতিবিম্ব। হ'বে অদ্ভুত, কিন্তু হ'বে সবার পরিচিত। কেউ যা ভাবতে পারত না তাই হ'বে, কিন্তু তাকে দেখবামাত্র, তার কথা শুন্‌বামাত্র নিজেদের সংগে তার সাদৃশ্য বোধ হ'বে। এমনি রসের সৃষ্টি যাঁরা করতে পারেন জগতে তাঁদের নখাগ্রে গোণা যায়। সুকুমার তাঁদের একজন। যেকোনও ভাষায় তাঁর রচনার তর্জমা করা যাক না কেন, তর্জমা যদি সঠিক হয়, ভাষার গুণ যদি বা হারিয়ে যায়, রসটুকু তবু হারাবে না।

সুকুমারের এই রসের আর শেষ ছিলো না; তা'র মধ্যে যেটুকু ভাষার অতীত ছিলো, তাঁর চিত্রে সেটুকু প্রকাশ পায়। সত্যিই তাঁর মতন মজার ছবি কেউ কখনও আঁকেনি। এখানে সুকুমারের একমাত্র পুত্র সত্যজিতের নাম উল্লেখযোগ্য, কারণ বাংলাদেশের চিত্রজগতে সুকুমারের রঙের তুলির আর কোনও যোগ্য উত্তরাধিকারী নেই।

বাংলাদেশের প্রত্যেক ছেলেমেয়ে এবং বুড়োবুড়ীরই

সুকুমার রায়ের আঁকা একটি ছবি

কর্তব্য সুকুমারের প্রত্যেকটি রচনা পড়া। নিচে তাঁদের সুবিধের জন্য একটা মোটামুটি তালিকা দিলাম :

আবোল-তাবোল, হ-য-ব-র-ল, পাগলাদাশু, ঝালাপালা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, চলচিত্তচঞ্চরী, অবাক জলপান ও "বহুরূপী"র গল্প সঞ্চয়ন।

গত এক বছরের মধ্যে 'সিগনেট প্রেস' এর মধ্যে যা অপ্রকাশিত ছিলো তা'র অধিকাংশই প্রকাশিত করেছেন এবং অবশিষ্ট যা আছে তাও শীঘ্রই প্রকাশ করবেন বলে আশা রাখি।

ছবিতে, গল্পেতে, কবিতায়, নাটকে সুকুমারের প্রতিভা প্রস্ফুটিত হ'ত। এইটুকু অনুতাপের বিষয় যে মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে আমরা তাঁকে হারালাম। আজকালকার ছেলেমেয়েরা ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে জানবার সুযোগ পেলো না, তবে তাঁর চিরন্তন দানটুকু রয়ে গেলো। সুকুমারের Monday Clubএর সাহিত্যিক সম্প্রদায়, কিম্বা Nonsense Clubএর মজলিসি সম্প্রদায়, এর কোনটাতেই যোগ দেবার আমাদের বয়স হয়নি। তবে লোকমুখে শুনেছি যাঁরা Nonsense Clubএর রসমঞ্চে ক্ষুদ্রতম নাটকে নিকৃষ্টতম বানরের পার্ট করবার সুযোগ পেয়েছিলেন এখনও তাঁরা গর্ব বোধ ক'রে থাকেন। সুকুমারের গাম্ভীর্যময় কবিতা "অতীতের ছবি" পড়তে সকলকে অনুরোধ করি। হাসি জিনিসটা যে গাম্ভীর্যের বিপরীত নয়, অপর পৃষ্ঠামাত্র, তার এমন নিদর্শন পাওয়া দায়। এমন আশাময় গাম্ভীর্য হাস্য-রসেরই দোসর। প্রথম চারটি ছত্র উদ্ধৃত করি—

"অজর অমর অরূপ রূপ
নহি আমি এই জড়ের স্তূপ।
দেহ নহে মোর চির নিবাস
দেহের বিনাশে নাহি বিনাশ।" ইত্যাদি

সুকুমারের কাছে বাংলা সাহিত্যের ঋণ অপরিশোধেয়। কিন্তু বাংলাসাহিত্য যে সে ঋণের অনুপযুক্ত নয় তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যায়।

ত্রিশ বছর আগে যেমন শিশুপাঠ্য বই-ই ছিলো না, এখন তেমনি রাশি-রাশি অপাঠ্যের নীচে শিশুদের স্বেচ্ছায় চাপা পড়বার সম্ভাবনা হয়েছে। এইরূপ আত্মহত্যা বন্ধ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সাহিত্যসাগর মন্থন করে মাণিকগুলি তুলে আনা। এখন সমালোচনার সময় এসেছে, ভালোমন্দ বিচারের সময় এসেছে। শিশু-সাহিত্যের সেরা রচনা ও সেরা লেখকদের একখানা পরিচিতি প্রস্তুত ক'রে যশের মন্দিরে শিশুসাহিত্যের আসন পাতা উচিত।

কুড়ি বছর ধ'রে যাদের সুকুমারের রচনার সঙ্গে পরিচয় তাদের যেন আর এক হাতে রুমাল নিয়ে পূজাবার্ষিকী পড়তে বস্‌তে না হয়। সুকুমারের জন্মদিনে এইটুকু আমাদের সঙ্কল্প হোক্।

<u>সুকুমার রায়</u> : কালিদাস নাগ

একুশ বছর আগে যখন য়ুরোপ থেকে দেশে ফিরে আসি তখন বন্ধুবর প্রশান্ত মহলানবিশ বোম্বাইয়ে সবচেয়ে তুঃখের খবর দিলেন : সুকুমার রায় আর এ-পৃথিবীতে নেই। সে-কথাটি আজ মনে পড়ছে। উনবিংশ শতাব্দীর যারা এখনও রয়েছেন তাঁদের কাছে সুকুমার রায় জীবন্ত মানুষ —এই আমার বিশ্বাস। জীবন্ত সুকুমার রায়কে মনে করা ও তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করার সার্থকতা আজ অনেকখানি। সাহিত্যিক ও শিল্পীকে তার সাহিত্য ও শিক্ষা থেকে আলাদা করে দেখা উচিত। আমরা যে-ভাবে সুকুমার রায়কে দেখেছি সে-সম্বন্ধে তুচারটি কথা বলব।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অর্থাৎ ১৮৮৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তখন কংগ্রেস সবে মাত্র হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করেছে। সেই আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হয়ে কী ভাবে তিনি দেশে হাসির ফোয়ারা তুলেছিলেন তা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র মতো মনে হয়। তিনি ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। তাঁর চেহারা, ভাবভঙ্গী পরম গাম্ভীর্যে মণ্ডিত ছিল। অথচ তাঁর প্রকাশ, তাঁর ভাষা ছিল হাস্যরস প্রধান। বাংলার গদ্য-সাহিত্য ভাবপ্রবণ। তার ভেতর হাসির ইতিহাস আধুনিক। এখন পর্যন্ত সে-ইতিহাস লেখা হয়নি। সিপাহী বিদ্রোহের আগে গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র আমাদের প্রথম হাসিয়েছেন। তারপর হাসিয়েছেন মাইকেল, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র। গজপতি বিদ্যা-

দিগ্‌গজ ও নিমে দত্ত হাসির হররা ছুটিয়েছিলেন। এ-সব হয় কংগ্রেসের আগে। ক্রমে ক্রমে হাসির সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালী সজাগ হয়ে উঠলো। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "হঠাৎ নবাব" নামে একখানা হাসির বই লেখেন।

সুকুমার রায়ের শৈশবে হাসির উপাদান যে একেবারে ছিল না তা নয়। পাশ্চাত্য humour-এর নক্সা "ভারতী"র মধ্যে বেরিয়েছে। "সাধনা"র মধ্যেও সে-প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুকুমার রায়ের পিতা স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। অনেক জায়গায় তিনি বেহালা নিয়ে সুর ও তালের সংযোগ করতেন। রবীন্দ্রনাথের যখন পঞ্চাশ বছর বয়স তখন একবার আমরা থার্ডক্লাসের টিকিট করে শান্তিনিকেতনে যাই। পথে পরিচয় হয় সুকুমার রায়ের সঙ্গে। তিনি বিলেত যাবেন। তখনই দেখেছি সত্যকে ভেতর থেকে টেনে বের করে তার যে-রূপ দেখলে হাসি পায় সেই রূপ ফুটিয়ে তোলবার জন্মগত অধিকার ছিল তাঁর। তাঁর প্রকাশ-ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। বৈশাখী রৌদ্রে তাঁর সঙ্গে বোলপুর গেলাম। হাসিতে হাসিতে পথের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। আশ্রম বলতে আমাদের মনে বাল্মিকীর আশ্রম, বশিষ্ঠের আশ্রমের কথা উদয় হয়। মনে হয় যা কিছু প্রয়োজন সেখানে পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে তখন ছিল পয়সার টানাটানি। তিনি নিজের জামা-কাপড় সাবান দিয়ে নিজে কাচতেন। এক সমিতিতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। ছুটি মেনু ছিল: সকালে একটা, বিকেলে একটা। শাল-পাতায় নুন রেখে কাঁকরভরা চাল-ডাল খেতে হত। তখন সুকুমার রায়ের হাসির হররা শোনা গিয়াছিল। খাচ্ছেন আর মুখে মুখে গান রচনা করছেন। রবীন্দ্রনাথের অনু-করণে বললেন: "এই ত ভাল লেগেছিল আলুর নাচন হাতায় হাতায়।"—তিনি খাচ্ছেন আর রবীন্দ্রনাথের গানের parody করছেন।

সুকুমার রায় অভিনেতা এটা আমরা কেউ কল্পনাও করিনি। একবার রবীন্দ্রনাথ জেদ ধরলেন "গোড়ায় গলদ" অভিনয় করতে হবে। অভিনয়ে গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ নেমেছিলেন। সেই সঙ্গে সুকুমার রায়ের অপূর্ব অভিনয় দেখলাম। তাঁর মধ্যম ভ্রাতা সুবিনয় রায় ও আর সকলে মিলে বেসুরের ভূমিকা করেছিলেন। যত বেসুর হয় তত ভাল লাগে। রবীন্দ্রনাথের মতো সুরজ্ঞের মধ্যে বেসুরের অভিনয় আশ্চর্য জিনিস। রবীন্দ্রনাথ বললেন দীনুবাবুকে ডেকে আনতে। কিন্তু এ কথাও বললেন লম্বা দড়ি নিয়ে যেন রামানন্দবাবু না আসেন। সেই ব্যবস্থাই হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুকুমার রায়ের আশ্চর্য মিল ছিল—গাম্ভীর্য, শিক্ষা-পিপাসা ও অভিনয়ের দিক দিয়ে। সুকুমার রায় ব্রাহ্ম সমাজের কর্মী ছিলেন, যুবক-সংঘের প্রাণ ছিলেন তিনি। কতবার রবীন্দ্রনাথ ডাকের পর ডাক দিয়েছেন। প্রশান্ত মহলানবিশ, সুকুমার রায় ও আমি সে-ডাকে সর্বদা তাঁর কাছে গিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভা ও প্রভাব থেকে নিজের মৌলিকতা বজায় রাখা কষ্টকর ব্যাপার ছিল। নিজের মতো করে হাসবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল সুকুমার রায়ের। একটা ক্লাব ছিল, নাম ছিল 'মণ্ডা ক্লাব', পরে নাম বদলিয়ে রাখা হয় 'মাণ্ডে ক্লাব' (Monday Club)। তার প্রাণ ছিল সুকুমার রায়। জার্মানী ও ফ্রান্সের জ্যাঠামির সুন্দর নকল তিনি করতে পারতেন। সঙ্গে খাতা থাকত। সেই খাতাগুলি যদি বের হয় তা হলে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ হবে। লেখবার সময় একটানে তিনি লিখে যেতেন।

অনেকেরই হাসি দেখেছি। কিন্তু সুকুমার রায়ের হাসি ছিল অদ্ভুত। বড়দের সম্বন্ধে তাঁর অভিমান ছিল—তাঁরা নির্দেশ দেন। তিনি বলতেন বড়দের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চির-তরুণ, তাঁর হাসি ছিল চিরন্তন। তাই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি মস্ত সাড়া পেয়েছিলেন। বিলেত থেকে ফেরার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। "ভারতী"র পাশে তাঁর বাড়ি ছিল। ঘরে বসে তিনি গান করতেন। পাঁচালীর মতো গান তিনি ভালোবাসতেন ও সঙ্গীতের পরিবেশ রচনা

করতেন। যে কণক দাসের গান সবাই শুনেছেন সেখানে তিনি তৈরী হয়েছেন। সুকুমার রায়ের বাড়িতে দেখেছি—গান হচ্ছে, তিনি প্রুফ দেখছেন, আবার ছবি আঁকছেন, সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তাও চলত। কেমন করে পাশাপাশি চালাতেন বুঝতে পারি না।

তিনি সিনেমার কার্টুন ছবির pioneer হতে পারতেন। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তিনি ছবি এঁকেছেন। তিনি বলতেন প্রাচ্য চিত্রকলার অনেকখানি য়ুরোপিয় শিল্পকলার মধ্যে আছে। তাঁর মধ্যে ছিল মস্ত বড় এক শিল্পীর সংস্কৃতি। তাঁর রচনা ও শিল্পের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের সমন্বয় দেখতে পাই। তিনি বলতেন East ও Westকে মিশতে হবে।

নিজেকে হাসাবার জন্যে তিনি পরকে কাঁদাতেন না। দুর্দশাগ্রস্ত মানবের কাহিনীকে সৌখীনভাবে সাহিত্যে ও নাটকে এনে চোখের জল ফেলাবার যে চেষ্টা তিনি দেখে এসেছেন সেটা পছন্দ করতেন না। সত্যিকারের দরদ দিয়ে তিনি তাদের দুঃখ অনুভব করতেন। হাসির ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুতো তাদের জন্যে তাঁর কান্না। যারা সবার নীচে পড়ে রয়েছে তাদের বেদনা তাঁর মনে জেগেছিল। সমবেদনা দিয়ে তিনি সকলকে কাছে টানতেন। এই সমবেদনা শুধু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়িয়েছিল। "দেশ দেশ নন্দিত করি"—রবীন্দ্রনাথের এই গানটি তিনি প্রায়ই গাইতেন।

সুকুমার রায় ও Monday Club:

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১৮৮৭ সালে সুকুমার রায়ের জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সাহিত্যের দিকে ঝোঁক ছিলো, যদিও তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন এবং কৃতী ছাত্রই ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জলপানি নিয়ে ফোটোগ্রাফি এবং ব্লক সম্বন্ধে পড়াশুনো করতে তিনি বিলেত যান। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোরের নানা আশ্চর্য প্রতিভার মধ্যে ভারতবর্ষে হাফটোন ব্লকের প্রথম প্রবর্তন করা একটি। সুকুমার রায়ও এ-বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন এবং এ-বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করে বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এফ্. আর. পি. এস্. উপাধি পান।

যাঁরা প্রাণ খুলে হাসতে পারেন তাঁরা সৌভাগ্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু যাঁরা হাসাতে পারেন তাঁরা আমাদের নমস্য। এ-ধরণের লোক খুব বেশি নেই। সুকুমার রায় ছিলেন সেই দুর্লভ জাতের মানুষ। তাঁর জীবনের অল্প কয়েকটি বছরের মধ্যেই তিনি এমন অফুরন্ত হাসির ঢেউ সৃষ্টি করে গেছেন যা কোনোদিন থামবে না: ছেলেবুড়ো সবাইকেই বয়েসের ব্যবধান ঘুচিয়ে একই সঙ্গে হাসাবে, জীবনের ভার লাঘব করবে, পৃথিবীর বয়েস কমিয়ে দেবে। সার্কাসের ক্লাউনকে দেখে আমরা হাসি, মোটা লোককে পথে পিছলে পড়তে দেখলেও হাসি। কিন্তু সে-হাসি খুব উঁচুদরের নয়। তার একটা স্থূল দিক আছে। সুকুমার রায় আমাদের মধ্যে যে-হাসি রেখে গেছেন তা এমন এক উঁচুদরের শিল্পীর সৃষ্টি যার মধ্যে একটি নির্মলতা ও অন্তস্পর্শী স্বচ্ছতা আছে। জীবনকে গভীরভাবে ভালো না বাসলে, মানুষের প্রতি আন্তরিক দরদ না থাকলে সে-হাসি হাসানো যায় না।

সুকুমার রায়ের রচনাই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এবং সেই প্রতিভাকে আমরা সবচেয়ে সম্মান দেখাতে পারি তাঁর রচনা বারবার পড়ে।

এমনিতে দেখলে তাঁকে বেজায় গম্ভীরজাতের লোক বলেই ভুল হোতো। কিন্তু আসলে মানুষটা ছিলেন তিনি ভারি আমুদে। কত ছোটো-ছোটো ব্যাপারে যে তাঁর সরস মনের পরিচয় রেখে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সেদিন তাঁর এক লেখার-খাতা ওল্টাতে গিয়ে দেখি প্রথম পাতায় লেখা রয়েছে: নোটিস, এই খাতা হারাইলে কাহারও নিস্তার নাই, আদায় না করিয়া ছাড়িব না—না পাইলে গালি দিব।"

Monday Club নামে তিনি এক সাহিত্য-আসর প্রতিষ্ঠা করেন। Sunday Schoolকে ব্যাঙ্গ করার জন্যে Monday Club কিনা ঠিক জানি না। যা জানা যায় তা এই: 'মণ্ডা' থেকে 'Monday'র উৎপত্তি। বহু গণ্যমান্য লোক এই ক্লাবের সভ্য ছিলেন। যেমন: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, অতুলপ্রসাদ সেন,

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুবিনয় রায়, জীবনময় রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, ইত্যাদি। সম্পাদক ছিলেন সুকুমার রায়ের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিশিরকুমার দত্ত। সভ্যতালিকায় তাঁর নামের পিছনে 'এ-বি-সি-ডি' এবং ব্র্যাকেটে 'সম্পাদক' ছাপা হয়েছিলো।

এই Monday Club-এ যে কী দারুণ হাসির তুফান আর মনখোলা ফুর্তির ঝড় বইতো তার কিছু-কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় সেই ক্লাবের কতকগুলি ছাপা নিমন্ত্রণলিপি, ইত্যাদি থেকে। এখানে কিছু উদ্ধৃত করা হোলো।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "মণ্ডা-সম্মিলন" নামে এই ক্লাবের জন্যে একটি গান বেঁধেছিলেন। গানটি এই:

মণ্ডা-সম্মিলন

(সুর: আমাদের শান্তিনিকেতন)

আমাদের মণ্ডা-সম্মিলন!
—আরে না—তা' না, না—
আমাদের Monday সম্মিলন!
আমাদের হল্লারই কুপন!
তার উড়ো চিঠির তাড়া
মোদের ঘোরায় পাড়া পাড়া,
কভু পশুশালে হাস্‌পাতালে আজব আমন্ত্রণ!
(কভু কলেজ-ঘাটে ধাপারমাঠে ভোজের আকর্ষণ!)
মোদের চারু-বাবুর দধি,
মোদের কারু ঘোলের নদী,
মোদের জংলী-ভায়ার সরবতে মন মাতাল অদ্যাবধি!
মোদের আলোচনার রীতি
দেশে জাগায় বিষম ভীতি,
কভু ভেয়াব্‌হারেন উঁকি মারেন, ভ্যাম্বেরী, ভিলন!
মোদের গানের বিপুল বেগে
পাড়া আঁৎকে ওঠে জেগে,
ঢিল ছুড়িতে সুরু করে বেজায় রেগেমেগে।
মোদের নাচ যদি পায়, তবে
কি যে হয় শোনো তা সবে,—
নাগ বাসুকীর ঘাড় খচে যায়, হয় ভূমিকম্পন!
(নাগ কালিদাস হয় কাবু হায়, পায় দশা খোদন!)
মোরা হপ্তা বাদে জুটি
সবাই হাঁপাই ছুটোছুটি,
রাধাবল্লভে মন নেইকো, রাধাবল্লভী বেশ লুটি!
মোদের কালোর সঙ্গে শাদায়
এ যে মিলিয়েছে দই-কাদায়,
মোটার সঙ্গে কাহিলকে তাই করেছে বন্ধন!
আমাদের মণ্ডা-সম্মেলন!

২১ আগস্ট, ১৯১৮
মণ্ডা-সম্মিলনের তৃতীয় জন্মদিন } শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

এই সম্মিলনীর "তৃতীয় বার্ষিক বিবরণী, সেপ্টেম্বর ১৯১৭—আগস্ট ১৯১৮"—তে আয়-ব্যয়ের একটি হিসেব ছাপা আছে। হিসেবের শেষে দেখা যায় নগদ সোয়া চোদ্দ আনা তখনো মজুত। সম্পাদক সেই হিসেবের তলায় লিখেছিলেন:

"আমার হাতে অর্থাৎ বাক্সে এই সোয়া চৌদ্দ আনা পয়সা মজুত আছে। সভ্যেরা যদি অসভ্যের মতো খাই-খাই না করিয়া চা-বিস্কুটে খুসী থাকিতেন—যাক্, সে কথা বলিয়া কোন লাভ নাই।

শ্রীশিশিরকুমার দত্তদাস
অনাহারী সম্পাদক।"

এই বিবরণীতে একটি বিজ্ঞাপনও ছাপা হয়েছিলো:

"কর্ম্মখালি

আমাদের অভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সংসার বিমুখ ও উদাসীন হইয়া লোটাকম্বল ও চা-বিস্কুট সহযোগে বাণপ্রস্থ অবলম্বনের সংকল্প জানাইয়া, ক্লাবের মায়া কাটাইবার উদ্যোগ করিয়াছেন। তাঁহাকে উক্ত সংকল্প হইতে নিরস্ত করিবার জন্য কয়েকটি বলিষ্ঠ ভক্তের প্রয়োজন। ভক্তসভ্যগণ সত্বর হউন।"

আমরা বেশ অনুমান করতে পারি এই বিজ্ঞাপনের ফলে এবং বলিষ্ঠ ভক্তদের সত্ত্বরতায় অনাহারী সম্পাদক'কে বাণপ্রস্থ অবলম্বনের সংকল্প ত্যাগ করতে হয়েছিলো। কিন্তু সম্ভবত তার প্রয়োজন ছিলো না। সম্পাদক মশাই

সংসার ত্যাগ করলেও হপ্তায়-হপ্তায় নিশ্চয়ই মণ্ডা-সম্মিলনীতে নির্ভুল হিসেবে যোগ দিতেন। তিনি না থাকলে ক্লাবটি যেমন অচল ছিলো ক্লাবটি না থাকলে তাঁরও সে-রকমই চলতো না। কারণ একটি "প্রতিবাদ সভা"র এই ছাপা চিঠিটি আমরা দেখতে পাই:

"সম্প্রতি ক্লাবের সর্ব্বজনস্বীকৃত সম্পাদকরূপে আমি 'অধিকারী' উপাধি গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে কোন কোন উদ্যাপরায়ণ 'সভ্য' অসঙ্গতভাবে আপত্তি করিতেছেন। কালিদাসবাবু আপত্তি করিতে চান করুন, কিন্তু আমি স্বোপার্জ্জিত উপাধি ছাড়িব না।

এই প্রকার অন্যায় আপত্তির বিশেষ প্রতিবাদ বাঞ্ছনীয়। অনেক হিসাব করিয়া দেখিলাম, আগামী মঙ্গলবার ২১শে আগষ্ট, বাংলা তারিখ জানি না, আমাদের ক্লাবের জন্মদিন, অর্থাৎ প্রায় জন্মদিন। ঐ দিনই সন্ধ্যার সময় ১০০নং গড়পার রোড, অর্থাৎ কালাবোবা ইস্কুলের পশ্চাতে, সুকুমারবাবু নামক ক্লাবের একজন আদিম ও প্রাচীন সভ্যের বাড়ীতে সভার আয়োজন হইয়াছে। বক্তা প্রায় সকলেই, সভাপতি আপনি, বিষয় গম্ভীর—সুতরাং খুব জমিবার সম্ভাবনা।

আসিবার সময় একখানা সেকেণ্ডক্লাস গাড়ী সঙ্গে আনিবেন—আমায় ফিরিবার পথে নামাইয়া দিতে হইবে; খাওয়া গুরুতর হইবার আশঙ্কা আছে। ইতি

শশব্যস্ত—
শ্রীশিশিরকুমার দত্তাধিকারী
সুযোগ্য সম্পাদক।"

ভালো ভোজের ব্যবস্থা না থাকলে সাহিত্য সভা যে জমে না এবং তার আয়ু যে চক্ষের নিমেষে ফুরিয়ে যায় এই চরম সত্য তথ্যটি ক্লাবের 'শশব্যস্ত' সম্পাদক থেকে প্রত্যেক সভ্যেরই খুব ভালো জানা ছিলো। তাই প্রত্যেকটি নিমন্ত্রণলিপিতে খাওয়ার কথাটাই বড় করে জানানো হোতো! এখানে আরো কয়েকটি সে-রকম চিঠির নমুনা দেওয়া হোলো:

"আঃ! আবার খাওয়া!!

এইত সেদিন সবাইকে বুঝিয়ে বললুম যে আর 'খাই খাই' ক'রো না—এর মধ্যে সুনীতিবাবু খাওয়াতে চাচ্ছেন। আমার হাতে কতগুলো টাকা গছিয়ে দিয়ে এখন বলছেন, না খাওয়ালে জংলিবাবুকে দিয়ে মোকদ্দমা করাবেন। আমি হাতে পায়ে ধ'রে নিষেধ করলুম; তা তিনি কিছুতেই শুনলেন না, উল্টে আমায় তেড়ে মারতে আসলেন। দেখুন দেখি কি অন্যায়! তা আপনারা যখন উপদেশমত চলবেন না, কাজেই অগত্যা সুকুমারবাবুকে ব'লে ক'য়ে এই ব্যবস্থা করে এসেছি যে তাঁর বাড়ীতে আগামী মঙ্গলবার (৩০শে জুলাই) সন্ধ্যা ৭ টার সময় আপনি সুস্থদেহে হাজির হবেন। সুনীতিবাবুর ভোজের পাত সেখানেই পড়বে। এখন খুসী হলেন ত?

ত্যক্তবিরক্ত
শ্রীসম্পাদক।"

নীচের চিঠিটি কবিতায় এবং কারুর স্বাক্ষর নেই। তাই কার যে রচনা ঠিক বলা কঠিন:

"কেউ বলেছে খাবো খাবো,
কেউ বলেছে খাই,
সবাই মিলে গোল তুলেছে—
আমি ত আর নাই।
ছোট্‌কু বলে 'রইনু চুপে
ক'মাস ধ'র কাহিলরূপে';
জংলি বলে, 'রামছাগলের
মাংস খেতে চাই।'
যতই বলি 'সবুর কর'—কেউ শোনে না কালা,
জীবন বলে কোমর বেঁধে, কোথায় লুচির থালা?
খোকন বলে রেগেমেগে
ভীষণ রোষে বিষম লেগে—
'বিষ্যুতে কাল গড়পারেতে
হাজির যেন পাই।'
Insure your life with Gresham at once"

এই কাব্যে-উল্লিখিত 'রামছাগলটি' কে (ক্লাবের কোনো সভ্যের অন্তরঙ্গ নাম নয় তো?) এবং সত্যিই

রামছাগল কিনা জানতে হয়তো অনেকেরই কৌতূহল হতে পারে। কিন্তু এই অশোভন কৌতূহল আমরা নিশ্চয়ই দমন করবো।

এই নিমন্ত্রণ-কবিতাটির নাম 'সরবৎ সম্মিলন', এটিও কার লেখা জানা নেই :

"শনিবার ১৭ই
সাড়ে পাঁচ বেলা,
গড়পারে হৈ হৈ
সরবতী মেলা।
অতএব ঘড়ি ধ'রে—
সাবকাশ হ'য়ে,
আসিবেন দয়া ক'রে
হাসিমুখ ল'য়ে।
সরবৎ, সদালাপ,
সঙ্গীত ভীতি—
ফাঁকি দিলে নাহি মাপ,
জেনে রাখ—ইতি।"

একদিন অকস্মাৎ সত্যিসত্যিই সম্পাদকমশাই ডুব দেওয়ায় ক্লাবের সভ্যদের মাথায় তো প্রায় বজ্রাঘাত হবার জোগাড়। ক্লাবটিও টলমল করে উঠলো। সে সময়ের এক অধিবেশনে সুকুমার রায়ের লেখা এই নিমন্ত্রণ-চিঠিটি বিলি হয়েছিলো। সম্পাদক না থাকায় শোকচিহ্নস্বরূপ চিঠির চারদিকে একটি কালো বর্ডার ছিলো।

"সম্পাদক বেয়াকুব
কোথা যে দিয়েছে ডুব—
এদিকেতে হায় হায়
ক্লাবটি ত যায় যায়।
তাই বলি, সোমবারে
মদ্‌গৃহে গড়পারে
দিলে সবে পদধূলি
ক্লাবটিরে ঠেলে তুলি।
রকমারি পুঁথি যত
নিজ নিজ রুচিমত
আনিবেন সাথে সবে
কিছু কিছু পাঠ হবে।
করযোড়ে বারবার
নিবেদিছে সুকুমার।"

তারপরেই এই খবরটি চিঠিতে জানা গেলো :

"শুভ সংবাদ, সম্পাদক জীবিত আছেন
আগামী সোমবার ২৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে ৬৷৷০ ঘটিকায়
তাঁহার শ্রীমুখচন্দ্র দর্শনার্থ ভক্ত সমাগম হইবে।"

এর পরের চিঠিটি সম্পাদকের স্বরচিত :

"আমি অর্থাৎ সেক্রেটারি
মাস তিনেক কলকেতা ছাড়ি
যেই গিয়েছি অন্য দেশে—
অমনি কি সব গেছে ফেঁসে !!
বদলে গেছে ক্লাবের হাওয়া,
কাজের মধ্যে কেবল খাওয়া !
চিন্তা নৈইক গভীর বিষয়,—
আমার প্রাণে এসব কি সয় ?

এখন থেকে সমঝে রাখ
এ সমস্ত চলবে নাকো,—
আমি এবার এইছি ঘুরে
তান ধরেছি সাবেক সুরে।—
শুনবে এস সুপ্রবন্ধ,
গিরিজার 'বিবেকানন্দ',
মঙ্গলবার আমার বাসায়—
(আর থেকো না ভোজের আশায়)।"

উক্ত ক্লাবের চতুর্থ জন্মোৎসবের ছোটো পুস্তিকাটির উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হোলো :

"আমাদের ক্লাবের ৪র্থ জন্মোৎসব
২৫শে আগস্ট, ১৯১৯
হিসাব—

আয়—	ব্যয়—
জানা যায় নাই	বিল্‌কুল্‌

Certified correct : শ্রীশিশিরকুমার দত্তাধিকারী

বৎসরের কার্য্যবিবরণী : সেপ্টেম্বর ১৯১৮—অগস্ট ১৯১৯ :

To Let

কৈফিয়ৎ

ক্লাবটিরে মারি
হ'ল অধিকারী
মাস তিন চারি
বিহার বিহারী।
বিরহেতে তারি
ব্যথা পেয়ে ভারি
নিশ্বাস ছাড়ি
ভিজাইল দাড়ি
যত বুড়োধাড়ি
সভ্যের সারি—
(ঘোর বাড়াবাড়ি)।

নূতন ধাঁধা

শুনেছিনু গেছ গেছে শুনেছিনু নেই সে
দাড়ি নেড়ে চাঁদা চায় শনিবার তেইশে।"

১৩৩০এর ২৪শে ভাদ্র কালাজ্বরে সুকুমার রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁকে স্মরণ করে আজ কেবল বারবার মনে হচ্ছে এই অসাধারণ প্রতিভাবান পুরুষ আজ যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে জীবনের অনেক যন্ত্রণার হাত থেকে আমরা রেহাই পেতুম।

আশ্চর্য : সুকুমার রায়

নিরীহ কলম নিরীহ কালি
নিরীহ কাগজে লিখিল গালি—
'বাঁদর বেকুব আজব হাঁদা
বকাট ফাজিল অকাট গাধা।'
আবার লিখিল কলম ধরি
বচন মিষ্টি যতন করি—
'শান্ত মাণিক শিষ্ট সাধু
বাছারে, ধনরে, লক্ষ্মী যাদু।'
মনের কথাটি ছিল যে মনে
রটিয়া উঠিল খাতার কোণে,
আঁচড়ে আঁকিতে আখর কটি
কেহ খুসি, কেহ উঠিল চটি!
রকম রকম কালির টানে
কারো হাসি কারো অশ্রু আনে।
মারে না ধরে না হাঁকে না বুলি
লোকে হাসে কাঁদে কী দেখি ভুলি ?
সাদায় কালোয় কী খেলা জানে ?
ভাবিয়া ভাবিয়া না পাই মানে।

সম্পাদকের দপ্তর

রংমশালের বর্তমান সংখ্যাটিকে "সুকুমার রায়"-সংখ্যা করা হোলো। এ-বিষয়ে নানাভাবে নানাজনের কাছে সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই মাসের প্রতিযোগিতা ছিলো সুকুমার রায়ের 'সৎপাত্র' কবিতার উপর কার্টুন আঁকা। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এই প্রতিযোগিতায় মাত্র তিনজন গ্রাহক ছবি পাঠিয়েছিলো এবং কোনটিই পুরস্কার পাবার মতো নয়। সে-জন্যে ঐ পুরস্কার দেওয়া হোলো না।

গত-সংখ্যার (কার্তিক) 'নতুন ধাঁধায়' একটি ছাপার ভুল আছে। ২১৬ পৃষ্ঠার ডানদিকের কলমের নয়-এর লাইনে ছাপা হয়েছে : "বাঁদর আর তার মা'র বয়েসের ওজন যোগ ক'রলে হয়" ইত্যাদি। ছাপা হওয়া উচিত ছিলো : "বাঁদর আর তার মা'র বয়স যোগ করলে হয়" ইত্যাদি। এই ধাঁধাঁটির উত্তর আগামী সংখ্যায় বেরুবে।

———

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.
Founded by Prof. K. N. Sen.

শিশু-সাহিত্যে সেরা কে ?
এ নিয়ে মতভেদ আছে। এক নিঃশ্বেসে উত্তর দেওয়া কঠিন।
কিন্তু
শিশু-খাদ্যের মধ্যে সেরা কি ?
এ নিয়ে মতভেদ নেই।
এক নিঃশ্বেসে বলা যায়

মাতৃদুগ্ধের অনুরূপ
ভিটা-মিল্ক

ন্যাশনাল নিউট্রিমেন্টস্ লিঃ ঃঃ কলিকাতা

I—S—VM/B

রংমশাল

[নবম বর্ষ, নবম সংখ্যা : পৌষ, ১৩৫১]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

ভুতপত্রীর যাত্রা : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ঘোড়াদের প্রবেশ ॥

আগারোম্ বাগারোম্ সবরোন্ ঘোড়া
নর্ম্মন্ ঘোড়া জর্ম্মন্ ঘোড়া,
আগাড়ুম বাগাড়ুম্ পাৎলুন ঘোড়া পান্টুন ঘোড়া
ঢাক্‌টুম্ টাকাটুম্ বর্ম্মণ টাট্টু
টপাটপ্ টগাটপ্ ষ্টড্‌ব্রেড ঘোড়া।
হাইব্রীড্ ক্রস্‌ব্রীড্ কাথিওয়াড়
নাইন্‌টি হর্স পাওয়ার কানট্রি ঘোড়া ;
চক্কড় ঘোড়া লক্কড় ঘোড়া—হার্স ষ্টন্ হাজীর।
বাজী রাওন তাজিঘোড়া, হিন্দ্‌রাওন সিন্দি ঘোড়া
গুল্ দাগ্ ফুল্ ব্লাড ইরবী ঘোড়া
ডির্ব্বি ঘোড়া তুর্কি ঘোড়া সুরতি বাজীর
হাজির হাজির।
টেক্ টেক্ নো টেক্ নো টেক্
হবে হর্স নো মিষ্টেক্
পারসী আশপ নাচুম ঘোড়া—হাজীর !
... ...
লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্, তাড় তাড়, তড় বড়
টাপে টাপে চক্কর লাগ্
দাপট্ ঝাপট্ খট্ খটা খট্ চট্ চটাপট্ উলুখড়
উড়ে যাগ্।
তত্ত্বড় তত্ত্বড় ছক্কড় লক্কড়—লকড়ি ঘোড়া নেংড়ি ঘোড়া
কুমরী ঘোড়া !
লড় বড় লড় বড় লড়র বড়র তড়র বড়র
কঙ্কর কর্দ্দম ছড়কট্ ছরর ছরর
খবরদার পঁইস্ পঁইস্ লগড় ঝগড়
—আড়াই ঘর সবর সবর
জল ভিস্তি হাজীর !
(প্রস্থান)

॥ জল ভিস্তির নৃত্যগীত ॥

শীতল শীতল পানি ছিটল্
মিঠল মিঠল ঠাণ্ডা পানি
ছিটল্ ছিটল্ লহর পানি
বম্বাপানি শীতল শীতল
মুশক পানি ছিটল্ ছিটল্ !
রে ভিস্তি, ইস্তাবিল মে পানি ছিটল্
বাংলে মে পানি মিঠল
ফুল বাগিচোমে বম্বাজল ছিটল।
ফুল বাগিচা শুখাই যাতা
পানি বিনা ঘোড়া মরতা
রাস্তামে গরদা
ছিটল্ ছিটল্ পানি ছিটল্। (প্রস্থান)

[ক্রমশ]

পদীপিসির বর্মি বাক্স : লীলা মজুমদার

পাঁচুমামা এইখানে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোকের দিকে একদৃষ্টে কট্‌মট্ ক'রে চেয়ে থাকার ফলে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক উঠে গিয়ে সুড়সুড় ক'রে নিজের জায়গায় ব'সে নিবিষ্ট মনে দাঁত খুঁটতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বেশ রাত হ'য়ে যাওয়াতে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সবাই ঘুমিয়ে টুমিয়ে পড়ে একেবারে স্তূপাকার হ'য়ে রয়েছে দেখা গেলো।

আমি আশা ক'রে বসেই আছি পাঁচুমামা লোমহর্ষণ আরও কিছু বল্‌বে, কিন্তু পাঁচুমামা দেখলাম চটিটি খুলে ঘুমোবার জোগাড় করছে। তাই দেখে আমার কেমন অসোয়াস্তি বোধ হতে লাগলো আর চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক থাক্‌তে না পেরে দাঁত-খোঁটা বন্ধ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "একশ' বছর ধরে যা' এত খোঁজা সত্ত্বেও পাওয়া যায়নি, তা'কে যে আবিষ্কার করবেন, কোনও পায়ের ছোপ বা আঙুলের ছাপ জাতীয় চিহ্নটিহ্ন কিছু পেয়েছেন ?"

পাঁচুমামা বল্লো, "ঠিক পাইনি, তবে পেতে কতক্ষণ ?

পদীপিসির শেষ কথায় ত' মনে হয় যে চোখের সাম্‌নেই কোথাও আছে, চোখ ব্যবহার করলেই পাওয়া যাবে। লুকিয়ে রাখ্‌বার ত' সময়ই পান্‌নি। আর মনে প'ড়ে যখন হাসি পেয়েছিলো তখনি নিশ্চয় চোরেও নেয়নি। কিন্তু পাঁচশ' বার বল্‌ছি মশাই, আপনার তাতে কী?" চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক কোনও উত্তর না দিয়ে মাথা পর্য্যন্ত মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সবাই শুয়ে পড়লো আর আমি একা জেগে অন্ধকার রাত্রের মধ্যে ঝোপেঝাড়ে হাজার হাজার জোনাকি পোকার ঝিকিমিকি আর থেকে থেকে এঞ্জিনের ধোঁয়ার মধ্যে ছোট ছোট আগুনের কুচি দেখতে লাগলাম। ক্রমে সে সব আব্‌ছা হ'য়ে এলো, আমার চোখের সাম্‌নে খালি দেখতে লাগলাম বড় সাইজের একটা বর্মি বাক্স, লাল্‌চে রঙের উপর কালো দিয়ে আঁকা বিকট হিংস্র এক মাছ প্যাটানের ড্র্যাগন, তা'র চোখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে, নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, জিভ লক্‌লক্‌ করছে। আরও দেখতে পেলাম যেন বাক্সর ঢাক্‌নিটা খোলা রয়েছে আর তার ভিতর পায়রার ডিমের মতন, মোরগের ডিমের মতন, হাঁসের ডিমের মতন, উট পাখীর ডিমের মতন সব হীরে-মণি আমার চোখ ঝল্‌সে দিচ্ছে! হঠাৎ ঘচ্‌ করে ট্রেন থেমে গেলো।

মামাবাড়ীর ষ্টেশনে পৌছলাম গভীর রাত্রে। ষ্টেশনের বেড়ার পেছনে কতকগুলো লম্বা লম্বা শিশুগাছের পাতার মধ্যে একটা ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া শিরশির ক'রে বয়ে যাচ্ছে। প্ল্যাট-ফর্মে জনমানুষ নেই। ছোট্ট ষ্টেশনবাড়ীর কাঠের দরজার কাছে ষ্টেশনমাষ্টার একটা কালো সেড লাগানো লণ্ঠন নিয়ে হাই তুলছেন। পান খেয়েছেন অজস্র, আর বহুদিন দাড়ী কামান নি। একটা গাড়ী নেই, ঘোড়া নেই, গোরুর গাড়ী দূরে থাকুক, একটা বেড়াল পর্য্যন্ত কোথাও নেই।

আমি পাঁচুমামার দিকে তাকালাম; পাচুমামাও ফ্যাকাসে মুখ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তখন আর সহ্য করতে না পেরে বল্লাম, "তুমি যে প্রায়ই বল আমরা এখানকার জমিদার, এরা তোমাদের প্রভুভক্ত প্রজা, এই কি তার নমুনা? আমি ত' ভেবেছিলাম আলো জ্বলবে, বাদ্যি বাজ্‌বে, মালাচন্দন নিয়ে সব সারিসারি দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর আমরা চতুর্দোলায় চেপে মামাবাড়ী যাব। গিয়ে গরম গরম—"

পাঁচুমামা এইখানে আমার খুব কাছে ঘেঁষে এসে কাণে কাণে বল্ল, "চোপ্‌ ইডিয়ট্‌! দেখ্‌ছিস্‌ না চারদিক থেকে অন্ধকারের মতন বিপদ ঘনিয়ে আসছে। রক্তলোলুপ নিশাচররা যা'দের পিছু নিয়েছে তাদের কি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা শোভা পায়?"

চম্‌কে গিয়ে বক্তৃতা থামিয়ে অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলাম একটা নিবুনিবু হুসেল্‌ওয়ালা টর্চ্‌ জ্বেলে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক ও গাড়ী থেকে রাশিরাশি পোঁটলাপাট্‌লি ছেলেপুলে ও মোটা গিন্নীকে নামাচ্ছেন! তাঁরা নাম্‌তে না নাম্‌তেই গাড়ীটাও ঘড়ঘড় ক'রে চলে গেলো, আর অন্ধকার লম্বা প্ল্যাট্‌ফর্ম জুড়ে কেমন একটা থম্‌থমে ভাব বিরাজ করতে লাগল! তা'র মধ্যে শুন্‌তে পেলাম পাঁচুমামা আমার ঘাড়ের কাছে ফোঁসফোঁস ক'রে নিশ্বেস ফেলছে। এমন সময় অন্ধকার ভেদ করে কে চ্যাঁচাতে লাগল, "অ পাঁচুদাদা; অ মেজদিমণির খোকা! বলি এয়েছ না আসনি?" পাঁচুমামার যেন ধড়ে প্রাণ এলো, খচ্‌মচ্‌ ক'রে ছুটে গিয়ে বল্ল, "ঘনশ্যাম এলি। আঃ বাঁচালি।"

[ক্রমশ]

কয়েকটি কবিতা : পরিমল রায়

গান

গুপীবাবু গলা ছেড়ে গানে দেন গিটকিরি
গর্জন শুনে তাঁর সবে দেয় টিটকিরি।
গুপীবাবু কন ক্ষেপে
ভয়ানক সংক্ষেপে
"গলা কিছু ধরো-ধরো ঘরে নেই ফিটকিরি।"

ডাক্তার

এক যে আছেন ডাক্তার
টাকার বেজায় খাঁক তাঁর,
চার থেকে আট ষোলো করে যতই বাড়ান ভিজিট
ব্যাঙ্কেতে তাঁর জমার অঙ্কে ততই বাড়ে ডিজিট,
একেক লাখে থুতনীটাতে পড়ে একটি যাক্‌ তাঁর!

চিকিৎসা

কনে সদ্বংশের, বস্থ ওরা বন-গাঁর—
দোষ শুধু রঙটায়, একেবারে অঙ্গার,
হায় পিস্‌-শাশুড়ীক
চিকিৎসা আস্থরিক
—অবিরল গায়ে জল ঢালে আদি গঙ্গার!

চাপরাশি

এক যে আছে জজ-সাহেবের চাপরাশি,
তার ওপরে হুকুম আছে ঢালাই
রসুইখানায় রোজ খাবে সে মালাই,
নইলে কিসে ঢাকবে জজের পাপরাশি!

ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সেই কালো কুতকুতে মতো ভদ্রলোক জগু, পান্না আর ঘোঁতনদের বলে চলেছেন ক্ষুদে শয়তানের কথা। জগুর মুখ খানিকটা হাঁ হয়ে রয়েছে, ঘোঁতনের মুখ পুরো হাঁ হয়ে গিয়েছে। পান্না কিন্তু মুঠো পাকিয়ে দাঁড়িয়ে: সিওয়ান যে সত্যি কথা বলেছে তার প্রমাণ কী? পোড়া হাওয়া আর তাজা হাওয়া এক জিনিস নয়। পোড়া হাওয়া থেকে হয়ত পোকা জন্মায় না; কিন্তু তাজা হাওয়া থেকে জন্মাতে পারে! তা হলে বীজাণু হাওয়ায় ভেসে আসে, সিওয়ানের এ কথার প্রমাণ হয় না।

"ঠিক বলেছ", ভদ্রলোক বল্লেন, "প্রমাণ হয় না বটে, তবু সিওয়ানের কথাই ঠিক।"

"ইস্‌", পান্না বলে বসল, "আবদার নাকি? ঠিক বল্লেই ঠিক? প্রমাণ চাই।"

"হুঁ, প্রমাণ নিশ্চয়ই চাই। সিওয়ান যদিও প্রমাণ দিতে পারেননি, তবু, লুই পাস্তুর সিওয়ানের কথাটাই অন্য ভাবে প্রমাণ করেছেন। তাই বলছিলুম, সিওয়ানের কথাই ঠিক।"

"কী ভাবে প্রমাণ করেছেন, বলুন।"

সেই ভদ্রলোক বলে চল্লেন, "গেঁজে যাওয়া কাকে বলে জানো ত? রসগোল্লার রস আঢাকা পড়ে থাকলে দুদিন পরেই টকটক হয়ে যায়, তার ওপর ফেনা মতো জমে। জ্যামের বোতল খুলে রাখলে কিছুদিন পরেই তার থেকে স্পিরিটের গন্ধ ছাড়ে। খেজুরের রস রোদে আঢাকা পড়ে থাকলে তাড়ি হয়ে যায়। এই যে সব বদল এগুলোর নামই গেঁজে যাওয়া। জিনিস গেঁজে যায় কেন? এই প্রশ্নের জবাব বের করতে পাস্তুর উঠে পড়ে লাগলেন। চিনির রস তৈরি করে দুটো খালি বোতলে ঢাললেন, একটা বোতলের মুখ তুলো দিয়ে বন্ধ করে দিলেন আর একটা রাখলেন আঢাকা। দেখা গেল আঢাকা রসটা চট করে গেঁজে যায়, ঢাকা দেওয়াটা যায় না। কেন এই তফাত হয় বলতে পারো?"

জগু বল্লে, "না ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"বাঃ, এ ত' খুব সোজা কথা। তুলোর মধ্যে দিয়ে হাওয়া যেতে পারে কিন্তু বীজাণু যেতে পারে পারে না। তাই বুঝতে হবে রস যে গেঁজে যায় তার কারণ বীজাণু হাওয়ায় ভেসে গিয়ে সেখানে আড্ডা গাড়ে।"

"ওঃ, তাই ত! এই সহজ কথাটা মাথায় ঢুকছিল না?" —জগু একটু লজ্জিতভাবে হাসল।

ভদ্রলোক বল্লেন, "কথাটা আসলে অত সহজ সত্যি নয়। তোমাদের খুব সহজ করে বোঝালুম। হাওয়ায় যে সত্যি বীজাণু ভাসে তার প্রমাণ অবশ্য পাস্তুর করেছেন অনেক কষ্ট করে। অনুবীক্ষণ দিয়ে চোখে দেখার আগে বীজাণুকে খুব সহজে মেনে নেবার পাত্তর পাস্তুর ছিলেন না। যাই হোক, এ সব হল পরের কথা। আপাতত যা বলছিলুম শোনো: পাস্তুর মনে করলেন তুলোর মধ্যে দিয়ে হাওয়া বোতলে ঢোকবার সময় যদি তুলোয় বীজাণুগুলো আটকে যায় তা হলে ত' অবস্থা অনেকটা চা-ছাঁকার মতো হওয়া উচিত। কেৎলি থেকে চা ঢালবার সময় চায়ের পাতা যে-রমক ছাঁকনিতে অটকে যায় সেই রকম। ছাঁকনি যদি চায়ের পেয়ালার ওপর উবুড় করে দাও তা হলে ত' পাতাগুলো আবার পেয়ালায় পড়বে? তুলো আর বীজাণুর বেলাতেও ত' তাই হওয়া উচিত। পাস্তুর দেখলেন হয়ও ঠিক তাই। না-গেঁজা বোতলের ওপোর যদি মুখের তুলোটা খুলে খানিক ঝেড়ে নেওয়া যায় তা হলে কিছু সময়ের পর এ বোতলের রসও গেঁজে যাবে।"

"ভারি মজা ত'!" ঘোঁতন অবাক হয়ে বলল।

"মজা এখুনি দেখছো? আরও কত মজা আছে, শুনবে। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখো। বীজাণু হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায় আর যেখানেই চটচটে মতো জিনিস পায় সেখানেই আড্ডা গেড়ে বসে। খাবারদাবার তাই

খোলা ফেলে রাখতে নেই, হাত-পা যদি নোংরা চটচটে হয়ে থাকে তা হলে বীজাণুর দল সেখানে এসে জুটবে।"

ইস্কুল থেকে ফেরার পর তাড়াহুড়োয় ঘোঁতন হাতমুখ ধুতে ভুলে গিয়েছিলো; তাড়াহুড়োয় বেরিয়ে পড়েছিল পার্কের দিকে। সে-কথা খেয়াল হতে তাড়াতাড়ি হাফ্-প্যান্টের পকেটে হাত লুকোতে গেল। কিন্তু ভদ্রলোকের চোখ এড়ানো কঠিন। ঘোঁতনকে বল্লেন, "আমি অনেক আগেই দেখেছি তোমার হাতমুখের অবস্থা। এতক্ষণ কিছু বলিনি কারণ শুকনো উপদেশ দিয়ে লাভ হয় না। এখন কারণটা বুঝিয়ে দিয়েছি, এবার নিশ্চয়ই আর নোংরা হাতে থাকবে না।"

লজ্জায় ঘোঁতনের কালো কালো কান একেবারে বেগুনি হয়ে গেল!

পান্নার কিন্তু এ সব কথায় মন লাগছিলো না। বিরক্ত হয়ে বলল, "কিন্তু সিওয়ানের কথা প্রমাণ হল কোথায়? সেই পোড়া হাওয়া আর তাজা হাওয়ার ব্যাপারটা কী হল?"

ভদ্রলোক হাসলেন। "ও, সেকথা পাস্তর খুব সহজ উপায়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তিনি বল্লেন হাওয়াকে পোড়াবার দরকার নেই, আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে হাওয়াকে নিয়ে গেলেই হাওয়ার বীজাণু ঝরে পড়বে বা আটকে যাবে পথে, জলে পৌঁছবে শুধু হাওয়া। তাই তিনি একটা বোতল করলেন তার মুখটা S অক্ষরের মতো আঁকাবাঁকা। দেখা গেল সেই বোতলে পরিষ্কার ফুটন্ত জল রাখলে তাতে আর বীজাণু দেখা দেয় না।"

পান্না হেরে গেল, কিন্তু এ সব তর্কে জগুর তেমন মন লাগছিলো না। কাল ত' বেশ মজার কথা বলছিলেন ভদ্রলোক, আজ এই সব খুঁটিনাটি তর্কের কথা তুলছেন কেন? জগু ভাবছিলো এতক্ষণে ডাংগুলিতে চার-সাট্ করে তিনশো কুড়ি হাঁকড়ে দেওয়া যেত। ভাবছিলো, আর বাঁ পায়ে ভর দিয়ে ডান পা হালকা করে, কোমর বেঁকিয়ে ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে হাই তুলছিলো। ওর হাই তোলা দেখে ভদ্রলোক বল্লেন, "কি হে, মন লাগছে না বুঝি?"

[ক্রমশ]

উঁচু নজর : সত্যব্রত ঘোষ

সস্তায় চাল ডাল
কিন্‌তো যে এতকাল
ভদ্দর আর যতো ইতরে,—
নহে তারা ধন্য,
মান্য কি গণ্য
আধুনিক মানুষের ভিতরে!

যাই বল আমাদের
নজরটি উঁচু ঢের;—
খরচ করতে পিছু যাই না।
চড়া দামে সব তাই
আজ কাল কিনি ভাই!—
বলছি যা, খাঁটি কথা! তাই না?

পরের দিন বড়দিন (উপন্যাস) : এডালবার্ট স্টিফটার

মাসের পর মাস কেটে যায়। বছরে একবারের বেশি প্রায়ই জিশ্‌চেডবাসীদের মিল্‌সডর্ফের বড় হাটে আসা হয়ে ওঠে না। মিল্‌সডর্ফবাসীরাও তাই, যদিও বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে একটি যোগসূত্র বজায় রাখতে হয় বলে তারা জিশ্‌চেডবাসীদের মতো অতটা কুনো নয়। মিলস্‌ডর্ফের উপত্যকার ভিতর দিয়ে একটি বড় পথ চলে গেছে। সে-পথে যাবার সময় কোনো পর্যটক একবার ভাবতেও পারে না যে উত্তরে, বিরাট তুষার-পর্বতের ওপাশে, আরো একটি উপত্যকা আছে যেখানকার ছড়ানো বাড়িগুলো সংখ্যায় নেহাৎ কম নয় আর সেই বাড়িগুলির সঙ্গে আছে একটি গির্জে যার চূড়োটা ছুঁচলো।

জিশ্‌চেডে খুব ভালো জুতো তৈরি হয়। সেখানকার লোকেরা এই জুতোর ব্যাপারে একটু বেশি শৌখীন। খুব ভালো না হলে জুতো তাদের পছন্দ হয় না। বলতে গেলে একটি মাত্র লোক আছে যে খুব ভালো জুতো তৈরি করতে পারে। যেখানে সবচেয়ে ভালো-ভালো বাড়িগুলো দেখতে পাবে তার বাড়িটা সেখানেই। তার দেয়ালের রঙ ধূসর, জানালার কাঠামো শাদা, পাখীগুলো সবুজ। একতলায় কারখানা, কারিগরদের ঘর, একটি ছোটো ও একটি বড় বৈঠকখানা, ছোট্ট একটি দোকান, রান্নাঘর, মাংস রাখার ভাঁড়ার এবং আরো কয়েকটি সাংসারিক জিনিসপত্র রাখার ঘর। দোতলার ঘরটি বেশ বড়: চমৎকার দুটি বিছানা, জামাকাপড় রাখার সুন্দর পালিশকরা দেরাজ, বাসন রাখার কাঁচের তাক, খোদাই-কাজকরা টেবিল, গদিমোড়া চেয়ার। দেয়ালে টাঙানো নানা মহাপুরুষের ছবি, দুটি ঘড়ি—লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতার পুরস্কার—আর কতকগুলি বন্দুক। পাশেই আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোটো কুঁড়ে বাড়ি। তার মালিকও একই ব্যক্তি। সেখানে একটি মাত্র বাসপোযোগী বড় ঘর। অন্য ঘরগুলি ছোটোছোটো, টুকিটাকি জিনিস রাখার। ছেলের বা উত্তরাধিকারীর হাতে বড় বাড়ি ও ব্যবসা তুলে দিয়ে বাড়ির মালিক সস্ত্রীক এই ছোটো বাড়িতে এসে শেষ জীবনের ছুটি ভোগ করে। তাদের মৃত্যুর পর নতুন বাসিন্দের অপেক্ষায় বাড়িটা খালি পড়ে থাকে। বড় বাড়ির পিছনে ছোটো পশুশালা আর গোলাঘর। তারপরেই বাগান। জিশ্‌চেডের প্রত্যেক ভালো বাড়িতেই একটি করে বাগান দেখতে পাবে। সেখানে তরিতরকারি থেকে ফুল ও ফল পর্যন্ত পাওয়া যায়। জিশ্‌চেডের অনেক বাগানে মৌমাছি পোষবার বন্দোবস্তও আছে —পাহাড়ে অনেকেই মৌমাছি পুষে থাকে।

এখানে আর একটি লোক যে জুতোর ব্যবসা করে তার নাম টোবিয়াস। লোকটা বুড়ো, সে শুধু জুতো সারায়। তার হাতে সর্বদা অনেক কাজ। স্থানীয় জুতোর ব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবার তার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে নেই, বিশেষত অন্য জনের কাছ থেকে বিনামূল্যে সে যখন চামড়ার টুকরো-টাকরা প্রায়ই পেয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে গ্রামের প্রান্তে বড়বড় ঝোপের পাশে বসে সে কাজ করে। তাকে ঘিরে থাকে অসংখ্য জুতো: পুরনো, ধূসর, কাদামাখা, ছেঁড়া। হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বুট একটিও দেখতে পাবে না। কারণ সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে গির্জের পুরোহিত আর শিক্ষক ছাড়া আর কেউই সে-ধরণের বুট ব্যবহার করে না আর তারা সর্বদাই নিজেদের জুতো সারাবার জন্য বড় দোকানে যায়, সেখান থেকেই নতুন জুতো তৈরি করায়। শীতকালে বুড়ো টোবিয়াস বড় ঝোপের পিছনে তার ছোটো ঘরের চুল্লিতে কাঠের আগুন জ্বেলে কাজ করে। জিশ্‌চেডে কাঠ খুব সস্তা।

স্থানীয় জুতোর ব্যবসায়ী নিজের অধিকারে বড় বাড়িটা পাবার আগে শ্যামোয়-মৃগ শীকার করে বেড়াতো। ইস্কুলে সে ছিলো খুব ভালো ছাত্র। তারপর বাবার কাছে ব্যবসা শিখে ব্যবসার কাজে কিছুদিন নানা জায়গা ঘুরেফিরে এলো। কিন্তু তার চাল-চলন হোলো একেবারে অন্য ধাঁচের। তার বাবা কিংবা অন্যান্য কারিগররা যে-রকম কালো টুপি আর দীর্ঘ কালো কোট পরতো সে-রকম না পরে, সবুজ টুপিতে অনেক পালক গুঁজে ছোটো কোট পরে সে ঘুরে বেড়াতো। নাচের মাঠে আর খেলার আখড়ায় সর্বদাই তাকে দেখা যেতো আর কেউ এ-বিষয়ে তাকে উপদেশ দিতে এলে খুব নীচু সুরে সে শিষ দিতে আরম্ভ করতো। আশেপাশের প্রত্যেক লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতায় সে তার বন্দুক নিয়ে যেতো আর প্রায়ই উপহার নিয়ে ফিরতো। সে-অঞ্চলের প্রত্যেক শিকার-দলে সে থাকতো আর ভালো লক্ষ্যভেদ করতে পারে বলে যথেষ্ট সুনাম কিনেছিলো। পাহাড়ে চড়বার লোহার সরঞ্জাম আর দোনলা বন্দুক নিয়েও মাঝেমাঝে সে বেরুতো। একবার এ-ভাবে বেরুবার পর মাথায় গভীর এক ক্ষত নিয়ে সে ফিরেছিলো বলে শোনা যায়।

মিলস্‌ডর্ফে এক রঙের ব্যবসায়ী ছিলো। জিশচেড থেকে এ-গ্রামে ঢুকতে যে-বাড়িটা প্রথম চোখে পড়ে সেটা তার। সেখানেই তার ব্যবসার কাজকর্ম হয়, অনেক লোক কাজ করে, এমন কি অনেক যন্ত্রপাতীও সেখানে আছে। উপত্যকাবাসীরা ইতিপূর্বে কলকব্জা আর যন্ত্রপাতীর কথা শোনেইনি, চোখে দেখা তো দূরের কথা। এই ব্যবসা ছাড়া চাষবাসের জন্যে লোকটার অনেক জমিও আছে। এই ধনী রঙের ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করার লোভেই আমাদের জুতোর ব্যবসায়ী সেই পাহাড় টপকে মিলস্‌ডর্ফে হাজির হয়েছিলো। মেয়েটির রূপের কথা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো। সেই সঙ্গেই শোনা যেতো তার সংসার চালানোর প্রশংসা, তার নম্রতা আর হিসেবীপনার কথা। গুজব রটলো আমাদের জুতোনির্মেতাকে মেয়েটির ভালো লেগেছে। কিন্তু রঙের ব্যবসায়ী তাকে নিজের বাড়ির ভিতর ঢুকতে দিতো না। এতোদিন তার সুন্দরী মেয়ে বাপের বাড়ির পাঁচিলের বাইরে গ্রামের উৎসব-মণ্ডপে বড় একটা আসতোই না, গুজব রটবার পর তার বেরুনোই বন্ধ হয়ে গেলো শুধু গির্জেয় যাওয়া কিংবা বাগানে বেড়ানো ছাড়া।

এদিকে সেই জুতোনির্মেতার ভিতরেও দেখা গেলো এক পরিবর্তন। তার বাবা-মা'র মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সে হোলো। একলাই থাকতে হোতো তাকে। আগে যেমন সে সর্বদাই ঘুরে বেড়াতো এখন আবার তেমনিই সর্বদা ঘরের মধ্যে নিজেকে বন্ধ রাখতে সুরু করলো। দিনের

পর দিন আর রাতের পর রাত জুতোর শুকতালায় হাতুড়ি পিটে সে কাটিয়ে দিতে লাগলো। সে খুব গর্ব করে বাজী ধরে বলতে সুরু করলো পৃথিবীতে এমন কোনো লোক নেই তার চেয়ে যে ভালো জুতো বানাতে পারে। সবচেয়ে ভালো কারিগর না হলে নিজের দোকানে সে চাকরি দিতো না আর যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তার নির্দেশমতো কাজ শিখতো ততক্ষণ সে ছাড়তো না। ইতিপূর্বে জিশ্‌চেডবাসীরা জুতো কিনতে আশেপাশের গ্রামে যেতো। কিন্তু দেখতে-দেখতে গোটা গ্রামটাই তার খদ্দের হয়ে গেলো, তারপর হোলো সেই উপত্যকার সমস্ত লোকেরা, শেষে মিলস্‌ডর্ফ এবং অন্যান্য উপত্যকা থেকেও লোক আসতে সুরু করলো তার কাছে জুতোর বায়না দিতে। এই জুতো তৈরির ব্যাপারে তার নাম এমনই ছড়িয়ে পড়লো যে বহুদূরে সমতল দেশের অনেক লোক পর্যন্ত পাহাড়ে বেড়াবার জন্যে তাকে দিয়ে বুটজুতো করিয়ে নিয়ে যেতো।

ভারি সুন্দর পরিপাটি করে সে বাড়ি সাজালো। খিলেনদেওয়া কুলুঙ্গির তাকের উপর জুতোর সারি ঝকঝক করতে লাগলো। প্রতি রবিবারে গ্রামের সমস্ত লোকেরা চাঁদনিচকের চারটে লিন্‌ডেন্ গাছের আশেপাশে এসে জমা হোতো আর তাদের কেউই সেই জুতোর দোকানের কাঁচের ভিতর দিয়ে অন্তত একবার উঁকি মেরে দেখবার লোভ সামলাতে পারতো না। ভিতরে তখন কেনাবেচা আর দরদস্তুর চলেছে।

পাহাড়কে সে ভারি ভালবাসতো আর সেইজন্যেই পাহাড়ে বেড়াবার জুতোই সে তৈরি করতো সবচেয়ে ভালো। গ্রামের সরাইখানায় বহুবার তাকে বলতে শোনা গেছে যে পৃথিবীতে এমন কোনো লোক নেই যে তার দোকানের চেয়ে ভালো একজোড়া পাহাড়ে বেড়াবার জুতো দেখাতে পারে। সে বলতো, "তারা জানেই না এমন জুতোর কথা, জীবনে তারা শোনেইনি কী করে এ-রকম জুতো বানাতে হয়: এ-জুতোর শুকতলায় আকাশের তারার মতো ঝকঝকে কাঁটাগুলো কী করে লাগানো হয় আর কী করে লোহার ওজনটা তারা বইতে পারে এ-খবর আর কেউ জানে না। যাতে যত তীক্ষ্ণই হোক না কেন পাথরের ধাক্কা পা টের না পায় তার জন্যে জুতোর বাইরেটা যে কী রকম শক্ত আর ভেতরটা যে দস্তানার মতো কী রকম নরম করতে হয় সেকথাই বা কে জানে শুনি?"

তার মস্ত একটা মোটা হিসেবের খাতা ছিলো। সেই খাতায় প্রতি জোড়া জুতোর কথা লিখে রাখতো: কারা সেই জুতোর মালমসলা দিয়েছে, জুতোটা কোন্ জাতের হোলো—এই ধরণের সব কথা। একই ধরণের জুতোগুলোর গায়ে পরের পর নম্বর দেওয়া থাকতো। সেই কুলুঙ্গির এক মস্ত বড় দেরাজে সেই খাতাটা থাকতো বন্ধ হয়ে।

মিল্‌স্‌ডর্ফের সেই রঙের কারবারীর মেয়েটি তার বাপের বাড়ির বাইরে আসতো না বটে, এমন কি তার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাওয়াও সে বন্ধ করেছিলো—তবু জিশ্‌চেডের সেই জুতোনির্মেতা বেশ বুঝতে পারতো মেয়েটি বাগানে বেড়াবার সময়, গির্জের যাবার পথে কিংবা জানালার ভিতর দিয়ে পাহাড়ী মাঠ দেখার ফাঁকে-ফাঁকে তাকে লক্ষ্য করছে। ব্যাপার দেখে সেই রঙের কারবারীর বউ বহু সাধ্য-সাধনার পর শেষে একদিন এই বিয়েতে তার নাক উঁচু স্বামীর মত করাতে পারলো। আর সত্যি বলতে কি তার চেয়ে ভালো পাত্রও কেউ তখন ছিলো না। ফলে এই সুন্দরী বড়লোকের মেয়েকে একদিন সে নিজের বৌ করে জিশ্‌চেডে ফিরে এলো। তা সত্বেও কিন্তু রঙের কারবারীর গুমোর ভাঙলো না। সে বললো, "সত্যিকারের বুদ্ধিমান লোকের জানা দরকার কী করলে ব্যবসার উন্নতি হয়, নিজে আর বৌ-ছেলেমেয়ে-চাকরবাকর পেট ভরে খেতে পায়। কী করলেই বা বাড়িঘর ঝকঝক করে আর অনেক টাকা যায় জমানো। সংসারে এই জমানো টাকার ওপরেই খাতির বাড়ে কমে।" অতএব তার মেয়েকে বিয়ের জিনিসপত্র ছাড়া যৌতুক হিসেবে কিছুই সে দিলো না। কারণ, সে বললো, বাকী সবটাই তো এবার থেকে তার স্বামীর উপর নির্ভর করছে। মিলস্‌ডর্ফে রঙের ব্যবসা আর চাষের বাগানগুলো ধরলে তার সম্পত্তির পরিমাণ বেশ মোটা হয়ে দাঁড়ায়—এই সম্পত্তিকে ভাগ-বাঁটরা করলে তার সুনামের ক্ষতি হবে। তা ছাড়া তার ব্যবসার মূলধনই হচ্ছে এই সমস্ত সম্পত্তি। তাকে এখন ভাগ করবে কী করে! ফলে যৌতুক দেবার মতো এককোঁটা সম্পত্তিও তার নেই! ভবিষ্যতে, সে আর তার স্ত্রী যখন মারা যাবে, মিলস্‌ডর্ফের সমস্ত জমিদারি আর রঙের ব্যবসা তখন অবশ্যই তাদের একমাত্র মেয়ে, জিশ্‌চেডের জুতোর ব্যবসায়ীর স্ত্রী-ই, পাবে। তারা স্বামী-স্ত্রীতে এই সম্পত্তি নিয়ে তখন অবশ্য যা খুসি করতে পারে। কিন্তু এই পাবার ব্যাপারেও কতকগুলো সর্ত সে ঠিক করেছে: প্রথম সর্ত হচ্ছে এই সম্পত্তি পাবার ও রাখবার উপযুক্ত তাদের হতে হবে। না হলে সেটা পাবে

তাদের ছেলেমেয়েরা। ছেলেমেয়েও যদি না থাকে তা হলে সম্পত্তির যৎসামান্য অংশ ছাড়া সবটাই ভাগ করে দেওয়া হবে তাদের আত্মীয়স্বজনদের।

আমাদের জুতোর ব্যবসায়ীও অবশ্য কিছু চায়নি। গর্ব করে সে হাব-ভাব দেখাতে লাগলো মিল্‌স্‌ডর্ফের এই সুন্দরী মেয়েটিকেই সে শুধু চেয়েছিলো। বাড়িতে মেয়েটি যে-রকম খেতে-পরতে পেতো সে রকম খাবার-দাবার জামাকাপড়ের ব্যবস্থা করা তার পক্ষে কিছু কঠিন হোলো না। তার সঙ্গে বিয়ে হবার পর সে যে শুধু জিশচেডের কিংবা উপত্যকার কাছে-পিঠের সব মেয়ের চেয়েই বেশি সেজেগুজে বেড়াতো তা নয়, এ-রকম ভালো জামাকাপড় ইতিপূর্বে মেয়েটি কোনদিন তার বাপের বাড়ীতেও পরেনি। তার বাপের বাড়িতে যে-রকম খাবার-দাবার হোতো এখানে যাতে তার চেয়ে অনেক ভালো খাবার ব্যবস্থা হয় এদিকেও সে নজর রাখলো। তার শ্বশুরের সঙ্গে সমানে সমান হতে, এতোদিন যে টাকাকড়ি জমিয়েছিলো তাই ভাঙিয়ে, সে ধীরে-ধীরে জমি কিনতে লাগলো। তার জমিজমার কথা কিছুদিনের মধ্যেই সবাই বেশ ফলাও করে বলতে সুরু করলো।

জিশ্‌চেড়ের লোকেরা বড় একটা নিজেদের উপত্যকার বাইরে যেতো না। এমন কি মিলস্‌ডর্ফেও তাদের খুব কমই যাতায়াত ছিলো। এই দু-গ্রামের হালচাল ছিলো দু-জাতের, তা ছাড়া মাঝখানে একটা পাহাড়ের বাধাও রয়েছে। এ-পর্যন্ত কোনো লোককেই সে-গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে ঘরসংসার করতে শোনা যায়নি। মাঝেমাঝে শুধু ক্ষেতের কাজে তাদের অনেক দূর-দূর জায়গায় যেতে হয়। কোনো মেয়েই এক উপত্যকা ছেড়ে অন্য উপত্যকায় গিয়ে থাকতে রাজী হয় না—অবশ্য বিয়ের কথা অন্য। তাকে তখন বউ সেজে অন্য উপত্যকায় শ্বশুর-বাড়িতে এসে থাকতেই হয়। কিন্তু লোকে কানাকানি করতে লাগলো মিলস্‌ডর্ফের রঙের কারবারীর সুন্দরী মেয়েটি জিশ্‌চেডের জুতো নির্মেতার বউ হলেও সে-গ্রামের লোকদের সঙ্গে ঠিক যেন মিশে যেতে পারছে না। তারা তার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার কখনোই করেনি, বরঞ্চ মেয়েটির সরল স্বভাব আর মধুর ব্যবহারের জন্যে ভালোই বাসতো—তবু কেমন যেন একটা লজ্জা-লজ্জা ভয়-ভয় ভাব তাদের সর্বদাই দূরে-দূরে রাখতো। জিশ্‌চেডের মেয়েরা আর ছেলেরা সবাই সবাইকার সঙ্গে যে-রকম মন খুলে মিশতে অভ্যস্ত কখনই সে-ভাবে তার সঙ্গে তারা মিশতে পারেনি। এ-ভাবেই দিন কেটে চললো, কিছুতেই তাদের ভিতরকার আড়ষ্টতা কাটলো না। তার উপর মেয়েটিকে সংসারের কাজ করতে হোতো না দেখে আর সবসময়েই সেজেগুজে আছে লক্ষ্য করে তাদের সেই দূরে-দূরে থাকা তো কমলোই না, বরঞ্চ বেড়েই চললো।

বিয়ের এক বছর পরে তাদের একটি ছেলে হোলো, আরো কয়েক বছর পরে হোলো একটি মেয়ে। কিন্তু তার মনে হোতো তার স্বামী বুঝি ছেলেমেয়েদের যতটা ভালোবাসা উচিত ততটা বাসছে না, অন্তত সে যতটা বাসে ততটা তো নয়ই! একথা সে সন্দেহ করতো তার কারণ সর্বদাই তার স্বামীর হাবভাব ছিলো ভারি গম্ভীর-গম্ভীর আর সর্বদাই সে নিজের ব্যবসার ভাবনায় ডুবে থাকতো। ক্বচিৎ ছেলেমেয়েদের সে আদর করতো কিংবা তাদের নিয়ে খেলতো আর এমন একটা ঠাণ্ডা শান্ত গলায় তাদের সঙ্গে কথা কইতো যেন বয়স্ক লোকের সঙ্গে কথা কইছে। কিন্তু তাদের খাওয়া-পরার ব্যাপারে কোনোদিন যাতে সামান্য ত্রুটিও না হয় সেদিকে সর্বদাই বিশেষ লক্ষ্য রাখতো। [ক্রমশ]

চলন্তিকা

গত ২২শে নভেম্বর ইংলণ্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাস্ট্রনমির অধ্যাপক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার আর্থার এডিংটন, এফ্. আর. এস্-এর মৃত্যু হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত আইনস্টাইনের 'থিওরি অফ্ রিলেটিভিটি'র উপর তিনি অনেক কাজ করেছিলেন এবং নক্ষত্রদের গতি ও গঠন নিয়ে অনেক মৌলিক গবেষণা করেছিলেন। বিজ্ঞানের উপর তাঁর বিখ্যাত দুটি বই আছে: "Expanding Universe" ও "New pathways to Science"। আশাকরি বড় হয়ে তোমরা পড়বে।

* * * *

১৯৪৩-এ ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন পেনসিল্‌ভেনিয়ার পিটস্‌বার্গের 'কার্নেগি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি'র অধ্যাপক ও স্টার্ন। ১৯৪৪-এ ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবি।

১৯৪৩-এ কেমিস্ট্রিতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন স্টকহমের অধ্যাপক জর্জ ফন্ হেভেসি।

* * * *

জার্মানির প্রথম গোপন অস্ত্র V-1—ফ্লাইং বম্ব-এর কথা তোমরা আগে শুনেছো। এখন তারা ইংলণ্ডের উপর তাদের দ্বিতীয় গোপন অস্ত্র V-2 ব্যবহার করছে। এই অস্ত্রকে রকেট-বোমা বলা যায়। আকাশের ভিতর প্রায় পঞ্চাশ হাজার ফিট উঁচু দিয়ে এই লম্বা ধরণের রকেট-বোমা ২০০ থেকে ৩০০ মাইল পর্যন্ত পথ অতিক্রম করে। এর গতি ঘণ্টায় তিন হাজার মাইল। তার মানে শব্দের চেয়ে আগে এসে পৌঁছয়। সে-কারণে সাংকেতিক সাইরেন বাজিয়ে জনসাধারণকে এর কথা জানানো যায় না।

* * * *

দশ বছর আগে ১৯৩৪-এর ২০শে অক্টোবর মলিসন্'রা ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছিলো ২০ ঘণ্টা ১৩ মিনিটে। এতোদিন এইটাই রেকর্ড ছিলো। কিন্তু কিছুদিন আগে ফ্লাইট লেফ্টানেণ্ট জেম্স্ লিনটন্ ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে মাত্র ১৬ ঘণ্টা ৪৬ মিনিটের মধ্যে এসে পৌঁছে একটি নতুন রেকর্ড করেছেন। তিনি মোট ৪,৫৬৬ মাইল ঐ সময়ের মধ্যে অতিক্রম করেন। গড়-পড়তায় তাঁর প্লেনের গতি ছিলো ঘণ্টায় ৩১৫ মাইল। বর্তমান যুদ্ধে মিত্রশক্তি Mosquito (অর্থাৎ মশা) নামে যে বিখ্যাত উড়োজাহাজ ব্যবহার করছে লিনটন্ সেই ধরণের এক 'মশা'র পিঠে চড়ে এই নতুন রেকর্ড করলেন। Mosquito অবিশ্বাস্য তীব্রগতিতে উড়তে পারে। কিছুদিন আগেই এই প্লেনের এক নাবিক ইংলণ্ডে সকালের চা খেয়ে, রাশিয়ায় মধ্যাহ্নভোজন সেরে, ডিনারের সময় আবার ইংলণ্ডে হাজির হয়েছিলেন। এই Mosquito প্লেনে চেপে তা হলে রাত দুটোয় ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে 'ব্রিটিশ সামার টাইমে'র সোয়া একটা নাগাদ ইংলণ্ডে পৌঁছনো যায়!

বিলিতি 'মশা'র কাণ্ডকারখানাই আলাদা। তাদের কথা খবরের কাগজে পড়ে আমরা তাজ্জব হই। এদিকে দেশি মশায় আমাদের বাংলাদেশের গ্রাম আর সহরগুলো তো প্রায় উজাড় হতে চললো।

রংমশাল বৈঠক

জহরলালের মালা : প্রতিমা সেন [গ্রাহক নং ২০৮৪]

[পৌষমাসের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত]

আমার এই বার বছরের মধ্যে এমন বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেনি, যা বলবার মতো। একটা ঘটনাই আমার বিশেষ করে মনে আছে। ঘটনাটা খুব ছোট্ট, কিন্তু সেটা মনে করলে খুব আনন্দ হয়। আমার বয়স তখন পাঁচ-ছ' বছর। আমরা সেবার কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমাদের ছোটকাকারা কলকাতায় থাকেন। আমরা ক' ভাই-বোনে খুব হৈচৈ করতে লাগলাম। একদিন শুনতে পেলাম যে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কলকাতায় আসছেন। শুনে খুব আনন্দ হ'ল। অবশ্য আমার চেয়ে আমার দিদি-দাদাদেরই বেশি আনন্দ হয়েছিলো! আমি তখন তো এত বুঝতাম না! শুধু ভাবতাম যে বুঝি একজন মস্ত বড় লোক আসছেন! যেদিন তিনি এলেন, সেদিন দেখলাম যে দলের পর দল লোক তাঁকে দেখবার জন্য যাচ্ছে। আমরাও মোটরে করে রওনা হলাম। অনেক অলি-গলি ঘুরে শেষে একটা রাস্তায় (রাস্তাটার নাম ভুলে গেছি) পৌঁছলাম। তার ধারে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে। মনে হ'ল বুঝি কলকাতা সহরের সমস্ত লোক আজ জড় হয়েছে। আমরা ভীড় ঠেলে যেতেই পারছিলাম না। অনেক কষ্টে রাস্তার এক পাশে গিয়ে মোটর থামান হ'ল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর হঠাৎ শুনতে পেলাম তিনি আসছেন। আমরা আগে বসেই ছিলাম। কিন্তু তিনি আসছেন শুনেই সবাই এ-ওকে মাড়িয়ে উঁচু হয়ে তাঁকে দেখবার জন্যে দাঁড়ালাম। আমি প্রথমে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। দিদি আমাকে কোলে করল বলে দেখতে পেলাম। দেখলাম যে কয়েক জন ভদ্রলোক ভীড় কমাতে বলছেন, আর দু-পাশের ভীড় কমিয়ে দিচ্ছেন। তারপরে দেখি যে পণ্ডিত জহরলাল এবং আরো দু-জন ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন। জহরলালের হাতে আর গলায় অনেক ফুলের মালা। গায়ে সাদা খদ্দরের জামা, মাথায় টুপি। হাসি মুখে চারদিকে তাকাতে-তাকাতে তিনি যাচ্ছেন। আমরা সবাই হাত জোড় করে প্রণাম করলাম। হঠাৎ আমাদের দিকে তাঁর চোখ পড়ল। তিনি একটু হেসে গলার থেকে একটা মালা খুলে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। সেটা এসে আমাদের গায়ে পড়ল। সেই মালাটা সযত্নে আমরা বাড়ি নিয়ে এলাম। মালাটা আমরা ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। আস্তে-আস্তে সেটা শুকিয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটা ছোট্ট কিন্তু এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। এর কথা মনে পড়লে খুব আনন্দ হয় কারণ জহরলালের হাত থেকে মালা পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়!

মশাল : মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্বানুবৃত্তি

কৃষ্ণদাসের কাছে সব শুনে পাগলা ডাক্তার ভারি খুসী হয়ে বললেন, 'তা বেশ, তা বেশ! রসিক তো কম নয় ছোঁড়াগুলো! ছেলেকে বাগাতে না পেরে বাপের চোখ কাণা! হা হা। বেশ বেশ।'

কৃষ্ণদাসের মুখের ভাব দেখে তার কাঁধে একটা হাত রেখে প্রায় ধমকের স্বরে বললেন, 'তুমি বাপু বড়ই অভিমানী বালক। একচোট গালাগাল না দিয়ে ওদের রসিক বললাম, মুখখানা হাঁড়ি হয়ে গেল তোমার। সত্যি কথাই বলেছি বাবা, বুঝে ছাখ্। রস একটু বেশী হয়েছে ছোঁড়াগুলোর। রসাধিক্য একটা ব্যারাম তা তো মানিস? হাতের কাছে পেলে ডবল ডোজ ক্যাষ্টর অয়েল ঠুকে দিতাম সব কটাকে।' কৃষ্ণদাস সাগ্রহে বলল, 'বাবাকে জিজ্ঞেস করুন না কে খোঁচাটা দিয়েছে? আমায় বললে না।' তার গালে আস্তে একটা চড় বসিয়ে চলে যেতে যেতে পাগলা ডাক্তার বলে গেলেন, 'তোর বাপের চোখ কাণা হবে না রে, ভাবিস্ নে।'

পরদিন সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমেছে। সে এমন বৃষ্টি যে ছেলেরা রেনি-ডে আশা করতেও ভরসা পায়নি, রেনি-ডে না পেয়েও বিশেষ হতাশ হয় নি।

ক্লাশটা সেদিন বসল কেমন একটা খাপছাড়া শব্দিত স্তব্ধতায় গুম্‌গুম্ করে। গোলমাল হৈচৈ কিছু নেই, একজন চেঁচিয়ে আরেকজনের নাম ধরে পর্যন্ত ডাকছে না, কাছাকাছি মুখ এনে শুধু ফিসফিস করে কথা বলছে দু'জন তিনজন মিলে। টিচাররাও পড়াতে এসে একটা অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। ছেলেদের এই হাটে যেন গুমোটের আবির্ভাব হয়েছে। সেটা কিসের ইঙ্গিত ধরা যায় না।

সুন্দরদের প্রত্যেকের সঙ্গে আজ একজন করে চাপরাসী বা দরোয়ান এসে স্কুলে পৌঁছে দিয়েছে, ছুটির সময় আবার তারা ওদের নিতে আসবে। স্কুলে কৃষ্ণদাসের দল সোজাসুজি মারামারি করবে না এটুকু সুন্দরদের জানা ছিল। তবু কোনদিক দিয়ে কী ভাবে প্রতিশোধ আসবে অনুমান করতে না পারায় মুখগুলি তাদের একটু শুকনো আর লম্বাটে হয়ে গেছে। আড়চোখে আড়চোখে তারা তাকিয়ে দেখছে কৃষ্ণদাস আর তার বন্ধুদের রকম সকম।

কৃষ্ণদাস ধীর স্থির এবং কিছু পরিমাণে গম্ভীর, খুব বেশী নয়। সুন্দরদের দিকে তাকিয়েও দেখছে না আবার এমনি আপনা থেকে ওদিকে মুখ ফিরলে তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়েও নিচ্ছে না। নিজের মনের মধ্যে কী হচ্ছে ওদের সে জানতে দিতে চায় না। তাতে মুস্কিল হয়েছে সুন্দরদের। তাদের মনে হচ্ছে, প্রতিশোধর এমন নির্ঘাৎ ব্যবস্থাই কৃষ্ণদাস করেছে যে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, একটু ক্ষোভও তার নেই। কৃষ্ণদাসকে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত দেখলে ওরা খুসী হ'ত।

টিফিনের সময় একটা খাপছাড়া ব্যাপার ঘটল। কৃষ্ণদাস ক্লাসে বসেই নাজিরের সঙ্গে কথা বলছিল, নাজির চলে যেতেই তার সেই দলত্যাগী বন্ধু শচীন এসে সামনে দাঁড়াল। কৃষ্ণদাসের মনে পড়ল শচীনকে সে আরও দু-তিনবার ঘুরে ফিরে যেতে দেখেছে বটে এইমাত্র।

'বাবার চোখ কেমন আছে কেষ্ট?' এদিক ওদিক চাইতে চাইতে শচীন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল।

'তুমি অমন করছ কেন? চোরের মতো?' কৃষ্ণদাস বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল।

'এ্যাঁ ? না, ও কিছু না। চোখটা কানা হয়ে গেছে নাকি কেষ্ট ?' 'ও! এবার বুঝেছি। খবর জানতে এসেছো ওদের স্পাই হয়ে।' কৃষ্ণদাস গম্ভীর হয়ে গেল।

'স্পাই ? আমি স্পাই ?' শচীনের সুন্দর মুখখানা লাল হয়ে গেল। 'তাই তো মনে হচ্ছে।' সংক্ষেপে বলল কৃষ্ণদাস।

'তুই আমায় স্পাই ভাবলি! আমি কোথায় জানতে এলাম—' রাগে অভিমানে শচীনের গলা বন্ধ হয়ে গেল।

[ক্রমশ]

কার্তিক মাসের ধাঁধাঁর উত্তর

বাঁদরের মা'র বয়েস যখন বাঁদরের বয়েসের তিন গুণ হবে তখন ধরো বাঁদরের মা'র বয়েস হবে ৩ x ও বাঁদরের বয়েস x। তাদের বয়েসের তফাৎ তাহলে ২x। এ তফাৎ ত' বাড়তে কমতে পারে না। বাঁদরের মা'র আপাতত যা বয়েস বাঁদরের বয়েস যখন তার তিন গুণ হবে তখন বাঁদরের বয়েস নিশ্চয়ই ৯x হবে। বাঁদরের মা'র বয়েস এর অর্দ্ধেক হলে হবে ৪½ x ; এবং বাঁদর যেহেতু মা'র চেয়ে ২x বছরের ছোট তার বয়েস হবে ২½ x। তাহলে বাঁদরের মার আপাতত বয়েস হল এর দ্বিগুণ, অর্থাৎ ৫ x এবং বাঁদরের বয়েস ৩ x (৫x থেকে ২x কম)। আপাতত বাঁদর আর তার মা'র বয়েস যোগ করলে হচ্ছে ৪ বছর ; অর্থাৎ ৫ x + ৩ x = ৪ বছর, অর্থাৎ x = ½ বছর, অর্থাৎ বাঁদরের মা'র বয়েস এখন ২½ বছর ; তাহলে বাঁদরের ওজনও ২½ পাউণ্ড। লোহার ওজনও তাহলে ২½ পাউণ্ড।

তাহলে, দড়ির ওজন + ৪০ আউন্স (লোহার ওজন) = ½ (৪০ + ৪০ − ৪০) আউন্স = ৬০ আউন্স।

তাহলে দড়ির ওজন = ৬০ − ৪০ = ২০ আউন্স। দড়ির যদি প্রতি ফিটের ওজন হয় ৪ আউন্স তাহলে লম্বায় দড়িটা ২০/৪ = ৫ ফিট হবে।

নতুন ধাঁধাঁ : পরিমল রায়

নীচে কয়েকটি 'মজার পদ্য' ছাপা হোলো। প্রত্যেকটি কবিতা দু-লাইনের। শেষের কথাটির সঙ্গে দ্বিতীয় লাইনের শেষের কথাটির মিল আছে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে কথাগুলি একই। যেমন ধর :

আঁধার গহন রাতি শুধু জ্বলে **জোনাকী**
পথ চিনে চলবার আছে কোনো **যো নাকি ?**

নীচে এই ধরণের কয়েকটি পদ্য দেওয়া হেলো। শেষের কথাগুলো তোমাদের বসাতে হবে। দেখো দিকিনি পারো কি না!

(১) করেছে কি গবেষণা মেঘনাদ——
বালুতে বোঝাই কেন গোবি আর——?

(২) ভারী ভালো মেয়েটি সে কল্যাণী——
রোজ করে লেখা পড়া বাজে কাজে——।

(৩) দু' গাছা কাঁচের চুড়ি বেগুনী ও——
তাই নিয়ে মিছিমিছি এতো কথা——!

(৪) দু'শো টাকা কুকুরের খাবারে ও——?
পাগলামী বলে নাকি এ-রকম——?

(৫) দু' চামচ জলে শুধু এক ফোঁটা——,
তেতো নয়, কড়া নয়, তবু খেতে——।

সম্পাদকের দপ্তর

"সুকুমার রায় স্মৃতি-সংখ্যা" রংমশাল যে তোমাদের খুব ভালো লেগেছে এ-খবর অনেকের চিঠিতে জানতে পেরে খুব ভালো লাগলো। প্রত্যেককে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই রংমশালের ভিতর দিয়েই জানালুম।

যতদিন না প্রেসের হাঙ্গামা কাটে ততদিন বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে রংমশাল প্রকাশিত হবে বলে ঠিক হয়েছে। আমরা অবশ্য তাড়াতাড়ি ছাপাবার চেষ্টা করবো। কিন্তু আজকালকার বাজারে জোর করে কিছুই বলা যায় না। পত্রিকা প্রকাশের দেরি দেখে অনেকেই তোমরা চিঠি লিখে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হও। তাই সবাইকে জানাচ্ছি বাংলা মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত পত্রিকার জন্যে অপেক্ষা করবে। তার মধ্যে না পেলে তখন চিঠি লিখে জানিও। আপাতত এই ব্যবস্থা থাকুক। ভবিষ্যতে যখন অন্য ব্যবস্থা হবে তখন জানাবো।

শিশু-শিল্প প্রদর্শনী

আগামী ২১ শে থেকে ২৭ শে জানুয়ারি 'শিশু সাহিত্য পরিষদে'র উদ্যোগে কলকাতায় একটি শিশু-শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রদর্শনীর সমস্ত ভার দেওয়া হয়েছে একটি কার্যনির্বাহক সমিতির উপর। এই সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন খগেন্দ্রনাথ সেন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, স্বামী প্রেমঘনানন্দ, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ও ইন্দিরা দেবী। ছবি, উলশিল্প, এম্‌ব্রয়ডারি, বেতের কাজ, ঘাসের টুকরি, তালপাতার ব্যাগ, মাটির মূর্তি, খেলনা, 'ফ্রেট্ ওয়ার্ক', কাঠের উপর 'পোকার ওয়ার্ক', চামড়ার কাজ, কাঁথা সেলাই, কাঠ-কাগজ-ঘটের উপর ছবি আঁকা, জয়পুরি মীনের কাজ, কাঠ ও কার্ডবোর্ডের খেলনা, পুতুলকে পোষাক পরানো, কাপড় ছাপা ও রঙ্ করা, সুপুরি যব ও ধানের খেলনা, ট্রে, পুঁথির কাজ, ছুঁচের কাজ, হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি এই প্রদর্শনীতে দেখানো হবে। শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে নিজেদের সম্পূর্ণ নাম, ঠিকানা এবং বয়স স্পষ্টাক্ষরে কাগজে লিখে আটকে দেবে। বিক্রির জন্যে কিনা এবং হলে কত দাম জানাতে ভুলো না। পাঠাবার শেষ তারিখ ১৪ই জানুয়ারি। এই এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে : রংমশাল কার্যালয় (সন্ধে ছ'টা থেকে সাতটার ভিতর), মৌচাক কার্যালয়, কৈশোরক কার্যালয়, রামধনু কার্যালয়, কিশোর বাংলা কার্যালয় বা ইন্দিরা দেবীর কাছে (৪০, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা)।

টাক ডুমাডুম ডুম

নাকুর বদলে নরুন পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
নরুনের বদলে হাঁড়ি পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
হাঁড়ির বদলে টোপর পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
টোপরের বদলে বউ পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম
বউয়ের বদলে ঢোলক পেলুম
টাক ডুমাডুম ডুম।

ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী নাটক
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আঁকা সাতখানি রঙিন ও একরঙা ছবি
দাম এক টাকা
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Printed and Pubulished by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.
Founded by Prof. K. N. Sen.

রংমশাল
[নবম বর্ষ, নবম সংখ্যা : মাঘ, ১৩৫১]
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

সম্পাদকের দপ্তর

গত ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৪, বিখ্যাত ফরাসী লেখক রোমাঁ-রঁলার মৃত্যুতে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য মানুষ শোকাচ্ছন্ন হয়েছে। ৭৯ বছর আগে তিনি জন্মেছিলেন। ১৯৪৩-এর অক্টোবর মাসে আর একবার তাঁর মৃত্যুসংবাদ বেরিয়েছিলো, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেলো সে-খবর সত্যি নয়। ফরাসী দেশের পতনের সঙ্গেই নাৎসীরা তাঁকে বন্দী করে জেলে আটকে রেখেছিলো। শেষের গোটা একটা বছর তাঁর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। হঠাৎ ২রা জানুয়ারি, ১৯৪৫, তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গেলো।

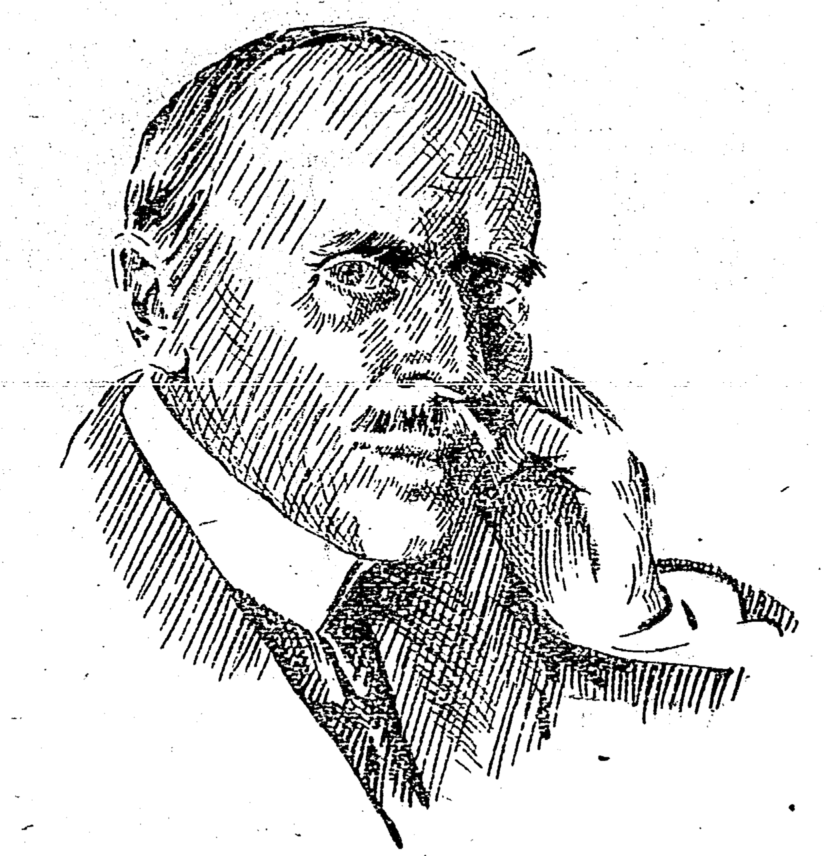

রোঁমা-রঁলার কথা হয়তো তোমরা এখন খুব বেশি শোনোনি। কিন্তু যখন বড় হবে, যখন তাঁর বই পড়বে তখন দেখবে বাস্তবিক কী আশ্চর্য লেখক তিনি ছিলেন। তখন বুঝবে কেন তাঁর এই মৃত্যু শুধুই ফরাসী সাহিত্যের অপূরনীয় ক্ষতি নয়, বিশ্ব সাহিত্যেরও ক্ষতি। যাঁরা সত্যিকারের মহৎ লেখক তাঁরা কোনো বিশেষ দেশের, বিশেষ ভাষার বা বিশেষ সময়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ নন। দেশকাল ছাড়িয়ে ছড়িয়ে থাকে তাঁদের কারুশিল্প। রোমাঁ রঁলা ছিলেন এই জাতের শিল্পী।

তাঁকে অনেকেই শুধু মহৎ ঔপন্যাসিক হিসেবে জানে। কিন্তু সমালোচক এবং সংগীত ও শিল্পকলার সমঝদার হিসেবেও তাঁর আসন উঁচুতে। সংগীতের মধ্যে তিনি নিজের মুক্তির পথ পেয়েছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত সাংগীতিক হ্যাণ্ডেল, বেঠোফেন ও ভাগ্‌নারের রচনা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস জঁা ক্রিস্তফ্‌। ক্রিস্তফ্‌ তাঁর উপন্যাসের নায়কের নাম। দু-হাজার পাতারও বেশি এই উপন্যাস—তাতে ক্রিস্তফের জীবনের শৈশব থেকে বার্দ্ধক্যের আগাগোড়া ইতিহাস পাওয়া যায়। ক্রিস্তফ্‌ একজন মস্তবড় সংগীত রচয়িতা। উপন্যাসের পাতা থেকে সে যেন রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠে এসেছে। কিন্তু জঁা ক্রিস্তফ্‌ কেবলমাত্র একটি উপন্যাসই নয়। তার মধ্যে রয়েছে রঁলার জীবন-দর্শন—জীবনকে তিনি কী ভাবে দেখেছেন, কী-ভাবে গ্রহণ করেছেন—আনন্দ ও বেদনা, হাসি ও অশ্রু তাঁকে কী ভাবে দোলা দিয়াছে, কী সূক্ষ্মভাবে তাঁর সৃষ্টির কাজে সাহায্য করেছে—এই সমস্ত কথা। সে-কারণেই জঁা ক্রিস্তফ্‌ এতো বিখ্যাত উপন্যাস। জঁা ক্রিস্তফ্‌-কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে একটি বললে যেন নেহাৎই কমিয়ে বলা হয়। এই উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীতে যেন সাড়া পড়ে গেলো। ১৯১৫ সালে রঁলা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে নোবেল প্রাইজ পেলেন।

শিল্পী হিসেবে তাঁর স্থান অকে উঁচুতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি আরো বড়। সমস্ত মানুষই যে নিজের পরমাত্মীয় এই কথা তিনি শুধু মুখেই বলতেন না, সর্বান্তঃকরণে অনুভব করতেন। মানুষে মানুষে এই হানাহানি কাটাকাটিতে তিনি মনেমনে যেন ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিলেন। পাশ্চাত্যের চেয়ে প্রতীচ্যের দর্শন তাই

তাঁর বেশি প্রিয় ছিলো। গান্ধীজির মতবাদের সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন। ১৮২৩-এ তাঁর লেখা গান্ধীজির জীবনী প্রকাশিত হয়। ১৯৩১-এ এঁদের তুজনের সাক্ষাৎ হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের তিনি বিশেষ বন্ধু ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও দর্শন খুব ভালো করে তিনি পড়েছিলেন। ভারতবর্ষকে তিনি মনে-প্রাণে ভালোবেসেছিলেন এবং ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে বোঝবার জন্যে তিনি আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রঁলার দেখা হয় য়ুরোপে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন ভারতবর্ষকে ভালো করে বুঝতে হলে বিবেকানন্দের রচনা পড়া দরকার। এই উপদেশ রঁলা গ্রহণ করেছিলেন এবং রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দের রচনা তিনি যে কত যত্ন নিয়ে পড়েছিলেন সে-কথা রঁলার লেখা রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দের জীবনী পড়লেই বোঝা যায়।

ভূতপত্রীর যাত্রা : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবুর প্রবেশ

অবু। এঃ জলকাদায় রাস্তাটা হয়েছে পিছল—ঘোড়ার পায়ের দাগ না বাঘের থাবার দাগ এ সকল!

আকাশ তো পরিষ্কার, কোথা থেকে এল এত জল? রাস্তাটা চিটে গুড়ের মতো চিপটে ধরেছে জুতোজোড়ার সুকতল!

বাতাস বইছে না তো—ক্ষ্যাপা ঘোড়া যেন ফেলছে নিশ্বাস—হোঁস্ ফোঁস্ হুস্ হাস্! ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে যেন উচ্চৈশ্রবা দলের পর দল।

খৈ খাওয়া যাক্ এক থবল!—এঃ উড়ে পালালো যে! ওমা ওটা কি দেখি তেকাটার পরে—ঘোড়ার মুণ্ডু না গরুর মুণ্ডু ঝুলছে। হাঁ করে যেন খৈ খেতে আসছে —নে বাবু তুই খা আমিও খাই এক খাবল—আর নয় মুখ বন্ধ করে,—এ কে আসে? বস্!

(দালাল সাহেবের প্রবেশ)

ঐ বাবু! ঘোড়াকে দিবে জৈ
আদমি কে দিবে খৈ
গরুকে দিবে ঘাস্,
এন্তে কালে মিলবে বৈকুণ্ঠে বস্‌বাস্।
ঘোড়া চাও ঘোড়া, গরু চাও গরু—
সব মিল হামারা পাস্!

অবু। সাহেব দিতে পার একখানা পাল্কি?

দালাল। পাল্কি তো মিলবে না ঘোড়া মিলবে আড়-গড়ার হার্স টন সাহেব পাস্।

অবু। একটা ঘোড়ার দাম কি?

সাহেব। পাঁচশত পঁচাশ।

অবু। অত নেই সাহেব, ট্যাঁকে আছে পয়সা গণ্ডা পাঁচ।

সাহেব। কাঠের ঘোড়া মিলতে পারে—প্যালারাম দিলাও হবি হর্স!

(কাঠের ঘোড়ার প্রবেশ)

॥ গীত নৃত্য ॥

কাঠের ঘোড়া কাঠের ঘোড়া
জল পী পী মাঠের ঘোড়া
নারদ মুনির ঢেঁকিশালের ঘোড়ার জোড়া
নামটা জগৎ জোড়া।
থোড়া বহুত হয়েছে উমর
রথ টানতে ভেঙেছি কুমর
রং মেখে আষ্টে পৃষ্ঠে
চেয়ে আছি এক দৃষ্টে
ভিতরটা ঘুনে পোরা,
সোয়ারি পাইতো বই পৃষ্ঠে
ডানা মেলে দিই ওড়া! [ক্রমশ]

হলুদি-ঝর্ণা : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এ ক-দিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিলো। হঠাৎ কোথা থেকে পাতলা মেঘ সমস্তদিন ধরে ভেসে আসতে লাগলো। রাত্রে মেঘগুলো জমাট বাঁধলো আর হঠাৎ বিদ্যুতে আর ঝড়ে আমাদের চমকে দিয়ে নামলো তুমুল বৃষ্টি। এ

কেমন যেন হোলো! কৈ, এ-রকম তো কথা ছিলো না! কাল সকালে যে আমাদের হল্‌দি-ঝর্ণায় যাবার কথা। কথাটা কি মাঠেই মারা যাবে? বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবে? ঝড়ে উড়ে যাবে? এ এক আজব দেশে এসে পড়া গেছে! নাম শিমূলতলা, কিন্তু মাথাকুটে মরলেও শিমূল গাছ খুঁজে পাওয়া কঠিন! শুনেছি এদেশের হল্‌দি-ঝর্ণাও তাই। আসলে নাকি তার রঙ হলদেও নয়, সেটা নাকি ঝর্ণাও নয়! সেই রসিক লোকটির সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে যে এই জায়গার নামকরণ করেছে, এখানকার মহুয়াবনকে উপেক্ষা করে শিমূলগাছের জয়ধ্বনি করেছে, কোনো পাহাড়ের নাম দিয়েছে 'লাট্টু', কোনোটির বা 'ছাতু', কালো পাথরের ভিতর দিয়ে টিপটিপ করে শাদা জল যেখানে পড়ছে তাকে বলেছে ঝর্ণা, শুধু ঝর্ণা বলেই ক্ষান্ত নয় সেই সঙ্গে রঙটাও বাৎলে দিয়েছে। সেই রসিক পুরুষের দেখা পেলে মন্দ হোতো না। তার চশমাটা চেয়ে নিতুম।

সেই ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে ছোট্ট-বারান্দায় কাঠের বেঞ্চি, টিনের চেয়ার ও সরু চৌকিতে বসে, লণ্ঠনের মৃদু লালচে আলো-আঁধারিতে আমরা অনেক-রাত পর্যন্ত আড্ডা জমালুম। কাল সকালে আকাশ পরিষ্কার হবে কিনা, উনিশ্-শো-চুয়াল্লিশে যুদ্ধ থামবে কিনা, কাল বৃষ্টি থামলেও গরুর গাড়ির গাড়োয়ান ঠিক সময় হাজির হবে কিনা, হিটলার জাপানে পালাবে কিনা, সকালে আকাশ পরিষ্কার আর গরুর গাড়ির গাড়োয়ান হাজির হলেও চায়ের ত্বধ পাওয়া যাবে কিনা, 'আশ্রম'বাড়ি থেকে প্রতিশ্রুত ডিমগুলো আসবে কিনা, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে কিনা, মেয়েরা সবটা পথ হাঁটতে পারবে কিনা—এই সব নানাধরণের গভীর বিষয়ে তুমুল আলোচনা হোলো। যখন সভা ভাঙলো তখন ঝড় কমেছে বটে, বৃষ্টির তেজও নেই—কিন্তু আকাশ মোটেই পরিষ্কার নয়। একটা কালো ভারি পাথরে যেন ঢাকা।

রাত থাকতে ওঠার কথা। কিন্তু যখন ঘুম ভাঙলো দেখি বাইরেটা ফরসা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি মাথার বালিসের তলা থেকে ঘড়িটা বার করে টর্চ জ্বালিয়ে দেখি চারটে। বন্ধ হয়ে গেছে নাকি ঘড়িটা? কানের কাছে এনে দেখলুম টিকটিক করছে। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলুম। কোথায় মেঘ? কোথায় ঝড়-বৃষ্টি? কোথায় বিদ্যুৎ? সমস্ত আকাশভরা তীব্র জ্যোৎস্না। ঝাঁকে-ঝাঁকে তারা। বরফের মতো শাদা উজ্জ্বল আধ-খানা চাঁদ ভোর-রাতকে দিন করে তুলেছে। শেষরাত্রের সেই জ্যোৎস্নায় ভিজে মাটির উপর গাছের আর বাড়ির আর আমার ছায়া পড়ছে। মাটিতে রাশিরাশি ফুল ঝরেছে : চামেলি আর শিউলি। ঝিঁঝির ডাক নেই, গাছের মর্মর নেই। চাঁদের আলোর এই দিনে একলা দাঁড়িয়ে মনেই হোলো না পৃথিবীর কোনোখানে লড়াই চলেছে : V-1 আসছে, বোমা ফাটছে, ডাইভ-বম্বার নামছে, বাড়িঘর চুরমার হচ্ছে, মানুষ মরছে।

আশ্চর্য এই দেশ। লড়াই-এর কথা বলতে মনে পড়লো : এখানে এসে পর্যন্ত কোনো খাকি-কোর্তা দেখিনি, মিলিটারি লরির শব্দ পাইনি, কলকাতার ট্রাম-বাসে বাতুড়-ঝোলার স্মৃতিও নেহাৎই অবাস্তব হয়ে গেছে। শুধু একদিন শেষরাত্রে একলা বেরিয়ে মাঠের মধ্যে হঠাৎ অতি মৃত্বু শব্দে আকাশের দিকে চেয়েছিলুম। সমস্ত পাহাড় আর প্রান্তর তখনো ঘুমে আচ্ছন্ন। পরিষ্কার স্বচ্ছ আকাশ স্ফটিকপাত্রের মতো। জোনাকির মতো ঝাঁকে-ঝাঁকে তারায় আকাশটা ভরা। দূরের পাহাড়ের বুকে নীল নীল কুয়াশা—উপরের কোনো পাথর জ্যোৎস্নায় ঝকঝক করছে, কোথাও বা অন্ধকার ছায়া। উত্তর-পশ্চিম কোণে জমিটা ঢালু নেমে গেছে। তারের বেড়া দেওয়া একটা বাংলো বাড়ি। ভিতরে উলুঘাসের বন। তুটো বড়-বড় ইউক্যালিপটাস গাছ। পিছনে বেশ খানিক দূরে পাথর আর মহুয়া—আরো কিছু দূরে পাহাড় —শেষরাত্রির শীতের কুয়াশায় ছাওয়া। আর সেই পাহাড়ের হাতের নাগালে প্রায় গোল একটা চাঁদ। সে-রকম বড় চাঁদ কখনো দেখিনি। বড় আর লালচে—ঠিক যেন সত্যিকারের সোনার একটা থালা, বাতাসে ভাসছে।—আকাশের শব্দে চেয়ে দেখলুম। দেখি অনেক-অনেক উঁচু দিয়ে রাত্রির পাখীর মতো একটি এয়ারোপ্লেন

ভেসে চলেছে। জ্যোৎস্নায় তার রূপালী ডানা ঝকঝক করছে। সেই ডানায় লাল আর সবুজ দুটি তারা যেন আটকে গেছে। শিশির-ভেজা চোরকাঁটার মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে একমাত্র আমিই সেই দৃশ্য দেখলুম। ঠিক যেন জাপানী একটি ছবি। কোথাও বাহুল্য নেই, বাড়াবাড়ি নেই। ওই পাহাড় আর উলুঘাসের বন আর বাংলো-বাড়ি, ইউক্যালিপটাস আর মহুয়া আর দূরের নীল-কুয়াশা-জড়ানো পাহাড় আর প্রায় গোল সোনার থালার মতো একটি বাতাসে-ভাসা চাঁদ আর রাত্রির শাদা পাখীর মতো একটি এয়ারোপ্লেন। দেখতে-দেখতে সেই সবুজ আর লাল তারা মিলিয়ে গেলো। চাঁদের ভিতর যেন মিলিয়ে যেতে লাগলো সেই উড়োজাহাজ। একটি কালো বিন্দু হয়ে গেলো। তারপর আর দেখাই গেলো না। তখনো মৃদু একটা গুনগুননি শিমূলতলার শেষ-রাত্রির আকাশে লেগে রয়েছে।

এ-দেশে বেড়ানোর শেষ নেই। দেখতে-দেখতে কখনো হাঁপিয়ে উঠতে হয় না। অথচ বেড়াবার বাঁধানো পথ বলতে মাত্র দুটি। একটি পথ ইস্টিশানের কাছ থেকে এঁকেবেঁকে, কখনো দক্ষিণে কখনো পশ্চিমে খুসিমতো মোড় ঘুরে, চলে গেছে হাজারিবাগে। এই পথের নাম চাকাই-রোড। কোথায় চাকাই নামে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামের নামেই এই পথের নাম। অন্য পথটি রেললাইনের পাশ দিয়ে চলেছে। সেই পথ ধরে পশ্চিমে গেলে ঝাঁঝাঁ, পূবে গেলে জশিডি। তা ছাড়া আছে মাঠ আর ক্ষেত আর সরীসৃপের মতো আঁকাবাঁকা আল। সে-সব মাঠে আর ক্ষেতে আর আলে চোরকাঁটা ঠেলে, ধানশীষ সরিয়ে, কাদা বাঁচিয়ে কিংবা ছোট্ট নদীর ঝকঝকে বালির ভিতর খালি পায়ে কাঁপড় ভিজিয়ে যত খুসি ঘুরে বেড়াও। কেউ বারণ করবে না। পথ শেষ হবে না। দৃশ্য পুরোনো হবে না। যত খুসি বেড়াও, যত খুসি দেখো, যত খুসি হল্লা কর, যত খুসি বেসুরো গান ভাঁজো—নাকের ডগায় চশমা-আঁটা এমন কোনো মাস্টারমশাই নেই যে ছিছি করবে কিংবা ব্যাকরণের বাছা-বাছা কঠিন-কঠিন প্রশ্ন তুলে বসবে।

সকাল সাড়ে সাতটায় বেশ রোদ উঠে গেছে। চাকাই-রোড ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি। এই পথ ধরেই হল্‌দি-ঝর্ণায় যেতে হয়। পথে আজ ধুলো নেই। দু-পাশের ক্ষেত গতকাল বৃষ্টিতে স্নান করে আরো উজ্জ্বল-সবুজ দেখাচ্ছে। শেষ-রাত্রের জ্যোৎস্নায় দেখা সেই কোমল-নীল রঙের পাহাড়গুলো সকালের রোদের কুমকমে এখন গোলাপী হয়ে উঠেছে। আমরা সদলবলে এগিয়ে চলেছি। গরুর গাড়ি দুটোয় খাবার আর চা-য়ের সরঞ্জাম। মেয়েরা কেউ গাড়িতে উঠতে রাজি হয়নি। আমাদের চেয়ে কোনো অংশেই তারা যে পিছিয়ে নেই সেটা প্রমাণ করবার অন্য কোনো সুবিধেমতো উপায় না দেখে সবচেয়ে আগে-আগে তারাই চলেছে। কেউ তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছে না বলে জুতোজোড়া হাতে নিয়েছে, কেউ সাড়িটা কোমরে জড়িয়েছে। কারুর জুতোর হিল খসে যাচ্ছে, পা মচকাচ্ছে, কাঁটা ফুটছে। একজনের তো আংটির একটা পাথরই পড়ে গেলো। আমরা চলেছি পিছনে-পিছনে—জুতোর হিল কুড়িয়ে আংটির পাথর খুঁজে, মেয়েদের গরম কোটগুলো কাঁধে নিয়ে। আমাদের দলটিও কম বিচিত্র নয়। একজনের ধারণা তার মতো ভালো পাথর কেউ চেনে না। ক্রমাগত সে পাথরই কুড়ুচ্ছে। একজনের ধারণা তার মতে নির্ভুল সুরজ্ঞান আর কারুরই নেই। সেই ধারণাকে অক্লান্তভাবে সে ঘোষণা করে চলেছে। ফলে তা কাছাকাছি কেউ নেই। একজনের অভ্যেস প্রতি কথা তর্ক করা। যদি বলি : জায়গাটা বাস্তবিক চমৎকার তৎক্ষণাৎ তিনি বলবেন : কৈ, কোথায়—এ আর এম কি বলবার মতো ভালো? যদি তখনি একমত হ বলি : না, তেমন কিছু নয় সত্যি। অমনি তি আপত্তি জানিয়ে বলবেন : তেমন কিছু নয় মানে ভারতবর্ষ পরাধীন বলেই এ-সব জায়গার কদর নেই হোতো বিদেশ তাহলে দেখতে এইখানেই ভালো-ভা হোটেল থাকতো, ভালো পথ তৈরি হোতো, কত লো আসতো বেড়াতে।

চাকাই-রোড ধরে আমরা চললুম। সকালে এই প

আমরা বেড়াতে আসি না। সকালে আমরা মাঠে-মাঠে ঘুরি। রাত্রে সাপের ভয়ে মাঠে বেড়াতে অনেকেরই আপত্তি। তাই রাত্রে এই চাকাইপথে বেড়াতে আসা হয়। জ্যোৎস্নায় এই পথ শাদা ধবধব করে। কাছেই একটা গ্রাম আছে। চাকাই-পথ তার মধ্য দিয়ে চলে গেছে। সেই গ্রামে একদল বাচ্চা-বাচ্চা বিচ্ছু ছেলেমেয়ে থাকে। আমাদের দেখলেই তাদের কাজ হোলো জনাকুড়ি একসঙ্গে মিলে পিছন-পিছন আসা আর এক সুরে কোরাস গাওয়া : এ বাবু, পয়সা—এ বাবু, পয়সা। তাদের পয়সা দিলেও নিস্তার নেই। একমুখ হেসে আরো উৎসাহিত হয়ে গলা সপ্তমে চড়িয়ে তারা এই গান-গান খেলা করবেই। তাদের দেখলেই আমাদের দলের গায়কের মুখ সবচেয়ে শুকিয়ে যায়। এতোগুলি প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে নিজেকে সে ভারি অসহায় বোধ করে।

আজ সকালের আলোয় ভালো করে এই পথ দেখলুম। ঝিরঝির করে হাওয়া দিচ্ছে। এতো হাওয়া এতো আলো আর এতো ছুটি যে কোথাও আছে কে জানতো সে-কথা? গ্রাম্য শিশুর দল কিছুক্ষণ পিছন-পিছন এসে শেষে ফিরে গেলো। আমরাও চাকাইপথ ছেড়ে ডানদিকের পথ নিলুম। মাইল খানেক মেঠো পাহাড়ি পথে চলবার পর পথ সংকীর্ণ হয়ে এলো। গরুর গাড়িগুলো সেখানে দাঁড়ালো। খাবারের বাক্স আর চা-য়ের সরঞ্জাম নিয়ে সেই সরু পথে সারি বেঁধে আমরা নীচে নেমে চললুম। ছোট্ট একটি স্রোত পেরুতে হোলো। হল্‌দি-ঝর্ণাই তার উৎস। সেই স্রোত পেরিয়ে পাথরের ঠাণ্ডা ছায়ায়, পাহাড়ের আল দিয়ে এক সময় একটুখানি খোলা জায়গায় পৌঁছলুম। এইটাই হল্‌দি-ঝর্ণা। সবাই খুব খুসি হলুম—হল্‌দি-ঝর্ণা দেখে নয়, এবারে চা আর ডিম আর লুচি পাবার আশায়। এখানকার বাতাস তো বাতাস নয়—যেন হজমিগুলি। ক্রমাগতই ক্ষিদে পায়।

সেইখানে একটি জলের স্রোত রয়েছে। তাকে কী বলবো তাই ভাবছি। নদী নয়—নদী বললে বড্ড বড় একটা কিছু মনে হয়। স্রোত বললে তার পাথর আর নির্জনতা আর চাঞ্চল্যের ছবি মনে ভাসে না। আর ঝর্ণা তো নয়ই। অন্য কোনো নাম না পেয়ে এইজন্যেই কি সেই রসিক পুরুষ তাকে হল্‌দি-ঝর্ণা বলেছে? কে জানে! সেখানকার বালির চরে চা তৈরি হোলো। শালপাতায় লালচে নুন, সবুজ লঙ্কা, ডিম, লুচি, বেগুন ভাজা আর মিষ্টি দিয়ে অতি পরিপাটি করে ভোজন পর্ব সারলুম। কেউ বালিতে বাড়ি বানালো, কেউ চরের উপর কাঠি দিয়ে নাম সই করলো। কেউ গান ধরলো। কেউ পাথর কুড়ুলো। কেউ ফুল-প্যাণ্ট পাকিয়ে হাফ-প্যাণ্ট করে জলে-জলে ঘুরলো। একজনের রাগ হোলো। খানিক কান্নাকাটির পর চোখের জল শুকোবার আগেই একটা গোটা লুচি মুখে পুরে গাল ফুলিয়ে খেতে সুরু করলো। অন্যমনস্ক থাকায় সবুজ লঙ্কাটা চোখেই পড়েনি। ফলে লঙ্কার ঝালে আবার তার চোখ দিয়ে জল গড়ালো।

এইখান থেকে স্রোতের উপরকার পাথরের উপর পা ফেলে-ফেলে আমি একটা ভারি সুন্দর জায়গা আবিষ্কার করেছিলুম। আর একটি স্রোত পাহাড় আর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে এসে সেইখানের বড় স্রোতের সঙ্গে মিশেছে। সেখানে একটি ডুমুর গাছ। থোপা-থোপা ডুমুর ধরেছে। টুপিটা সেই ডুমুর গাছের ডালে আটকে তার তলায় খানিক শুয়ে রইলুম। দূরে দলের লোকেরা আমাকে খোঁজাখুঁজি করছে। তাদের মৃদু স্বরে শুনতে পাচ্ছি। তার সঙ্গে স্রোতের ঝরঝর। সামনের ঝোপের ভিতর দিয়ে শীতের নরম রোদ খানিকটা এসে পড়ছে। একটা পাহাড়ি মাছি ভোঁ-ভোঁ করে সেই একটু-খানি রোদের ভিতর দিয়ে উড়ে গেলো। কাঁচপোকার মতো তার গায়ের রঙ। সেই রোদে একটা বুনো-মাকড়সা জাল বুনছে দেখলুম। বাতাসে সেই মিহি রূপুলি জাল মাঝেমাঝে রামধনুর মতো ঝিকমিক করে উঠছে। সামনের ডালে একটা ফড়িং এসে বসলো। তার গোলগোল চোখ দিয়ে অনেকক্ষণ আমাকে লক্ষ্য করলো। রেশমের মতো পাতলা পাখাগুলো তার কখনো ছবির মতো স্থির হয়ে রয়েছে কখনো বা বিদ্যুতের মতো থরথর করছে।

কলকাতায় বসে হল্‌দি-ঝর্ণার কথা লিখতে-লিখতে এই সব ছবিই দেখতে পাচ্ছি। আর এই প্রথম আবিষ্কার

করে আশ্চর্য হচ্ছি যে সত্যিকারের সেই ঝর্ণাটিকে দেখতেই আমি ভুলে গিয়েছিলুম। অন্য সবাই-ই দেখেছিলো। নাকি আমিই সত্যিকারের হল্‌দি-ঝর্ণাকে দেখেছিলুম, আর কেউই দেখেনি ?

পদীপিসির বর্মি বাক্স : লীলা মজুমদার

[পূর্বানুবৃত্তি]

ঘনশ্যাম কিন্তু পাঁচুমামার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিরক্ত হ'য়ে বল্ল, "ঘ্যান্ ঘ্যান্ ভালো লাগে না পাঁচুদাদা। এদিকে বড় গোরু ত' আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসে পড়েছেন। কত টানাটানি করলাম, কত কাকুতি মিনতি করলাম, কত ল্যাজ মোচ্ড়ালাম। শেষ অবধি গাড়ীর বাঁশ খুলে নিয়ে পেটের নীচে চাড় দিয়ে পর্য্যন্ত ওঠাতে চেষ্টা করলাম। সে কিন্তু নড়েও না, ঐ রকম বসে ঘাস চাবায় !"

পাঁচুমামা বল্ল, "এ্যাঁ ঘনশ্যাম ! তবে কি হবে ?"

ঘনশ্যাম বল্ল, "হবে আবার কি ? চল দেখ্‌বে চল।"

আমরা সেই ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে কাঁকর বেছানো প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গেটের মধ্যে দিয়ে ওদিকে ধূলোমাখা রাস্তায় এসে পড়লাম। সেইখানে দেখি রাস্তার ধারে একটা গোরুর গাড়ী। কা'র একটা গোরু পা গুটিয়ে মাটিতে বসে বসে দিব্যি ঘুমুচ্ছে, অন্য গোরুটা, তার দিকে হতাশভাবে তাকিয়ে জাবর কাটছে।

সত্যি সত্যি সে গোরু কিছুতেই উঠলো না। তখন ঘনশ্যাম পাঁচুমামাকে আর আমাকে জিনিষপত্র শুদ্ধ গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে সে গোরুটার জায়গায় নিজেই গাড়ী টানতে স্থুরু করে দিলো। অমনি চলতে লাগলো।

ষ্টেশন ছাড়িয়েই ডান হাতে পুরোণ গোরস্থান। সেখানটাতে আবার মস্ত মস্ত ঝুলো ঝুলো পাতাওয়ালা উইলো গাছ জমাট অন্ধকায় ক'রে রয়েছে। সে-খানে পৌঁছতেই পাঁচুমামা ফিস্‌ফিস্ করে আমাকে ইংরিজিতে বল্ল, "এখানে সব সিপাই বিদ্রোহের সময়কার কবর আছে"। অমনি ঘনশ্যাম গাড়ী থামিয়ে মাথা ঘুরিয়ে বল্ল, "ইংরিজিতে সব ভূতের গল্প বল্লে ভালো হবে না পাঁচুদাদা। এইখানে গাড়ী নামিয়ে চম্পট্ দেব বলে রাখলাম !"

পাঁচুমামা ব্যস্ত হ'য়ে বল্ল, "আরে ভূতের গল্প নয় রে ঘনশ্যাম। কবরের কথা বল্‌ছিলাম।" ঘনশ্যাম আরও বিরক্ত হ'য়ে বল্ল, "ভূতের কথা নয় মানে। কবর আর ভূত কি আলাদা ? ইংরিজি জানি না বলে কি তোমাদের চালাকি-গুলোও ধরতে পারব না নাকি। না পাঁচুদা আমার পোষাবে না।" বলেই ঘনশ্যাম গাড়ীটা দুম্ করে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

এমন সময়ে খটাখট্ খটাখট্ শব্দ করে একটা ছ্যাকড়া গাড়ী এসে উপস্থিত ! আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় জান্‌লা দিয়ে দেখতে পেলাম সাদা ফ্যাকাসে মুখ করে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক জ্বলজ্বলে চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন ! পাঁচুমামাও তখুনি হাত পা ছুঁড়ে মূর্চ্ছা গেলো।

ঘনশ্যাম বল্লে, "ইয়ারকি ভালো লাগে না পাঁচুদাদা।" বলে আবার গাড়ী টানতে স্থুরু করলো। পাঁচুমামাও রুমাল দিয়ে মুখ মুছে উঠে বসলো। অনেক রাত্রে মামাবাড়ী পৌঁছলাম। মনে পড়লো পদীপিসিও এমনি দুপুর রাতে রামকান্তকে নিয়ে নিমাই-খুড়োর বাড়ী থেকে ফিরেছিলেন। সত্যি, বর্মি বাক্সটা গেলো কোথায় ? পাঁচুমামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "হাত থেকে পড়ে টড়ে যায় নি ত' ?

পাঁচুমামা দাঁত কিড়মিড় ক'রে বল্ল, "স্‌স্ চুপ, এটা শত্রুর আস্তানা। বুক থেকে হৃৎপিণ্ড উখড়ে নিলেও পদীপিসির বর্মি বাক্সর নাম মুখে আনবি না।"

গাড়ী বারাণ্ডার নীচে গোরুরগাড়ী নামিয়ে ঘনশ্যাম সিঁড়ির উপর বসে পড়লো। ঘরের মধ্যে থেকে প্যাঙা, ফিঙে, নটবর, খেন্তি, পেঁচী, ইত্যাদিরা সব বেরিয়ে এল মজা দেখ্‌বার জন্যে। কিন্তু গাড়ী থেকে লট্ বহর নামাতে কেউ সাহায্যও করলো না। পাঁচুমামাও নেমেই কোথায় জানি চলে গেলো। শেষ অবধি আমি মনে মনে ভারী রেগে জিনিষপত্র দুম্‌দাম্ করে মাটিতে ফেল্‌তে লাগলাম। সেই দুম্‌দাম্ শুনে দিদিমা বেরিয়ে এসে আমাকে চুমুটুমু খেয়ে একাকার ! দিদিমা আমাকে সেজ দাদামশাইয়ের কাছে নিয়ে গেলেন।

দেখ্‌লাম সেজ দাদামশাই-এর ইয়া শিং বাগানো গোঁফ, হিংস্র চোখ, দিব্যি টেরীকাটা চুল নিয়ে ইজিচেয়ারে বালাপোষ গায়ে দিয়ে শুয়ে আছেন। বুকের ভিতর ধ্বক্ করে টের পেলাম শত্রু নং ওয়ান্ ! সেজ দাদামশাইকে প্রণাম করতেই একটু মুচ্‌কি হেসে আমাকে মাথা থেকে পা অবধি দেখে নিয়ে বল্লেন, "হুঁ !"

ভীষণ রাগ হ'ল। রেগেমেগে দিদিমার সংগে খাবার ঘরে

গিয়ে আমার দাদামশাই যে বড় পিঁড়িতে বসতেন, তা'তে আসন হ'য়ে বসে লুচী, বেগুন ভাজা, ছোলার ডাল, ফুলকপির ডাল্‌না, চিংড়ি মাছের মালাইকারি, চাল্‌তার অম্বল, রসগোল্লার পায়েস, এক নিশ্বেসে সমস্ত রাশিরাশি পরিমাণে খেয়ে ফেল্লাম। খাওয়া শেষ হ'লে দেখলাম পাঁচুমামাও কোন্ সময় আমার পাশে বসে খুঁটে খুঁটে খেতে স্থুরু ক'রে দিয়েছে।

দু' একবার তাকালাম। পাঁচুমামার ভাবখানা যেন আমায় চেনেই না। তখন আমার ভারী দুঃখ হ'ল। পাঁচুমামাও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। কিন্তু হাত ধোবার সময় কাণের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বল্ল, "দু'জনে বেশী ভাব দেখালে মৎলব ফেঁসে যাবে। ওল্ড লেডি নং ওয়ান্ স্পাই !" আমি একটু আপত্তি করতে গেলাম, কারণ দিদিমাকে আমার ভালো লাগছিলো। পাঁচুমামা বল্ল, "চুপ, আমার খুড়ি আমি চিনি না !"

[ক্রমশ]

কবিতা : পরিমল রায়

মোক্তার

এক যে ছিল মাহুতটুলির মোক্তার
কাব্যচর্চ্চায় ছিল বেজায় ঝোঁক তার,
একদিন এক মামলাতে
না-পেরে আর সামলাতে
ঝেড়ে দিল 'রঘুবংশ' ব্যাখ্যাসহ শ্লোক তার।

কবি

"আমি নই ধনিকের আমি নই নিঃস্বের,
আমি এই রূপে-রসে-গানে-ভরা বিশ্বের।"
শুনে হেন মহাবাণী
চোখে-চোখে বহে পানি,
রাতারাতি দুয়ারেতে ভিড় জমে শিষ্যের।

আদুরে

আঁকটা দেখেই কষার আগে ভড়কায়,
ইস্কুলেতে গাল ভরে তাই চড় খায়।
মায়ের কাছে গাল ভরে খায় চুমো
সঙ্গে আবার গল্প-শোনার ধূম-ও।
মায়ের মতে অঙ্ক শিখুক শত্তুরে
আহা বাছার মুখ শুকোনো রোদ্দুরে !

ঘড়িও নয় ঘোড়াও নয় : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নাতি-নাতনিরা উৎপাত করে মারে, "দাদু তোমার সেই ঘড়ির গল্পটা আবার বলো না।" অনেকবার বলেছি। তবু ওদের উৎপাত বন্ধ করতে আবার স্থুরু করলুম :

"পিসি যেদিন ঘড়িটা কিনে দিল সেদিন আর আমায় পায় কে ! অহংকারে মাটিতে পা-ই পড়তে চায় না। আর অভ্যেস এমন হল যে, ঘড়ি না দেখে কিছু করতে পারি না—নাওয়া, খাওয়া, ইস্কুল যাওয়া সব কিছুতেই ঘড়ি ! কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখি ঘড়ি ত' নয় ঘোড়া—ওর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার ধাতে পোষায় না। হয়ত দেখলুম ঘড়িতে দশটা বেজে গিয়েছে ; হাউমাউ হৈচৈ করে নেয়ে-খেয়ে ছুটলুম ইস্কুল। গিয়ে দেখি ওমা, জনমনিষ্যি নেই। ইস্কুলের দরোয়ান বল্লে—'খোঁকাঁবাঁবুঁ এঁত্‌নাঁ ফঁজ্‌র কেঁও ! আঁভি তঁ আঁট ভিঁ নেই বাঁজাঁ হ্যাঁয় !' এদিকে আমার ঘড়ি এগারোটা টপকে গিয়েছে। কিম্বা, শীতকালে সন্ধেয় ঘনঘন ঘড়ি দেখছি—সাড়ে সাতটা, সাড়ে আটটা, সাড়ে নটা—টপ্‌টপ্ করে বেজে চলেছে। যাক। এত রাতে আজ আর মাস্টারমশাই কিছুতে আসবে না। লেপমুড়ি দিয়ে একটা গল্পের বই নিয়ে একটু আয়েস করা যাক। ওমা, একটু পরেই মাস্টারমশাই এসে উপস্থিত। আমার ত' চক্ষু স্থির ! তাঁরও চক্ষু স্থির ! হেঁড়ে গলায় দীর্ঘনিশ্বেস ফেলে তিনি বল্লেন—'সন্ধে ছটা সাতটা না পেরুতে লেপ মুড়ি ! এ ছেলের কিস্‌সু হবে না !' আমিও দীর্ঘ নিশ্বেস ফেলতে ফেলতে লেপ থেকে বেরিয়ে পড়ি, ঘড়িতে দেখি সোয়া দশটা !"

এই না শুনে নাতি-নাতনিরা হেসে গড়িয়ে পড়ে, "সাড়ে দশটা ! হী হী হী ! তার পর কী হল দাদু, তারপর কী হল…হী হী হী…"

"এমনি করেই সুখেদুঃখে দিন কাটছিল। নানান্ রকম কসরৎ করেও কিন্তু ঘড়িকে কিছুতে বাগ মানাতে পারছিলুম না। এমন সময় একদিন এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা প্রায় ঘনিয়ে এল ; আর দিন তেইশ মাত্র। আমার ত' হাত-পা হিম। একেই পড়াশুনো ভালো হয়নি, তায় ওই

পাগলা ঘড়ির ওপর নির্ভর করলেই গেছি আর কি! মুখ চূণ ক'রে পিসির কাছে গিয়ে বল্লুম, 'রইল পিসি তোমার ঘড়ি। ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটবার সাধ্যি নেই। ঘড়ি ত' নয়, খাস বিলিতি ঘোড়া।' পিসি বল্লে, 'তুইও যেমন ক্যাবলা, হাবা গঙ্গারাম! ঘড়ি বাগ মানাতে পারিস না ত' ঘেঁচুকাকার দোকানে দিয়ে আয়, সাতদিনে সায়েস্তা করে দেবে!' গেলুম পিসির ঘেঁচুকাকার দোকানে। সেখানে দেখি সায়েস্তা করবার জন্যে অনেক সব বদখদ ঘড়িকে পেরেকের গায়ে সারি সারি লটকে রাখা হয়েছে। বল্লুম, 'ঘেঁচুদাছু, পিসি এই ঘড়িটা আমায় দিয়েছিল। দিন সাতেকে একে সায়েস্তা করে দাও।' পিসির ঘেঁচুকাকা পট করে বাঁ চোখ বন্ধ করে ডান চোখে যন্তর আঁটলেন আর ঘড়িটার পেটে ছুরি দিয়ে এমন খোঁচা মারলেন যে ঘড়িটা একেবারে হাঁ। তারপর, অনেকক্ষণ পরে ভুরু কুঁচকে বল্লেন, 'সাতদিনে হবে না। বিশ দিন লাগবে।' বল্লুম 'তাই সই, পরীক্ষার আগে পেলেই হল!' গেলুম দিন কুড়ি পরে। পরীক্ষা তখন ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। দুশ্চিন্তার শেষ নেই! আর ত সব এক রকম তৈরি হয়েছে, কিন্তু এসে-টার কী করা যায়। ওঃ, এসে-টা যদি আগে থাকতে জানা যেত! এই সব ভাবতে ভাবতে ঘেঁচুদাছুর দোকানে ঢুকলুম। দেখি আমার ঘড়ি দেয়ালে ঝুলছে, তাতে ছ'টা বেজে রয়েছে। ঘেঁচুদাছুকে বল্লুম, 'এখন কটা বাজে?' তাঁর হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে তিনি বল্লেন, 'ঠিক ছটা।' 'ওঃ তা হলে মেরে দিয়েছি, ঘড়িটা সায়েস্তা করেছেন বলুন। দিন ওটা।' কিন্তু এত বড় আশ্চর্য ঘটনাতেও ঘেঁচুদাছুর উৎসাহ দেখলুম না। বল্লেন, 'নিয়ে যাও। কিন্তু ঘড়ি ত' নয়, ঘোড়া। ওকে সায়েস্তা করার সাধ্যি আমার নেই। এখন ওটা আটচল্লিশ ঘণ্টা ফাস্ট যাচ্ছে। ছটা যে বেজেছে দেখছ তা হল আসলে আগামী পরশুর ছটা!'—"

নাতি-নাতনিরা সব আবার হী হী করে হাসতে লাগল। "আগামী পরশুর ছটা! হী…হী…হী…। তারপর কী হল দাছু?"

"তারপর বিমর্ষ মুখে সেই ঘড়ি হাতে বেঁধে বাড়ি ফিরে এলুম। বাড়ি ফিরে হতাশ ভাবে বসে ঘড়ির দিকে চেয়ে আকাশ পাতাল সব ভাবতে লাগলুম। ছিছি, এমন কপাল! বিশ দিনে ঘড়িটা আটচল্লিশ ঘণ্টা ফাস্ট হয়ে গেল! পরীক্ষাতেই বা কী হবে কে জানে। এসে-টা কিছুই তৈরি হল না। কিসের এসে আসবে? পোড়া কপালে কি আর জানা এসে আসবে! কী লিখব কে জানে! মন ভারি খারাপ হয়ে রইল। সেদিন রাতে ভালো করে পড়াশুনো করতেই পারলুম না। পরদিন ভোরে রাত-থাকতে উঠে এক মনে পড়াশুনো স্থুরু করলুম। কতক্ষণ পড়েছি খেয়াল নেই; শরীরটা খুব ক্লান্ত লাগছিল, ভাবলুম একটু জিরিয়ে নি'। বই বন্ধ করলুম। পড়া ত' যা হোক এক রকম হয়েছে, কিন্তু এসে-র কী করা যায়—মাথায় এই দারুণ দুশ্চিন্তা কেবল পাক লাগাচ্ছে। 'ভাবলুম আধঘণ্টা খানেক জিরিয়ে নিয়ে ভাবা যাবেখন। ঘড়ির দিকে তাকালুম, দেখি দশটা বেজেছে। কিন্তু, যা ঘোড়ার ঘড়ি, ঠিক দশটা ত'! তা কী ক'রে হবে? এ ঘড়ি ত' আটচল্লিশ ঘণ্টা ফাস্ট যাচ্ছে। তা হলে দশটা মানে আগামী পরশুর দশটা! ভাবতেই বুকের মধ্যেটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। আগামী পরশুর দশটা? এতক্ষণে ত' পরীক্ষা স্থুরু হয়ে গিয়েছে, হাতে পড়েছে কোশ্চেন-পেপার। এসে-টাও নিশ্চয়ই দেখতে পাবো তখন। মাথার মধ্যে নানা রকম ভাবনা ঘুরতে লাগল: আচ্ছা ঘড়িটা ত' আটচল্লিশ ঘণ্টা এগিয়ে গিয়েছে, তা হলে নিশ্চয়ই আটচল্লিশ ঘণ্টা পরের ঘটনাগুলো ঘড়িটার সামনে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। কী আশ্চর্য! ভাবতে ভাবতে দেখি ঘড়ির কাঁচটার ওপোর আবছা একটা কিসের ছায়া যেন। ভালো করে নজর করে দেখি ছাপা কাগজ! আমার সমস্ত শরীর সিরসির করতে লাগলো—এনট্রান্সের ছাপা কোশ্চেন-পেপার। স্পস্ট দেখতে পেলুম। না দেখবই বা কেন? ঘড়িটা ত' আটচল্লিশ ঘণ্টা এগিয়ে গিয়েছে, কোশ্চেন ত' তা হলে ঘড়িটার কাছে অজানা থাকতেই পারে না! আমি ঘড়িটার ওপোর ঝুঁকে পড়ে এসে-টা দেখবার চেষ্টা করলুম। দেখি স্পষ্ট লেখা রয়েছে: HORSE। ঘোড়া ঘোড়া,—ঘোড়ার এসে এসেছে! তখন আর আমায় পায় কে। পাগলের মত ছুটলুম

মাস্টারমশাইএর বাড়ি। জব্বর করে লিখিয়ে নিলুম এসে-টা—আর গড়গড়ে করে জলের মতো মুখস্ত করে ফেললুম। তারপর পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখি ঠিক তাই। HORSE-এর এসে-ই! বেঁচে থাকুক আমার পাগলা ঘড়ি! হুড় হুড় করে লিখে ফেল্লুম। আর পরীক্ষায় নম্বর এত পেলুম যে আর বলবার নয়—অনেক অনেক নম্বর।"

নাতি-নাতনিরা রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলো, "তারপর কী হল দাছু? তারপর? তারপর?—"

"তারপর আর কী হবে?" আমি দীর্ঘ-নিশ্বেস ফেলে বললুম। "বেরসিক লোকেরা যা করে থাকে মাস্টারমশাইও তাই করলেন। ঘরে ঢুকেই পেটে খোঁচা মেরে বল্লেন—'গর্দভ ছেলে! পরীক্ষার দুদিন আগেও ঠিক-দুপুরে বসে ঘুম!'" নাতি-নাতনিরা হী হী করে হেসে উঠলো। "স্বপ্ন দেখছিলে? তাই বলো, দাছু! তা সেবার তোমার পরীক্ষায় কী হল?" বিরক্ত হয়ে বললুম, "পরীক্ষায় কী আর হবে! ফেল করেছিলুম।"

ওরা হেসে গড়িয়ে পড়ল। "হীহীহী, হীহীহী। তা হলে ঘড়িও নয় ঘোড়াও নয় একেবারে ঘোড়ার ডিম!"

ঘুম পাহাড়: রঞ্জিত সিংহ

'ঘুম'-পাহাড়ে ঘুম দিয়ে যায় নীলসায়রের ঘুম-পরী:
সাত পাহাড়ের ফুলঝুরি
পাহাড়তলীর স্বপ্ন, আর
নীল পাহাড়ের দোলনখেলা আকাশ-জোড়া দুর্নিবার—
মেঘ-নগরের অন্ধকার।
নিঝুম ঘুমের স্বপ্ন-হাওয়ায় মেঘ-পাহাড়ের রূপ নগর:
কাঠগোলাপের 'ঘুম'-সহর
হিম্-সায়রের দিল্‌বাহার;
ঘুমের দেশে সূর্য ঘুমায় নীল-কুয়াশায় রং বাহার—
স্বপ্ন ঝরা সাত পাহাড়।
সবুজ পাহাড়: সন্ধ্যাবতীর ঢেউ-খেলানো মেঘ-ঝালর,
অনেক দূরের ঘুম-সাগর!
কোথায় আমার যাত্রাশেষ?
ওই যে দূরের বন-পাহাড় সেথায় যে নেই ঘুমের লেশ,
ময়নামতীর স্বপ্নদেশ!
আকাশ কাঁপে তারায় তারায়, পাহাড়তলীর লাল বাড়ী
ঘুমায়, দূরে ঝাউ সারি—
কোথায় কারো নেইকো সাড়!
আকাশবনের ঝরণা ধারায় ঘুমায় যে ওই সাতপাহাড়—
ঘুমাও ঘুমায় 'ঘুম'-পাহাড়!

মশাল: মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি] তার রকম দেখে একটু খটকা লাগল কৃষ্ণদাসের মনে। শচীনের মনটা চিরদিন বড় দুর্বল। হয় তো সে যা ভাবছে তা নাও হতে পারে। হয় তো সত্যিই সে নিজেই জানতে চায়, সুন্দরেরা তার সঙ্গে কথা কইতে দেখলে চটে যাবে এই ভয়ে সুযোগ পেয়ে লুকিয়ে জিজ্ঞেস করতে এসেছে। কিন্তু স্পাইগিরি করতে আসার চেয়ে এরকম মনোভাবও তো বিশেষ ভালো নয়।

'চুপি চুপি চোরের মতো জানতে আসবে কেন? দশ জনের সামনে যদি আমার সঙ্গে কথা কইতে না পার কথা না কওয়াই ভালো। আমি এসব ভালোবাসি না।'—'ও!' 'এমন বন্ধুও আমি চাই না যে সকলের সামনে আমার সঙ্গে কথা কইতে ভয় পায়। কেক বিস্কুট কেমন লাগছে?' শচীন আরেকবার লাল হয়ে দমক মেরে চলে গেল। শেষের কথাটা কৃষ্ণদাস বলবে ভাবেনি, হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

ছুটির পর কৃষ্ণদাস সবে বাড়ী পৌঁচেছে, একটি মুখচেনা ছেলে এসে তাকে খবর দিল, পাগলা ডাক্তার ডাকছেন। 'আমায় বলতে বললেন যে কয়েকটি রোগীর রসাধিক্যের চিকিৎসা করছেন, তুমি দেখতে যাবে। শীগগির।' ছেলেটি হাসল। রসাধিক্যের চিকিৎসা! খিদেয় কৃষ্ণদাসের পেট জ্বলছিল, খিদেটিদে সব সে ভুলে গেল। বই খাতা ফেলে রেখে আগন্তুক ছেলেটির সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে প্রায় ছুটতে আরম্ভ করে দিল। 'ছুটতে হবে না। সময় আছে।' ছেলেটি বলল।

ছেলেটির নাম চিন্ময়। সে পাগলা ডাক্তারের একজন ভলান্টিয়ার। সত্যবতী ইনষ্টিটিউসনে পড়ে। 'কে কে রোগী এসেছে?' চলতে চলতে কৃষ্ণদাস জিজ্ঞেস করে বসলে ধৈর্য ধরতে না পেরে। চিন্ময় হেসে বলল, 'আমার আর কিছু বলা বারণ।'

পাগলা ডাক্তারের বাড়ীর সামনে দুটি মোটর, একটি ঘোড়ার গাড়ী ও একটি টমটম দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেয়ে কৃষ্ণদাস অনুমান করে নিল সুন্দর, শঙ্কর, মনোহর ও সলিল চারজনেই উপস্থিত আছে। ভেতরে গিয়ে দ্যাখে, রোগীদের বসবার বেঞ্চে চারজনের সঙ্গে শচীনও বসে। ভয়ে পাঁচজনেরই মুখে একটা হাস্যকর ভঙ্গি। তাদের পিছনে ও পাশে দাঁড়ান পাগলা ডাক্তারের জন পনের ভলান্টিয়ার। দরজার কাছে আরও চার-পাঁচ জন দাঁড়িয়ে আছে। পাগলা ডাক্তার বললেন, 'এসো কেষ্ট। মানুষের চোখ খুঁচিয়ে কানা করার রোগ হলে কী চিকিৎসা করতে হয় দেখতে চাইছিলে, দেখবে এসো। রোগ দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা খুব ভালো হয়। ওদের সবাইকে কলেরা রোগ খাইয়ে দেব ঠিক করছি।'

শচীন অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। অন্য সকলের মুখ আরও সাদাটে মেরে গেল। পাগলা ডাক্তার ওষুধের আলমারির পিছনে তার কম্পাউণ্ডিং রুম থেকে চীনে মাটির বড় একটা পাত্রে ওষুধ এনে সকলের সামনে চীনে মাটির দণ্ড দিয়ে জোরে জোরে ঘুঁটতে লাগলেন। বললেন, 'এ নির্ঘাৎ দাওয়াই। আজ রাত্রে সব কটার কলেরা হবে। তবে মরবে না। না, মরবে না।' একটু থেমে, ভুরু কুঁচকে আনমনে খানিক ভেবে আবার মাথা নাড়লেন, 'না, মরবে না।' মনে যেন তার বেশ খটকা আছে এ বিষয়ে এমনি রকম সকম পাগল ডাক্তারের।

শচীন প্রায় কেঁদে ফেলবার উপক্রম করছে দেখে তাকে দেখিয়ে কৃষ্ণদাস বলল, 'ওকে ছেড়ে দিন ডাক্তারবাবু। ওর দোষ নেই। ও কিছু করেনি।' পাগলা ডাক্তার বললেন, 'তাই নাকি হে ছোকরা? আচ্ছা তুমি সরে বোসো।' কিন্তু শচীনের কপালটা ছিল খারাপ। পাগলা ডাক্তারের হাতে তারা নাস্তানাবুদ হবে কিন্তু শচীন বেঁচে যাবে, এটা তার বন্ধুদের সহ্য হল না। মনোহর বলে বসল, 'ওই তো খোঁচা দিয়েছিল নিজে।' শুনে কৃষ্ণদাস কাঠ হয়ে গেল। ঘোঁটা শেষ হলে চীনে পাত্র থেকে একটা কাপে খানিকটা ওষুধ ঢেলে পাগলা ডাক্তার অগ্রসর হতেই সুন্দর লাফিয়ে উঠে গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, 'চাপরাশি!' পাগলা ডাক্তার ডান হাতের বিরাট থাবা দিয়ে চোয়াল টিপে ধরে আঙুলের চাপ দিতেই সুন্দরের মুখ হাঁ হয়ে গেল। কাপের ওষুধটা তিনি অল্পেঅল্পে তাকে খাইয়ে দিলেন। একটা ঢোক শুধু সুন্দর থুথু করে ছিটকিয়ে ফেলে দিতে পেরেছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাগলা ডাক্তরের আঙুলের টিপুনিতে চোয়ালের হাড়গোড় চুরমার হয়ে যাবার উপক্রম ঘটায় আর এরকম করার সাহস পায়নি।

একে একে পাঁচজনকেই কড়া ডোজের ক্যাস্টার অয়েল খাইয়ে পাগলা ডাক্তার ছেড়ে দিলেন

পাগলা ডাক্তারের কীর্তি জানাজানি হয়ে গেলে ছাত্র-মহলে হৈ চৈ পড়ে যায়। সহরের লোকেরাও হাসাহাসি করে ব্যাপারটা নিয়ে। ক্যাস্টর-ওয়েল-ভোজী পাঁচজন দু'টো দিন বাড়ী থেকে বার হয় না। এ দু'দিন কত যে উদ্ভট হাস্যকর গুজব রটতে থাকে তাদের নিয়ে! কেউ বলে পাগলা ডাক্তার তাদের চোখ কাণা করে দিয়েছেন, কেউ বলে কাণ কেটে নিয়েছেন, কেউ বলে ওষুধ খাইয়ে সাময়িকভাবে একেবারে পাগল করে দিয়েছেন পাঁচজনকে —দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়!

পাঁচজনের বাড়ীতেই পাগলা ডাক্তার ভলান্টিয়ারের হাতে একখানা করে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—ছেলের ওপর ক্যাস্টর অয়েলের ক্রিয়া দেখে তাঁরা যাতে ভয় না পান। প্রত্যেক চিঠির শেষে পাগলা ডাক্তার এই উপদেশ জুড়ে দিয়েছিলেন যে অতঃপর যেন মাসে অন্তত একবার করে-এ রকম জোলাপ ঠুকে দেওয়া হয়। তা হলে ছেলের স্বাস্থ্য ও মন দুই-ই ভালো থাকতে সাহায্য হবে। পাঁচটি বাড়ীর মধ্যে শুধু সরকারী উকিল অনন্তবাবু রেগে আইন বাঁচিয়ে গালাগালি করে আর ভয় দেখিয়ে চিঠির জবাব দিয়েছিলেন—অন্য চারজন ব্যাপারটা কী ভাবে গ্রহণ করেছিলেন জানা যায় নি।

শচীনের দিদি অমলা দেবী এখানকার মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। সহরের মেয়ে মহলে তাঁর খুব নাম, মেয়েদের ...য়ে সর্বদা সভাসমিতি করে বেড়ান। চওড়া লাল পাড় ...টা শাড়ী পরেন, সব সময় মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখেন, ...রের বিপদে খবর পেলেই গিয়ে হাজির হন। তাঁর ...কটি দশ বছরের মেয়ে আর সাত বছরের ছেলে আছে: ...ধা ও মণ্টু।

শচীনদের বাড়ী কেষ্টদাসের বাড়ীর কাছেই—রাস্তা ...য়ে যেতে আসতে যদি বা একটু ঘুর হয়, রায়বাবুদের ...পাড়ো জমি আর ঘোষালদের কলাবাগান ভেদ করে যেতে ...মিনিটও লাগে না।

সেদিন রাত্রেই লোক পাঠিয়ে অমলা কেষ্টদাসকে ডেকে ...াঠিয়েছিলেন। কেষ্টদাস যায়নি। সকালে সুধা আবার ...াকে ডাকতে আসে। বলে, 'মা তোমাকে ডাকছে ...কেষ্টমামা। শীগগির এসো, চটপট।'

অমলাকে কেষ্টদাস শ্রদ্ধা করে। কিছুদিন পর্যন্ত ও ...াড়ীতে তার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। লোক দেখানো ...স্নেহ দেখাতে অমলা দেবী মোটেই পটু নন, বিশেষ কোন ...স্নেহ মমতার পরিচয় কেষ্টদাস তাঁর কাছে কোনদিন পেয়েছে ...কিনা সন্দেহ। তবু শুধু হাসিখুসী ভাব ও সহজ ব্যবহার ...িয়েই তিনি কেষ্টদাসের মনকে অনেকখানি বশ করে ...ফেলেছেন। আজ ইনি এ ভাবে ডেকে পাঠানোতে ...কেষ্টদাস ফাঁপরে পড়ে গেল। এঁর আহ্বান তুচ্ছ করা ...হজ নয়, আবার শচীনের বাড়ীতেই বা সে যায় কী করে— ...ড়লোক বন্ধুদের খুসী করার জন্যে যে তার বাবার চোখে ...খোঁচা দিয়েছে! কেষ্টদাস মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, ...আসল অপরাধী কে জানতে পারলে সে উপযুক্ত প্রতিশোধ ...নবেই নেবে—সেজন্য নিজের যতই ক্ষতি হোক না কেন ...াহ করবে না। আসল অপরাধী যে শচীন একথা জানতে ...পেরে মনে তার কঠিন আঘাত লেগেছে। শচীনকে ...বিশেষভাবে শাস্তি দিয়ে প্রতিশোধ নেবার সাধটা সে দমন ...রেছে। কিন্তু ক্ষমা সে তাকে করতে পারেনি। তাকে ...্যাগ করলেও পূর্বতন এই বন্ধুটির জন্যে মনের তলে একটু ...ায়া কেষ্টদাসের রয়ে গিয়েছিল, ওকে আবার বন্ধুভাবে ফিরে ফেলে সে সত্যিই খুসী হয়। আজ মন তার বিদ্বেষে ও বিতৃষ্ণায় কাণায় কাণায় ভরে গেছে। কী করে এখন সে ওদের বাড়ী যাবে, ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে! তাকে দেখে ও যদি কাঁদো কাঁদো হয়ে ক্ষমাও চাইতে আসে তার কাছে, সে তো ওকে সহ্য করতে পারবে না!

সুধাকে সে ফিরিয়ে দিল। বলল, 'বলো গে আমি কাজে যাচ্ছি—ওষুধ আনতে যাচ্ছি।'

কিন্তু অমলা দেবী উৎসাহী কাজের মানুষ, অত সহজে তিনি হাল ছাড়লেন না। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে কেষ্টদাস মাঠে চানাচুর বিক্রী করতে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে, এমন সময় একেবারে শচীনকে সঙ্গে করে অমলা দেবী তাদের বাড়ীতে হাজির হলেন। [ক্রমশ]

পরের দিন বড়দিন : এডালবার্ট স্টিফটার

[পূর্বানুবৃত্তি] বিয়ের প্রথম কয়েক বছর রঙের কারবারীর স্ত্রী প্রায়ই জিশচেড়ে বেড়াতে আসতো। তার মেয়ে-জামাইও মাঝেমাঝে মেলার সময় বা ছুটির দিনে মিলস্‌ডর্ফে যেতো বেড়াতে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা জন্মাবার পর সে এক অন্য ব্যাপার হোলো। মা'য়েরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের এক ধরণের ভালোবাসে। কিন্তু নাতি-নাতনিদের জন্যে দিদিমাদের ভালোবাসা একেবারে অন্য জাতের: সেই ভালোবাসা এতো তীব্র যে ঠিক বোঝানো যায় না। তাদের দেখবার জন্যে দিদিমারা সত্যিকারের পাগল হয়ে পড়ে। নাতি-নাতনিদের দেখতে রঙের কারবারীর স্ত্রী ঘনঘন জিশচেড়ে আসতো, সঙ্গে আনতো অনেক উপহার। তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে যাবার আগে অনেক উপদেশ দিয়ে যেতো। কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো এতোটা পথ যাতায়াত করা তার পক্ষে তত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। তার স্বামীর শরীরও ভেঙে পড়লো ক্রমশ। মা'য়ে-ঝিয়ে তখন পরামর্শ করে ঠিক করলো ছেলেমেয়েরাই এবার থেকে দিদিমাকে দেখতে যাবে। এর পর প্রায়ই তারা মা'র সঙ্গে অন্য গ্রামে বেড়াতে যেতো। মাঝমাঝে খুব ভালো করে জামাকাপড় মুড়ে দাই-এর সঙ্গেও গাড়ি করে তারা নেক্ পার হয়ে আসতো। কিন্তু আরো একটু বড় হবার পর মা'র কিংবা দাই-এর সঙ্গে হেঁটেই তারা মিলস্‌ডর্ফে আসা সুরু করলো। ছেলেটি দেখতে-দেখতে বড় হয়ে উঠলো, চমৎকার মজবুত হোলো তার গড়ন আর বুদ্ধিও হোলো খুব। তাই

দেখে তার বাবা-মা পাহাড়ের সেই পরিচিত পথে একলাই তাকে যাতায়াত করবার মত দিলো। দিনগুলো খুব পরিষ্কার থাকলে তার ছোট্ট বোনটিকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি সে চেয়ে নিতো। জিশ্‌চেডবাসীদের কাছে এ ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। হাঁটা তাদের খুব অভ্যেস আছে। সেখানকার বাবা-মা'রাও চাইতো ছেলোমেয়েরা খুব শক্ত হয়। বিশেষ করে আমাদের জুতো নির্মে তার মতো লোকের বেলায় তো কথাই নেই।

ছেলেমেয়েরা সেই পাহাড়ী পথে যতবার আসা-যাওয়া করলো সে-গ্রামের লোকেরা সবাই মিলেও অতবার সে-পথে যাতায়াত করেনি। ইতিপূর্বে তাদের মাকেই শুধু গ্রামের লোকেরা বাইরের লোক বলে মনে করতো। ঘনঘন জিশচেডে ছেড়ে যাওয়ায় ছেলেমেয়েদেরও তারা এবার থেকে বাইরের লোক বলে ভাবতে সুরু করলো। বাস্তবিকই পুরোপুভিবে তাদের জিশ্‌চেডের বলা চলে না, মিলস্‌ডর্ফ গ্রামেরও তাদের উপর যেন অর্ধেক দাবী আছে।

ছেলেটির নাম কনরাড্। ইতিমধ্যেই তাকে দেখতে হয়েছে বাবার মতো গম্ভীর। তার মায়ের নামে মেয়েটির নাম হয়েছে সুসান্না, ডাক-নাম সান্না। তার দাদার জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি ও ক্ষমতার উপর সান্নার অগাধ বিশ্বাস। কোনো রকম প্রশ্ন না করে, তর্ক না করে, তার দাদা যে-পথে যেতে বলতো সেপথেই যেতো সান্না। তার মাও ঠিক একই ভাবে তার বাবার কথা মেনে চলতো আর ভাবতো সে-রকম বুদ্ধি আর বিচারশক্তি বুঝি আর কারুরই নেই।

যে-কোনো পরিষ্কার সকালে দেখা যায় ছেলেমেয়েরা উপত্যকার দক্ষিণের পথ ধরে, মাঠ পেরিয়ে নেক্-এর উপরকার অরণ্যের দীর্ঘ গাছের দিকে চলেছে। ক্রমশ তারা অরণ্যের কাছে এসে পাহাড়ের উপরকার গাড়ি-চলা পথ ধরে উপরে পৌঁছয় আর সূর্য মাঝ-আকাশে ওঠবার আগেই পাহাড়ের ওপাশে মিলস্‌ডর্ফের মাঠ ধরে আসে নেমে। আঙুল দেখিয়ে কন্‌রাড বলে এই সমস্ত মাঠই তার দাদামশাই-এর সম্পত্তি। ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় তার বোনকে সে চেনায় কী-কী ফসল ফলেছে। তারপর তাদের চোখে পড়ে বাড়ির ছাতের তলাকার বাঁশ থেকে ঝোলানো কাপড়গুলো শুকোচ্ছে—বাতাসে কখনো সেগুলো পাকিয়ে যাচ্ছে, কখনো যেন অদ্ভুত মুখভঙ্গী করছে। তারপর শোনে কাপড় ধোবার আর চামড়ার কলের শব্দ—তাদের দাদামশাই স্থানীয় তাঁতী আর চামড় কারবারীদের জন্যে তার ছোট্ট নদীটির পাশে ওই মিলগু বসিয়েছে। শেষে আর একবার মাঠের কোণে মোড় ঘু একটুখানি যাবার পর তারা বড় গেট পেরিয়ে রঙের কারবারী বাগানে এসে পৌঁছয়। তারা নিশ্চিত জানে দিদি তাদের জন্যে এখানে অপেক্ষা করে রয়েছে। তারা পৌঁছব আগেই বৃদ্ধা কি করে যেন বুঝতে পারে তার নাতি-নাতনি আসছে! কথাটা মনে হলেই জানালার কাছে গিয়ে সে দে আর অনেক দূর থেকেই চিনতে পারে তাদের—রোদে সান্না লাল চাদরটা ঝকঝক করছে।

কাপড় ধোলাই আর কাপড় ইস্ত্রির ঘরের মধ্যে দিয়ে তাদে সে নিয়ে যায় বসার ঘরে। আদর করে সেখানে বসায় ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে গলার রুমাল আর গায়ের কোট খুলতে দে না। তারপর হয় খাওয়া-দাওয়া। খাওয়া-দাওয়ার প তারা অনুমতি পায় রুমাল আর কোট খোলবার, দাদামশাই এর বাড়িময় দৌড়ঝাঁপ করবার—যা খুসি তাই করবার। তা বলে বাঁদরামো করার অনুমতি তাদের নেই। খাব সময় সর্বদা তাদের দাদামশাই হাজির থাকে। কী রক পড়াশুনো হচ্ছে সে-বিষয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে তারপ কী-কী তাদের শেখা দরকার সে-বিষয়ে দেয় উপদেশ বিকেলে আবার জামাকাপড় মুড়ে দিদিমা তাদের ফেরৎ পাঠা —নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পাঠায়, যাতে রাতের আগে পৌঁছতে পারে। রঙের কারবারী মেয়েকে যৌতুক তো দেয় নি, উপরন্তু প্রতিজ্ঞা করেছিলো মৃত্যুর আগে তার সম্পত্তি কণাটি পর্যন্ত তারা পাবে না। কিন্তু তার স্ত্রী এই প্রতিজ্ঞ মেনে চলতো না। নাতি-নাতনিদের সে নানা জিনিস দেয় টাকাটা-সিকেটা তাদের দেয় প্রায়ই—শুধু তাই-ই ন ছোটো-ছোটো ছুটি পুঁটলি করে তাদের জন্যে দেয় অনেক স দরকারি জিনিস, এমন সব জিনিস যা পেলে নিঃসন্দেহে তা খুসি হবে। সে-সব জিনিস জিশ্‌চেডে সেই জুতো নির্মে তা বাড়িতে আছে জানলেও তবু সে দেয়—নিছক দেবা আনন্দেই দেয়; ছেলেমেয়েরা সেগুলো মহামূল্য ধন-সম্পত্তি মতো নিয়ে যায় বাড়ি।

দিদিমা তাদের বরাবর তাড়া দিয়ে ফেরৎ পাঠানোর ফ তারা ধীরেসুস্থে ফিরে যায়। মাঝেমাঝে এখানে-ওখা -বসে গল্পগুজব করে। নেক্-এর উপরকার ছোটো-ছে

জল গাছের ধারে বসে পাথর দিয়ে বাদাম ভেঙে খেতে আর খেলতে তারা ভালোবাসে। বাদাম না থাকলে প্রথম বসন্তে র গাছ থেকে ঝরে-পড়া তামাটে রঙের ফল কিংবা পাতা কিংবা কাঠকুটো নিয়ে তারা খেলে। কখনো বা কন্‌রাড র বোনকে গল্প বলে। কখনো বা সেই লাল স্মৃতিস্তম্ভের ছে এসে বাঁ দিকের অন্য পথ ধরে পাহাড়ের চূড়োর দিকে কিছুটা পথ নিয়ে যায় তার বোনকে আর বলে এই পথ রে সোজা এগিয়ে গেলে তুষার-চূড়োয় পৌঁছনো যায়—সেখানে াছে বড়বড় পাথরের চাঁই, শ্যাময় হরিণ সেখানে লাফিয়ে বেড়ায় আর মস্ত বড়বড় পাখী ওড়ে। প্রায়ই তাকে বন াড়িয়ে ফাঁকা জায়গায় সে নিয়ে আসে আর তারা দুজনে দেখে কনো ঘাসে-ভরা মাঠ আর উলুখড়ের ছোটো ঝোপ-ঝাড়। কিন্তু বাড়ি ফিরতে কখনোই কন্‌রাড দেরি করে না—গোধূলির ক আগেই ছোটো বোনকে নিয়ে সে ফিরে আসে। তার কোনোদিন দেরি হয় না দেখে বাড়িতে সবাই তার খুব প্রশংসা রে।

[ক্রমশ]

লন্তিকা

তোমাদের যদি জিগগেস করি চুংকিং যাবে? এখনি হয়তো চটপট রাজী হয়ে পড়। কিন্তু ব্যস্ত হয়ো া, আস্তে। সেখানকার জিনিসপত্রের দাম আগে শোনো: একটা টুপি ৬৫০৲, একটা স্যুটের কাপড়ের জন্যে লাগে ৬০০৲, এক জোড়া জুতোর দাম ৩০০৲'র কাছাকাছি, ক পাউণ্ড মাখম কিংবা একটা লিপস্টিকের জন্যে দাম য় প্রায় ১৫০৲। মোটেই এটা গল্প-কথা ভেবো না, কেবারে খাঁটি সত্যি খবর! চুংকিং যাবে?

সম্ভবত এইসব খবর শুনে আমাদের দেশের বাঁদরের ল ক্ষেপে গেছে! গত ৫ই জানুয়ারি, ১৯৪৫, কলকাতায় াটসায়েবের বাড়ির সামনে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে। খাবার্তা নেই সেদিন দুপুরে হঠাৎ সেখানে ঝন্‌ঝন্ করে ুরো পয়সাকড়ি বৃষ্টির মতো পড়তে লাগলো। অনেক লোক জমলো। কৌতূহলী জনতা মহা ফুর্তিতে সেগুলো রির লুটের বাতাসার মতো পকটস্থ করলো। কিন্তু কে ছড়াচ্ছিলো তার কোনো হদিস্ হোলো না। অনেকেই জল্পনা-কল্পনা করছে এটা লাটসায়েবের বাড়ির বাঁদরের কীর্তি। যুদ্ধের দৌলতে বাঁদরেও তাহলে আজকাল পয়সা ছড়ায়।

কিন্তু লক্ষ্ণৌএর এক বাঁদরের কীর্তি শুনে তাকে আরো চালাক বলে মনে হোলো। এক দোকানীর হাত থেকে হঠাৎ সে পঁচিশটা দশটাকার নোট ছিনিয়ে নিয়ে গাছে উঠে বসলো। নাম, নাম—আর নামা! শেষে ছোট্ট একটি ছেলে বুদ্ধি করে এক কাঁদি কলা দেওয়ায় নোটগুলো ফেলে সে চটপট কলার কাঁদি নিয়ে উধাও হোলো। বাঁদরেও আজকাল বুঝেছে এক গোছা নোটের চেয়ে এক কাঁদি কলার দাম অনেক বেশি!

নতুন ধাঁধাঁ: পরিমল রায়

গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'মজার পদ্য' ধাঁধাঁর আরো কতকগুলি একই ধাঁচের পদ্য নীচে ছাপা হোলো। শেষের কথাগুলো বসাবার আর একবার চেষ্টা করে দেখো দিকিনি!

(১) ঠাস্ করে পিঁড়ি পেতে জল নিল—,
তারপর গপাগপ্ খাওয়া নয়, —!

(২) কত তারা আকাশেতে নাহি তা'র—,
তুমি তো আঁকেতে ফাস্ট, পারো যদি—।

(৩) কিনিল নতুন বই, কালি নিল—,
বিদ্যা হইবে কিছু আল্লার—।

(৪) বোধোদয় ছেড়ে যবে সুরু হোলো—,
দু' চোখ ভাসায়ে আহা, কী বিষম—!

(৫) সুন্দরী নাত্‌নীটি কবিত্ব—,
দাদু তার অস্থির নালিশে ও—।

(৬) সাত সিকে দাম যা'র, সেই মাছ—
হায় হায় সস্তায় দশ আনায়—!

(৭) বিদ্যায় গজ্‌গজ্, এত ডাক—,
হঠাৎ ঠেকিয়ে গেছে এগারোর—!

পৌষ মাসের ধাঁধাঁর উত্তর

(১) সাহা-রা, সাহারা (২) নামেতে, না মেতে (৩) সোনালী, শোনালি (৪) পোষাকে, পোষা-কে (৫) চায়না, চায় না।

রংমশালের নিয়মাবলী ঃ বার্ষিক চাঁদা ৩৷০, ষান্মাসিক ১৷৵০। আষাঢ় কিংবা তারপরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হতে হয়। গ্রাহক নং ও রিপ্লাই-কার্ড না-পেলে চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। অমনোনীত রচনার সঙ্গে ফেরৎ পাঠাবার জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট না পাঠালে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করে ফেলা হয়। সে-কারণে ভবিষ্যতে সেই লেখা সম্বন্ধে কোনো খবর জানানো সম্ভব হয় না। এই ঠিকানায় চিঠিপত্র টাকাকড়ি পাঠাতে হয় ঃ ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা।

গল্পসল্প

বাংলাদেশের ছেলেমেয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ শেষ বৎসরে এই বইয়ের গল্প আর কবিতাগুলি রেখে গিয়েছেন।

"অনেক দিন ধরে আমি গম্ভীর পোশাকী সাজ পরে কাটিয়েছি, সেলাম পেয়েছি অনেক। তখন ছিলুম সময়ের গোলাম। আজ আমি গোলামিতে ইস্তফা দিয়েছি। ছেলেমানুষির দোসর পেয়ে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসেছি। যা খুশি বলে যাব মাথা চুলকে কারো কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না।"

ইরুমাসির রাজার বাড়ি, ম্যাজিসিয়ান হ. চ. হ. বাচস্পতি, পান্নালাল, নীলমণিবাবু, চন্দনী, মুনশীজি, রাজরানী প্রভৃতি অনেক গল্প ও কবিতা। দাম পাঁচসিকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.
Founded by Prof. K. N. Sen.

রংমশাল

[নবম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : ফাল্গুন, ১৩৫১]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

৺সুবিনয় রায় : লীলা মজুমদার

আমাদের তিনপুরুষের সমবয়সীটিকে হারিয়েছি। কোনও নতুন জিনিষ দিয়ে আর সেই পুরোন জিনিষটির অভাব পূর্ণ হবে না। যে আমাদের মায়ের সঙ্গে খেলা করেছিল, আশৈশব আমাদের মধ্যে গল্প করেছিল আর আমাদের ছেলেমেয়েদেরও অজস্র গল্প বলেছিল, সে এবার চলে গেলো। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা, তোমরা একজন এমন বন্ধু হারিয়েছ যার জুড়ী নেই।

সুবিনয় রায়ের 'কাড়াকাড়ি', 'রকমারি'র ছোটগল্প, 'বল তো'র ধাঁধাঁগুলি তোমাদের পরিচিত, কিন্তু যে মানুষটি ঐ বইগুলি রচনা করেছিলেন তোমরা তাঁকে চেনবার আর সুযোগই পেলে না, এই বড় দুঃখ।

'সন্দেশে'র প্রথম সম্পাদক ৺উপেন্দ্রকিশোরের নাম তোমরা জান, তিনি সুবিনয়ের পিতা। 'আবোলতাবোলে'র ৺সুকুমার রায় সুবিনয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রসের অক্ষয় ভাণ্ডারের চাবি নিয়ে এসে একের পর এক তিনজনেই অকালে চলে গেলেন। এঁদের একজনের নাম করলেই বাকী দু'জনও মনের সাম্‌নে এসে দাঁড়ান, তাই তাঁদের নাম একসঙ্গে করতে হয়—আর এঁরা সকলেই আমার অতি নিকট আত্মীয় বলে গর্বে আমার বুক ফুলে ওঠে, আনন্দ রাখবার আর জায়গা পাই না।

উপেন্দ্রকিশোর আমার শৈশবে স্বর্গারোহণ করেন, সেইজন্য তাঁর কথা স্পষ্ট মনে নেই। কেবল তাঁর দীর্ঘ গৌর সৌম্য মূর্তিখানা মনে পড়ে, কখনও বেহালা বাজাচ্ছেন, কখনও ছবি আঁকছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যের কী সুন্দর তৈলচিত্র যে তিনি আঁকতেন সে আর কি বল্‌ব! আর যতদিন বেঁচে আছি মনে পড়বে ১৯১৩ সালে তাঁদের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে প্রথম 'সন্দেশ'খানা হাতে করে সন্ধেবেলা তিনি দোতলার বৈঠকখানা ঘরে হাসিমুখে প্রবেশ করলেন।

সুকুমারকে আরও ভালো করে জানতাম। তিনি যখন স্বর্গারোহণ করেন, আমার তখন পনেরো বছর বয়স। তাঁর কবিতা পড়ে, ছোটগল্প পড়ে, নাটিকা পড়ে, তাঁর আবৃত্তি শুনে, ছবি আঁকা দেখে, রসিকতা শুনে, এবং সর্বোপরি তাঁর অদ্ভুত রসভঙ্গিমা দেখে, আমাদের বাক্‌রোধ হ'ত। সত্যি বল্‌ছি, তাঁর ভেংচিকাটা পর্যন্ত এমন অপরূপ ছিল যে বুঝ্‌তে পারতাম এও একটা চারু[illegible]। গোপনে অনুকরণ করতাম ; এমন কি এখনও গর্ব [illegible]রতে পারি যে তোমাদের অধিকাংশের চেয়ে আমি ভালো ভেংচি কাট্‌তে পারি।

এমনি ছিলেন আমাদের সুকুমার।

তারপর ছিলেন সুবিনয়। যতদিন বড়দা জীবিত ছিলেন তাঁর অদ্ভুত প্রতিভার কাছে অপর সকলকেই দ্বিতীয় স্থান নিতে হ'ত। কিন্তু বড়দা মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বিদায় নিলেন। রইলেন সুবিনয়। আস্তে আস্তে তাঁর স্বরূপ আমাদের চোখ জুড়ে বসলো, মন জুড়ে বসলো।

আমরা তাঁকে মণিদা বলে জানি। তাঁর কথা বলতে গেলে ত' আর একটি মণিদার কথা মনে হয় না। সারি সারি মণিদা স্মৃতির গুহার ভিতর থেকে দিব্যলোকে বেরিয়ে আসেন। তাঁর ছিলো লম্বা ফর্সা চেহারা। আগে বেশ দোহারা ছিলেন, ইদানিং রোগে ভুগে ছিপ্‌ছিপে চেহারা হয়ে গিয়েছিলো। মুখে তাঁর হাসি লেগেই থাকতো।

বলেছি বড়দার উজ্জল প্রতিভার কাছে তিনি সহসা চোখে পড়তেন না। কিন্তু তবু তাঁকে সবাই জানত। আশ্চর্য মজলিসি লোক ছিলেন তিনিও। হাসি গল্প, সব রকমের খেলা, গান, অভিনয়, লোক-খাওয়ান, সব কিছুতেই

অদ্ভুত আগ্রহের সঙ্গে যোগ দিতেন। এবং তাঁর উৎসাহ ও আনন্দ দেখে আমাদের উৎসাহ আনন্দও দ্বিগুণ হ'য়ে যেত।

লেখাপড়া ছিলো তাঁর কাজ। বি-এস্-সি পরীক্ষা পাশ করবার আগে থেকেই পিতার কার্যালয়ে যোগ দেন, আর হাতে কলমে প্রেসের কাজ শেখেন। পরে যখন সুকুমার অকালে বিদায় নিলেন, ইউ রায় এণ্ড সন্স-এর বিশাল দায়িত্ব মণিদার ঘাড়ে এসে পড়লো। আর মণিদাও সাগ্রহে সেই দায়িত্ব নিলেন।

'সন্দেশে'র তৃতীয় সম্পাদক হ'লেন সুবিনয়। আমরাও ততদিনে একটুআধটু সাহিত্যচর্চা সুরু করেছি। আরও পাঁচজনের মতন আমারও গল্প লেখা ও রেখাচিত্রের শিক্ষানবিশি হয়—বড়দার আদর্শ ও মণিদার পরামর্শ নিয়ে।

প্রেস চালানোর আর পত্রিকা সম্পাদনার কাজ সম্বন্ধে ছিলো তাঁর অগাধ অভিজ্ঞতা। তোমরা 'রামধনু'র সম্পাদক মহাশয়ের প্রবন্ধ-খানা ফাল্গুনমাসের রামধনুতে পার ত নিশ্চয় প'ড়। দেখ্‌বে কেমন পরম বন্ধু ছিলেন তিনি।

ঐ 'সন্দেশ' কার্যালয়খানা নানান কারণে বন্ধ হ'য়ে গেলো। কিছুদিন মণিদা অকুলসাগরে পড়লেন। পায়ের তলা থেকে যেন মাটিটা সরে গেলো। পিতার অমন আদরের প্রেস গেলো, বাড়ি গেলো, বিষয়-আসয় সব গেলো। কিন্তু মণিদার উৎসাহ গেলো না। সারাদিন নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়ে মণিদা সন্ধেবেলা যখন বাড়ি আসতেন, দেখতাম চোখমুখ কালি হয়ে গেছে। কিন্তু হাতমুখ ধুয়েই নতুন মানুষ হ'য়ে যেতেন। আর চায়ের টেবিলে আমাদের কলেজের সহপাঠির মতন জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প সব কিছু নিয়ে আলোচনা করতেন, ও মাঝে মাঝে রোমাঞ্চকর রকমের তর্কে মেতে যেতেন। আমরা রেগে যেতাম হয় ত, কিন্তু মণিদা তর্ক শেষ করেই আবার হাসিমুখে বসতেন। তারপর মণিদা সরকারি জিওলজিক্যাল সার্ভেতে চাকরী নিয়ে নানান মাসিক পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করলেন। গল্প, ধাঁধাঁ, প্রবন্ধ, কবিতা, কিছুই বাদ গেলো না। তাঁর ঐ অদম্য উৎসাহ একটুও কমলো না। প্রায় কুড়ি বছর বয়সের ব্যবধান ডিঙিয়ে মণিদা আমাদের সমবয়সী হলেন।

কিন্তু আমাদের মণিদা বাঁচলেন না। দু বছরের বেশী বুকের নানান রোগে ভুগে, শেষটা বিদায় নিলেন। চৌদ্দমাস শয্যাশায়ী ছিলেন। উৎসাহ তেমনি ছিলো। শুয়ে শুয়ে লিখ্‌তেন, পড়তেন, লেখাপড়ার স্বপ্ন দেখতেন, বইয়ের দোকানের স্বপ্ন দেখতেন। এমনটি আর দেখা যায় না।

আর কত গল্প করব মণিদার বিষয়ে? বললে যে শেষ করা যায় না। ছোটবেলা থেকে মণিদা বড় স্বদেশভক্ত ছিলেন। সেকালে ভালো দিশী জিনিষ পাওয়া যেত না। তবু খুঁজে খুঁজে এনে ত্যাড়াবাঁকা, ভোঁতা, রং ওঠা নানান রকমের দিশী জিনিষ নিজেও ব্যবহার করতেন, আর সকলকেও ব্যবহার করতে বাধ্য করতেন। তখন দিশী জিনিষ ব্যবহারের রেওয়াজ ছিলো না, এবং মণিদা তখনও স্কুলের ছাত্র। তাঁর জ্বালায় বাড়ীর সকলে খেরোর মতো কাপড় কিনত, হাঁড়ি সরার মতন পেয়ালাপিরিচ কিনত। মনে মনে সকলে শ্রদ্ধা না ক'রে থাকতে পারত না, কিন্তু মুখে কৌতুক করতেও ছাড়তো না। বড়দা ত একটা ছড়াই বানিয়ে ফেলল, তা'তে সুর লাগিয়ে গান গাওয়া হ'ত:

"আমরা দিশী পাগলার দল। দেশের জন্য ভেবে ভেবে হয়েছি পাগল।"......তারপর দিশি জিনিষের কথা আছে: "দেখ্‌তে খারাপ, টিক্‌বে কম, দামটা একটু বেশী। তা হোক্ না। তাতে দেশেরই মঙ্গল!" ইত্যাদি। এম্‌নি উপেন্দ্রকিশোর, এম্‌নি সুকুমার, এম্‌নি সুবিনয় সারাজীবন শিশুসাহিত্যের সেবা করেছেন। মনে হচ্ছে আমরা যা'রা বাংলাদেশে এখনও শিশুসাহিত্য রচনা করবার প্রয়াস পাই, আমরাও যেন এবার সবার কাছে প্রমাণ করি আমরা তাঁদের উত্তরাধিকারী হ'বার অযোগ্য নই, কারণ বাংলাদেশের শিশুরা ত' তাঁদের দান গ্রহণ করবার অযোগ্য পাত্র নয়।

ভূতপত্রীর যাত্রা : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবু। আমি পিসির বাড়ি যাবো—হাতে পয়সা নেই ঘোড়াকে কী খাওয়াবো?

ঘোড়া। জল পী পী ঘোড়া জল চিবায়ে খাবো—যত খাওয়াবে তত খাবো!

সাহেব। সস্তা ঘোড়া আচ্ছা ঘোড়া।

দালাল। ভারি তেজী ঘোড়া চড়েই দেথ।

অবু। সাহেব, কামড়াবে না তো?

সাহেব। কামড়ে দেবে তো কান মলে দেবে—ঠাণ্ডা করে চেপে লেবে।

অবু। না সাহেব, ও রথো ঘোড়া আমার পছন্দ নয়।

সাহেব। হোয়াট্, কৃষ্টবর্ণ কৃষ্টরথের কাষ্ঠ ঘোড়া না পছন্দ?—টুমি হিন্দু না কৃষ্টান?

অবু। অত শত জানিনে সাহেব আমি মাসিপিসির অবুচাঁদ।

সাহেব। গো বাবু, ইউ আর নো ট্রিবুটারি মহারাজ!

অবু। আমি টাট্টু চড়তে পারি সাহেব, নো রাগ—হাড্ডু হাড্ডু।

সাহেব। প্যালারাম ল্যাও টাট্টু!

॥ টাট্টু ঘোড়ার প্রবেশ ॥

টাক্‌টুমা টুম্ টাক্ টুমাটুম টাট্টু ঘোড়া
লাট্টু রামের টাট্টু ঘোড়া
ছাত্তু খাই কাম বাজাই থোড়া থোড়া
ঘীউ ভি চাই রোটি পোড়া।

অবু। না সাহেব নিজেই খেতে পাইনা শেষ আমারে খেয়ে ফেলবে ঘোড়া!

সাহেব। পেলারাম, লাও কুমড়ী ঘোড়া।

পেলারাম। এ ঘোড়া বহুত আচ্ছ আছে, সস্তাভি আছে দেখে লেন।

॥ কুমরী ঘোড়ার নৃত্যগীত ॥

ওমরাও শেঠের কুমরী ঘোড়া
চুমকী সাজ যুমরী জোড়া
ডুলকি দিতে চলকি পোড়ে
সওয়ার হয়েছে খোড়া।
বরাতে কেরায়া খাটে
গৌখানাতে বৌবাজারে
মখ্‌মল মোড়া
স্তাবলমে কোন হ্যায় মেরা জোড়া!
বাইরে বাই ওমরাও শেঠের কুমরী ঘোড়া!

অবু। বাঃ এইতো আসল বাদশাই আমলের টাট্টু—এর দাম?

সাহেব। এক দিল্লীকা লাড্ডু।

অবু। বাঁচাইয়া বিধি যদি দিল্লি লয়ে যায়,
তবে তো ঘোড়ার ফরমাস্ পাঠাই তোমায়।

সাহেব। পেলারাম খরিদার একদম ফাল্‌তু।

পেলারাম। হাথ মে নেহি একভি লাড্ডু।

সাহেব। বাবু, কোপালে তোমার ঢেঁকি জোড়া টোমার কেনো হোবে ঘোড়া! পেলারাম, গেটাউট্, বন্ধ হার্সষ্টন আড়গড়া!

অবু। উঠ কপালে উট বলে গেল! অ্যাঁ সাহেবটার মেজাজ তো ভারি কড়া—উচিৎ হচ্ছে সরে পড়া।

॥ জুড়ি দোহার গীত ॥

হাইটে চল হাইটে চল
বৈসে থাকার চাইতে ভালো
হয়ে এলো অন্ধকার
মাফুল ময়দান নাকুল দরিয়া
চল হেঁটে পাড়ি দিয়া
ভাবিয়া লাভ কি আর!
পথ চলে হলো গুড়মুড়ো ঢিলে
বেদনায় কোমর পড়তেছে হিলে।
আগাইলেও গোল না আগাইলেও গোল
গোলে হরি বোল হল ভালো!

॥ অবুর গীত ॥

চলরে আমার হাতের নাঠি কাঠের ঘোড়া
পাখনা মেলে ওড়ান দাও
তুমি যেথায় আমি সেথায়, রে আখ কাঠের কাঠ ঠোকরা
আমি যেথায় তুমি সেথায় একই পথের পথিক
দুই জনায় ভব ঘোরা। (প্রস্থান)

"ইতি কেয়াতলার সাট॥"

পরের দিন বড়দিন : এডালবার্ট স্টিফ্‌টার

[পূর্বানুবৃত্তি] বড়দিনের আগের দিন সকালটা ভারি সুন্দর হয়ে দেখা দিলো। ভোরের ঝিকিমিকি আলো জিশচেডের উপত্যকার উপর ক্রমশ স্পষ্ট দিনের আলো হয়ে উঠলো। একটি পাতলা ওড়নায় সমস্ত আকাশ যেন ছেয়ে গেলো আর দক্ষিণ-পুব কোণে সবাই অবাক হয়ে দেখলো সূর্যকে, নিষ্প্রভ একটি লাল বিন্দুর মতো। বছরের এই সময়েই সূর্য সবচেয়ে দূরে আর সবচেয়ে নীচুতে দেখা দেয়। এদিনের বাতাসটাও সুন্দর—মৃদু আর প্রায় কুমকুমে গরম—সমস্ত উপত্যকার উপর যেন ঝুলে রয়েছে। আকাশে মেঘগুলো স্থির ও শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। তাই না দেখে জুতোনির্মেতার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের বললো, "ভারি সুন্দর আজকের দিনটা। বৃষ্টিও অনেক আগে ধরেছে। বাইরের পথে কাদা নেই, শুকিয়ে শক্ত হয়েছে। গতকাল তো উনি বলেছিলেন আজকের দিনটা পরিষ্কার থাকলে মিলসডর্ফে তোদের দিদিমার সঙ্গে দেখা করে আসতে দেবেন! যাবার আগে একবার ওঁর মত নিয়ে আয়।"

ছেলেমেয়েরা তখনো নাইটগাউন পরে দাঁড়িয়েছিলো। মা'র কথা শুনেই এক দৌড়ে হাজির হোলো পাশের ঘরে। সেখানে তাদের বাবা খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইছিলো। তাদের কথা শুনে জুতোনির্মেতা মত দিলো মিলসডর্ফে যাবার। অনুমতি পেয়ে আবার তারা এক দৌড়ে ফিরে এলো মা'র কাছে।

মা তাদের খুব পরিপাটি করে সাজাতে লাগলো——মানে মেয়েকেই সে পরালো যত রাজ্যের মোটা-মোটা গরম জামা। ছেলেটি নিজেই নিজের জামাকাপড় পরে তার বোনের অনেক আগে প্রস্তুত হয়ে নিলো। জামা-কাপড় পরানো হলে মা বললো, "সন্নাকে তোর সঙ্গে যেতে দিচ্ছি—দেখিস, খুব সকাল-সকাল ফেরা চাই কিন্তু। পথে এদিক-ওদিক ঘুরবি না। দিদিমার ওখানে খাওয়া-দাওয়া শেষ হলেই বাড়ি ফিরবি। একটুও দেরি করিস না। দিনগুলো এখন ভারি ছোট্ট আর দেখেছিস তো কি চটপট সূর্য অস্ত যায়!"

"কিচ্ছু ভেবো না মা", বললো কনরাড।

"সান্নাকে সামলে নিয়া যাস্‌। দেখিস, যেন হোঁচট না খায় আর যেন ঘেমে না ওঠে।"

"হ্যাঁ মা, দেখবো।"

"ভগবান তোদের নিরাপদে রাখুন। যা দৌড়ে গিয়ে বাবাকে বলে আয় যাচ্ছিস বলে।"

তাদের বাবা বাছুরের চামড়ার ভারি সুন্দর একটা থলি সেলাই করে দিয়েছিলো। কনরাড কাঁধের উপর দিয়ে স্ট্র্যাপটা গলিয়ে নিলো তারপর দু-ভাইবোন পাশের ঘরে গেলো বাবাকে বলতে। চটপট তারা বলে বেরিয়ে এলো, তাদের মা দু-জনকে আশীর্বাদ করলো আর বেড়াতে যাবার ফুর্তিতে শান-বাঁধানো মেঝেয় তারা দুজনে উঠলো নেচে। গ্রামের চাঁদনিচকের মধ্যে দিয়ে, নানা বাড়ির কোল ঘেঁষে, ফলের বাগানের বেড়ার পাশ দিয়ে অবশেষে তারা একেবারে খোলা জায়গায় পৌঁছলো। পাহাড়ের উপরকার অরণ্যের উপর সবে তখন সকাল হচ্ছে, তার ভিতর দুধে-ধোয়া শাদা বাষ্প মাঝে-মাঝে আছে জড়িয়ে। সূর্য উঠেছে। তার লালচে নিষ্প্রভ চেহারাটা যেন পাল্লা দিয়ে চলেছে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। পথটা আপেল গাছের পাতাশূন্য ডালপালায় ভরা। তাই মাড়িয়ে তারা দুজনে এগিয়ে চললো।

উপত্যকার কোনোখানে তুষার নেই। শুধু দূরের বড়-বড় পাহাড় থেকেই গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তুষার ঝকঝক করছে। ছোটোপাহাড়গুলোতেও তুষার পড়েনি। যেন ফার্‌ অরণ্যের জামা আর নিষ্প্রভ ডালপালার রুক্ষ প্রায় পোষাক পরে শান্ত হয়ে তারা দাঁড়িয়ে। মাটিটাও ঠাণ্ডায় জমে যায়নি। ইতিপূর্বে বহুদিন বৃষ্টি না পড়ায় এসময়ে শুকনো খটখটে হয়ে যাবার কথা। কিন্তু বছরের এ-সময়ে পুরু হয়ে শিশির পড়ায় একটু ভিজে-ভিজে রয়েছে। তা বলে মোটেই পিছল হয়নি। যেন আরো এঁটে গেছে। ফলে তার উপর খুব জোরে হাঁটা যায় আর হাঁটার সময় মনে হয় শরীরটা বেজায় হাল্কা হয়ে উঠেছে। মাঠে আর খাদে তখনো ছোটো-ছোটো ঘাসগুলো রয়েছে। তাদের চেহারায় কেমন একটা শুকনো ধূসর হেমন্তের ভাব।

মাটির উপর শাদা কুয়াশা জমে নেই; খুব কাছ থেকে ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় শিশিরের চিহ্নও নেই। গ্রামের লোকেরা এ-রকম জমি দেখলে বলে শিগগীরই বৃষ্টি হবে।

মাঠের শেষে, একেবারে কোল ঘেঁষে, ছোট্ট একটি পাহাড়ি ঝর্ণা চোখে পড়ে। তার উপর দিয়ে পায়ে-চলা একটি সাঁকো ওপারে গেছে। সেই সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে তারা নীচের দিকে চেয়ে রইলো। ঝর্ণায় জল প্রায় দেখাই যায় না। শুকনো নুড়িগুলোর পাশ দিয়ে শীর্ণ রীতিমতো নীল একটি রেখা চলে গেছে। বৃষ্টির অভাবে নুড়িগুলো ধবধবে শাদা। স্রোতের রঙ আর শীর্ণ চেহারা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় পাহাড়ের উপর এখন দারুণ ঠাণ্ডা। এতো ঠাণ্ডা যে সেখানকার মাটিও গেছে জমে, ফলে স্রোতের সঙ্গে কাদা মিশে জলের রঙ একটুও ঘোলা করতে পারছে না। বরফের চাঁইগুলোও এমন শক্ত হয়ে উঠেছে যে তাদের ভিতর দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা স্বচ্ছ জল ছাড়া আর কিছুই পারছে না গলে আসতে।

সাঁকোর উপর থেকে তারা দৌড়তে সুরু করলো উপত্যকার সরু পথ দিয়ে। ক্রমশ ফার্‌ গাছের বনের কাছে তারা এসে পড়লো। আরো কিছু পরে বনের ধারে পৌঁছলো, তারপর চললো অরণ্যের ভিতর দিয়ে।

নেক্‌-এর উপরকার জঙ্গলে এসে তারা লক্ষ্য করলো গাড়ির চাকার গর্তের মাটিগুলো উপত্যকায় যে-রকম নরম দেখেছিলো সে-রকম নয়—বেজায় শক্ত। মাটিটা যে শুকিয়ে শক্ত হয়েছে মোটেই তা নয়। সহজেই তারা বুঝতে পারলো ঠাণ্ডায় এখানকার মাটি জমে গেছে। কয়েক জায়গায় মাটির ঢেলা এমনি শক্ত যে তার উপর দাঁড়ালেও গুঁড়িয়ে যায় না। সব ছেলেমেয়েদের মতোই তারাও বেশ মজা পেয়ে গেলো। গাড়ির চাকার দাগের পাশেকার সরু পথ দিয়ে না হেঁটে দাগের উপরকার মাটির রেখা ধরে তারা চললো আর পরখ করতে লাগলো সেই মাটিটা কতটা শক্ত হয়েছে, তাদের ভার সইতে পারে কিনা। আরো ঘণ্টাখানেক পরে নেক্‌-এর সবচেয়ে উঁচু জায়গায় পৌঁছে তারা দেখলো জমিটা এমন শক্ত হয়েছে যে হাঁটলেও শব্দ হয়। সেখানকার মাটির ঢেলাগুলো এক-এক টুকরো পাথর যেন।

সেই রুটিওলার লাল স্মৃতিস্তম্ভের কাছে পৌঁছে সান্নাই প্রথম লক্ষ্য করলো যে স্তম্ভটা আজ আর দাঁড়িয়ে নেই। যেখানে সেটা থাকবার কথা সেখানে গিয়ে দেখলো লাল রঙের গোল খুঁটিটা, যার উপর ছবিটা ছিলো, শুকনো ঘাসে গড়াগড়ি যাচ্ছে। খড়ের মতো পাতলা ঘাসে জায়গাটা ঢাকা। ফলে চিৎপাৎ হয়ে পড়ে-থাকা স্তম্ভটা ভালো করে নজরেই পড়ে না। তারা ঠিক বুঝতে পারলো না কেন সেটার এই অবস্থা: কেউ কি ফেলে দিয়েছে, নাকি নিজে থেকেই আছড়ে পড়ছে—কে জানে! তারা লক্ষ্য করলো খুঁটিটার গোড়াটা একবারে পচে গেছে। এ-কারণেই হয়তো সেটা পড়েছে চিৎপাৎ হয়ে। জীবনে প্রথম খুব কাছ থেকে ছবিটা দেখতে আর আর লেখাটা পড়তে পেয়ে তারা দারুণ খুসি হোলো। কিছু তারা বাদ দিলো না, খুব খুঁটিয়ে দেখলো: সিমনেল-কেক-ভরা বাক্স, রুটিওলার পাণ্ডুর হাত, তার বোজা চোখ, ধূসর কোট আর আসেপাশের ফার্‌ গাছ। সবকিছু দেখা হলে আর লেখাটা বানান করে চেঁচিয়ে পড়া হলে পর আবার তারা চলতে সুরু করলো।

এক ঘণ্টা পরে দু-পাশ থেকেই যেন অন্ধকার অরণ্য সরে গেলো। গাছের সারি পাতলা হয়ে এসেছে: মাঝে-মাঝে একটা-দুটো ওক, কখনো বার্চ গাছ। ছোটো-ছোটো ঝোপঝাড় আরো কিছুক্ষণ যেন তাদের সঙ্গে-সঙ্গে চললো। তারপর ঢালু মাঠ দিয়ে তারা মিলসডর্ফের উপত্যকার উপর দৌড়ে নামতে লাগলো।

এখানকার উপত্যকা জিশচেডের চেয়ে অনেকটা নিচু। সে-তুলনায় মিলসডর্ফ অনেকটা গরম। এখানকার উষ্ণ আবহাওয়ার জন্যে জিশচেডের চেয়ে দিন পনেরো আগে থেকেই এই উপত্যকায় ফসল কাটা সুরু হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এখানকার সমস্ত জমিটা আজ ঠাণ্ডায় জমে রয়েছে। দাদামশাই-এর চামড়ার আর কাপড়-ধোলাই-এর কারখানার কাছে পৌঁছে তারা দেখলো চারদিকে সুন্দর-সুন্দর বরফের টুকরো রয়েছে ছড়িয়ে। মিলের বড়-বড় চাকা থেকে যে-জল ছিটিয়ে পড়ে এই

বরফের টুকরোগুলো তা-ই থেকেই জন্মেছে। দেখে তারা ভারি খুসি। সব ছেলেমেয়েরাই খুসি হয়।

দূর থেকেই দিদিমা দেখতে পেয়েছিলো তারা আসছে। তাই এগিয়ে এসেছিলো। জমে-যাওয়া ঘোলা-জলের পাশ দিয়ে সান্নাকে সে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলো।

গরম জামাকাপড়গুলো দিদিমা তাদের গা থেকে খুললো। তারপর ঘরের ভিতরকার চুল্লিতে কাঠ দিয়ে আগুনটা জোরালো করতে-করতে পথের নানা খবর জিগগেস করলো।

নাতি-নাতনির উত্তর শুনে সে বললো, "খুব ভালো করছিস। এই তো চাই। তোদের দেখে যে কী খুসি হয়েছি! কিন্তু আজ তোরা চটপট ফিরে যাবি। দিনটা ভারি ছোট্ট আর ঠাণ্ডাটাও ভীষণ তাড়াতাড়ি পড়ছে। আজ সকালেও মিলস্‌ডর্ফে কোনো কুয়াশা ছিলো না।"

"জিশ্‌চেডেও না", উত্তরে কন্‌রাড বললো।

"সেই জন্যেই তো বলছিলুম খুব তাড়াতাড়ি ফেরার কথা। নইলে যাবার সময় সন্ধেবেলায় ঠাণ্ডায় হয়তো কষ্ট পাবি।" তারপর সুরু হলো দিদিমার অন্য সব প্রশ্ন: মা কী করছে, বাবা কী করছে, জিশ্‌চেডে কোনো অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে কিনা, ইত্যাদি।

প্রশ্ন শেষ করে দিদিমা তাড়াতাড়ি খাবার ব্যবস্থা করলো। অন্যবারের চেয়ে অনেক আগেই আজ টেবিলে খাবার সাজানো হোলো। নাতি-নাতনির জন্যে একটা খুব মুখরোচক রান্না নিজের হাতেই দিদিমা রাঁধলো। তারপর তাদের দাদামশাই হাজির হোলো আর বড়দের সঙ্গে সামনে সমান হয়ে ছেলেমেয়েরা খেতে বসলো। বিশেষ ভালো খাবারগুলি দিদিমা ডিশ্‌ থেকে তাদের তুলে-তুলে দিলো আর খাওয়া শেষ হবার পর সান্নার গালে হাত বুলিয়ে করলো অনেক আদর। ইতিমধ্যেই টুকটুকে লাল হয়ে গিয়েছিলো তার দুটি গাল।

একটুও আর অপেক্ষা না করে ব্যস্ত হয়ে ঘুরঘুর করতে-করতে দিদিমা তাদের জন্যে নানা জিনিসপত্র প্যাক করতে লাগলো। দেখতে-দেখতে কন্‌রাডের চামড়ার থলিটা টাই-টম্বুর হয়ে উঠলো ফুলে। নানা ধরণের সব জিনিস সেঁধুলো তার পকেটেও। সান্নার ছোট্ট দুটি পকেটও খালি রইলো না। পথে খাবার জন্যে এক-এক টুকরো রুটি সে দিলো। থলির মধ্যে দিলো দুটি গমের পিঠে আর বললো খুব ক্ষিধে পেলে তারা যেন ওগুলোও খায়। [ক্রমশ]

মশাল: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি] বললেন, 'কান মলে দেব?' 'দিন।'

অমলা দেবী সত্যি সত্যি একে একে কেষ্টর দুটি কানই মলে দিলেন। অমলা দেবীর হাত ভারি মিষ্টি—এস্রাজ বাজানো আর কানমলা দুয়েই। শচীনকে দেখে কেষ্টর মুখের ভাব বিগড়ে গিয়েছিল, কানমলা খেয়ে মুখে হাসি ফুটল।

'ডেকে পাঠালে যাওনা, এ হল তার শাস্তি। আর এই হল বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি'—অমলা দেবী দু'হাতে কেষ্টর গাল দুটি থাপড়ে দিলেন। চড় যেন আরও মিষ্টি লাগল কেষ্টর কাছে। মা অথবা দিদির আদরের মতো। হাসি রইল কেষ্টর মুখে, চোখে ছলছলিয়ে এসে পড়ল জল। অমলা দেবী বললেন, 'ওমা! বটে! উঁ!' খানিকটা তিনি অনুমান করলেন। সদয় ব্যবহার ও কারো কাছে আশা করেনি, তার আদরে ছেলেটার মন নাড়া খেয়েছে।

'আমার এই হতভাগা ভাইটিকে তোমার বন্ধু করে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম কেষ্ট। তোমায় বিশ্বাস করেছিলাম! তুমি কি বলে ওকে একটা পাজী নচ্ছারের হাতে ছেড়ে দিলে?'

'কচি খোকা নাকি ও? ওর যদি তাদের সঙ্গে মিশতে ভাল লাগে, জোর করে আটকে রাখব বলতে চান?' 'জোর করে কেন? বুঝিয়ে সুজিয়ে, ভালবাসা দিয়ে—' 'ভালবাসা দিয়ে? ও বাবার চোখ কাণা করে দিয়েছে জানেন?' কেষ্টর চোখ জ্বল জ্বল করতে থাকে।

'জানি!' অমলা দেবী বলেন শান্ত কণ্ঠে, 'ইচ্ছে করে দেয়নি ভাই। আমার কাছে সব বলতে বলতে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল। আর যাই করুক, লক্ষ্মীছাড়ার একটা গুণ আছে, মিথ্যে কথা বলে না।' 'এবার মিথ্যেই বলেছে।' কেষ্টকে আর নরম মনে হয় না।

অমলা দেবী তার কথার ঝাঁঝে বেশ খানিকটা ভড়কে যান। বলেন, 'কথাটা বুঝে ছাখো। তোমার সঙ্গে ওর কতকালের ভাব, তোমার বাবাকেও ও ভাল করে জানে। তাছাড়া, তুমি তো জানই ও কি রকম ভ্যাচকাঁদুনে নিরীহ ছেলে। তুমি কি ভাবতে পারো কেষ্ট, ইচ্ছে করে তোমার বাবার চোখে খোঁচা দেবার ক্ষমতা ওর আছে?'

কেষ্টও এ সব কথা ভেবেছে অনেকবার। শচীনের মনটা সত্যিই নরম, তলতলে। ভীরুও সে একনম্বরের। মুকুন্দকে আক্রমণ করে সে তার চোখে খোঁচা দেবে এটা যেন কেমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার বলে মনে হয়। অথচ সে নিজেই দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। অনেক ভেবে কেষ্ট এ ধাঁধাঁর একটা মানে বার করেছে। শচীন ঝোঁকের মাথায় সাময়িক উত্তেজনায় কাজটা করে বসেছিল। সুন্দরেরা তাকে সাহস দিয়েছিল, উত্তেজিত করেছিল। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় করুক, আর ঝোঁকের মাথায় করুক, এমন কাজ যে করতে পারে তাকে ক্ষমা করার সাধ্য কেষ্টর নেই। অন্য কেউ হলে তার দুটো চোখই সে কাণা করে দিত, ওকে সে এমনিতেই রেহাই দিয়েছে। তাই অনেক ভাগ্য ওর! 'বাবার চোখে যে খোঁচা দিয়েছিল সে ইচ্ছে করে গায়ের জোরে খোঁচা দিয়েছিল অমলাদি।' কেষ্ট বলে। অমলা দেবী খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। 'আচ্ছা, তুমি ওকে ক্ষমা কর। ও তোমার কাছে, তোমার বাবার কাছে মাপ চাইছে। সুন্দরদের সঙ্গেও আর কোনদিন মিশবে না।' কেষ্টর কাঠের মতো মুখ দেখে অমলা দেবী আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, 'শচীন তোমাকে সত্যি ভালবাসে কেষ্ট।'

'চাই নে ভালবাসা।'

এবার অমলা দেবী রাগ করলেন। 'তোমার স্বভাব তো ভারি বিশ্রী হয়ে গেছে কেষ্ট! বড্ড ছোট হয়ে গেছে তোমার মন।'

'ছোটলোকের ছেলে যে আমি—চানাচুরওলার ছেলে।' ভাইকে নিয়ে অমলা দেবী চলে গেলেন, আর কথা কইলেন না। রাস্তায় শচীন কেষ্টর সম্বন্ধে কী একটা কথা বলতে যেতেই তিনি ঠাস করে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। আদরের মিষ্টি চড় নয়, সে চড়ে গাল জ্বালা করে।

কিন্তু এমনি আশ্চর্য্য ব্যাপার, চড় খেয়েও ভ্যাঁচকাদুনে শচীনের অভিমানও উথলে উঠল না, চোখে জলও এল না! যা বলতে যাচ্ছিল সে কথাটা দিদিকে শুনিয়ে তবে ছাড়ল। 'কেষ্ট ঠিক করেছে দিদি।' 'তুই ইচ্ছে করে খোঁচা দিয়েছিলি? মিথ্যে কথা আমাকে?' 'আমি খোঁচাই দিই নি।'

শচীনের জন্যে মন কেমন করে কেষ্টর। বাতিল করলাম বললেই তো মন রাজী হয় না বন্ধুকে বাতিল করতে, চাই না বললেই তো মন না চেয়ে পারে না বন্ধুর ভালবাসা। কেষ্ট জানতই না সেও শচীনকে এত ভালবাসত। সত্যি কথা বলতে কি, কখনো টেরও পায়নি শচীন তার এতবড় বন্ধু হয়ে উঠেছিল। না চেয়ে যা প্রচুর মেলে তার দাম কমে যায়। শচীনের অজস্র বন্ধুত্ব পেয়ে পেয়ে কেষ্টর কাছে বন্ধু হিসেবে তার দাম ছিল না। ডালভাতের মতো হয়েগিয়েছিল। ওর অসহায় ভীরু প্রকৃতির জন্যে মনেমনে একটু অবজ্ঞাই বরং সে পোষণ করত। ডালভাত না পেতে আরম্ভ করলে তখন টের পাওয়া যায় সে কি জিনিস!

দিন যায়, রাগ দ্বেষের জ্বালা কমে আসে, শচীনের সঙ্গে দেখা হয় কিন্তু কথা হয় না, বেড়ানো হয় না, খেলা হয় না—যাওয়াও হয় না শচীনের বাড়ী। টানা হয় না সুধার বেণী ধরে, দু'হাত ধরে শূন্যে বোঁ করে পাক খাইয়ে ভাণ করা হয় না মণ্টুকে মামাবাড়ীতে ছুঁড়ে পাঠিয়ে দেবার, হাসা হয় না মোটা চশমা আঁটা মণ্টুর মোটা বাবার হাসির কথায়, কাড়াকড়ি করে খাওয়া হয় না খাবার, আর জোটে না অমলা দেবীর সহজ নরম স্নেহ।

একটা প্রকাণ্ড তথ্য আবিষ্কার করেছে কেষ্ট। ভদ্রলোক বাবুদের এই একটিমাত্র বাড়ী আছে জগতে যে বাড়ীতে ঢুকে সে কখনো এতটুকু অস্বস্তি বোধ করেনি, আপনা থেকে ঘরের ছেলে হয়ে যেতে পেরেছে। শুধু এই বাড়ীতেই কেউ কখনো কথায় ব্যবহারে চালচলনে তার

মনে পড়িয়ে দেয়নি সে চানাচুরওয়ালার ছেলে! ও কথা মনে পড়বার কথাটা পর্য্যন্ত মনে পড়ার স্থযোগ ঘটেনি কোনদিন। এ রকম অন্য বাড়ীতেও সে গিয়েছে, অবহেলা দূরে থাক্ আদর যত্নের সামান্য ত্রুটিও হয়তো ঘটেনি, সকলে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেছে তার সঙ্গে, কিন্তু তবু সব সময়েই সে যেন কেমন সঙ্কোচ বোধ করেছে, মনে হয়েছে সকলের আদরযত্ন ভাল ব্যবহারের অনেকখানিই কৃত্রিম নিছক ভদ্রতা ছাড়া কিছু নয়।

শচীনের সঙ্গে ভাব করবার জন্যে, আবার ওদের বাড়ী যাবার জন্যে মনটা ছটফট করে কেষ্টর। কিন্তু হলে হবে কি, মনের ছটফটানি যতই কষ্টকর হোক কতকগুলি ব্যাপারে মনটাই তার আবার লোহার মতো শক্ত। নিজেকেই সে কড়া ভাষায় শাসন করে দেয়: খবর্দ্দার! ও সব ন্যাকামিপণা চলবে না!

স্থন্দরদের সঙ্গে শচীন যে বন্ধুত্ব ছেঁটে ফেলেছে এটা চোখে পড়ে। ওদের মধ্যে আর মেলামেশা নেই। তবে এর মধ্যে শচীনের বিশেষ কোন বাহাদুরীর প্রমাণ কেষ্ট খুঁজে পায় না। পাগলা ডাক্তারের ওখানে সেদিন ওরা যেভাবে শত্রুতা করেছিল, তারপর ওদের সঙ্গে শচীন কোন মুখে ভাব করবে? স্থন্দররা মাঝেমাঝে শচীনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে, শচীন ভাসাভাসা ভাবে জবাব দেয়, আসল দেয় না। তবু, জবার তো দেয়! কি ভীরু, কি কাপুরুষ ছেলেটা!

কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে শচীন আশ্চর্য্য হয়ে যায়। শচীনের কাছে কেমন যেন নিরীহ হয়ে থাকে স্থন্দরেরা, কথা যেন বেশ খাতির করে বলে, প্রায় যেন ভয়ে ভয়েই!

একদিন বিকেলের দিকে খগার মাঠে কেষ্ট জাম খেতে গেছে। খগার মাঠের জামগাছগুলিতে অজস্র জাম ফলে, যার খুসী পেড়ে খায়। একটা জামগাছের নীচে স্থন্দরের ছোট বোন শ্রীকে দেখা গেল। তার সঙ্গে শচীন। কোটের পকেট থেকে জাম বার করে সে স্থন্দরের বোনকে উপহার দিচ্ছে।

শচীনের সম্পর্কে লোহার মতো শক্ত মনটা কেষ্টর ইস্পাত হয়ে গেল। [ক্রমশ]

ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি] তা সত্যি কথা বলতে কি, জগুর মন বাস্তবিক লাগছিলো না। "অত তর্ক ফর্ক আমার সত্যি মাথায় ঢোকেও না, ভালও লাগে না", জগু সটান বলে বসল! ভদ্রলোক বল্লেন, "তার কারণ বোধহয় তুমি মন দিয়ে শুনছ না; মন দিয়ে শুনলে বুঝতেও পারবে, ভালও লাগবে।" জগু ভাবলো—সেরেছে। এও যে দেখছি একটি জ্যান্ত সেকেণ্ড-পণ্ডিত মশাই, এবার না কান ধরে বার করে পার্কের কোণায় দাঁড় করিয়ে দেয়! তাই একটু ভয়ে ভয়েই বল্ল, "না, মানে সেদিন বেশ গল্পের মতো করে বলছিলেন কিনা, তাই আপনিই মন লাগছিলো।" "ঠিক বলেছ", ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন, তাঁর কুতকুতে চোখদুটো একটু বোধহয় চকচক করে উঠল, "ঠিক বলেছ, গল্পের মতো না বল্লে কি আর জমে! তবে আমাকে কষ্ট করে গল্পের মতো আর বলতে হবে না, কেননা লুই পাস্তুরের জীবনী এমনিই গল্পের মতো!

"তারপর লুই পাস্তুর স্থরু করলেন নানান রকম অদ্ভুত অদ্ভুত রোগ নিয়ে পরীক্ষা। বাস্তবিক, কত রকম রোগভোগ যে আছে! ছাগল-টাগলের একরকম বিধঘুটে ফোড়া হয়, তার নাম এ্যান্থ্রেক্স্, বাচ্ছা মুরগির একরকম কলেরা হয়, এমনি কত কি। শুধু জন্তু জানোয়ার কেন, মানুষেরও কত রকম আষ্টেলা রোগ হয়, যেমন ধরো পাগলা কুকুর কামড়ালে হয় জলাতঙ্ক। এ সব রোগ যে কেন হয় তা আগে কেউ জানত না, আর জানত না বলেই আন্দাজে এলোপাতাড়ি ওষুধ দিত, সে-সব ওষুধ খেয়েও যারা বাঁচত তারা নেহাতই কপাল-জোরে বাঁচত, অধিকাংশই পেত অক্কা। পাস্তুর লেগে পড়লেন কোমর বেঁধে: কেন যে এ-সব রোগ হয় তা আবিষ্কার করতেই হবে। তাঁর মনে মনে ধারণা ছিলো এ-সব রোগের কারণ জীবাণু ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এবং যে-সব জীবাণুর দরুণ এই সব রোগ হয় তাদের একবার ধরতে পারলে একেবারে নিকেশ করাও অসম্ভব হবে না। অসুখগুলো সত্যিই সারানো যাবে। মনে মনে এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি পরীক্ষা স্থরু করলেন। ওঃ সে যেন এক অসাধ্য সাধনের গল্প! জীবাণু-ত শুধু ক্ষুদে নয়, শয়তানও। তাদের ধরা কি চারটিখানি কথা? পাস্তুরের কপালে কত ব্যার্থতা এলো, এলো কত উপহাস। কিন্তু ধৈর্য হারাবার ছেলে তিনি ছিলেন না, ছিলেন না দমবার পাত্র। বাজে লোকে ফ্যা ফ্যা করুক, তাতে কীই বা আসে যায়? কিন্তু ক্ষুদে শয়তানদের কিছুতে ছাড়া হবে না। মনে মনে যেন এই প্রতীজ্ঞা করে পাস্তুর কাজ থেকে এক পাও নড়লেন না। তারপর একদিন সত্যিই তিনি সফল্ল হলেন, একদিন সত্যিই সমস্ত পৃথিবী চমকে শুনল তাঁর দুঃসাহসিক আবিষ্কারের কথা। তখন দুনিয়াময় হৈচৈ পড়ে গেল।"

জগু বল্লে, "সেই যাঁর জীবন নিয়ে একটা সিনেমা হয়েছিলো সেই লুই পাস্তুর নাকি?"

"হুঁ, সেই লুই পাস্তুর," ভদ্রলোক বল্লেন, "তা হলেই বোঝ, দুনিয়াময় কী হৈচৈটাই পড়েছিল তাঁকে নিয়ে!"

পান্না বল্লে, "হৈচৈ ত বুঝলুম। কিন্তু ভদ্দরলোক আবিষ্কার কী করলেন, কেমন করেই বা করলেন, তা কিছু বলছেন না ত!"

"বলছি", ভদ্রলোক বল্লেন, "কিন্তু সব কথা বলতে গেলে রাত কাবার করতে হবে, হয়ত রাত কাবার করেও বলা যাবে না। তিনি আবিষ্কার করেছেন যে এ সব রোগ-ভোগের কারণ হল শয়তান বীজাণু। কী ভাবে যে আবিষ্কার করেছেন তার একটা শুধু উদাহরণ দিতে পারি।

"ধরো, ছাগলটাগলের সেই বিধঘুটে ফোড়ার কথাই। এ ফোড়া হলে জানোয়ারগুলো আগে সটান স্বর্গে যেত, কোন চিকিৎসা সম্ভব হত না। তখন ফ্রান্সে প্রথা ছিল ছাগল এ্যান্থ্রেক্সে ভুগে স্বর্গে গেলে পর তার মৃতদেহটা মাঠে কবর দেওয়া হত। এবং দেখা যেত, কিছুদিন পরে মাঠের সেই জায়গাতেই ছাগলগুলোর ওই রোগ স্থরু হয়েছে এবং ব্যাব্যা করতে করতে তারা শিঙে ফুঁকছে। পাস্তুর করলেন কি, ছাগলের কবর থেকে খানিকটা মাটি তুলে অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলেন তার মধ্যে এক রকম জীবাণু থেকেই রোগটা জন্মায়। পরীক্ষা পাকা করবার আশায় পাস্তুর আটটা আস্ত পাঁঠা জোগাড় করলেন, চারটেকে বাঁধলেন কবর-দেওয়া জমির ওপোর, আর চারটেকে বেশ খানিকটা তফাতে। কবরখানার ওপোরে বাঁধা ছাগলগুলোকে আর বেশীদিন ভবলীলা করতে হল না; এদিকে দূরে বাঁধা ছাগলগুলো দিব্বি নিশ্চিন্দি মনে ঘাস খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে লাগল, মরবার নামগন্ধ নেই।"

ঘোঁতন অবাক হয়ে বল্লে, "বারে। বেড়ে পরীক্ষা ত!"

[ক্রমশ]

হালদারের হা-হুতাশ: পরিমল রায়

হীরালাল হালদার!
আজ বাকী, কাল ধার,
এই ক'রে দিন ত'ার
চ'লে যায়, চিন্তার
মনে কভু নেই লেশ,
ঘরে টাকা যেই শেষ,
অম্‌নি সে লোন্ নেয়,
সেটা নহে অন্যায়।
ধার-বাকী স'বার-ই
কিছু-কিছু হ'বার-ই,
কানা-ঘুঁষো তা' নিয়ে
মিছে কথা বানিয়ে
বলে, জানি অনেকে,
কিন্তু তা' শোনে কে?

হালদার হীরালাল!
আগে ছিল কিবা হাল,
বাপ তার ম'লো যেই
গোল স্থরু হ'লো সেই,
ক্ষেত ভরে' চাষ হ'লে
স্থদেতে ও আসলে
ছিল তা'র বহু আয়,
কথাটাকে কভু হায়,
যত চাল-ই চালো না,
ওড়ানোটা ভালো না,

কবে ক'র কী যে হয়
কথাটা তো মিছে নয়,
টাকাকড়ি হাতে তাই
কিছু কিছু সাথে চাই।
সেই টাকা নাই যা'র,
হো'ক না সে কাইজার,
কেবা তা'কে মানবে ?
সে-ব্যাটাকে জানবে ?
ক'টা লোক দুনিয়ার
বাদে আমি তুমি আর ?

হালদার হীরু, হায়,
তাই আজ নিরুপায়,
ছেলে দু'টি বিলেতে
ভোগে সেথা পিলেতে,
মেম -বৌ তাছাড়া
বিয়ে করে' বাছারা,
করে' কত বাখানাই
জানিয়েছে টাকা নাই।
বিয়ে নেই মেয়েটার
ভার নেবে কে এটার
বদ্‌খৎ বেয়াড়া
যে রকম চেহারা !
বিবাহের বাজারে
কুলোবে দু' হাজারে
মনে নাহি লয় সে
মনে মনে কয় সে।

গিন্নির গয়না
দু' গাছায় হয় না,
যত সব বাজে চাল,
হীরালাল নাজে হাল,
ধারে-কেনা জিনিসে
তাই এত ঋণী সে।

নয় তো হে ডাকাত ও
চাই তার টাকা তো,
তাই নেয় টাকা ধার
ধার দেয় কাকা তা'র,
তা'রে বল অন্যায়,
সেটা, বাপু, কোন্ ন্যায় ?

<u>পদীপিসির বর্মি বাক্স</u> : লীলা মজুমদার

[পূর্বানুবৃত্তি] পুরোণ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে, হাতে মোমবাতি নিয়ে, দিদিমার সঙ্গে সঙ্গে দোতলায় বিশাল এক শোবার ঘরে শুতে গেলাম। কত রকম কারুকার্য্য করা, ভীষণ প্রকাণ্ড আর ভীষণ উঁচু এক খাটে শু'লাম। সেটা এমনি উঁচু যে সত্যিকারের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তা'তে উঠলাম। খাটের উপর আবার দু'তিনটে বিশাল বিশাল পাশ-বালিশ। আর খাটের নীচে মস্ত মস্ত কাঁসা পেতলের কল্‌সিটল্‌সি কি সব দেখতে পেলাম। দিদিমা একটা রঙচঙে জলচৌকির উপর মোমবাতিটা নামিয়ে রেখে, আমাকে বেশ ভালো করে ঢাকা দিয়ে, মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লেন, "আজ টপ্ ক'রে ঘুমিয়ে পড়তো মাণিক। আমি খেয়ে এসে তোমার পাশে শোব। কাল তোমাকে পদীপিসির বর্মিবাক্সর গল্প বলব। একা শুয়ে থাকতে ভয় পাবে না ত' ?" পদীপিসির নাম শুনে আমার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগলো। মুখে বল্লাম, "আলোটা রেখে যাও, তাহ'লে কিচ্ছু ভয় পাব না।" দিদিমা আদর ক'রে চলে গেলেন। পাঁচুমামা কেন বল্ল স্পাই নং ওয়ান !

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, যখন ঘুম ভাঙলো দেখি ভোর হ'য়ে গেছে। দিদিমা কখন উঠে গেছেন। আমিও খচ্‌মচ্ ক'রে খাট থেকে নেমে আস্তে আস্তে গিয়ে ঘরের সাম্‌নের বারাণ্ডায় দাঁড়ালাম। দেখি ফুলবাগান থেকে, আর তার পেছনে আম বাগান থেকে কুয়াশা উঠছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সেইজন্যেই হোক কিম্বা আম গাছতলায় যা' দেখলাম সেইজন্যই হোক আমার সারা গা শির শির ক'রে উঠলো। দেখলাম ছাই রঙের পেন্টেলুন আর ছাই রঙের গলাবন্ধ কোট পরে, মুখে মাথায়

কম্ফটার জড়িয়ে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক চোঁখে বাইনকুলার লাগিয়ে একদৃষ্টে বাড়ীর দিকে চেয়ে রয়েছেন। তাই না দেখে আমার টন্‌সিল ফুলে কলাগাছ।

এমনি সময় সুট্ ক'রে সে আমগাছের ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেলো আর ভোর বেলাকার প্রথম সূর্য্যের আলো এসে বাগান ভ'রে দিলো। ফিরে দেখি আমার পাশে লালনীল ছক্‌কাটা লুঙ্গী আর সবুজ কম্বলের ড্রেসিং গাউন পরে আম কাঠির দাঁতন চেবাতে চেবাতে সেজ্ দাদামশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সেজ্ দাদামশাই বল্লেন, জানিস্, "এই বারাণ্ডাটাতে আমার ছোটকাকা কত কি করিয়েছিলেন! বিলেত থেকে ছোটকাকা ভীষণ সাহেব হ'য়ে ফিরলেন। ঘাড় ছাঁট চুল, কোটপ্যাণ্ট পরা, হাতে ছড়ি, মুখে চুরুট্, কথায় কথায় খারাপ কথা। এসেই বল্লেন 'আমি মেম আন্‌ব, বিলেতে সব ঠিক করে রেখে এসেছি। এই দোতলার উপর শোবার ঘরের সঙ্গে লাগা এক বাথ্‌রুম বানাব, লম্বা বারাণ্ডাটা ত' আছেই, তার এক কোন দিয়ে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বানাব। সাদা পাগ্‌ড়ি মাথায় দিয়ে ঐ সিঁড়ি বেয়ে জমাদার ওঠা নামা করবে। নইলে মেম আসবে না বলেছে।' তাই না শুনে আমার ঠাকুমা পিসিমা আর জেঠিমারা হাত পা ছুঁড়ে বল্লেন, 'অমা! সে কি কথা গো! মেমদের যে লালচুল, কটা চোখ, ফ্যাক্‌সা রং আর মড়া-খেকো ফিগার হয়। কি যে বলিস্ তার ঠিক নেই, মেমরা যে ইয়েটিয়ে পর্য্যন্ত খায় শুনেছি!' ছোটকাকা বিরক্তমুখ ক'রে বল্লেন, 'অবিশ্যি তোমরা যদি চাও যে আমি সন্নিসী হই, তা' হলে আমার আর কিছু বল্‌বার নেই। বল তো নাগা সন্নিসীই হই, মেমেও দরকার নেই, নতুন সুট্‌গুলোকেও দরকার নেই!' তাই শুনে ঠাকুমারা সবাই আরও চ্যাঁচামেচি সুরু করে দিলেন। কিন্তু ভয়ে ঠাকুর্দার কানে কেউ কথাটাই তুল্‌লে না। ছোটকাকাও সেই সুযোগে মিস্ত্রী লাগিয়ে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি তৈরী করিয়ে ফেল্লেন। ঐখানে রেলিং কেটে সিঁড়ি বসানো হয়েছিলো। দোতলা থেকে ছাদে ওঠবার কাঠের সিঁড়ি একটা ছিলোই, বাঁদর তাড়াবার জন্যে, তারই ঠিক নীচে দিয়ে নতুন সিঁড়ি হ'ল। এখন খালি বাথ্‌রুম বানানো আর জমাদারের পাগড়ী কেনা বাকী রইল। ঠাকুরদার কাছে কি ধরণের মিথ্যে কথা ব'লে টাকা বাগানো যায় দিনরাত ছোটকাকা সেই চিন্তাই করতে লাগ্‌লেন। এদিকে পাড়ার চোররাও সুবিধে পেয়ে রোজ রাত্রে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে সুরু করে দিলো। তাদের জ্বালায় ঘুমোয় কার সাধ্যি! শেষটা একদিন ঠাকুরদার ঘুম ভেঙে গেলো, গদা হাতে ক'রে বারাণ্ডায় বেরিয়ে এলেন, চোররাও সিঁড়ি দিয়ে ধপ্ ধপ্ নেমে বাগানের মধ্যে দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিলো। চাঁদের আলোয় ঠাকুরদা অবাক্ হ'য়ে সিঁড়ির দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে আবার শু'তে গেলেন। পরদিন সকালে উঠেই মিস্ত্রী ডাকিয়ে ঐ সিঁড়ি খুলিয়ে ফেল্‌লেন। রাগের চোটে ছাদে ওঠবার কাঠের সিঁড়িটা অবধি খুলিয়ে দিলেন। কাটা রেলিং ফের জোড়া দেওয়ালেন। আর ছোটকাকাকে ডেকে বল্লেন, 'পানুর ছোট মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করেছি। টোপর পরে প্রস্তুত হও!' শেষটা ঐ পানুর ফর্সা মোটা গোলচোখো বারো বছরের মেয়ের সঙ্গে ছোটকাকার বিয়ে হয়ে গেলো। এবং বিশ্বাস করবে কি না জানি না, তারা সারাজীবন পরম সুখেকাটালো। পাঁচুটা তো ওঁরই নাতি। এই রে ঘনশ্যাম আবার আমার ঈশপগুল নিয়ে আস্‌ছে। বলিস্ যে আমি বেরিয়ে গেছি।"

বলেই সেজ দাদামশাই হাওয়া!

আমি তাকিয়ে দেখলাম ছাদ পর্য্যন্ত বাঁদর তাড়াবার সিঁড়ির খাঁজগুলো দেওয়ালের গায়ে কাটা কাটা তখনও রয়েছে।

সব পুরণো বাড়ীর মতন মামাবাড়ীর ঘরগুলো বিশাল বিশাল, সিঁড়িগুলো মস্ত মস্ত, বারাণ্ডাগুলোর এ মাথা থেকে ডাক্‌লে ও মাথা থেকে শোনা যায় না। আর দুপুরে সমস্ত বাড়ীখানা অদ্ভুত চুপচাপ হ'য়ে গেলো। পাঁচুমামার টিকিটি সকাল থেকে দেখা যায় নি। নেহাৎ আমার সঙ্গে এক ট্রেনে এসেছিলো নইলে ও যে জন্মেছে তারই কোনও প্রমাণ পাওয়া গেলো না। বাড়ী শুদ্ধ কেউ ওর নাম করলো না। দুপুরে পদীপিসির বর্মিবাক্সর সন্ধান নিচ্ছি এমন সময় কানে এলো খুব একটা হাসি গপ্পের আওয়াজ! [ক্রমশ]

চায়ের পেয়ালায় তুফান : শ্রীশামুক

শীতের সকাল। আরম-চেয়ারে পা গুটিয়ে শাল মুড়ি দিয়ে বসে জেঠামশাই। দু'চোখ বন্ধ। আমরা নানান জায়গায় নানান ভঙ্গিতে বসে চা খাচ্ছি। জেঠামশায়ের চা তখন এসে পৌঁছয়নি। এই চা খাবার সময়টুকু ভালয় ভালয় উতরলে দিন ভাল, নইলে রক্ষে নেই। আগে মেজাজ খারাপ হত কম এবং হলেও রেহাই ছিল, —সারাদিন কাজে বাইরে থাকতেন, ফিরতেন রাত করে। আজকাল পেনসন নিয়েছেন সুতরাং ধাক্কাটি ঘরে ঘরে ভাগ করে নিতে হয়! সকলেই সজাগ ও শংকিত হয়ে বসে আছি, নতুন চাকর ওনার চা আনছে সব শেষে দেরী করে। একবার হঠাৎ চোখ খুলে সোজা উঠে বসলেই গেছি আর কি!

কলকাতায় এখন চাকরের কথা না বলাই ভাল। সকালে চা দিয়ে গেল কেষ্ট, বিকেলে চা হাতে দেখি নতুন লোক গোবিন্দ, পরের দিন গদাধর, তারপর গোপাল-মুরারী-মুকুন্দ—শেষ নেই! একটি মাসে শ্রীকৃষ্ণের শতনাম মুখস্থ না হয়ে যায় না! চাকর চা এনে ডাকে, বাবু। জেঠামশায়ের একটি চোখ খুলে যায়। চায়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, চা না দুধের পায়েস?

—আজ্ঞে না।

—চোপ্! ধোঁয়া উঠছে কই, গরম নেই!—গলা চড়েছে।

চাকরটি নতুন মানুষ, সম্ভব গ্রাম থেকে শহরে এসেছে এই প্রথম। ধাঁ করে আঙুল ডুবিয়ে বলে, খুব গরম বাবু!

বাস্। চায়ের পেয়ালা চাকরের কান ঘেঁসে ছুটে বেরিয়ে গেল, পেয়ালার পিছনে চাকর, চাকরের পিছনে হাওয়ার পিছনে ছোটে পিরিচ! আমরাও নাকের সামনে যে যে দরজা পেলাম—চা ফেলে, চটিজুতো ফেলে, গায়ের র‍্যাপার ফেলে, কেবল প্রাণটুকু সঙ্গে নিয়ে। ও সমস্ত জিনিষ হারালে ফিরে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাণ? একবার গেলে আর হয় না। বড়দা মোটা মানুষ, তার মাত্র আধ পেয়ালা পেটে গেছে। ঝুঁকে পড়ে ও হাত আড়াল করে শরীর ও চা দুটোকেই একসঙ্গে বাঁচিয়ে এগিয়ে আসে, যেন প্রবল তুফানের বেগে প্রিদিম নিয়ে চলেছে! তারপর? তারপর এক মাইলের ভিতর সমস্ত প্রতি-বাসীরা শোনে যেন হিট্লারের গমকে গমকে বক্তৃতা, কেবল মধ্যে মধ্যে বিপুল হর্ষধ্বনি ও হাততালি বাদ পড়ল। সে আওয়াজ ও ভাষা শুনলে গান্ধীজীর অহিংস শরীরেও হিংসা জেগে উঠত নিশ্চয়!

আশ্চর্য! ঐ রাগারাগির পরই কিন্তু জেঠামশাই ঝিমিয়ে একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। কথা বলেন অল্প, চুপ করে বসে থাকেন, আর চা দিতে গেলে বলে ওঠেন, না না থাক দরকার নেই। এত ভালবাসতেন আর এ-কী ভয়ানক বিতৃষ্ণা! রাগী মানুষের অমন ঠাণ্ডা ভাবও ভাল লাগে না, ভয় হয় সব সময়েই। যেন এক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরী, কখন ফাটবে ঠিক নেই। সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকা যায় না, আবার প্রস্তুত না হয়েও উপায় নেই। এদিকে ঠাকুমা কেঁদেকেটে ভাসান—আমার অনন্তর পেন্সেন নিয়ে একী হ'ল, এতে শরীর টিকবে কেমন করে?

বুড়োমানুষের কান্না চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না। সকলে মিলে ঠিক করি যেমন করেই হোক জেঠামশাইকে আবার চা ধরাতে হবে। মেজপিসি গঙ্গা-জলে তুলসীপাতা দিয়ে বিশুদ্ধ হিন্দু চা তৈরি করে আনেন পাথর বাটিতে, একটি চুমুক—উহুঁ! এরপর কত সাধ্য-সাধনা, কত রকমের চা। খাস্ হিমালয়ের পিকো—চিনি কম দুধ বেশী, আবার দুধ কম চিনি বেশী—উহুঁ! নীলগিরির সোনার রঙের সুগন্ধী চা, কাশ্মীরের সবুজ চা, চীনের কালো তেতো কড়া চা, তিব্বতের খাস ইট চা চর্বি মিশিয়ে, এমনকি গুজরাটি ধরণের তৈরী চা—দুধ-চিনি-চা-মাথাঘসাগরম মসলা সব একসঙ্গে ফুটিয়ে! কিছুতেই কিছু নয়। এক এক চুমুক খান আর উহুঁ, মুখ এমন করেন যেন মুসোলিনীর ভীষণ কান্না পেয়েছে! কত বার ত মুখের চা'টুকু তখুনি ফিরে আসে সামনে যে দাঁড়ায় তার গায়ের উপরই। অদ্ভুত অরুচি চায়ের উপর। আমরা হাল ছেড়ে দি ভাগ্যের উপর, যা হবে হবে।

আমি চীনা কন্‌সালে চাকরি করি। কন্‌সাল মিষ্টার

চিয়াং অতি ভদ্র ও অমায়িক মানুষ। প্রতিদিন তিনটের সময় আমাদের সঙ্গে চা খান ও গল্প করেন। কতবার আমাদের বাড়িতেও এসেছেন। একদিন চা খেতে খেতে হঠাৎ জেঠামশায়ের কথা মনে হতে ফিক্ করে হেসে ফেললাম। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলি এই ব্যাপার! চিয়াং ছোট চোখ কুঁচকে মিটিমিটি হাসেন ও ভাবেন। দু'পাশের মাত্র তিন তিন গাছা গোঁফ চুমরোন, দাড়ির পাঁচ গাছায় আলতো হাত বুলোন। বলেন, এর মীমাংসা আমি করে দেব। এই রবিবার ভোরে তোমাদের বাড়ি আসছি, তুমি একটি মুখ ঢাকা ঘটি ও হাত তিরিশেক দড়ির জোগাড় রেখো।

আমাদের বাড়ি শহরের একপ্রান্তে। রবিবারে চিয়াং এসে হাজির, হাতে এক প্যাকেট চা। বলেন, এ আসল হিমালয়ের গাছের উপরের চারটি পাতার চা, মেঘহীন তাজা নীল আকাশের তিনটি সোনালী রোদে শুকোনো। চলুন এবারে জল আনতে যাই।

—জল? বাড়িতে ত কত জল আছে?

—আরে রাখুন, শহরের কলের জলে কি ভাল চা তৈরি হয়? আমরা চীন দেশের মানুষ, চায়েতেই আমাদের সভ্যতা। চা তৈরি শিখতে পুরো তিন বছর লাগে, পরিবেষণে আরো এক বছর। আমার নিয়মে একবার চা খেয়ে দেখুন, তারপর বলবেন।

জেঠামশাই চিয়াংএর সঙ্গে দড়ি ও ঘটি নিয়ে বেরিয়ে যান। আমাদের বাড়ির উত্তর দিকে বিহারীবাবুদের বাগানে একটি পাথরে বাঁধান কূয়ো আছে। যেতে আসতে এক ঘণ্টার পথ। চিয়াংএর জানা ছিল। সেখানে পৌঁছে জেঠামশাই নির্দেশমত আস্তে আস্তে জল তুলে নেন এবং সাবধানে ঘটি বুকে চেপে ধরে বাড়ি ফিরে আসেন। জলে বেশী ঝাঁকুনি লাগবে না, তাহলেই গেল সব। যখন ফিরে এলেন এই শীতকালেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে পরিশ্রমে। পায়রার পালকের মতো সাদা কাপ ডিস এল, বাটির মতন থ্যাবড়া। টিমে আঁচে জল যেই গান গাওয়া শেষ করে ফুটে উঠেছে তখুনি তাড়াতাড়ি চা ফেলে দেওয়া হল। ঘড়ি দেখে ঠিক তিন মিনিট সতেরো সেকেণ্ড বাদে ছেঁকে নিয়ে এক বল্‌কা সর-না-পড়া দুধ মেশানো ও মোটাদানা চিনি—বাস্। আস্তে আস্তে চামচ দিয়ে নাড়া, চায়ের পেয়ালায় জলতরঙ্গ বাজবে না! এক চুমুক খেয়ে জেঠামশাই শব্দ করেন, আঃ! দু'চুমুক নিয়ে চোখ বুজে ধীরে ধীরে গলা দিয়ে নামিয়ে দেন। মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বলেন, ওঃ সুন্দর! খুসিতে চিয়াংএর বাঁকা চোখ আরো বেঁকে বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর থেকে জেঠামশাই দুবেলা নিজে গিয়ে জল নিয়ে আসেন ও নিজে চা তৈরি করে খান। আমরা কাছে থাকলে এক-আধ পেয়ালা ভাগও দেন। মন মেজাজ এক্কেবারে খুশ্, সরিফ্!

একদিন চিয়াংকে আপিসে জিজ্ঞাসা করলাম এমন পরিবর্তনের আসল কারণ কী? দাড়ির পাঁচ গাছায় আলতো হাত বুলিয়ে ধীরে ধীরে উত্তর দেন, পরিশ্রমের পুরস্কার আনন্দ!

দেখলাম চীনারা কম কথা বলেন কিন্তু খাঁটি কথা বলেন। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে পূবদিকে নমস্কার করলাম চীনদেশকে ও তাঁর জ্ঞানী দরদী মানুষদের।

চলন্তিকা

জোহানেসবুর্গ থেকে হালে একটি অদ্ভুত খবর জানা গেছে। খবরটি পড়লেই বুঝবে সেটি যে-কোনো ডিটেকটিভ গল্পের চেয়েও বেশি রোমাঞ্চকর। সেখানে উড়োজাহাজ চালাতে শেখবার একটি মাঠ আছে। অল্পদিনের ব্যবধানে একটির পর একটি করে মোট ছ-টি উড়োজাহাজ সেই মাঠের উপর আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেলো। এই দুর্ঘটনার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কুচক্রী লোকের সাংঘাতিক একটা চক্রান্ত জড়িত আছে—এই কথাই সবাই সন্দেহ করলো এবং অপরাধীকে ধরবার জন্যে জোর তদন্ত চললো। কিন্তু কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলো না। কেবল একটিমাত্র বিধ্বস্ত উড়োজাহাজের গায়ে কম্যাণ্ডিং অফিসারকে গালাগালি করে কিছু খড়ির লেখা আবিষ্কৃত হোলো। হাতের লেখার বিশেষজ্ঞ'রা বললেন সেই খড়ির লেখার সঙ্গে মাইকেল শ্যাঙ্কস্ নামে এক আইরিশ উড়োজাহাজ

চালকের হাতের লেখা মিলে যাচ্ছে। শ্বাস্কসকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করা হোলো। কোর্টমার্শালের বিচারে জানা গেলো যে এআরোপ্লেনগুলি যখন মাটিতে থাকতো সেই সময় কেউ পচা পাতা তাদের ইঞ্জিনের মধ্যে রেখে দিতো। খানিক ওড়বার পর সেই পাতাগুলো ইঞ্জিনের কলকব্জার সঙ্গে আটকে যেতো, ফলে ইঞ্জিনগুলো কাজ করতে পারতো না। এইভাবেই ছ-টি এআরোপ্লেন মাটিতে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়েছিলো। বিচারকদের মধ্যে একজনের শখ ছিলো গাছগাছড়ার খবর জানা। তিনি কিন্তু সন্দেহ করলেন এই দুর্ঘটনার কারণ অন্য। 'কেপ এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে'র ডাঃ সিড্‌নি এইচ্ স্কেফকে ডাকা হোলো এ-বিষয়ে আবার তদন্ত করার জন্যে। ডাঃ স্কেফ তদন্তে এসে প্রথমেই লক্ষ্য করলেন যে প্রত্যেকটা পাতাই গোল-গোল করে কাটা আর তাদের আয়তন এক-একটি হাফ-পেনির মতো। দেখেই তাঁর সন্দেহ হোলো: এগুলো মৌমাছির কাণ্ড নয় তো? আরো ভালো করে অনুসন্ধান করার পর দেখা গেলো উড়োজাহাজের সেই মাঠের এক সারি ডালিয়া ফুলগাছের পাতায় ঠিক হাফ-পেনির মতো গোল-গোল গর্ত রয়েছে। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে জানা গেলো উড়োজাহাজের ইঞ্জিনের মধ্যেকার পাতার সঙ্গে এই ডালিয়াগাছের পাতাগুলির কোনো তফাৎ নেই। অপরাধীকে সত্যিই তখন ধরা সম্ভব হোলো। তারা মানুষ নয়, এক-একটি ছোট্ট-ছোট্ট মৌমাছি—সেই ডালিয়াগাছ থেকে পাতার টুকরো সযত্নে কেটে তারা উড়োজাহাজের ইঞ্জিনের মধ্যে নিয়ে যায় বাসা বানাবার জন্যে! ডাঃ স্কেফের আবিষ্কারের ফলে শ্বাস্কস্ মুক্তি পেয়েছে। নইলে তার মৃত্যুদণ্ড যে হোতো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

* * *

শিশুসাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে কলকাতার কমার্শিয়াল মিউজামে শিশুশিল্প-প্রদর্শনী সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রদর্শনীতে ছোটদের তৈরি নানারকমের জিনিস দেখানো হয়েছিলো। তা'ছাড়া প্রদর্শনীর দীর্ঘ ন'দিন ধরে প্রত্যহ নানাধরণের বক্তৃতা, আবৃত্তি, গান, ম্যাজিক ও ম্যাজিক-লণ্ঠনের আয়োজন করা হয়েছিলো। প্রদর্শনীর শেষে শিল্পীদের নানারকম পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তোমাদের মধ্যে যারা কলকাতায় থাকো নিশ্চয়ই প্রদর্শনীতে এসেছিলে। আগামী বছরে যাতে আরো ভালো করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় এখন থেকেই সে-বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে।

নতুন ধাঁধাঁ:

একটা ছোট্ট দ্বীপ। সেখানে শুধু দু-ধরণের লোক থাকে: এক হোলো গুহার লোক, আর এক হোলো গাছের লোক। গুহার লোকরা শুধু সত্যি কথা বলে, মিথ্যে বলতে পারেই না। গাছের লোকরা মিথ্যেই বলে, সত্যি বলতে পারেই না। একজন আগন্তুক এসে দেখেন সেই দ্বীপের তিনটি লোক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। আগন্তুক প্রথম লোককে প্রশ্ন করলেন সে গাছের লোক না গুহার লোক? প্রথম লোক বিড়বিড় করে কী যে বললো আগন্তুক ভালো করে সে-কথা শুনতেই পেলেন না। দ্বিতীয় লোককে তখন আগন্তুক প্রশ্ন করলেন যে প্রথম লোক কী বললো? উত্তরে দ্বিতীয় লোকটি বললো প্রথম লোক বলেছে যে সে গুহার লোক। আগন্তুক তখন তৃতীয় লোকটিকেও একই প্রশ্ন করলেন। উত্তরে তৃতীয় লোক বললো যে প্রথম লোক বলেছে যে সে গাছের লোক। বল[illegible] দিকিনি, দ্বিতীয় লোক ও তৃতীয় লোকের মধ্যে কে গাছের লোক, কে গুহার লোক?

মাঘ মাসের ধাঁধাঁর উত্তর

(১) গেলাসে, গেলা সে (২) গণনা, গণো না
(৩) দোয়াতে, দোয়া-তে (৪) ধারাপাত, ধারা-পাত
(৫) শালী সে, সালিশে (৬) বিকালে, বিকালে
(৭) নাম তায়, নামতায়

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.

রংমশাল
[নবম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : চৈত্র, ১৩৫১]
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত
৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

নইলে: অজিত দত্ত

প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির?
ঝুলে কি থাক্‌তে পারো সুস্থির?
নইলে
রইলে
ট্রাম না চড়ে'
ভ্যাবাচাকা রাস্তায় পড়ে' বেঘোরে।

প্র্যাক্‌টিস্ করেছো কি দৌড়ে?
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আর ভোঁ-উড়ে?
নইলে
রইলে
লরীতে চাপা,
তাড়া করে' বাড়ি থেকে বাড়িয়ো না পা।

দাঁত আছে মজ্‌বুত সব বেশ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস?
নইলে
রইলে
ভাত না খেয়ে,
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

স্থির করে' পা দুটো ও মনটা
দাঁড়াতে পারো তো বারো ঘণ্টা?
নইলে
রইলে
না কিনে ধুতি,
যতোই দোকানে গিয়ে করো কাকুতি।

পরের দিন বড়দিন: এডালবার্ট স্টিফ্‌টার

"তোদের মা'র জন্যে এক প্যাকেট ভালো ভাজা কফি দিলুম। ফ্লাস্কের মধ্যে ভরা রইলো এক রকম কালো কফি। ছিপিটা ভালো করে এঁটে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। ওখানকার চেয়ে অনেক ভালো এই কফিটা। একটু চেখে দেখলেই সে বুঝবে। রীতিমতো ভালো ওষুধের মতো কাজ করে। এতো কড়া যে ছোট্ট এক চুমুক খেলেই সমস্ত ভেতরটা একেবারে গরম হয়ে ওঠে। এক চুমুকে শীতকালের সবচেয়ে ঠাণ্ডা দিনেও শীত করে না। থলির মধ্যে আরো অন্য সব ছোটো-ছোটো বাক্স আর কাগজের মোড়ক রইলো। যত্ন করে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাবি।"

আরো কিছুক্ষণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করে দিদিমা বললো এইবার যাওয়াই ভালো। "দেখিস্ সান্না, তোর যেন ঠাণ্ডা না লাগে। জোরে হেঁটে ঘেমে ওঠার চেষ্টা করবি না। আর মাঠে আর গাছের তলা দিয়ে খবর্দার ছুটবি না। সন্ধের দিকে যদি হঠাৎ বাতাস বইতে সুরু করে তা হলে আরো ধীরে-ধীরে হাঁটবি। তোদের বাবা-মাকে আমার ভালোবাসা জানাস। বড়দিনটা তাদের যেন চমৎকার কাটে এই আমি কামনা করি।"

ছেলেমেয়েদের গালে চুমু খেয়ে দিদিমা তাদের সঙ্গে বাইরে পর্যন্ত এলো। সঙ্গে করে বাগানের ভিতর দিয়ে গিয়ে খিড়কির সেই গেট পর্যন্ত পৌছে দিলো তারপর গেটটা বন্ধ করে বাড়ির মধ্যে গেলো ফিরে।

পাহাড়ের ঢালু জায়গাটার ছড়ানো গাছ আর ছোটো-ছোটো ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে উপরে ওঠবার সময় আকাশ দিয়ে একটি-একটি করে খুব ধীরে-ধীরে তুষার-ফুল ঝরতে লাগলো।

কন্‌রাড বললো, "যা ভেবেছিলুম, সান্না! বরাবরই মনে হয়েছে আজ আমরা তুষারবৃষ্টি দেখতে পাবো। মনে

পড়ছে তো যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম তখনো সূর্যটা দেখা যাচ্ছিলো টুকটুকে লাল ; এখন দ্যাখ তার কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই। গাছের আগায় শুধু ধূসর কুয়াশা রয়েছে। আর তার মানেই হচ্ছে তুষার পড়বে।"

তারা মহা ফুর্তিতে এগিয়ে চললো। একটি পড়ন্ত তুষার-ফুলকে তার জামার কালো হাতার উপর ধরতে পেরে সান্না তো দারুণ খুসি হয়ে উঠলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার জামার হাতার উপর সেটি গলে গেলো না। এইভাবে তারা মিলস্‌ডর্ফ এলাকার সবচেয়ে উঁচু জায়গাটায় পৌঁছলো। এখান থেকে নেক্‌-এর অন্ধকার-অন্ধকার ফার্‌ গাছগুলোর দিকে পথটা চলে গেছে। তারা লক্ষ্য করলো দেয়ালের মতো নিবিড় অরণ্যের গায়ে ইতিমধ্যেই চমৎকার তুষার পড়েছে! এইবার বেশ ঘনঘন তুষার পড়ছে। ছেলেমেয়েরা ততক্ষণে ঘন অরণ্যের মধ্যে ঢুকেছে। এখান থেকে বাকি পথটার প্রায় সমস্তটাই বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে।

অরণ্যের সুরু থেকে লাল স্মৃতিস্তম্ভ পর্যন্ত সমস্তটা পথ চড়াই উঠতে হয়। স্মৃতিস্তম্ভ থেকে পথটি নেমেছে জিশ্‌চেডের উপত্যকায়—এ-কথাতো আগেই বলেছি। মিলস্‌ডর্ফের দিকে জঙ্গলটা এতো খাড়াই যে সোজাসুজি পথটা উপরে উঠতে পারেনি—পূব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পূবে এইভাবে ক্রমাগত এঁকেবেঁকে উঠেছে। স্মৃতিস্তম্ভ থেকে জিশ্‌চেডের মাঠ পর্যন্ত গোটা পথটাই আবার ঘন জঙ্গলে ভরা—উঁচু-উঁচু ঘেঁষাঘেঁষি গাছ, কোথাও এতোটুকু জায়গা ফাঁক নেই। যতক্ষণ না উপত্যকার সমতল জায়গাটায় পৌঁছনো যায় ততক্ষণ পর্যন্ত গাছগুলো একটুও ফাঁক-ফাঁক হয়নি। তাই জঙ্গল থেকে খোলা মাঠের মধ্যে পড়লে একেবারে সামনে দেখা যায় জিশ্‌চেডের উপত্যকাটিকে।

নেক্‌-টা দুটি বিরাট পাহাড়ের চূড়োকে যোগ করেছে। তাদের তুলনায় সেটা নেহাৎই ছোটো। কিন্তু আসলে কোনো সমতল জায়গায় পুঁতলে তাকে রীতিমতো এক বড় দরের পাহাড় বলে মনে হবে।

অরণ্যের মধ্যে এসে তাদের প্রথম নজরে পড়লো মাটির চেহারাটা কি রকম যেন ধূসর হয়ে গেছে। যেন তার উপর আটা ছড়ানো হয়েছে। পথের ধারে আর গাছের ফাঁকে-ফাঁকে ঘাসের শুকনো শীর্ণ চূড়োগুলোয় তুষার জড়িয়ে রয়েছে আর হাতের মতো লম্বা নানা ফার-গাছের সবুজ ডালগুলোও ইতিমধ্যে তুষারে ঢেকে গেছে, যেন তাদের উপর আগুনের শাদা শিখা জ্বলে উঠেছে।

"আমাদের বাড়িতে মা-বাবার কাছেও বরফ পড়েছে নাকি দাদা?" সান্না প্রশ্ন করলো। "নিশ্চয়ই," উত্তরে বললো কনরাড। "ঠাণ্ডাটাও বাড়ছে দেখছিস! কাল দেখিস সমস্ত পুকুরটা একেবারে জমে গেছে।" "তাই নাকি!" সান্না বললো।

তার ভাই এবার জোরেজোরে পা চালিয়েছে। তার সঙ্গে হাঁটার জন্যে সান্না প্রায় ছুটতে আরম্ভ করলো। আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে রীতিমতো জোরেজোরে তারা এগিয়ে চললো, কখনো পশ্চিম থেকে পূবে কখনো পূব থেকে পশ্চিমে। তাদের দিদিমা যে বলেছিলো জোর বাতাস উঠবে, এখনো তার দেখা নেই। বরঞ্চ চারদিক এতো থমথমে যে একটি ডাল কিংবা পাতাও নড়ছে না। শীতকালে বনের মধ্যে বেশ গরম লাগে। তাদেরও মনে হোলো ঠাণ্ডাটা যেন কমেছে। ক্রমশ বেশি-বেশি তুষার পড়তে লগেলো। সমস্ত জমিটা এরই মধ্যে প্রায় শাদা হয়ে গেছে। সমস্ত বনের উপর কে যেন শাদা পাওডার ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের জামা-কাপড়-টুপিও তুষারে ভরে উঠলো।

ভারি মজা লাগলো তাদের। সেই নরম তুষার মাড়িয়ে তারা চললো। পা দিয়ে-দিয়ে তারা খুঁজতে লাগলো কোনখানটায় সবচেয়ে বেশি তুষার জমেছে তারপর পা ঘষে-ঘষে চললো, যেন জল ঠেলে চলেছে। জামাকাপড় থেকে তারা আর তুষার ঝেড়ে ফেললো না।

চারদিকটা কিন্তু ভারি চুপচাপ হয়ে গেছে। শীতকালে প্রায়ই বনের মধ্যে অনেক পাখী এদিক-ওদিক ওড়ে। আজ কিন্তু একটিও পাখীর সাড়াশব্দ নেই। আসবার সময় বরঞ্চ তারা পাখীর ডাক শুনেছিলো। ফেরার পথে কিন্তু একটি পাখীও তারা দেখতে পেলো না—না

গাছের ডালে, না উড়তে। সমস্ত বন থেকে যেন জীবনের চিহ্ন হঠাৎ মুছে গেছে। তাদের পিছনে শুধু নিজেদেরই পায়ের ছাপ, তাদের সামনে কেবল মসৃন তুষার; একটু আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত নেই। তাই দেখে মনে হয় আজকের দিনে তারা ছাড়া নেক-এর উপর দিয়ে আর কেউই যায়নি। দিক ঠিক রেখে তারা এগিয়ে চললো। কখনো গাছগুলোর কাছে এসে পড়ে, কখনো দূরে সরে যায়। যেখানে-যেখানে ঘন আগাছা ছিলো তাদের ডালপালার উপর তুষার ছড়িয়ে রয়েছে।

ক্রমশ আরো বেশি-বেশি তুষার পড়তে লাগলো। ফলে গভীর তুষারের জন্যে তাদের আর খোঁজাখুঁজি করতে হোলোনা, চারিদিকেই রাশিরাশি তুষার জমে উঠেছে আর জল ভেঙে যাবার মতো তুষার ঠেলে তারা চলেছে। ফলে ফুর্তিও তাদের বাড়তে লাগলো খুব। ইতিমধ্যেই এতো ঘন হয়ে তুষার ঝরছে যে নিজেদের জুতোর শুকতলার নীচে তারা নরম-নরম স্পর্শ পেতে লাগলো। এমন কি তাদের বুটজুতোর চারদিকে সেগুলো জমে লাগলো আটকে যেতে। সেই নির্জন নিস্তব্ধ অরণ্যের ছুঁচলো পাতার উপর তুষার বেঁধার শব্দ পর্যন্ত তারা যেন শুনতে পেলো।

সান্না প্রশ্ন করলো, "সেই থামটা আমরা কি দেখতে পাবো, দাদা? সেটা তো শুয়ে পড়েছে আর তার ওপর রাশিরাশি বরফ জমেছে। লালের বদলে থামটার রঙ নিশ্চয়ই এখন শাদা হয়ে গেছে।"

কনরাড জবাব দিলো, "তবু দেখতে আমরা পাবোই। তার ওপর যত বরফই পড়ুক না কেন আর সেটা শাদা হোক কি না-ই হোক, মাটির ওপর সেটা নজরে পড়বেই পড়বে। সেটা খুব মোটাসোটা আর তার ওপর লোহার একটা ক্রশ্‌ আটকানো আছে—ক্রস্‌টা তো উঁচিয়ে থাকবেই।"

"হ্যাঁ ভাই, তাই তো!"

ইতিমধ্যে তারা আরো খানিকটা এগিয়াছে আর এতো ঘন হয়ে তুষার পড়তে আরম্ভ করেছে যে খুব কাছের গাছগুলো ছাড়া আর কিছুই তারা দেখতে পাচ্ছে না।

জমা মাটি আর পথের চাকার দাগের শক্ত মাটির ঢেলাগুলোকে আর বোঝাই যায় না। তুষার-বৃষ্টির জন্যে সমস্ত পথটায় যেন একটা নরম জিনিস হয়ে পড়েছে। অরণ্যের ভিতর দিয়া একটি মসৃন রেখা চলে গেছে যেন। একমাত্র সেটা দেখেই বোঝা যায় এখানে পথ ছিলো। গাছের ডালে-ডালে তুষারের সুন্দর শাদা কম্বল যেন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছোট্ট-ছোট্ট পা দিয়ে তুষরের উপর গভীর দাগ এঁকে পথের মাঝখান দিয়ে তারা এখন চলেছে, হাঁটাও ক্রমশ কষ্টকর হয়ে উঠছে। ফলে ধীরে-ধীরে চলতে হচ্ছে। গলার ভিতর দিয়ে তুষার যাতে ভিতরে সেঁধুতে না পারে সে-জন্যে কনরাড কোটের কলার উল্টে দিলো। সান্নার দু-কাঁধের উপর দিয়ে তাদের মা শাল জড়িয়ে দিয়েছিলো। সেটাকে সামনের দিকে টেনে মাথার উপর ভালো করে কনডার বেঁধে দিলো যাতে কপালের উপর বেশ একটা ভালো ঢাকা হয়। দিদিমা যে বাতাসের কথা বলেছিলো এখনো তার কোনো চিহ্নই নেই। তার বদলে ক্রমশ তুষারপাত আরো ঘন হয়ে উঠলো। এতো ঘন যে কাছের গাছগুলোকেও ভালো করে চেনা যায় না। মনে হয় বাতাসের মধ্যে তুষারের স্তম্ভ যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথার উপর ভালো করে কাপড়গুলো বেঁধে তারা এগিয়ে চললো। বাছুরের চামড়ার থলিটা কনরাড নিজের কাঁধ থেকে চামড়ার যে ফিতেটা দিয়ে ঝুলিয়েছিলো সেটা ধরে সান্না লাগলো চলতে।

তখনো সেই স্মৃতিস্তম্ভের কাছে তারা পৌঁছয়নি। আকাশে সূর্য নেই বলে কনরাড ঠিক বুঝতে পারলো না কটা বাজে। চারদিকেই একটি ধূসর শাদা রঙ। "আমরা কি শিগগীরই স্তম্ভটার কাছে পৌঁছবো?" সান্না প্রশ্ন করলো। "কে জানে", উত্তরে বললো কনরাড। "আমি তো আর গাছগুলো দেখতে পাচ্ছি না। চারদিকটা শাদা বলে পথটাকেও চিনতে পারছি না। আমার তো মনে হয় স্তম্ভটাকে আজ আর দেখতেই পাবো না। এতো ঘন হয়ে বরফ পড়েছে যে সেটা তো ঢেকে গেছেই এমন কি ঘাসের কোনো ডগা আর কালো ক্রশটার কোনো চিহ্ন

থাকবে বলেও মনে হয় না। তার জন্যে কিছু ভাবিস না। আমরা পথটা ধরে চলি। গাছগুলোর মধ্য দিয়ে স্তম্ভের কাছে পৌছে পথটা নীচে নেমে গেছে। আমরা এখন সোজা পথ ধরে চলবো। গাছগুলো শেষ হলেই দেখবো জিশচেডের মাঠে পৌছে গেছি। তারপর সেই সাঁকো; আর সেখান থেকে আমাদের বাড়িটা তো একেবারে কাছে।"

"হ্যাঁ দাদা, তাই তো," বললো সান্না।

পথটা ক্রমশ চড়াই উঠছে। সেই পথ দিয়ে তারা এগিয়ে চললো। পিছনে তাদের পায়ের দাগ বেশিক্ষণ আর দেখা যাচ্ছে না। ঘন তুষার-বৃষ্টি চটপট ঢেকে দিচ্ছে। গাছের ছুঁচলো পাতার মধ্যে দিয়ে তুষার পড়ার সেই শব্দটাও এখন মিলিয়ে গেছে। তুষারের ফুল শুধু চটপট সেই শাদা কম্বলের উপর নিঃশব্দে বিছিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের জামাকাপড়গুলো আরো জোরে তারা আঁকড়ে ধরলো। নইলে চারপাশ দিয়ে ঝরা তুষার ভিতরে ঢুকে পড়ছে।

বেশ জোরেই তারা হাঁটতে স্বরু করলো। কিন্তু পথটা ক্রমশই যেন উপর দিকে উঠছে। অনেক্ষণ চলার পরেও, যেখানে স্মৃতিস্তম্ভটা থাকার কথা আর যেখান থেকে পথটা জিশচেডের দিকে নেমে যাবার কথা সেখানে তারা পৌছলো না। শেষে তারা এমন একটি জায়গায় এসে পৌছলো যেখানে কোনো গাছপালা নেই। "আমি তো আর গাছপালা দেখতে পাচ্ছি না," বললো সান্না। "রাস্তাটা বেজায় চওড়া আর তুষার-ঝড়ের জন্যেই বোধ হয় কিছু দেখা যাচ্ছে না", উত্তর দিলো কনরাড।

"তাই হবে বোধ হয়," সান্না বললো।

আরো কিছু পরে থেমে গিয়ে কনরাড বললো, "আমিও তো কোনো গাছপালা দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই বন পেরিয়ে আমরা এসেছি। তবু পথটা তো ওপর দিকেই চলেছে। একটু দাঁড়ানো যাক। কোনো চেনা জিনিস হয়তো দেখতে পাবে।"

কিন্তু কিছুই তারা দেখতে পেলো না। উপর দিকে তারা চাইলো—শুধু শাদা ফাঁকা জায়গা। শিলাবৃষ্টির সময় শাদা আর সবুজ মেঘের রাশি থেকে যে-রকম ঝালরের মতো রেখা দেখা যায় এখনো সেই রকমই শুধু নজরে পড়ে। সেই বোবা বৃষ্টি ঝরেই চললো। নীচের দিকে তারা শুধু দেখলো খানিকটা গোল শাদা জায়গা। আর কিছু নয়।

কনরাড বললো, "আমার তো মনে হচ্ছে, সান্না, আমরা শুকনো ঘাসের ওপর এসে পড়েছি। এখানেই তো তোকে গ্রীষ্মকালে বেড়াতে নিয়ে আসতুম। এখানে বসেই তো আমরা দেখতুম ঘাসগুলো ক্রমশ পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে যেখানে স্বন্দর-স্বন্দর বুনো আগাছা জন্মায়। অতএব এখান থেকেই আমাদের ডানদিকে নামতে হবে।"

"হ্যাঁ ভাই, তাই তো।"

"দিদিমা বলেছিলেন আজকের দিনটা খুব ছোট্ট। তুই-ও তো দেখতে পাচ্ছিস। আমাদের চটপট যেতে হবে।"

"হ্যাঁ ভাই, তাই তো।"

"একটু দাঁড়া, তোর জামাকাপড়গুলো আরো ভালো করে ঠিক করে দি।"

নিজের টুপিটা খুলে সান্নার মাথায় সে পরিয়ে দিলো তারপর টুপির ফিতে দুটো তার থুৎনির তলায় ভালো করে দিলো ফাঁস দিয়ে। সান্নার মাথায় আর গলায় যে রুমালটা জড়ানো ছিলো সেটা নেহাৎ পাতলা। কিন্তু কনরাডের একমাথা কোঁকড়া কালো চুলের ভিতর দিয়ে তুষার গলে ভিতরে ঢুকতে যথেষ্ট সময় লাগবে। তারপর নিজের ফারের জ্যাকেটটা খুলে সান্নাকে সে পরিয়ে দিলো। নিজের ঘাড় আর কাঁধের উপর মাত্র একটি শার্ট ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই সান্না যে ছোটো শালটা এতোক্ষণ বুকের উপর জড়িয়েছিলো আর যে-বড় শালটা তার কাঁধের উপর ছিলো—দুটোই সে নিলো। সে ভাবলো তার পক্ষে এই যথেষ্ট, একটু জোরে হাঁটলেই আর শীত করবে না।

সান্নার হাত ধরে সে এগিয়ে চললো। চারদিকের ধূসর-শাদা রঙের উপর নিজের উজ্জ্বল কৌতূহলী চোখ রেখে খুসি হয়েই সান্না হাঁটতে লাগলো। শুধু তার ছোট্ট পা দুটি কনরাডের সঙ্গে সমান তালে তাল রাখতে পারছিলো

না। কনরাড এমন ভাবে হাঁটছে যেন আজকের ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত সে করতে চায়।

কোথাও আর না দাঁড়িয়ে তারা এগিয়ে চললো। এ-রকম অবস্থায় শিশু আর পশুদের দেহে অদ্ভুত একটা শক্তি আসে। কারণ তারা জানে না তাদের কপালে আরো কী লেখা আছে আর কখন-ই বা তাদের সামর্থ্য ফুরিয়ে যাবে।

কিন্তু হাঁটবার সময় তারা কিছুতেই বুঝতে পারলো না পাঁহাড় থেকে নীচে নেমে আসছে কি না। ডানদিকে মোড় নিয়ে নীচের দিকে মুখ করে এবার তারা হাঁটতে স্বরু করেছিলো। কিন্তু তবু আবার তারা এমন পথে এসে পড়লো যেটা কেবলই উপর দিকে উঠেছে, চড়াইয়ের পর চড়াই ভাঙতে হচ্ছে। প্রায়ই তাদের সামনে বড়বড় পাথর পড়তে লাগলো। সেগুলোকে পাশ কাটাবার জন্যে ঘুরে যেতে হোলো। একটি পরিখাপথে তারা এগুচ্ছিলো। সে-পথ তাদের গোল একটি চক্রের মধ্যে ঘোরালো। অনেক উঁচু-উঁচু চড়াই তারা ভাঙলো—তাদের ছোটো-ছোটো পায়ের তলায় সেই চড়াই-পথ বড় বেশি খাড়া বলে মনে হোলো। কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো লাভ হোলো না। যে-পথ তাদের মনে হোলো নীচের দিকে গেছে সে-পথে চলতে গিয়ে হঠাৎ তারা আবিষ্কার করলো হয় সেটা সমতল, নয় গভীর গর্ত কিম্বা এ-পাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত সোজা চলে গেছে।

"ভালো রে ভালো! কোথায় তবে এলুম দাদা?" সান্না প্রশ্ন করলো। "ঠিক বলতে পারি না", উত্তর দিলো কনরাড। "শুধু যদি এমন কিছু দেখতে পেতুম যেটা দেখে কিছুটা আন্দাজ করা যায়!"

কিন্তু তাদের চারদিকে সেই চোখ-ধাঁধাঁনো শাদা রঙ ছাড়া আর কিছুই নেই। চারপাশেই যেন শাদা রঙের জাল বিছানো আর তার ওপাশেই যেন জলন্ত একটি কুয়াশা। সেই কুয়াশা সবকিছুকে যেন গিলে ফেলেছে, ঢেকে ফেলেছে আর সবশেষে আকাশ থেকে শেষহীন তুষারপাতের সঙ্গে মিশে গেছে।

"একটু দাঁড়ানো যাক, সান্না", বললো কনরাড। "আবার একটু থেমে কান পেতে থাকি। হয়তো নীচের উপত্যকার কোনো শব্দ আমরা শুনতে পাবো—হয় কুকুরের ডাক, কিংবা ঘণ্টার শব্দ, মিলের আওয়াজ, কিংবা কারুর গলার স্বর। নিশ্চয়ই কিছু আমরা শুনতে পাবো আর তা হলেই বুঝবো কোন পথে যেতে হবে।"

তাই চুপ করে তারা দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু কিছুই শুনতে পেলো না। আরো খানিক চুপ করে রইলো তারা। কিন্তু তবু কিছু শোনা গেলো না। কোনো শব্দই নেই, খুব অস্পষ্ট আবছা কোনো রকম শব্দই কোথাও নেই। শুধু নিজেদের নিশ্বেস নেবার শব্দ তাদের কানে এলো। সেই নির্মম স্তব্ধতার ভিতর মনে হোলো বুঝি তাদের চোখের পাতার উপর তুষারপাতের শব্দও তারা শুনতে পাবে।

এখনো পর্যন্ত কিন্তু তাদের দিদিমার ভবিষ্যদ্বাণী ফললো না: কোনো বাতাস এখনো ওঠেনি। এমন কি বাতাসের মধ্যে ক্ষীণতম স্পন্দনও কোথাও যেন নেই। এ অঞ্চলে এটা খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা।

অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পর আবার তারা চলতে স্বরু করলো।

"যাকগে, এতে কিছু এসে যায় না সান্না," কনরাড বললো। "ভয় পাসনে—তা হলেই হোলো। আমার সঙ্গে আয়। দেখিস, ঠিক নিয়ে যাবো।—কেবল বরফ-পড়াটা যদি থামতো!"

সান্না অবশ্য মোটেই ভয় পায়নি। তার ছোটো-ছোটো পা বাড়িয়ে আগেকার মতো আবার সে হাঁটতে স্বরু করলো। কনরাড তাকে জলন্ত, শাদা, চোখ-বাঁধাঁনো পথের ভিতর দিয়ে নিয়ে চললো।

কিছু পরে তারা পাথর দেখতে পেলো। প্রচণ্ড উজ্জ্বল শাদা জায়গার ভিতর থেকে নিজেদের অস্পষ্ট অন্ধকার দেহকে পাথরগুলো যেন তুলে ধরেছে। তারা কাছে আসতে-না-আসতেই পাথরগুলো যেন তাদের ঘাড়ে এসে পড়লো! খাড়া সোজা দেয়ালের মতো সেগুলো উঠেছে—এতো সোজা উঠেছে যে কোনো পরিমাণ তুষারই তাদের দুপাশে জমতে পারেনা।

"সান্না, সান্না," কনরাড চেঁচিয়ে উঠলো, "এই সেই পাথরগুলো! আমাদের শুধু সোজা এগিয়ে যেতে হবে, সোজা যেতে হবে!"

তারা সোজা চললো। পাথরের মাঝখান দিয়ে, পাথরের তলা দিয়া তারা চললো। পাথরগুলো তাদের খুসিমতো ডান বা বাঁ দিকে যেতে দিলো না—কেবল একটি সরু পথে তাদের চালিয়ে নিয়ে চললো। কিছু পরে পাথরগুলোও অদৃশ্য হোলো, সেগুলোকে আর দেখা গেলো না। যেমন হঠাৎ তাদের উপর ছেলেমেয়েরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো তেমনি হঠাৎ সেগুলো যেন হারিয়ে গেলো! আবার তাদের চারপাশে সেই শাদা কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই নেই। কোথাও নেই এতোটুকু অন্ধকার। মনে হোলো চারপাশে যেন আলোর ছড়াছড়ি অথচ তিন পা আগেকার জিনিস তারা দেখতে পেলো না। যেন সব কিছুই একটা শাদা অন্ধকারের ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথাও ছায়া পড়েনি। ফলে কোন জিনিসটা কত বড় সেটা মাপবার উপায় নেই। তারা বুঝতেই পারলোনা উপর না নীচু কোনদিকে তরো চলেছে। হঠাৎ তারা পা ফেলে বুঝলো একটা শক্ত চড়াই তাদের সামনে। আর সেই চড়াই যেন জোর করে উপরে তাদের টেনে নিলো।

"আমার চোখ ব্যথা করছে," বললো সান্না।

"বরফের দিকে দেখিস না," কনরাড উত্তর দিলো, "মেঘের দিকে চেয়ে থাক। অনেক আগে থেকে আমারও চোখ ব্যথা করছে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। বরফের দিকে আমাকে চেয়ে থাকতে হবেই, পথটা লক্ষ্য করা দরকার তো! ভয় পাসনে, বুঝলি। যেমন করেই হোক তোকে আমি জিশ্‌চেডে নিয়ে যাবো, কোনো ভয় নেই!"

"বুঝতে পেরেছি দাদা। কোনো ভয় নেই।" [ক্রমশ]

<u>কণ্টকে কমল</u> : পরিমল রায়

রাত্তিরে খেতে বসে হাবুলের গলায় কৈ মাছের কাঁটা ফুটে গেল। কৈ মাছগুলোর রকমই ওই। ভাজা হ'য়ে পাতে পড়েও ওদের আক্রোশ যায় না। হাবুলকে ভালো-মানুষ পেয়ে তলিয়ে যেতে যেতে দিলে ওর গলায় কাঁটার এক খোঁচা বসিয়ে।

মা বল্লেন, জল খা। খেলো জল—এক গ্লাশ, দু' গ্লাশ, তিন গ্লাশ। কিন্তু কাঁটা আটকেই রইলো। এর পর দ্বিতীয় উপায় হ'লো, ভাত চট্‌কে নিয়ে বড় বড় দলা পাকিয়ে গলাধঃকরণ করা। তা'তেও ফল হলো না। দলার পরই হচ্চে কলা। দু'তিনটে মর্ত্তমান বংশীয় কদলী কোঁৎ কোঁৎ শব্দ সহকারে হাবুলের অন্তর্ভুক্ত হলো। তথাপি গলার নিষ্কটক হ'বার লক্ষণ দেখা গেল না। ততক্ষণে বেচারা হাঁপিয়ে উঠেছে। সমস্ত শরীর ঘেমে জল, চোখ দুটো গোল্লা পাকিয়ে গেছে, কেঁদে ফেলে আর কি। বাকি রইলো বমি করা। তা-ও শেষ অবধি বাকী রইলো না। বাথ্‌রুমে গিয়ে হাবুল দিলে গলায় আঙুল চালিয়ে। বেরিয়ে এলো ভাত, বেরুলো কলা, কাঁটার খোঁচায় গলা থেকে রক্তও পড়লো খানিকটা। কিন্তু যাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যে এত কৃচ্ছ্র সাধন, তিনি এপিগ্লাটিসের পাশে সেই যে বিদ্ধ হয়ে রইলেন, আর নড়বার নাম নেই। একটা শেষ চিকিৎসা ছিল, বেড়ালের পায়ে ধরা। বেড়াল কিনা মাছের কাঁটাকে থোড়াই কেয়ার করে, তাই বেড়ালের পা ছুঁয়ে প্রার্থনা জানালে গলার কাঁটা নেমে যায়। কিন্তু বাড়ীতে বেড়াল নেই। ছিল একটা। হাবুলই তা'কে মেরে তাড়িয়েছে।

হাবুল কাঁদো-কাঁদো। বল্লে, "মা, কী হবে?" মা বল্লেন, "হবে আবার কি? ঘুমো গে যা। কাল সকাল-বেলায় দেখ্‌বি, কাঁটা কোথায় চলে গেছে।"

অগত্যা হাবুলকে শয্যাশায়ী হ'তে হ'লো। ঘুমও এলো চট্‌ ক'রে। যে ধ্বস্তাধ্বস্তি-টা গেছে! কিন্তু ভোরবেলা ঘুম ভেঙে ঢোক গিল্‌তেই—খচ্‌। কাঁটা সেই আগেকার মতই কণ্ঠস্থ। গলাটাও যেন একটু ফুলেছে।

এবারে হাবুলের মার যেন একটু ভাবনাই হলো। হাবুলের বাবা এবং দাদারা থাকেন বিদেশে। মা থাকেন হাবুলকে নিয়ে একা। মাঝে মাঝে হাবুলের এক মামা এসে দেখাশুনো ক'রে যান। সে-মামারও আজ দিন পনেরো হ'ল দেখা নেই। মা বল্লেন, "তাই তো, এখন করি কী?"

হাবুল নিজেই বুদ্ধি করে বল্লে, "যাই হাসপাতালে, কাঁটা তুলে' আসি।" মা বল্লেন, "একা পারবি তো যেতে?" হাবুল বল্লে, "কী যে বলো মা!"

হাসপাতালে হাবুলের এক বন্ধুর দাদা হ'লেন আর-এম-ও। তাঁর সাহায্যে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ডাক্তারের দেখা মিল্‌লো। ডাক্তার বল্‌লেন, "কবে বিঁধেছে?" "কাল রাত্তিরে।" "কী মাছ?" "কৈ মাছ"। ডাক্তার বলেন: "হুঁ।" তারপর একটা কাঠিতে তুলো জড়িয়ে তা'তে কী একটা মাখিয়ে বল্‌লেন: "হাঁ করো।" হাবুল হাঁ করলো। ডাক্তার গলার ভিতরে সেই তুলোর ওষুধটা বেশ করে লাগিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গলটা এলো ভারী হয়ে। ঢোক গিল্‌লে কাঁটাটা আর খচ্‌ ক'রে বেঁধে না। গলাটা অসাড় হয়ে গেছে। ঈষৎ ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে হাবুল বল্লে, "এ কী হ'লো?" ডাক্তার হেসে বল্লেন, "রোসো না, এক্ষুনি কাঁটা বা'র ক'রে দিচ্ছি। ওষুধটা ধরেছে বুঝি?"

খানিক বাদে হাবুলকে নিয়ে ডাক্তার আর তাঁর য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট এলেন ছোট্ট একটি ক্যাবিনে। হাবুল বসলো একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে, আর ডাক্তার তা'র মুখোমুখী হ'য়ে একটা টুলের ওপর। ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করতেই অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। কিন্তু য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট কোথায় একটা স্থইচ্‌ টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বিদ্যুৎতের মতো সাদা ঝক্‌ঝকে একটা আলোর রেখা কোত্থেকে ঘরে এসে ঢুকলো, আর হাবুল হাঁ করতেই আলোটা গলায় চলে গেল। এর পর স্থরু হলো কাঁটার সন্ধান। য়্যাসিষ্ট্যাণ্টটি একখানা পুরু খস্‌খসে তোয়ালের সাহায্যে হাবুলের জিভটা টেনে ধর্‌লেন, যা'তে ওটা দৃষ্টির বাধা স্থষ্টি না করে। অন্যের জিভ্‌ ধ'রে টানা খুবই সোজা, বোধহয় মজা-ও লাগে খানিকটা। ভদ্রলোক মজাটা খুব ভালো ভাবেই উপভোগ করতে লাগলেন। হাবুল মা কালীর মত লম্বা জিভ বার করে শ্রীকৃষ্ণের মত ডাক্তার দুজনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাতে লাগলো।

অনেকক্ষণ সন্ধানের পর ডাক্তার বল্লেন, "দেখা গেছে, কিন্তু অনেক ভেতরে। পাওয়া মুস্কিল হবে।" য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট জিভ ছেড়ে দিলেন। হাবুল রসনা সম্বরণ করে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলে। তারপর আবার সেই কালী-কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি! ডাক্তার অনেক তাক করে' চিম্‌টে দিয়ে কাঁটাটি ধরতে যেতেই ওটা পিছিয়ে যায়, চিম্‌টেতে আটকায় না। কখনো আবার হাবুল ঢোক গিলে ফেলে, আর ডাক্তারের দৃষ্টি এলোমেলো হয়ে যায়। তা ছাড়া, নাগাড়ে কতক্ষণই বা ওরকম ভাবে থাকা চলে? দুতিন মিনিটেই হাবুল হাঁপিয়ে ওঠে, একটু জিরিয়ে নেয়, তারপর আবার হাঁ করে, ডাক্তার আবার আস্তিন গোটান। এই রকম চল্‌লো প্রায় এক ঘণ্টা। ডাক্তার দু'জন গলদঘর্ম্ম, আর বেচারা হাবুলের অবস্থা তো বুঝতেই পারো। ধরতে গেলে কাঁটা যায় পিছিয়ে, আর গলার অত নীচে চিম্‌টেও চালানো যায় না।

শেষকালে ঠিক হ'লো, অন্য উপায় দেখতে হবে। য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন একটা যন্ত্র নিয়ে। একটা লম্বাটে জিনিসের একদিকে চাবির রিং-এর মত আছে, ওটা ধরে টানলেই অন্যদিকে একটা লুকোনা ব্রাশ ফুলের মত ফুটে উঠে। হাবুল হাঁ করতেই ডাক্তার যন্ত্রটা গলার ভিতর চালিয়ে দিয়ে রিং ধরে এক টান! হাবুল এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। দম্‌ বন্ধ হবার মত হ'তেই দু'হাত দিয়ে ডাক্তারকে এক ধাক্কা! ডাক্তার চিৎপাত হ'তে হ'তে সামলে গেলেন। উদ্দেশ্যটা ছিল, গলার ভিতরে ব্রাশটা রিংএর টানে খুলে যাবে। তারপর যন্ত্রটা বার করে আনবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাশটা সমস্ত গলাটা একেবারে মুছে' পরিষ্কার করে আনবে। চাই কি, কাঁটাটিও ব্রাশে আটকে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু ওতে একবারের বেশি দুবারে হাবুল রাজী হ'লো না। যন্ত্রটা সাক্ষাৎ যমদূত। কাঁটার বদলে প্রাণটাই টেনে বা'র করে।

এর পর আর কী করা যায়! ডাক্তার আর উপায় না পেয়ে আঙুলে বেশ পুরু করে খানিকটা 'গজ'-এর ন্যাকড়া জড়ালেন। এবারে একেবারে যা'কে বলে দিশী চিকিৎসা। হাবুলকে হাঁ করিয়ে—কতকটা রাগের চোটে—গলার ভিতরে যতটা যায় আঙুল চালিয়ে আচ্ছা করে ঘুঁটে

দিলেন। তারপর আলো ফেলে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, কাঁটা আর নেই, অর্থাৎ স্থানভ্রষ্ট হয়ে ওটা নিম্নগামী হয়েচে। হাবুল অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বাড়ী ফিরলো।

দু'দিন ভালোই কাটলো। কিন্তু তৃতীয় দিন হঠাৎ হাবুলের মনে হ'ল, কাঁটাটা আবার কোত্থেকে এসে জুটেছে। ঢোক গিলতে আবার সেই—খচ্। কী মুস্কিল! হাবুল আর খায় না, শোয় না, ঘুমোয় না। আবার হাসপাতালে যাওয়া অবশ্যই হ'তে পারে না। যে অমানুষিক চিকিৎসা! এবারে গেলে হয়তো গলাটাই দুখণ্ড করে দেবে! কিন্তু যতদিন যায়, গলার যন্ত্রণা তত বাড়ে। হাবুল বলে, "গলাটা, মা, ফুটোই হয়ে গেছে।" আরেকদিন বলে, "ক্যান্সার হ'লো নাকি?" রাত্তিরে ঘুম হয় না। মনে হয়, গলাটা কে চেপে ধরেছে। ধড়ফড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে। মা পড়লেন মহা বিপদে সত্যিই তো, যদি একটা কিছু হয়েই থাকে? শেষকালে একদিন হাবুল নিজেই ভয় পেয়ে গেল। বল্লে, "যাই ডাক্তারকে দেখিয়েই আসি। ডিপ্থিরিয়া হ'লো কিনা, কে জানে!"

ডাক্তার দেখেশুনে বল্লেন, "ও কিছু নয়। কাঁটা আর নেই। অনেক সময় ঐ রকম হয়। কাঁটা গেলেও মনে হয় কাঁটা আছে। কিচ্ছু ভাবনা করো না তুমি। একদম সেরে গেছে।"

হাবুল বল্লে, "কিন্তু ঢোক গিল্লে খচ্ করে' লাগে যে।"

ডাক্তার বল্লেন, "ওটা ইগ্নোর করতে পারো। ওদিকে মন-ই দিয়ো না। তাহলেই দেখবে, কাঁটা আর নেই।"

হাবুল নিশ্চিন্ত হয়ে খুসি মনে বাড়ী ফিরলো।

মা ব্যস্ত হয়ে বসে ছিলেন। হাবুলকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, কী হ'লো?" "ডাক্তার ওটা ইগ্নোর করতে বল্লেন," হাবুল জবাব দিল। হাবুলের মা অস্থির হয়ে উঠলেন। "সে আবার কী চিকিৎসা? এখানেই হবে তো? না, কলকাতা যেতে হবে?" হাবুল একেবারে চাঙ্গা হয়ে ফিরেছে, মনে বেজায় ফুর্ত্তি! মা'র প্রশ্ন শুনে মথায় চট্ করে' একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বল্লে: "এখানেই হবে। তবে টাকা লাগবে কিছু।"

"তা লাগুক্ বাপু। সেরে ওঠা নিয়ে কথা। কত টাকা লাগবে?" হাবুল আরেকটু অগ্রসর হ'ল। বল্লে, "দু'টো সিটিং দিতে হবে। দশটাকা করে' কুড়ি টাকা।"

হাবুলের দু'টো সিটিং হয়ে গেছে। কুড়ি টাকার মালিক হয়ে বন্ধু মহলে তার তখন বেজায় প্রতিপত্তি! রোজ সিনেমা আর রেস্তোরাঁতে চা এবং চিংড়ি কাটলেট।

টাকাটা ফুরিয়ে গেলে, ভাবছে, মা'কে বলবে, ডাক্তার বল্ছেন ওটাকে একেবারে 'ডিস্মিস্' করে ফেলতে। এক সিটিংয়েই হবে, তবে ফি বত্রিশ টাকা।

পদীপিসির বর্মি বাক্স : লীলা মজুমদার

[পূর্বানুবৃত্তি] রান্নাঘরে আনন্দ কোলাহল! এমন কথা ত' জন্মে শুনিনি। অবাক্ হ'য়ে এগিয়ে বাগিয়ে চল্লাম। বারান্দার বাঁকে ঘুরেই দেখি চাকর-বাকররা বিষম ঘটা ক'রে অতিথি সৎকার করছে। কে একটা রোগা লোক ঠ্যাং ছড়িয়ে বামুনঠাকুরের উঁচু জলচৌকিতে বসে রয়েছে। চারিদিকে পানবিড়ি আর কাঁচি সিগারেটের ছড়াছড়ি। বামুনদিদি পর্য্যন্ত ঘোমটার মধ্যে বিড়ি টান্ছে। ঘনশ্যাম-ট্যাম সবাই উপস্থিত আছে, পান খেয়ে খেয়ে সব চেহারা বদ্লে ফেলেছে।

আমার পায়ের শব্দ পেয়েই নিমেষের মধ্যে রান্নাঘর ভোঁভাঁ, কে যে কোথায় চম্পট্ দিলো ঠাওরই করতে পারলাম না। চোখের পাতা না ফেল্তেই দেখি কেউ কোথাও নেই, খালি বামুনদিদি ঘোমটার ভিতরে হাই তুল্ছে এবং বিড়িটার শেষচিহ্ন পর্য্যন্ত গোপন ক'রে ফেলেছে! কিন্তু একটা জিনিস আমার চোখ এড়াতে পারেনি। ঠ্যাং ছড়ানো রোগা লোকটা হচ্ছে আমাদের পরিচিত সেই চিম্ড়ে ভদ্রলোক। ভাবতে ভাবতে গা শিউরে উঠলো! এতদূর সাহস যে ভোরবেলা দূরবিন দিয়ে পরখ ক'রে নিয়ে দুপুর না গড়াতে একেবারে ভেতরে এসে সেঁদিয়েছে!! চুলগুলো আমার সজারুর কাঁটার মতন্ উঠে দাঁড়ালো। বামুনদিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কে লোকটা?" বামুনদিদি যেন আকাশ থেকে পড়লো।

"কোন্ লোকটা খোকাবাবু? তুমি আমি ছাড়া আর ত' লোক দেখ্ছি না কোথাও!" বলেই সে স'রে বস্লো,

অমনি তার কোলের মধ্যে কতকগুলো রূপোর টাকা ঝন্ঝন্ করে বেজে উঠ্লো। বুঝ্লাম ঘুষ দিয়ে চাকর সম্প্রদায়কে হাত করেছে! কি ভীষণ!!

এদিকে পাঁচুমামার সঙ্গে পরামর্শ করব কি! সে যে সকাল থেকে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে তার আর কোনও পাত্তাই নেই। একবার কি একটা গুজব শুনেছিলাম নাকি ভুলে বেশী জোলাপ খেয়ে ফেলেছে। তবুও তখুনি তার খোঁজে বেরুলাম। চার-পাঁচটা ভুল দরজা খুলে চার-পাঁচবার তাড়া খাবার পর দেখি পূব দিকের ছোট ঘরে তক্তপোষের ওপর শুয়েশুয়ে পাংশু পানা মুখ ক'রে পাঁচু মামা পেটে হাত বুলুচ্ছে। আমাকে দেখেই বিষম বিরক্ত হয়ে নাকি স্বরে বল্লো, "কেন আঁবার বিরক্ত কঁরতে এঁসেছ। যাঁওনা এঁখান থেঁকে!" আমি বল্লাম, "চারদিকে যে রকম ষড়যন্ত্র চলেছে এখন আর তোমার আরাম ক'রে শুয়েশুয়ে পেটে হাত বুলুনো শোভা পায় না! এদিকে শত্রু এসে ঘরে ঢুকেছে সে খবর রাখ কি?" পাঁচুমামা কোথায় আমাকে হেল্প্ করবে না তাই না শুনে এম্নি ক্যাঁওম্যাঁও সুরু ক'রে দিলো যে আমি সেখান থেকে যেতে বাধ্য হ'লাম।

সারাদিন ভেবে ভেবেও একটা কুলকিনারা করতে পারলাম না। রাত্রে দিদিমা পাশে শুয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্লেন, "বলেছিলাম তোকে পদীপিসির বর্মি বাক্সের গল্প বল্ব, তবে শোন্।"

দিদিমা সবুজ বালাপোষ ভালো ক'রে জড়িয়ে গালের পান দাঁতের পেছুনে ঠুসে গল্প বলবার জন্যে রেডি হ'লেন। আর আমার বুক টিপ্‌টিপ্ করতে লাগলো। দিদিমা বল্তে লাগ্লেন, "পদীপিসির ইয়া ছাতি ছিলো, ইয়া পাঞ্জা ছিলো। রোজ সকালে উঠে আধসের দুধের সঙ্গে এক পোয়া ছোলা ভিজে খেতেন। কি তেজ ছিলো তাঁর। সত্যিমিথ্যে জানি না, শুনেছি একবার একটা শাম্লা গোরু হাম্বাহাম্বা ডেকে ওঁর দুপুরের ঘুমের ব্যাঘাত করেছিলো বলে উনি একবার তার দিকে এম্নি ক'রে তাকালেন যে সে তিনদিন ধরে দুধের বদলে দই দিতে লাগ্লো। পদীপিসি একবার শীতকালে গোরুর গাড়ী চেপে কাউকে কিছু না বলে রমাকান্ত নামে একটি মাত্র সঙ্গী নিয়ে কোথায় জানি চলে গেলেন। ফিরে এলেন দুপুর রাত্রে। এসেই মহা হৈ-চৈ লাগালেন কি একটা নাকি ওঁর বর্মি বাক্স হারিয়েছে। সবাই মিলে নাকি দেড় বছর ধ'রে ঐ বাক্স খুঁজেছিলো। কোথায় পাওয়া যাবে! কেউ চোখেই দেখেনি সে বাক্স! শেষ পর্য্যন্ত সে পাওয়াই গেলো না!" আমি নিশ্বেস বন্ধ ক'রে বল্লাম "তাতে কী ছিলো?"

দিদিমা বল্লেন, "কে জানে! মশলা-টশলা হবে। ঐ পদীপিসির একটিমাত্র ছেলে ছিলো, তার নাম ছিলো গজা। কালো রোগা ডিগ্‌ডিগে, এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া তেলচুক্‌চুকে চুলে টেড়ি বাগানো। দিন রাত কেবল পান খাচ্ছে আর তামাক টান্ছে। পড়াশুনো কি কোনও রকমের কাজকর্মের নামটি নেই। সারাদিন গোলাপী গেঞ্জি আর আদ্দির ঝুলো পাঞ্জাবী প'রে পাড়াময় টোটো কোম্পানি। সখের থিয়েটার, এখানে ওখানে আড্ডা। অথচ কারু কিছু বল্বার যো নেই, পদীপিসি তা হ'লে আর কাউকে আস্ত রাখ্বেন না।

"জানিস্ ত' ভালো লোকের কখনও ভালো হয় না। যত সব জগতের বদ্মায়েস আছে সবাই সুখে জীবন কাটিয়ে যায়। গজারও তাই হ'ল। যখন আরও বড় হ'ল, গাঁজা গুলি খেতে শিখ্ল, জুয়োর আড্ডায় গিয়ে জুটলো। মাঝেমাঝে একমাস দুমাস দেখা নেই। আবার একগাল পান নিয়ে হাস্তে হাস্তে ফিরে আসে। পদীপিসি যেখান থেকে যেমন ক'রে পারেন টাকা জোগান। পাজী ছেলেকে পায় কে!

"হঠাৎ দেখা গেলো গজার অবস্থা ফিরেছে। কথায় কথায় বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে পাঁঠার মাংস খাওয়ায়, ঝুড়ি ঝুড়ি সন্দেশ আনে। একবার সমস্ত চাকরদেব গরম বেনিয়ান কিনে দিলো। ঘোড়ারগাড়ী কিন্লো, হীরের আংটি কিন্লো। বাড়ীশুদ্ধ সবাই থরহরি কম্পমান! কে জানে কোথা থেকে এত টাকা পায়!! পদীপিসি অবধি চিন্তিত হলেন। অথচ চুরী ডাকাতি করলে ত এতদিনে পেয়াদা এসে হানা দিতো! টাকা ভালো, কিন্তু পায় কোথা?"

[ক্রমশ]

আমাদের লাইব্রেরী :

জোড়াসাঁকোর ধারে : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীরাণী চন্দ। বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। দাম তিন টাকা।

ভালো গল্প বলতে পারা খুব সহজ কথা নয়। বাংলাদেশে আগে ঘরে-ঘরে গল্প বলার খুব রেওয়াজ ছিলো। আমরাও ছোটোবেলায় অনেকের মুখে অনেক সব সুন্দর-সুন্দর গল্প শুনেছি। বর্ষাকালের রাতে আর শীতকালের সন্ধেয় নানা গল্প-শোনার স্মৃতি আজও ভাবতে ভারি ভালো লাগে। আজকাল দেখছি সেই গল্পবলার রেওয়াজ যেন ক্রমশ কমে যাচ্ছে। তাই এই বইটি পড়ে অনেক দিন পরে আবার যেন গল্পশোনার আনন্দ নতুন করে পেলুম। পড়লে তোমরাও পাবে। এ-যুগের শ্রেষ্ঠ গল্প-বলিয়ে অবনীন্দ্রনাথ। আর সে সব গল্প যে-সে গল্প নয়—জোড়াসাঁকোর গল্প, রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ যে আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন তার সব আশ্চর্য গল্প। কত আজব মানুষ জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দায় একদিন জড় হয়েছে—কেউ বা গায়ক, কেউ বা ম্যাজিকওলা, কেউ বসে-বসে শুধুই গড়গড়া টানে, কেউ হঠাৎ পকেট থেকে মহামূল্যবান হীরে-জহরৎ বার করে—তাদের সব গল্প এ-বইতে পাবে। পড়তে-পড়তে মনে হবে আশ্চর্য এক রূপকথার রাজ্যে যেন এসে পড়েছো। সেখানকার আশ্চর্য আলো, আশ্চর্য রঙ, আশ্চর্য ছবি তোমাদের চমকে দেবে। অবনীন্দ্রনাথ শুধু রঙেরই রাজা নন, কথারও রাজা। সুখের আর দুঃখের নানা রকম রসে ভরা এই বইটি। অবনীন্দ্রনাথ নানা সময়ে নানাভাবে যে-সব গল্প বলেছেন শ্রীরাণী চন্দ ঠিক সেই রঙ সেই রস বজায় রেখে তা লিখে গেছেন! এটি খুব সহজ কথা নয়। তোমরা সবাই এই বইটি পড়ে দেখো—এ-রকম বই বাংলাভাষায় খুব বেশি নেই।

সম্পাদকের দপ্তর :

এই সংখ্যার সঙ্গে-সঙ্গে রংমশালেরও বছর ফুরুলো। বৈশাখ মাস থেকে রংমশালের নতুন বছর আরম্ভ হবে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো গ্রাহক থাকবে, অনেক নতুন গ্রাহকও আসবে, কেউ-কেউ হয়তো আর গ্রাহক থাকবে না। তোমাদের সবাইকার জন্যেই সর্বদা আমাদের শুভকামনা রইলো।

রংমশাল পত্রিকা সম্পাদনা করার আগে আমরা অনেক কিছু করবো ভেবেছিলুম। কিন্তু বলতে গেলে তার কিছুই প্রায় করতে পারিনি। এর প্রধান কারণ হোলো সরকার বাহাদুরের নতুন কাগজ নিয়ন্ত্রণের আইন। পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়াবার জন্যে আমরা নানা চেষ্টা করেছিলুম। শেষে নিউজ-প্রিন্টে ছাপাবার অনুমতিও পেয়েছিলুম। কিন্তু হিসেব করে দেখা গেলো যে নিউজ-প্রিন্টে ছাপলেও বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যার চেয়ে বেশি আমরা ছাপতে পারি না। ফলে সেটি প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে।

প্রেসের গোলমালের জন্যে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করতেও আমরা পারিনি। ম্যালেরিয়া ও বসন্তের মহামারীতে বাংলাদেশের লোকেরা প্রায় উজাড় হতে চললো। সহরে যারা প্রেসের কাজ করে দেখলুম তাদের উপর দিয়েই যেন এই দুর্দিনের ঝড় সবচেয়ে বেশি বয়ে গেছে! কলকাতার প্রায় সব প্রেসেই অর্দ্ধেকের উপর কর্মচারীর দেখা নেই। আশাকরি আগামী বছরে এই কালো ছায়া মিলিয়ে যাবে।

আগামী বছর থেকে রংমশালের পৃষ্ঠা-সংখ্যা আরো কিছু বাড়াতে পারবো আশা করছি। দামও কমানো হোলো। অনেক নতুন ভালো লেখার আয়োজনও করেছি। তা ছাড়া তোমাদের লেখা নিয়মিত 'রংমশাল বৈঠকে' ছাপাবার ব্যবস্থাও হয়েছে। যারা পুরো বছরের গ্রাহক হবে তারা নানা রকম সুবিধে পাবে। একটি কথা মনে রেখো—নতুন বছরের গ্রাহক হতে হলে যে-কোনো মাস থেকে আর গ্রাহক হওয়া চলবে না। হয় বৈশাখ থেকে চৈত্র, কিংবা বৈশাখ থেকে আশ্বিন, কিংবা আশ্বিন থেকে চৈত্র—এই ভাবে বার্ষিক ও ষান্মাসিক গ্রাহক হতে হবে। তবে যে-কোনো মাসেই গ্রাহকের চাঁদা পাঠাতে পারো। আগামী বছরে খাপছাড়া মাসে যাদের চাঁদা শেষ হয়েছে তাদের বাকী ক'মাসের চাঁদা দিয়ে হয় ষান্মাসিক নয় বার্ষিক চাঁদা পুরো করে দিতে হবে। মনে রেখো রংমশালের

পুরো বছরের গ্রাহকেরাই নানা রকম সুবিধে পাবে—ষান্মাসিক গ্রাহকেরা পাবে না।

নতুন ধাঁধা :

সে-বছর শ্রাবণ মাসের এক বিশেষ সপ্তাহে দেখা গিয়েছিলো রবিবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত গড়পড়তায় দৈনিক যতটা বৃষ্টি পড়েছিলো তার পরিমাণ সোমবার থেকে শনিবার গড়পড়তায় দৈনিক যতটা বৃষ্টি পড়েছিলো চেয়ে শতকরা ১৬⅔ বেশি। গড়পড়তায় সমস্ত সপ্তাহটাই রবিবারের মতো ভিজে ছিলো। তা হলে বলতে পারো কি শনিবার কতটা বৃষ্টি পড়েছিলো?

উত্তরদাতাদের নাম বৈশাখে ছাপা হবে।

চৈত্রমাসের ধাঁধাঁর উত্তর :

প্রথম লোক কী বলেছিলো? সে যদি গুহার লোক হয় তা হলে তো মিথ্যে বলতেই পারে না এবং তা হলে নিশ্চয়ই সে বলেছে যে সে গুহার লোক। যদি সে গাছের লোক হয় তা হলে মিথ্যে ছাড়া সে তো অন্য কিছু বলতেই পারে না এবং তাহলেও নিশ্চয়ই সে বলেছে যে সে গুহার লোক। যাই হোক, প্রথম লোকের পক্ষে শুধু একটি কথাই বলা সম্ভব: সে গুহার লোক। তা হলে দ্বিতীয় লোক যখন বললো যে প্রথম লোক বলেছে যে সে গুহার লোক তখন মানতেই হবে দ্বিতীয় লোকটি সত্যবাদী—অর্থাৎ গুহার লোক। তৃতীয় লোক যখন এর উল্টো কথা বলেছে তখন তৃতীয় লোকটি নিশ্চয়ই মিথ্যেবাদী—অর্থাৎ গাছের লোক।

রংমশালের নিয়মাবলী

রংমশালের হয় বার্ষিক, না হয় ষান্মাসিক গ্রাহক হতে হয়। বৈশাখ থেকে বর্ষ আরম্ভ। বৈশাখ থেকে চৈত্র, কিংবা বৈশাখ থেকে আশ্বিন, কিংবা আশ্বিন থেকে চৈত্র—এই ভাবে গ্রাহক হতে হবে। নতুন গ্রাহক হলে মনি অর্ডার কুপনে "নতুন গ্রাহক" এই কথাটি এবং নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকা দরকার। নমুনা সংখ্যার জন্যে।৫ ডাক-টিকিট পাঠাতে হয়। অমনোনীত রচনার সঙ্গে ফেরৎ পাঠাবার ডাকটিকিট না থাকলে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করে ফেলা হয়; ভবিষ্যতে সে সম্বন্ধে কোনো খবর জানানো তাই সম্ভব নয়। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি সমস্তই নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে:

C/o সংকেত ভবন
৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট
পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা।

চৈত্র মাসে যাদের চাঁদা শেষ হোলো তাদের কাছ থেকে কোনো খবর না পেলে যথাসময়ে আগামী বছরের রংমশাল ভি. পি. যোগে পাঠানো হবে। আশাকরি ভি. পি. ফেরত দিয়ে আমাদের কেউ ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

১৩৫২ সালের রংমশালের দাম কমানো হোলো। বার্ষিক ৩৲, ষান্মাসিক ১৷৽ এবং প্রতি সংখ্যা।৽। ইতিমধ্যে যারা ১৩৫২'র চাঁদা পাঠিয়েছো নতুন চাঁদার হারে হিসাব করে তাদের বাড়তি রংমশাল দেওয়া হবে।

আগামী বছর থেকে রংমশালে নানা নতুন ধরণের লেখা থাকবে। তোমাদের প্রিয় লেখকরা তো নিয়মিত লিখবেনই। যারা পুরো বছরের গ্রাহক থাকবে তারা অনেক রকম সুবিধে পাবে।

'সংকেত' পত্রিকার পরিবর্তে যাঁরা রংমশাল পাচ্ছিলেন চৈত্র মাসের সঙ্গে তাঁদের চাঁদাও শেষ হোলো। তাঁদের কাছ থেকে কোনো খবর না গেলে ১৩৫২'র রংমশাল যথাসময়ে ভি. পি. করে পাঠানো হবে।

ছেলে-মেয়েদের

ভবিষ্যতের জন্য আপনি কোনও সংস্থান করেছেন কি ?

উপযুক্ত লেখাপড়ার ?
সৎপাত্রে বিবাহ দিবার ?
সংসারে প্রবেশ করবার
উপযুক্ত পাথেয়ের ?

অভিভাবক

হিসাবে ব্যবস্থা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনারই, কিন্তু হিন্দুস্থান সর্ব্বদা সে দায়িত্ব পালনে আপনার সহায়তা করতে প্রস্তুত।

শিশুদিগের মেয়াদী বীমা
বিলম্বে প্রাপ্য শিশু-বীমা

যে কোনওটি আপনার প্রয়োজন মত হিন্দুস্থান থেকে আপনি নিতে পারেন।

১৯৪৪-এর নূতন বীমা
১০ কোটি টাকার উপর

হিন্দুস্থান

কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি
লিমিটেড্
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

প্রসাদ চট্টোপা
২০০্ টাকা পুরস্কার!

রচনার নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
	য	
যার চেয়ে নাই সুন্দর	ফল্‌গু কর	৩০১
	র	
রংমশাল বৈঠক	১৮, ৪৩, ৬৬, ৯১, ১২০, ১৫৪, ১৮৬, ২২১, ২৫৭, ২৯৫, ৩৩১, ৩৭৬	
'রংমশাল'	পরিতোষকুমার চন্দ্র	১১০
রবার্ট কোচ্ আর-ক্ষুদে-শয়তান	দেবীপ্রসাদ	১৯৬
	ল	
লড়াই থামার পন্থ	বিমলচন্দ্র ঘোষ	২৩
লড়াই ফেরত নানকুদা	শ্রীশামুক	৬০
লেখা	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৯৫
লিউএনহুক	দেবীপ্রসাদ	১৭৭
	শ	
Shoe-শিক্ষা	বুদ্ধদেব বসু	১২

রচনার নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
শ্বেত চক্র	কামাক্ষীপ্রসাদ	১০
	১৪৩, ১৭২, ২১০, ২৪১, ২৬৫, ৩০৫, ৩	
শাল সামিয়া সোয়ালো	মহাশ্বেতা ঘটক	১
শিক্ষার চাকা	কৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ী	৩
	স	
সম্পাদকের দপ্তর	২০, ৪৪, ৭০, ৯২, ১২১, ১৫	
	১৮৯, ২২৩, ২৫৮, ২৯৭, ৩৩৫, ৩	
সিংহ শাবকের শিক্ষা	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোঃ	
সত্যিকারের এ্যাডভেঞ্চার	বংশীবদন মুখোপাধ্যায়	১
সাগর	ফল্‌গু কর	১
সত্যিকথার ঝুড়ি		১
সোনার বরণ চিল	অমল চট্টোপাধ্যায়	২
সোনালী রঙ	দিলীপ দে চৌধুরী	৩
	হ	
হিজিবিজি	দিলীপ দে চৌধুরী	২